

সৌরভ

বার্ষিক পত্র ও সমালোচন ।



—সম্পাদক—

শ্রী কৈলাসচন্দ্রনাথ মজুমদার :

—:0:—

—অষ্টম বর্ষ—

কার্তিক ১৩২৬ ইহতে আশ্বিন ১৩২৭ ।

—:0:—

অক্ষয়মসিংহ ।

বার্ষিক মূল্য—দুই টাকা ।

বিষয় সূচী ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অজানা দেশ (চিত্রিত চিত্র)	শ্রীযুক্ত নবেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৭
অশ্রু (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় শুক্ল	২৮
অশ্রুমালা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য	১০৭
আধুনিক উপভাস ও গল্প	শ্রীযুক্ত মনোজ্ঞান শুক্ল	৪২
আগ্নেয় গিরি ও ভূমিকম্প	শ্রীযুক্ত হরচরণ শুক্ল	১০০
আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথ	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসী	২২৩
আলফোর্স দোদে	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্রন ঘোষ এম, এ,	৬৬
আলেকসান্ডরের পঞ্চদশ আক্রমণ	শ্রীযুক্ত অভুলবিহারী শুক্ল বি এ,	১৬৯, ২০৯
আলোক পাখী	শ্রীযুক্ত হরিচরণ শুক্ল	২৪
আলোর ঐর্ষ্য (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য	২২৫
ইতিহাসের কয়েকটি কথা	কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ এম, এ,	১৩
একটি পয়সা (গল্প)	৮ অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ, বি, এল,	৬১
কপোতী (কবিতা)	শ্রীমতী বিভাবতী সেন	৯২
কবি মধুসূদন	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার কর বি, এল,	৭০, ৯৭
কাবুলে বাজালী	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিভাজুষণ	৮৭
কাব্যের শিক্ষা	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার কর বি, এল,	১৪৭
কামন্দকীর নীতি সার	কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ এম, এ,	১২১
কুস্তীরের কার্য্য	শ্রীযুক্ত মাদুরীমোহন মৃণোপাধ্যায়	১৪০
কোকিল শাবকের কর্ণ	শ্রীযুক্ত হরিচরণ শুক্ল	৬৯
কোমরভাঙ্গা কুরুর (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৬৮
ধোলা বনাম ব্যারাম	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ শুক্ল এম, এ,	১৫৬
গবেষণা (গল্প)	শ্রীযুক্ত অপুষ্ককৃষ্ণ ঘোষ	১৩৭
গ্রন্থ সমালোচনা		৭০, ৯৬, ১৪৪, ২৫৬
চন্দ্রলোকের পথে	শ্রীযুক্ত হরিচরণ শুক্ল	১২৮
চিত্রাঙ্গদা কাব্য প্রসঙ্গ	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার কর বি, এল,	২৩০, ২৫৭
চিনির নুতন উপকরণ	শ্রীযুক্ত হরিচরণ শুক্ল	২৩
জলকে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১১০
জীবজন্তুর পরমায়ু	শ্রীযুক্ত হরিচরণ শুক্ল	৭০
জ্যোতিষে অনুভববাদ ও পুরুষকার	শ্রীযুক্ত বক্তব্যচন্দ্র কাব্যাতীর্থ	১৫০
জ্যোতিষে প্রত্নতত্ত্ব	এ	২০০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জ্ঞান পথের সহায় ও অন্তরায়	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার কন্ন বি,এল, ...	২
টুর্গেনিভের পঞ্চ কাব্য	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ...	১,২৫
ভূমি ও আমি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত ...	১০৯
ভ্যাক্সেন ভূগোলা	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ...	২২৬
দান ও দয়া	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম,এ, ...	২১৭
দিদিমা (গল্প)	সম্পাদক ...	১১৩
নববর্ষ	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ...	১৪৫
নাস্তিক (গল্প)	কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ রায় বাহাদুর বি,এ, ...	২৯
না হের নানা নন্না	শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায় বিজ্ঞানন্দ বি,এ, ...	১৫৪
নিয়তি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ ...	৯৬
নেপালী দরবার	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিজ্ঞানভূষণ ...	১২৩
স্নাতা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বি,এল, ...	১৫৮
পতিরতা	শ্রীযুক্ত মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় ...	২০২
পিতৃভক্তি (জর্জাণ গল্প)	সম্পাদক ...	২২৯
প্রকৃতির প্রতি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ...	২৫৩
প্রভাত (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সত্যজিত চৌধুরী ...	১৪৯
✓প্রাচীন কবিগান	শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য ...	৯০
বাঙ্গালার পাখী (বুলবুল)	রাজা শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ সিংহ ...	১১১
বাল বিধবা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ...	১৫২
বিপর্ধ্যয় (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ...	১৮৪
বিমান মার্গে ট্রাম	শ্রীযুক্ত মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় ...	১৪০
বেলিয়া (কবিতা)	শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত ...	৭
বৈদিক যুগে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম,এ, ...	২৬
ভগ্নমন্দির (কবিতা)	শ্রীযুক্ত বিজয়কান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ...	৫২
ভারতে ইংরেজ	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চক্রবর্তী ...	২৩৫
ভারতীয় জ্যোতির্বিদ—ব্রহ্মগুপ্ত	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বি,এস, সি ...	১১৮
ভারতীয় জ্যোতির্বিদ—তাকরাচার্য্য	ঐ ...	১৪১
মঙ্গল গ্রহের খবরাখবর	শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত ...	১২৮
মল্লিকা শরীরের উপাদানের মূল্য	শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত ...	২৩
মরমনসিংহের কবি কাহিনী—কবি হারাইল বিশ্বাস	শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য ...	১৩১
✓মরমনসিংহের বাউল সঙ্গীত	ঐ ...	৫৮
মহারাজচন্দ্রগুপ্ত	শ্রীযুক্ত অভুলবিহারী গুপ্ত বি,এ, বি,এস সি, ...	২৩৮
মধুমক্ষীর দোহা	শ্রীযুক্ত মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় ...	১৪৪
মা আনন্দময়ী (চিত্র)	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত ...	২০২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মিলনের ব্যাধি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার এম,এ, ...	১৪৪
মেসমেরিজম (ইংরেজী গল্প)	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ...	২৭৪
মোকলাত (কবিতা)	কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বি,এ, ...	১৬৮
মোটর বাগী	শ্রীযুক্ত মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় ...	১৪৪
রক্তক ও রাসত (কবিতা)	শ্রী— ...	২৫৬
রবীন্দ্র প্রসঙ্গ	শ্রীযুক্ত সত্যজিত চৌধুরী ...	১৮৬
রাজা রামমোহন রায়	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার কর বি,এল, ...	৬১
শক্তিপূজা	শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত ...	১৩৩
শকাব্দভূতি	ঐ ...	১২৭
শোক সংবাদ	১২০
শ্মশান বন্ধু (গল্প)	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকিশোর সরকার ...	৮০
শ্রদ্ধা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিত্বরণ ...	২৩৭
সঙ্গীতের ব্যয়	শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত ...	২৩
সত্য (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র রায় বি,এ, ...	১১২
সমস্যা (সামাজিক উপন্যাস)	৮,৪৪,৫২,৭৭,১০৬,১২৫,১৬০,১৭২,২১২,২৪৪,২৬৩	
সাধু দর্শন	শ্রীযুক্ত মদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি,এল, ...	১৫২
সুনিদ্রা ও অনিদ্রা	শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত ...	২৪
স্বর্গীয় পণ্ডিত দুর্গানন্দর কৃতিরায়	শ্রীযুক্ত দুর্গানন্দর বিজ্ঞাবিনোদ ...	২৪২
স্বতির বিচার (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র চৌধুরী বি,এ, ...	১৩
স্বপ্নর রাণী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ...	২৭৪
সুত্র ভুল (গল্প)	সম্পাদক ...	২৫৪

সৌরভ

অষ্টম বর্ষ।

ময়মনসিংহ, কার্তিক, ১৩২৬।

প্রথম সংখ্যা।

টুগনিভের গল্প কাব্য।

প্রার্থনা ১

মাহুশ বাবা কিছু পাইবার জন্য প্রার্থনা করে তাহারা
মূলে কিছু একটা অলৌকিক কাজ রহিয়াছে।
প্রত্যেক প্রার্থনার পর কথা এই—হে মহানুজগদীশ্বর,
যেন দুই আর দুইয়ে চার না হয়, তাহাই কর।

প্রত্যেক মাহুশের প্রকৃত প্রার্থনাই এইরূপ। পার্থিব
শক্তির নিকট, অগাধতার নিকট, নানা দার্শনিকের
নানা মতের নানা দেবতার নিকট এবং নানাকার
ভগবানের নিকট যে সমস্ত প্রার্থনা করা হয়, সেই সমস্ত
অসঙ্গত ও অশাসনীয়।

কিন্তু ব্যক্তিগত, জীবন্ত মুক্তি ভগবান্ কি দুই আর
দুইয়ে চার না করিয়া পারেন?

প্রত্যেক বিশ্বাসী উত্তর দিতে বাধ্য, তিনি তাহা
পারেন এবং তাহা করাইতে তাহাকে যুক্তি পরামর্শাদির
সাহায্য প্রয়োচিত করিতে বাধ্য করেন।

কিন্তু যদি যুক্তি তাহাকে এত নিষ্কুণ্ঠতার বিরুদ্ধে
বিরোধী করিয়া তুলে?

তখন মহা কবি সেকুপিয়ার বিশ্বাসীকে সাহায্য
করিতে আসেন। “হেরেশেরো, বর্ণে ও মতে আরও
এমন কিছু আছে—” ইত্যাদি।

যদি বিশ্বাসীরা সত্যের ধোঁয়াই দিয়া তাহাদের এই
মতদলব ধ্বংস করিতে আরম্ভ করে, তবে তিনি এই
বিখ্যাত প্রশ্নটি উত্থাপন করিতে পারেন—সত্য ক?

সুতরাং তবে আর কি—এস আমরা খাই দাই,
মলা করি, আর বাধা তুলি আওড়াইয়া প্রার্থনা করি।

মাথার খুলি।

বহু মূল্যে এবং পূর্ণ একটি সুসজ্জিত সুরক্ষণ প্রকোষ্ঠ।
অনেক ছাত্র মহিলায় ও পুরুষে বরতী ভরা।

সকলের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল—বেশ গল্পগুণব চলিতেছে।
জনৈক বিখ্যাত গায়িকার সম্বন্ধে মজার কথাবার্তা হই-
তেছে। তাহারা তাহাকে স্বপরিদেবী বলিয়া মনে করে।
ওঃ, কাল সে কেমন সুমধুর শেখ গানটি গাহিয়াছিল।
এখনো কাণে সেই গানের রেশ লাগিয়া রহিয়াছে।

হঠাৎ বাতাসেরে বাতাস মত প্রত্যেকের মাথার ও
মুখের চামড়ার আবরণ সরিয়া পেল। সঙ্গে সঙ্গেই মরা
মাহুশের মাথার শাদা খুলির মত সব শাদা শাদা খুলি
সমুদ্রে! মাংস বিহীন মূলের হাড় ও মাড়িগুলি এখানে
সেখানে দোঁলিয়া চক্ষু স্থির।

ভাষণ করে আমি ঐ সব চোয়ালের ও মাড়ির নড়া
চড়া দেখিতে লাগলাম। মোমবাতির আলোকে ঐ
সমস্ত পিণ্ডময় হাড়ের বলগুলা কক্ষমক করিতেছিল।
আবার গোল গোল গঠনগুলির ভিতর অর্ধশূন্য চক্ষুগুলি
বুরিতে ফিরিতেছিল।

আমি নিজেই আমার মুখ স্পর্শ করিতে সাহস
করি নাই; নিজেকে আয়নাতে দেখিতেও বুকে বণ
পাইলাম না।

মাথার খুলিগুলি পূর্বের মত ইতস্ততঃ বুড়িতেছিল।
কণ্ঠস্বরও ঠিক আগেকার মতনই। টুকরা টুকরা হেঁড়া
শাপ বস্ত্রধরের মত তাহাদের জিহ্বাগুলি কেমন অদ্ভুত
ভাবে আদ আদ কথা বলিতেছিল। হাঁ, কেমন সুন্দর
ভাবে অমরী পায়কা সুমধুর শেখ গানটি গাহিয়াছিল।

বুড়া মানুষ ।

জীবন মহা তিমিরে বিবিল । দেহ শক্তিহীন, আশা-
হীন জীবনে প্রিয়জনের দুঃখ, বার্ক্ক্যের তমসা সমাগত !
তুমি যাহা কিছু ভালবাসিতে, যাহা কিছু প্রিয় মনে
করিতে, যাহা কিছু আশ্রয় করিয়াছিলে—সে সব শতদা
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে ! এখন পতনের পথে, পথসের
মুখে ধাবিত হইতেছে ।

তুমি কি করিতে পার ? দুঃখ কল্যাণ ? ক্রন্দন ?
কিন্তু তাহাতে কোনো ফল নাই—না নিজের, না পরের ।

হুইয়ে পড়া শুকনো গাছের পাতা গুলি আকারে
ছোট, সংখ্যাতেও কম ; কিন্তু ভিতরটা আগেকার মতই
সরস ও সবুজ !

তুমি অন্তর্মুখী হও ; নিজের ভিতরে, নিজের
স্বতির ভিতরে ডুবিয়া যাও ! আত্মার অন্তস্তলে প্রবেশ
লাভ কর ; অতীতের স্মৃতি উল্টাটন তোমারই হাতে !
দিন আসিবে । শুভ বসন্ত সুরুয়ার সরস সৌন্দর্য্য আবার
আনয়ন করিবে ।

হা হতভাগ্য বুড়া, সাবধান—আর সম্মুখে তাকাইও না ।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ।

জ্ঞানপথের সহায় ও অন্তরায় ।

গত জুন সংখ্যক ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রে The
Intellectual Life (সাহিত্যিক জীবন) নামক
একটা সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । বিজ্ঞ
লেখক “গ্রন্থবিশাসী” (Bibliophile) এই কাল্পনিক
আখ্যার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছেন । কিন্তু
তাহার পক্ষে এ সতর্কতা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হইলেও
তাঁর এই কল্পিত নামটি যে সুপ্রযুক্ত ও সার্থক হইয়াছে,
ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রবন্ধের ভিতরেই রহিয়াছে ।
জ্ঞানপিপাসু লেখক জ্ঞানার্থীর উন্নত জীবনদর্শনটি
আমাদের সম্মুখে ধরিয়া এবং ঐ আদর্শকে জীবনে
উপলব্ধি করিবার পক্ষে যে সকল বাধা বিস্তারিত
কোটে তদ্বিষয়ে নিজের এবং বিখ্যাত মনীষিগণের
অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমাদের সতর্ক করিয়া

দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন । বস্তুতঃ, তাঁহার
এই চেষ্টা আমাদের শিক্ষিত-সমাজে ক্রিয়ৎপরিমাণেও
সাহিত্যিক চেতনা এবং কর্তব্য-বুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিতে
সহায়তা করিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে ।
যাই হউক, লেখকের প্রশংসা কিম্বা তাঁহার সমগ্র
লেখ্যটির সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে,—সাহিত্য-
চর্চার যে সকল সামাজিক অন্তরায়ের উল্লেখ করিয়া
তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে একটু
আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য ।

“Proper study of mankind is man” ‘মানুষ
কি, মানুষের কিসে—এই তত্ত্বের অসুসন্ধানই মানব জাতির
জ্ঞানচর্চার প্রকৃত বিষয়’—এই প্রাচীন উক্তির সারবস্তু
কে অস্বীকার করিবে ? ফলতঃ দেখিতে পাই,
মানুষের প্রথম জানানোম্বের মুহূর্ত্ত হইতে আজ পর্য্যন্ত
তাহার সকল উচ্চতর কর্ম্ম প্রচেষ্টা ও সাধনার মূলে
ঐ মানুষত্বের সন্ধানরূপ একমাত্র উদ্দেশ্য রহিয়াছে ।
তবে, প্রাচীনদের ও আধুনিক কালের জ্ঞানামূলীলনে
যাহা কিছু প্রভেদ তাহা প্রণালীর বিভিন্নতায়, উদ্দেশ্যের
পার্থক্যে নহে । প্রাচীন জ্ঞানীরা বাহিরকে, বিশ্ব-
জগতকে ভুলিয়া আত্মস্থ হইয়া তাঁহাদের জ্ঞের পদার্থকে
খুঁজিতেন—তাঁহাদের প্রণালী ছিল অন্তর্মুখীন (intros-
pective) । কিন্তু আধুনিক মানুষ বুদ্ধিতে পারিয়াছে,
প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অতীন্দ্রিয় প্রণালীই
প্রচুর নহে, ইন্দ্রিয়েরও সহায়তা আবশ্যক । মানুষের
বাহিরে মহান বিশ্ব-কবি-রচিত বিরাট দৃশ্যকাব্য বিস্তৃত
রহিয়াছে, যাহার এক অঙ্গ অতীতের তিমির ঘন স্মৃদূর
দিগন্তের সীমানা পর্য্যন্ত প্রসারিত, এক অঙ্গ রূপ-রস-
গন্ধ-স্পর্শ-সঙ্গীতময়ী বাহ্য প্রকৃতির সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্র-পটে
অঙ্কিত, এবং আরেক অঙ্গ সুখ-দুঃখ-কর্ম্মাঙ্কোলিত
বর্ত্তমান মানব সমাজের ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে
সজীব অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইতেছে । মানুষকে জানিতে
হইলে সে আদিম শৈশবাবস্থার কিরূপ ছিল এবং সে
অবস্থা হইতে অবস্থা ও অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া
কিরূপে বর্ত্তমানের স্রস্তু মানুষে উদ্ভবিত হইয়াছে,
তাহা নিজের চেষ্টায়, ইতিহাসের আলোকে, অতীতের

অন্ধকার অপসারিত করিয়া আমাদেরিগকে জানিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এবং যোগ কোথায়, তাহা দর্শন-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির বিশাল গ্রন্থ পাঠে আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে। আবার, দেশ কাল নির্বিশেষে মানুষকে মানুষে তুলনায় ও সংযোগ-সম্মিলনে আসল মানুষটিকে আবিষ্কার করিতে হইবে। এই বহু শাখা বিশিষ্ট প্রণালীকেই বিশেষ ভাবে আধুনিক জ্ঞানযোগের প্রণালী বলা যাইতে পারে। প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান-চর্চা হইতে মধ্যযুগীয় পন্থা অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল—তাহা একান্ত অতীন্দ্রিয় ছিল না, কিন্তু প্রাকৃতিক ও মানবীয় সংস্রব বিগীন, একান্ত গ্রন্থগত ছিল। এবং আমরা মনে হয়, আমাদের একালের জ্ঞানার্শিগণের উপর মধ্যযুগীয় প্রভাব এখনো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই।

গ্রন্থই যে জ্ঞান পথের প্রধান পাণেয় উজ্জ্বল সূর্যবানী সম্মত। মানুষের যুগযুগান্তর ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা অর্জিত উচ্চচিন্তা, উদার ভাব, মতঃ আদর্শের বাহন, দর্শন-বিজ্ঞান কাব্য-ইতিহাসাদি বহু অঙ্গ বিশিষ্ট যে সাহিত্য আমরা পূর্বপুরুষগণ হইতে উত্তরাধিকার স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই আমাদের বর্তমানের মানসিক কারবারের শ্রেষ্ঠ মূলধন। এই অতীতের দানকে অগ্রাহ্য করিলে, অতীতের এই রত্ন ভাণ্ডার আপনার করায়ত্ত না করিলে, অতীতের সঙ্গে আপনার দেহ-প্রাণ-মন-আত্মার অচ্ছেদ্য বন্ধন প্রাণে প্রাণে অহুত্ব না করিলে, মানুষ পিতৃ-মাতৃ-গৃহহীন অনাথ শিশুর জায় কত নিঃস্ব ও নিঃসহায় হইয়া পড়ে—তাহার ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা অস্বুর্ভিত হইতে না হইতে শুকাইয়া যায়,—তাহার অতীত-ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধহীন উদয়ম পেরণা বিহীন ক্ষুদ্র বর্তমানের বোকা তাহার পক্ষে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাই মানুষ অতীতের সর্ব্বম লুণ্ঠন করিয়া তার বর্তমানের পাছনিবাস ও চিরাকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের স্বর্গখণ্ড গড়িয়া তুলিতেছে। এমন কি স্বর্ঘ্য অতীতের আকর্ষণের

তাহার স্বর্ঘ্যময় সত্যযুগ অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ অনাগত ভবিষ্যতে নাহ, তাহা বহুদিন গত অনৈতিহাসিক অতীতের কল্পলোকে! তাই রহস্যময় পুরাতনের চিন্তনে, পুরাতনের ধ্যান, সে জীবনের সকল সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা-লক্ষ্য একেবারে ডুবাঁইয়া দিয়া নিষ্ক্রিয় সমাধি হইয়া পড়ে—ইহার মাণ ইতিহাসে বিরল নহে।

এই সমাজবিমুখীনতা ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা জ্ঞানোন্মেষীর পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার হইলেও ইহাই তাঁহার প্রকৃত গল্পনা পথের এক প্রধান শব্দট, তাঁহার সাধনার এক অন্তরায়। এই সংসার বৈরাগ্য মানব সভ্যতার কি পরিমাণ অনিহি করিয়াছে, মানুষের জ্ঞান-চেষ্টাকে কিরূপ পক্ষ ও নিষ্ফল করিয়াছে, তার স্পষ্ট প্রমাণ ঐতিহাসিক যাহাকে ‘হামস-যুগ’ বলেন সেই কালে, এবং বিশেষ ভাবে ভারত ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে। এই ইতিহাসেব পৃষ্ঠার যাহা কিছু স্পষ্ট আমাদের চোখে পড়ে, তাহা এই যে, যে কতিপয় মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি জ্ঞানের ক্ষীণ আলোক-রশ্মিটি জিয়াইয়া রাখিতেন, তাঁহারা প্রকৃত বীরের জায় গৃহে গৃহে বিচরণ করিয়া তাঁহাদের জ্ঞান-সম্পদের অংশ দিলাইয়া দিতেন না,—পক্ষান্তরে সমাজের কলুষ-স্পর্শের আশঙ্কায়, নারী জাতির সন্মোহিনী শক্তির ভয়ে কাপুরুষের মত নিজ নিজ তথাকথিত আধ্যাত্মিক বা মানসিক স্বার্থ সিদ্ধির আশায় ফল ফলাহারী শুভাঙ্গাসী হইয়া পড়িতেন। ইহার ফলে, একদিকে অবজ্ঞাত প্রকৃতি যেমন তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইতে ছাড়িত না, তাঁর যত্নশূন্যকে পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ করিয়া রাখিত, অপর দিকে সমাজও উন্নত আদর্শের প্রভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া সংকীর্ণ স্রিয়মান হইয়া পড়িত—ক্ষুদ্র ভাণ্ড, ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া মানুষে মানুষে পশু সুলভ লড়াই কাড়াকাড়ি চলিত, মানুষ স্বহৃদনিহিত বিচারবুদ্ধিকে অবহেলা করিয়া প্রচলিত প্রাণহীন অর্থশূন্য প্রণালী দাসত্ব করিত। বস্তুতঃ জ্ঞানী ও সমাজের প্রাকৃত জনগণের মধ্যকার এই দূতর বিচ্ছেদ বাবধানই গত কয়েক শতাব্দীর ভারতীয় সমাজের অধঃপতনের প্রধান কারণ। আর এই কারণে

আলোকের মধ্যেও সময় সময় যে সকল সবভাবের অল্প পলাইয়া উঠিত তাহা মানব সমাজের সজীবন উজ্জ্বলের অন্তর্বে পুণ্য কর্ম পল্লবের বিশাল মহীকূলে বিকশিত হইবার সুযোগ পাইত না। উচ্চ চিন্তা ও মহত্ত্বের পূর্ণ পরিণতি ও সার্থকতা যে পুণ্যকর্মে—তাহা বহুকাল হয় আমরা খুলিয়া গিয়াছি।

পূর্বোক্ত প্রবন্ধ লেখক পারিবারিক কর্তব্য এবং সামাজিক আচার সৌজন্তের সঙ্গে জ্ঞানার্থীর জীবনান্বর্ষণের বিরোধ ঘটে বলিয়া যে ক্রক হইয়াছেন, ইহার মূলেও সেই মধ্যযুগীয় প্রভাবের জের বহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। * জ্ঞান চর্চার পক্ষে নির্জনতা যেমন আবশ্যিক, তেমনি সময় সময় সজনতা বা মানব সমাজের উপস্থিতি আছে, তাহা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহার—এবং যে সকল চিত্তাশীল ব্যক্তিগণের উক্তি তিনি নিজ মতের পোষকতার উচ্চত করিয়াছেন তাঁহাদের—মতে অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ জন সাধারণের সম্পর্ক অত্যন্ত কঠিন এবং সর্বথা বর্জনীয়;—কেবল ইহারা জ্ঞানবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, ইহাদের সঙ্গে জ্ঞানার্থী সমাজের লোকের জ্ঞান বন খুলিয়া ভাব বিনিময় করিতে পারেন। তাঁহাদের সঙ্গে ও ভাবপ্রাধান্ভিতা-মূলক সহানুভূতিই জ্ঞানার্জনের সহায়ক, সব মন্য ভাবের

* আধুনিকতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আধুনিক যুগের কথি-প্রতিভাও কখনো কখনো পূর্বাভ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই তাহা নূরু দুই সমালোচক ব্যাপু আর্পড লক্ষ্য করিয়াছেন:—

“Wordsworth retired (in the middle Age phrase) into a monastery. I mean, he plunged himself in the inward life, he voluntarily cut himself off from the modern spirit. * * Scott became the historiographer of feudalism. Keats passionately gave himself up to a sensuous genius, to his faculty for interpreting nature. † Wordsworth, Scott and Keats have left admirable works; but their works have this defect,—they do not belong to that which is the main current of the literature of modern epochs, they do not apply modern ideas to life they constitute, therefore, minor currents.”

উদ্বোধক হইয়া থাকে। কিন্তু একথা স্বরণ রাখা আবশ্যিক যে সকল যুগেই শ্রেষ্ঠমনীষাসম্মল ব্যক্তির সংখ্যা মুষ্টিমেয়, আবার কোন কোন কালে ঐক্য ব্যক্তির একান্ত অসম্ভাব ঘটয়া থাকে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথের যুগ বা ভিক্টোরিয়া যুগ করটা দেখা গিয়াছে? ভারতীয় ইতিহাসে বিজয়াদিত্য যুগের নবরত্ন লক্ষ্যের পুনরাভিনয় হইয়াছে কি? “French Academy” বা পোন্ট-অ-লন্স-বার্ক-বোগার্ড-পেরিকের “Literary club” কত কাল সজীব ছিল? তাই, যদি সাহিত্য-সবীণে উচ্চত্বের লোক সম্ভব অগণনা করিতে হয়, তবে তাঁহাকে অনেক স্থলেই অধ্যয়নাগারের সংকীর্ণ প্রাচীর সীমার কাছার সন্ন্যাসীর মিসল জীবন যাপন করিতে হয়। মানব সম্প্রের সজীবতা ও প্রেরণা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। আসল কথা এই যে, সাহিত্য সেবাক্ষ উচ্চত্বের আনন্দ দ্বাত্রেকেই যদি আমাদের যুগ লক্ষ্য মনে না করি, জ্ঞানযোগকে যদি আমাদের সর্বাঙ্গীণ আয়োজিত ও আয়োজনকির অন্ততম উপায় গুরুত্ব মনে করি, তবে আবশ্যিক মত আমাদের কাছে বড় সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষাও অভিজ্ঞতার ভারতম্য বশতঃ মানুষে মানুষে যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহার অন্তর্গলে ও নিরূপেণে এমন একটি মূল সৌসাদৃশ্য বহিয়াছে, এমন একটি সর্বত্র বাণ্য যোগমুখে আপাতবিকিরিত বস্তুর যত্ন পণ্ডলিকৈ বাধিয়া একটা অগভতার সৃষ্টি করিয়াছে, বাহা সাধারণ মানুষের সঙ্গে বেলানেশা ছাড়া আমাদের জ্ঞানরত্ন হয় না। অথচ এই ঐক্য ও সাধারণ উপলক্ষিতেই আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের সার্থকতা—ইহার কলেই আমাদের জ্ঞানরত্ন হইতে সেই প্রেমের উৎস খুলিয়া বার, বাহা বিশালদেহা কুলপ্রাণিনী স্রোতবিনীতে পরিণত হইয়া উচ্চ নীচ ভাববর্ণ দেশবিদেশের সর্ব প্রকার বিভেদ রেখা ভাঙ্গিয়া ছুড়িয়া সমগ্র মানবজাতীকে আলিঙ্গন করে এবং অংশেবে এক বিরাট একত্বের আভ্যন্তরীণ বহাব্ধিবে গিয়া আত্ম সমর্পণ করে।

কিন্তু, জ্ঞানার্থীর পক্ষে সাধাভিকতা শুধু যে সামাজিক ভাষাভাষা ভাষা জীবন মিলিত জ্ঞানভিত্তিক ভাষাভাষা

অল্প আবশ্যক তাহা নহে,—তাহার মানসিক আবাহার, যনের পুষ্টির জন্যও যেমন একদিকে নির্জনে ‘কেতাবী’ বিস্তার আলোচনা আবশ্যক, তেমনি অল্প দিকে সমাজ প্রিয়তা চর্চার প্রয়োজন। বস্তুতঃ সমাজের নিকট আমরা কি পরিমাণে স্নানী সে বিষয়ে অনেক স্থলেই আমরা সজ্ঞান নই। তার কারণ মাতৃদানের বা প্রকৃতির দানের দ্বারা সমাজের দানও অল্প, আমাদের জানা ও অজানা মতে তাহা অশেষ হিতসাধন করিতেছে, তাহাতে আমরা জন্মাবধি অত্যন্ত। কিন্তু তাই বলিয়া সমাজের হাত হইতে কি পরিমাণ গ্রহণ ও আশ্রয়সাৎ করিয়া আমরা মানুষ হইয়াছি, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? দৈবী প্রতিভা লইয়াও বাহারা জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদিগকেও বহুল পরিমাণে এই গ্রাহিনী শক্তির (assimilating power) উপর নির্ভর করিতে হয়—তাঁহারা যেমন নিজেদের ভিতরকার প্রতিভালোকের এবং অতীতের নিকট, তেমনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং মানবীর আবেষ্টনের নিকট স্নানী। কত শ্রেষ্ঠ করিব নিশ্চিত সুন্দর চিত্র জীবিত মানুষের মুখাবয়ব এবং চিত্র ও মনোরমতার বিকাশকে সত্ত্ব করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, কত চিত্তাঙ্গীল লেখকের চিন্তার বীজ সাধারণ লোকের অসতর্ক বাক্যের ইজিতের ভিতর গুপ্ত রহিয়াছে, তাহা ঐ সকল কবি ও লেখকগণের মনস্তত্ত্বের উদ্ঘাটন করিতে পারিলে আমরা বুঝিতে পারিব। তাই মহা কবি গেটে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়াছেন—“What would remain to me if this art of appropriation were derogatory to genius? Every one of my writings has been furnished to me by a thousand different persons, a thousand things: wise and foolish have brought me, without suspecting it, the offering of their thoughts, faculties and experience. My work is an aggregation of beings taken from the whole of nature; it bears the name of Goethe”—অগরের সম্পদকে আশ্রয়সাৎ করিবার যে শিল্পনৈপুণ্য তাহা যদি প্রতিভাবান কবির যনের হানিজনক হয়, তবে আমার নিজের

কি অবশিষ্ট থাকে? আমার প্রত্যেকটি লেখা সহস্র সহস্র ব্যক্তি ও সহস্র পদার্থের হাত হইতে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। জানী মূঢ় সকলেই তাহাদের নিজ নিজ শক্তি, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার অঙ্গলি আমাকে অর্পণ করিয়াছে, যদিও তাহারা নিজেরা এ দানের বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমার গ্রন্থাবলী সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি হইতে সংগৃহীত উপকরণ রাশির সমষ্টি মাত্র, আমি কেবল গেটে নামের স্বাক্ষরটি তাহার উপর অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি।

আবার, অতীতকে প্রকৃত ভাবে বুঝিতে হইলেও, সুদূর অতীতের ইতিহাসের মর্ম উদ্ঘাটন করিতে হইলেও সজীব বর্তমানের মনুষ্য সাধারণের ভাব স্বভাবের চাকর সাহায্য নিতে হয়। তাই মাক্স মুলার আমেরিকার আদিম অধিবাসিদিগকে Living manuscript সজীব হস্তলিপি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মানব সমাজ শৈশবাবস্থায় কিরূপ ছিল তাহা আজ আমরা নবোদ্ভাবিত তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ও পৌরাণিক তত্ত্বের (Comparative philology and comparative mythology) সাহায্যে অনেকটা জানিতে পারিতেছি। কিন্তু ঐসকল নববিজ্ঞানের অসুমানলব্ধ সিদ্ধান্তগুলির অত্রাঙ্কতার প্রমাণ কিসে? বস্তুতঃ বর্তমানের মানব শিশু চরিত্র এবং (শিশুসদৃশ) আদিম অবস্থাপর, অসত্য সমাজের মানসিক প্রকৃতি, আচার ব্যবহার এবং জীবন প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা ঐ সকল সিদ্ধান্তকে যদি আমরা বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিতাম, তবে ঐ সব বিজ্ঞান “বিজ্ঞান” নামে অভিহিত হইবার দাবি করিতে পারিত কিনা সন্দেহ, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস ও স্বাক্ষরাক্ষর থাকিয়া যািত। পূর্বোক্ত সজীব হস্তলিপির চাকর সাহায্যে অতীতের গ্রন্থ পাঠকরিয়া স্বাক্ষর আমরা জানিতে পারিয়াছি, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, দিবা, রাত্রি, সূর্য্যোদয়, সূর্যাস্ত, মেঘ, রোজ, বজ্র বিদ্যুৎ প্রকৃতি প্রাকৃতিক হৃদ্যাবলী বিন্মিত নেত্রে ঘেঁষিয়া শিশু মানব কিরূপে অভিভূত হইয়া পড়িত, ঐ সকলে তাহারা জীবনী শক্তি আরোপ করিত, আমরা জানিতে পারি ঐ সকল প্রাকৃতিক জড় শক্তি হইতে মানুষ কিরূপে প্রথমে সমুদ্ভূত দেহধারী বহু

দেবতার কল্পনার উপনীত হইয়াছিল এবং অবশেষে মানবাত্মার অমরত্ব এবং এক অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়াভীত পর-
মাত্মার বিশ্বাসে পৌঁছিয়াছিল ।

পূর্বোক্ত লেখক মহোদয়ের ক্ষেত্রের আর একটি কারণ এই যে, আমাদের দুর্ভাগ্য দেশের পারিবারিক জীবন শুশ্রূষিত প্রভীচা দেশের পরিবারের মত সাহিত্য চর্চার সহায়তা না করিয়া প্রতিকূলতা করিয়া থাকে । কথাটা যে আংশিক ভাবে সত্য তাহা অস্বীকার করা যায় না । কারণ, পাশ্চাত্য দেশের ও আমাদের দেশের সাধারণ ভক্ত পরিবারকে আক্ষরিক বিদ্যা বিষয়ে ভুলনা করিলে পাশ্চাত্য ভক্ত পরিবারকেই শ্রেষ্ঠত্বের অংশ দিতে হইবে । কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রকৃত Culture, অর্থাৎ মাসিক উৎকর্ষ এবং হৃদয়ের উদারতা, ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী আক্ষরিক বিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ । এবং Culture বিষয়ে সাধারণ পাশ্চাত্য রমণীরা তাঁহাদের ভারতীয় ভগ্নীগণ অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ এ কথা এখনো প্রমাণ সাপেক্ষ । যে সাহিত্যিকের ভাণ্ডে Dorothy Wordsworth বা ফরাসীদেশীয়া বিদুষী Eugenie De Guerin কিম্বা Charles Lamb এর প্রতিভাশালিনী ভগ্নীর জায় সহযোগিনী, উৎসাহদায়িনী সহোদরা ছুটিয়াছে, অথবা Elizabeth B. Browning এর মত কাব্য-রাজ্যের সজিনী, সহধর্মিণী লাভ হইয়াছে তাঁহার সৌভাগ্যের ভুলনা কোথায় ? কিন্তু এরূপ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য-জগতেও আমরা কয়জন দেখিতে পাই ? অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিদের লৌকিক জীবন-সজিনীর বিস্তারিত সহকর্মে আমরা তাঁহাদের কাব্যাদিতে কিম্বা কাব্যের উৎপত্তি বিকাশ-সম্পর্কিত জীবনী গ্রন্থে তো কিছুই শুনিতে পাই না ; পক্ষান্তরে, প্রায় সমুদায় ‘কবি-প্রিয়াই’ মানস লোকের কাল্পনিক সৃষ্টিমাত্র দেখিতে পাই । বিখ্যাত রুশীয় ঔপন্যাসিক কাউন্ট টলষ্টয় পূর্ব জীবনে পত্রীর নিকট হইতে তাঁহার গ্রন্থাবলির পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত বিবরে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার শেষ কয়েক বৎসরের পারিবারিক ও সাহিত্যিক

কাকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা ঔপন্যাসিকের জীবনী পাঠক বিশেষ ভাবে জানেন । আর, গ্রীক জানিশ্রেষ্ঠ সফ্রেটিশ-পত্নী Xantippe ত বসনা-লালিতা এবং সত্যবের সৌকুমার্যের ভক্ত প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছেন ! তাই আমাদের এ বিষয়ে ক্ষোভপ্রকাশ নিরর্থক মনে হয় ।

কিন্তু অল্পসংখ্যক অসাধারণ পত্নী-সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য গণনার না আনিলে, সাধারণ ভাবে বলা যাউতে পারে যে রমণী সংসর্গ সাহিত্যসেবীর বা জানাখীর গন্তব্য পথের কণ্টক নহে, পক্ষান্তরে, ঐ পথের এক প্রধান পাত্থের স্বরূপ । স্ত্রীজাতির নিকট আমরা সাধারণতঃ বুদ্ধির প্রাণী, চিন্তার গাভীরা কিম্বা বিজ্ঞার প্রার্থী প্রত্যাশা করি না—হৃদয়ের মাধুর্য্যে, প্রীতির অমৃতত্বই নারীর নারীত্ব ও মহত্ত্ব । জানাহীন যখন গ্রন্থত্বপের “অ-নারী” মরুভূমির মধ্য হইতে তথোর শুষ্ক উপলব্ধি সংগ্রহ করিতে করিতে ক্লান্ত ও তৃপ্ত হইয়া পড়েন, তখন কিসের ভক্ত তিনি আকুল হইয়া উঠেন ? এক বিম্ব প্রেম-বারির ভক্ত নয় কি ? অধিকন্তু, তাঁহার বহুচেষ্টাসম্বিত তথোর লৌহখণ্ডলিকে প্রকৃত জানের সুবর্ণ কণিকার রূপান্তরিত করিতে হইলে প্রীতির অলৌকিক পরশ পাথরের স্পর্শ অতাবশ্যক । প্রাচীন কালে যাহাকে alchemy বলা হইত তাহার সম্মান এখনো নারী-প্রেমের মধ্যেই পাওয়া যায় । বস্তুতঃ, আমাদের বহুশ্রমলব্ধ লৌকিক জানের পরস্পর বিরোধী অসংলগ্ন উপকরণগুলির সঙ্গে যখন পেম-সুধার রসবিন্দু মিশ্রিত হয় তখন, কি-এক রহস্যময় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে, তাহা এক স্বতন্ত্র অমৃত পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়,—তখনই, ক্ষাত্ত্বের যাহা প্রকৃত কামনার বস্তু, তাহার বাহ্য জীবনব্যাপী পিপাসার বারি, সাধনার সিদ্ধি—আধ্যাত্ম বা পরাজ্ঞান—তাহার উদ্ভব হইয়া থাকে । স্বামী বিবেকানন্দ কঠোর জানের পথ অতিক্রম করিয়া যখন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানে পৌঁছিয়াছিলেন, তখন ঐ প্রেমের বাণীই প্রচার করিয়াছিলেন : সত্যের বাহ্য প্রমাণ অর্থাৎ একর-বোধ—
তাহাই আমাদের জানের লক্ষ্য—বাহ্য কিছু আশা-

প্রেমই সত্য, বিবেকই অসত্য' যেহেতু অসত্য বহু-
বিরোধের জন্ম দেয়। * * * প্রীতির বন্ধন সকল
বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া, সমস্ত মানব-জাতিকে প্রাণী
রাজ্যের সঙ্গে এক করিয়া দেয়—প্রেমই জীবন, প্রেম
ও পরমাত্মা অভিন্ন। X X পবিত্র হৃদয়ের আলোকে
মানুষ পরমাত্মার দর্শন লাভ করে, মানসিক শক্তি বা
মনীষা (Intellect) দ্বারা নহে। মনোবৃত্তি আমাদের
গৌণভাবে সাহায্য করে, তাহা আমাদের হৃদয়ের
দ্বারে প্রহরীর কাজ করে, হৃদয়ের গন্তব্য পথের
আবর্জনারাশি কাঁটাইয়া মুছিয়া দেয় মাত্র। বুদ্ধিবৃত্তি
অন্ধ, চলচ্ছক্তিহীন কিন্তু হৃদ বৃত্তিই সক্রিয়, তাহার গতির
সঙ্গে বিহ্যুভেদগতির তুলনা হয় না। হৃদয়ের প্রেমের
শক্তি বধন বর্জিত, প্রগাঢ় ও পূর্ণাভিব্যক্ত হইয়া দৈবী
শক্তিতে পরিণত হয়, তখনই সমুদায় সৃষ্টপদার্থের ও
নিজের অন্তরাঙ্গার মধ্যে এক অবিভীর্ণ পরমাত্মার
উপলব্ধি জন্মে, কিন্তু মানসিকতা দ্বারা তাহা অসম্ভব। *

প্রেমবিরহিতা বিজ্ঞা ক্লিষ্ট বস্তুর নারীর জ্ঞান
নিষ্ফল হইয়া থাকে, তাহা আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীরা
রূপকচ্ছলে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত—কচ-দেব-
যানীক পৌরাণিক উপাখ্যান। দেব-গুরু বৃহস্পতি
পুত্র কচ, দৈত্য গুরু-গৃহে সহস্র বৎসর প্রবাসের পর
স্বর্গের জন্ত সজীবনী বিজ্ঞা আহরণ করিয়া বিদায়
কালে বিজ্ঞা ও যশের আকর্ষণে গুরু হৃহিতা দেবযানীর
প্রেমের অর্থ্য প্রত্যাখ্যান করিলেন, তার ফলে প্রেমের
অবমাননাকারী কচের মৃত্যুকে যে ভীষণ অভিশাপের
বজ্রপাত হইল, তাহা বঙ্গীয় কবির ভাষায় ব্যক্ত
হইয়াছে,—

“যে বিজ্ঞার তরে

মোরে কর অবহেলা, সে বিজ্ঞা তোমার *

সম্পূর্ণ হবে না বশ :- তুমি শুধু তার

ভারবাহী হয়ে রবে, করিবেনা ভোগ,

শিখাইবে, পারিবেনা করিতে প্রয়োগ।”

• ও বাঙালি প্রতিষ্ঠিতা, মনে যে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্।

* আবিরাবীর এধি—আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক

* খানীজীর ইংরাজী বক্তৃতাংশ হইতে অনূদিত।

এবং মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। হে স্বপ্রকাশ,
আমার নিকট প্রকাশিত হও—এই শাস্তি-বচন
দ্বারা মনকে প্রস্তুত করিয়া প্রাচীন বিজ্ঞার্থী তত্ত্ববিজ্ঞা
অধ্যয়নে নিযুক্ত হইতেন। অন্তরকার বিভার্ণকে
স্বরণ রাখিতে হইবে—নিমিলিত নেত্র, ধ্যানভিমিত্ত
যোগীর জ্ঞান কেবল হৃদয়-গুহার ভিতরে সেই ‘শাবির’
প্রকাশকে অনুসন্ধান করিলে তিনি নিজের স্বরূপে
আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন না, কিম্বা শুধু
গ্রন্থকোটের মত গ্রন্থের জীর্ণ পত্রাশি দ্বারা আমাদের
অন্তরের ক্ষুধা মিটাইতে চাহিলে এ দারুণ বুদ্ধিকা
কিছুতেই প্রশমিত হইবে না—পক্ষান্তরে, সেই
স্বপ্রকাশের যে অন্তরহীন প্রকাশ বাহ্য-অভ্যন্তরে, জল-
স্থল-অন্তরীক্ষে, স্থাবর-জঙ্গম-চরাচরে, বর্তমানে, অতীতে
রাত্রিদিন অবিশ্রান্ত চলিয়াছে এবং চলিতেছে তাহা
সকল ইঞ্জিয়ের দ্বারা অব্যাহত রাখিয়া, আমাদের চক্ষু-
কর্ণ-হৃদয় মন-আত্মা দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে,
নতুবা আমাদের সকল চেষ্টা সকল আকাজক্ষা ব্যর্থ
হইয়া যাইবে। অন্তর ও বাহিরের, স্বরূপতা ও
বিজ্ঞনতার, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যের, ভোগ ও
ত্যাগের সমন্বয়ই প্রকৃষ্ট পন্থা—এই পরম শিখাই যুগ
যুগান্তরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আধুনিক মানবের জন্ত
বহন করিয়া আনিয়াছে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

বেদিয়া

সর বাধেনা, নৌকোয় থাকে ;

ওটাই তাঁদের সর বাড়ি।

জোত জেরাতের দার দারে না,

পাইক পিয়াদার ঝুম্মারি।

এ-দেশ সে-দেশ ক’রে বেড়ায়—

জয় জুমির নাই দাবি ;

কেমন দারা কাটার জীবন ?

অবাক হ’য়ে তাই ভাবি।

বহর বেঁধে ঢালার তরী—

সহর থানা বায় ভাসি !

বেঁটে ঢালার বেধেনীর।

ভলী দেখে পার হাসি !

সারাটা দিন ঝগড়া ঝাটি,

কঠে হারে ফুলরা ;

চুপটি ক'রে জুজুর মত

মিলে দেখে হল নড়া !

নিভা নুতন নদীর বঁকে

বহর থানা বয় বাঁধা ;

পক্ষে বেরোর সবাই মিলে—

নাটকো তাঁদের ভয় বাধা ।

কেউ বা দেখায় ভোজের বাজি

“আত্মারামের মস্তুরে,

দেখলে তাদের কারসাজিটা

জাতি জাগে অন্তরে !

শুভ্রে, বাধা দড়ির ‘পরে

“তানুমতির” কারখান —

ছোট মেয়ের কাণ্ড দেখে,

বীর পুরুষের হার থানা !

গোথরা নিরে, কেউটে নিরে,

খেলছে তারা নির্ভয়ে !

‘বেউলা’ সতীর হুংগে গয়ে—

চকু ভাসে নীর ব'য়ে !

এমনি ক'রে ভিন্ গোঁয়েতে

কাটছে তাদের দিন থানা !

য়েতের বেলা বহর জুয়ে—

তাক্ ধিনা ধিন্, ধিন্ তানা !

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ।

সমস্যা ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

“নমস্কার ।”

“এই যে, জগবজ্জ বাবু আনুন, বাসিতে আজ্ঞা হউক ; আমার নমস্কার । ভালতো ।

“ভগবানের ইচ্ছায় ভালই ; আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন তো ?

“তা একরকম আছি—দয়াদ—দয়াল” বলিয়া তত্ত্ব-লোকটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন ।

জগবজ্জ বাবু তাঁহার ছেলে শৈলেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “শৈলেন, ইনি তোমার মেসো মহাশয় হন ।” শৈলেন মাথা নত করিয়া দুর্গা দাস বাবুকে অভিবাদন করিল । দুর্গাদাস বাবু কহিলেন—“ধাক বাবা, তুমিই কাল আমাকে তোমার বাবার খবর দিতে আসিয়াছিলে না !”

শৈলেন মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া মখে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—“আজ্ঞা হাঁ ।”

“ব'সো বাবা, তোমরা ব'সো—নগেনের দিকে চাহিয়া দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—“এ ছেলেটাকে যে চিনিতে—”

জগবজ্জ বাবু বলিলেন—“এ আমাদের গ্রামের তারার চরণ মুখুর্দ্যার ছেলে নগেন—এম, এ, পড়িতেছে—সঙ্গে সঙ্গে ল লেকচারও এটোও করিতেছে ।”

নগেনও বুককে নত হইয়া অভিবাদন করিয়া শৈলেনের পাশেই ধীরে ধীরে উপবেশন করিল ।

জগবজ্জ বাবু আলাপি লোক । তিনি প্রথমে কথা তুলিলেন, “প্রাতে আপনার যোগী দেখিবার সময়, সে জন্মই কাল শৈলেনকে পাঠাইয়া আপনাকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল—এতদিন পরে কলিকাতায় আসা গেল—সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া চাই, অথচ আপনারা সকলি কর্ম্মলোক ।”

দুর্গাদাস বাবু হাসি হাসি মুখে বলিলেন—অতি উত্তম করিয়াছেন, নতুবা আমরা পরের দাস, অর্থের দাস, সময়ের দাস, বাড়ি ধরিয়া চলিতে বাধ্য হই—সাক্ষাৎ না হইলে কত বড় একটা ব্যথা অনুভব করিতাম—আপনার

খবর পাইয়া আজকার Routin বদলাইয়া লইয়াছি ;
সাক্ষাতে মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। দয়াল—
দয়াল--তারপর, কলিকাতা আর আছেন কত দিন ?

“আজই চলিয়া যাইব।”

“বাড়ীতে কি ভাল থাকেন ?

“মন্দ থাকি না।”

“পবর্ষান্তের কার্যো এই সুখ—শেষ বয়সটা পেন্সন,
আর হরি নাম—দয়াল ব্রহ্ম—”

ওই শেষটারই অবসর কম ; দলাদলির ওত মার
পেচ বে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাতে লিপ্ত হইতে হয়।”

দুর্গা—“আপনাদের পূর্ববঙ্গের লোক পশ্চিম বঙ্গের
লোক হইতে কিন্তু খুব sincere যাই হউক।”

জগবন্ধু বাবু হাসিয়া বলিলেন—“আর কোন বিষয়ে
না হইলেও শত্রুতা সাধনে খুবই—”

দুর্গা দাদা বাবু হাসিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা
করিলেন—“এই সকল দলাদলির বিষয় কি ?”

“একেবারে কিছুই না। অথচ পথ্য হজম করিবার
একমাত্র গ্রাম্য মহৌষধই ঐ দলাদলির হজুগে বৃথা
লক্ষ্যবস্ত্র দোড় ধাপ—ব্যর্থব্যয় ; যা ইচ্ছা তাই—”

দুর্গাদাস বাবু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন—“যাই
হউক ছেলেটা উপযুক্ত হইয়াছে।” এই কথা বলিয়া
তিনি শৈলেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“এবার কোন
year তোমার বাবা ?”

শৈলেন ও নগেন এতক্ষণ ঘরের চারিদিক নিরীক্ষণ
করিয়া বেন বেশ শান্তি পাইতেছিল। পরিস্কার হলটা
সুন্দর সাজান—যে স্থানে যেটা রাখিলে মানা হবে, ঠিক
সেই জিনিসটা সেইস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। ঘরের দেয়ালে
মহাশয়দিগের চিত্র আয়নার ফ্রেমে ঝুলান—এক দিকে
রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, অত্মদিকে ত্রৈলোক্য-
স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিত্তদানন্দ স্বামী, একদিকে
রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, অত্মদিকে যেরির ফ্রেণ্ডে বিত্তথষ্ট,
তার দুইদিকে দুইটা প্রার্থনাপত্রাণা বালিকা—চিত্রগুলির
দিকে তাকাইলে গৃহস্বামীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার
মত্তক নত হইয়া পড়ে। চিত্রগুলির মাঝে মাঝে সুন্দর
বড় বড় অক্ষরে “একমেবদ্বিতীয়ম্” “ব্রহ্ম কৃপাহি

কবলম্.” “সত্যমেব অয়তে,” “ধর্মই মুখ” ইত্যাদি
‘মোটো’ গুলি বিনস্ত হইয়াছে।

শৈলেন ও নগেন মুগ্ধনেত্রে সেগুলি নিরীক্ষণ করিতে
ছিল। দুর্গাদাস বাবুর প্রশ্নে সে মত্তক নত করিয়া বলিল—
“এটা 5th year”

“বেশ বাবা, ভগবান করুন, পাশ হইয়া আইস।”

দুর্গাদাস বাবু “বসুন” বলিয়া উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে
গেলেন। কিছু কাল পরেই তাহার মেয়ে ছেলেয়া
পর্দা তুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল ; পাছে পাছে দুর্গাদাস
বাবুও আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দুর্গাদাস বাবু ছেনে মেয়েদিগকে লক্ষ্য করিয়া
বলিলেন “ওদের প্রণাম কর, তারপর বাড়ীর ভিতরে
লইয়া যাও।”

পাকুল, বকুল, আশা ও তাতা পিতার আদেশ
অনুসারে একে একে তিন জনকেই প্রণাম করিল।

পর্দার আড়ালে গৃহিণী দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া
জগবন্ধু বাবু উঠিয়া ভিতরে গেলেন। আশা শৈলেনের
কবলে ও তাতা নগেনের কবলে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল এবং প্রতি-প্রশ্ন
করিয়া শৈলেন এবং নগেনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া
তুলিল।

নগেন হাসি মুখে—সকলেই শুনে অথচ চুপি চুপি—
তাতাকে বলিল “তোমার দিদিদের পরিচয় যাও দেখি ;
পরিচয় না হইলে আলাপ করিব কি করিয়া ?” নগেনের
কথা শুনিয়া বড়মেয়ে পাকুল হাসি মুখে কাপড় গুলিয়া
সরিয়া পড়িল, তারপর বকুলও তাহার দিদির অনুসরণ
করিল।

নগেন তাতাকে বলিল “তোমার দিদিদের নাম
কি ? তাতা বলিল—ছোট দিদির নাম বকুল, বড় দিদির
নাম পাকুল।” তাতা খামিগ না—বলিতে লাগিল
“বড় দিদি ব্রাহ্ম বালিকা—বিভাগলের ক্লাস নাইনে পড়ে।
আমি স্কুলে ভর্তি হই নাই। আমি, ছোট দিদি, আর
দাদা বাড়ীতে পড়ি। আশা দাদা সুন্দর ছবি আঁকিতে
পারে।”—বলিয়া তাতা দৌড়িয়া গিয়া পার্শ্বের
কোঠার দরজার পর্দা সরাইয়া নগেন ও শৈলেনকে

হাসিয়া বলিল—“এখানে আসিয়া দেখুন—তার আঁট ইতিও।”

কৌতূহল পরবশ হইয়া তাহারা উভয়েই তাতার অঙ্গুলয় করিল।

সুন্দর একটা চিত্র-কক। দেয়ালের গায়ে আয়না জেসে আটা খ্রীষ্টচৈতন্ত দেবের চিত্রটা দেখিয়া উভয়ে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। শৈলেনের তাহা এত ভাল লাগিয়াছিল যে সে চিত্র-শিল্পীকে টানিয়া বসে চাপিয়া লইয়া একটা ইজি চেয়ারে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল।

এই সময় পারুল ছুই হাতে ছুই খান। ডিস্ ও বকুল ছুই হাতে ছুই পেয়ালা চা লইয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইল।

অবস্থা দেখিয়া শৈলেন নগেনের মুখের দিকে, আর নগেন, শৈলেনের মুখের দিকে চাহিল।

টেবিলের উপর খাত রাখিয়া পারুল মাথা নীচু করিয়া কহিল—“একটু চা খান।”

পারুল অঙ্গুরোধ করিয়াই মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। শৈলেন বা নগেন কেহই প্রথমে কোন কথা বলিল না। কিছুকণ পরে পারুল ও বকুলের মুখের দিকে চাহিয়া নগেন বলিল—“খেতে বলছ—এ যে একটা অত্যাচার—না খেলে হবে না?” পারুল একটু ক্ষুধ হইয়া বলিল—“সে হবে না। এ বাজারের জিনিষ নয়, খবর করিয়াছি।”

বকুল ও দিদির সঙ্গে কথায় বোগ দিয়া হাসিয়া বলিল—“জাত বাইবার ভয় করেন কি?”

নগেন হাসিয়া বলিল—“করি না, একথাই বা বলি কেন করিয়া?”

বকুল হাসিয়া বলিল—“এখানে কেউ নাই, আমরাও কাহাকে বলিব না।”

শৈলেন হাসিয়া বলিল—“মানুষের ভয়ই কি সকলের চেয়ে বড় ভয়?”

পারুল ও হাসিয়া বলিল—“ভগবানের নিকট কি আর ভক্তি দিবার আছে?”

শৈলেন হাসিয়া কোন কথা বলিল না।

নগেন, পারুল ও বকুলের দিকে চাহিয়া গভীর ভাবে বলিল—“বামুনের ছেলের জাতটা তবে তোমরা মারিবেই সকল করিয়াছ?”

নগেনের গাভীর প্রকাশ ও অনিচ্ছার ভাব দেখিয়া পারুল ও বকুলের মুখ মলিন হইয়া গেল।

আশা হাসিয়া বলিল—“ও বিস্কিট গুলি বিলাতি, ন হয় সে গুলিই খান—সেতো সকলেই খাইয়া থাকে।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“হাঁ, তাহা হইলে সে গুলি অবশ্যই খাওয়া যাইতে পারে, কি বল হে শৈলেন। কিন্তু তোমার দিদির। তো কেবল তাহা খাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন না।” পারুল হাসিয়া বলিল—“আচ্ছা তাহাই খান।”

এই সময় গৃহিণীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে মাথা নত করিয়া অভিবাদন করিল।

গৃহিণী শৈলেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“তা বাবা তোমরা যখন পরিচিত হইলে, তখন সর্বদাই আসা যাওয়া রাখিও। এত দিন এখানে আছ, কই, এক দিনও তো এলে বাবা পরিচয় কর নাই। আপনার আপন মাসি মার স্বত্বাই মনে করো বাবা।” নগেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“বাবা পরিচয় হইল, ব্যবহারে পরকেও আপন করা যায়। তোমাকে ও শৈলেনকে আমরা যেন আপন বলিয়াই মনে করিতে পারি বাবা, আসিলে গেলেই অতি পরও আপন হয়—সহানুভূতি না থাকিলে অতি আপনও পর হইয়া যায়। একটু খাও বাবা,—তোমরা কলেজের ছেলে তোমাদের নিকট ব্রাহ্ম-হিন্দু কি বাবা—আর এ কলিকাতার সহরে এসব কি চলে বাবা।” বলিয়া গৃহিণী শৈলেন ও নগেনের মুখে ও মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন। তাহাদের উভয়ের চক্ষু ভাৱাক্রান্ত হইয়া গেল, মন প্রভায় অবনত হইয়া পড়িল। এমন মেহ এমন আপ্যায়ন তাহারা পল্লিগ্রামের বাহিরে পাইবেন, সেরূপ আশা করিয়াছিলেন না।

নগেন মাটির দিকে চাহিয়া নত মস্তকে বলিল—“আপনি বান আমরা খাইতেছি।”

রাষ্ট্রের আসিয়া নগেন আন্তে আন্তে শৈলেনকে বলিল—“জাতিটা একেবারে মাঠে মাঠে গেল।”

শৈলেন হাসিয়া বলিল—“দেশ কাল পাত্র ভেদে ব্যবস্থাও আছে—কলিকাতার অনেক লোক রাত ডরিয়া কুর্কর করে, প্রাতে গঙ্গা স্নান করিয়া সে পাপ ধুইয়া দেয়—চল গঙ্গা স্নান করিয়া আসি।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জগবজ্জ বাবু একটা দেওয়ানী মোকদ্দমার আপিল করিতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় কার্য শেষ করিয়া, বজ্জ বাবুকে সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া ও ছেলেকে তাঁহাদিগের সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়া সেই দিনই রাত্রির পাড়িতে বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন।

পীরপুর ঢাকা জেলার একটা গও গ্রাম। গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈষ্ণব, নমশূত্র, মালী মুসলমান সকল জাতিই দুই চার-দশ ঘর করিয়া আছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ যে গ্রামে বস বেঙ্গী, সামাজিক দলাদলিও সে গ্রামে তত বেশী হইয়া উঠে। পীরপুর এই সামাজিক দলাদলির আবধি ছিল না।

জগবজ্জ বাবু এই গ্রামের একজন বর্দ্ধিত তালুদার। তিনি ত্রিশ বৎসর কাল কান্টোনারী সেরেস্তাদারী করিয়া এখন পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। জীবন ভরিয়া বিদেশে থাকিয়া তাহার সমাজ ও সংসার জ্ঞান একেবারেই ছিল না। পূজার ছুটিতে বৎসরে একবার করিয়া যখন বাড়ী আসিতেন, তখন বার দিনের পল্লিচিহ্ন তাঁহার মনে পুণ্য ভাব জাগাইয়া দিত। গ্রামের ভদ্র ইত্তর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহার যে শ্রুণ কীর্তন করিত, তাহাতে তিনি মুগ্ধ হইতেন। বহু গ্রাম্য বিবাদ ও দলাদলি নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া এবং উপদেশ ও পরামর্শ প্রার্থীকে সহুপদেশ ও সং পরামর্শ দান করিয়া তিনি আত্ম প্রসাদ লাভ করিতেন। এই সকল কারণে পেন্সন লইয়া আসিয়া এইরূপ সং-সহবাস ভোগ করিয়া যে তিনি জীবনের শেষ দিন ওলি সুখে ও শান্তিতে কাটাইতে পারিবেন, ইহাই তাহার আশা ছিল। এখন দেখিলেন, তাহার সে স্বপ্ন, তাঁহাদের ঘরে গৃহস্থালী

অবস্থা দেখিয়া প্রথম কয়েক বৎসর তিনি বাড়ী ছাড়িয়া পুনরায় সহরে আসিয়াই বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতেও যখন নিজেকে নিরাপদ রাখিতে পারিলেন না; মাংসায় মোকদ্দমায়, সমাজে-সামিলে নিজেকে সম্পূর্ণ জড়িত দেখিতে পাইলেন, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া ঘরে আসিয়াই বসিলেন।

এখন জগবজ্জ বাবুও একজন সমাজপতি। তিনি আর এখন সামাজিক গোলমালে বা মাংসায় মোকদ্দমায় নিজেকে বিপন্ন মনে করেন না; বরং একটু অগ্রসর হইয়াই তাহা মাথা পাতিয়া লন।

জগবজ্জর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র শৈলেশ কান্টোনারী কেরানী, দ্বিতীয় পুত্র শৈলেন বি, এস সি. পাস করিয়া মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেছে। এবার তাহার শেষ পরীক্ষার বৎসর।

জগবজ্জ বাবু যে গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম ভাস্কর দুর্গাদাস চৌধুরীও সেই গ্রামের জামাতা। এখন বয়সে উভয়ই কেশব সেনের বক্তৃতা ও প্রাণনা শুনিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—এই হুত্রে তাঁহাদের পরিচয়। যৌবনের ভাব উত্তেজনা কাটিয়া গেলে জগবজ্জর ব্রহ্মজ্ঞান টুটিয়া যায়, তিনি জীব বিশেষের জ্ঞান সরল ভাবে সংসার কোটর অবলম্বন করেন। এখন তিনি এক জন পূজা আত্মিক পরায়ণ আধুনিক হিন্দু; দুর্গাদাস বাবু ব্রাহ্ম সমাজের নিষ্ঠা পরায়ণ ব্রাহ্ম।

জগবজ্জ বাবু দুই সপ্তাহ বাড়ী ছাড়া ছিলেন। আসিয়া শুনিলেন—সমাজে কয়েকটা নূতন মীমাংসার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার একটা লইয়া গ্রামে কলহুল বাধিয়া গিয়াছে।

সমস্তাটা এই—কালী গ্রামের গুরুপ্রসাদ বাবুর আত্মশ্রদ্ধ, তাঁহার ব্যাধিষ্ঠার পুত্র খুব সমারোহ সহকারে সম্পাদন করিয়াছেন। এই শ্রদ্ধে পীরপুরের ব্রাহ্মণ সমাজ বিরোধী ছিলেন; তাঁহারা বিদ্রোহ ফেরতকে সমাজে লইতে নারাজ। এখন বাহারা এই শ্রদ্ধে যোগ দান করিয়াছেন, তাহাদিগকে সমাজ চ্যুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পীরপুরের জীবন তরঙ্গ এই শ্রদ্ধে

মিরাছেন। জীবন তর্করত্নের সঙ্গে গিয়াছিল বলিয়া রমণ ভাগ্যবান নাতী অতুল আটকে পড়িয়াছে। রমণ জগবন্ধু বাবুর খানা বাড়ীর প্রজা। সুতরাং জগবন্ধু বাবুও উপস্থিত সমস্তার জড়িত।

এই সমস্তা উঠাইয়াছেন—তারারূপ মুখুর্ধ্য। তর্ক-রত্ন মুখুর্ধ্যার শিকড়ে দেওয়ানী মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়া তাঁহার একখানা মূল্যবান সম্পত্তি হস্তচ্যুত করাইয়াছেন। সম্পত্তি খানা তারারূপ পৈত্রিক ঋণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বেনামী করিয়াছিলেন—তর্করত্নের সাক্ষ্যে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এহেন শত্রুকে কবলে পাইয়া তারারূপ চূপ করিয়া থাকিবেন? তা কখনও হইতে পারে না।

মুখুর্ধ্যার পৈত্রিক সম্পত্তি খুব বেশী ছিল না। যাহা ছিল, পৈত্রিক ঋণে নীলাম হইয়া গিয়াছিল। তিনি পুলিশের দারগা ছিলেন। দারগাগিরির জৌলসে তিনি নিজেও বিস্তর সম্পত্তি করিয়াছিলেন। এক ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়িয়া তাঁহাকে দণ্ড ভোগ করিতে হয়—সম্পত্তিও তাহাতে অনেক বাহির হইয়া যায়। তারিণী ক্রমায়ত্তে তিন পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্রই আমাদের নগেন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় পক্ষের কোন সন্তান নাই। এখন তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ও তাহার দুই পুত্র বর্তমান।

তারিণীরূপ ঐবার তর্করত্নের উপর কিস্তি চালিবার স্বর্ণ সুযোগ পাইয়াছেন—যেহেতুই হউক তাহাকে সন্ধান চ্যুত করিতেই হইবে।

গ্রামে দলাদলির একটা সূত্র পাওয়া গেলেই তাহাকে উপকরণ সংযোগে পুল দড়িতে পরিণত করিতে অধিক সময় বা অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। প্রতি পক্ষ দুর্বল হইলে সমস্তা সহজেই মীমাংসা হয়, আর উভয় পক্ষে পরানর্শ দাতা জুটিলে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিয়া সমাজের পুষ্টি সাধন করে ও তাহার সবল আন্তর্যের পরিচয় প্রদান করিতে থাকে।

গ্রাম্য দলাদলিতে কোন পক্ষেই লোক জনের এবং পরানর্শের অভাব হয় না—তাহা সুপরাশ্রয়ই হউক আর

গ্রামে দুই দল হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ সমাজ তর্ক-রত্নকে আটক দিলে কারহ, বৈজ্ঞ ও শূদ্র সমাজ তর্করত্নের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন।

জগবন্ধু বাড়ী আসিয়া সমস্তাই অবগত হইলেন। অশিতিপর বৃদ্ধ রমণ ভাগ্যবানী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহাকে সমস্ত খটকা বুঝাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শতাব্দী কালের পীরপুত্র সমাজের দলাদলির ইতিহাস বিবৃত করিলেন। শুনিয়া জগবন্ধু বলিলেন—“সমাজে আপাততঃ কোন ক্রিয়া কাণ্ড উপস্থিত না হইলে কে, কাহাকে, কাহার সমাজ হইতে, কি উপায়ে বাহির করিবে? অনর্থক ঝগড়া ডাকিয়া আনা সঙ্গত নহে;—দেখা বাড়ুক কি হয়। আপাততঃ চূপ করিয়া থাকিয়া তারিণী মুখুর্ধ্যার কার্য লক্ষ্য করা বাড়ুক। সমস্তা নিকটবর্তী হইলে তখন কর্তব্য স্থির করা যাইবে।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

রবিবার ৩টার নগেন্ শৈলেনদের মেসে আসিয়া দেখিল শৈলেন বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছে, আর তাহার পার্শ্বে বসিয়া আশা আর্ট জার্ণালের পাতা উন্টাইয়া ছবি দেখিতেছে।

নগেন কে দেখিয়া আশা কি বলিবে কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বলিল—“আপনার বাসা কত দূরে নগেন্ বাবু?”

নগেন বলিল “এই ঘে নিকটেই; তুমি কখন আসি-রাছ? শৈলেন ঘুমাইতেছে কতক্ষণ?”

শৈলেনের ঘুম ভালিয়া গেল। সে শব্দের শ্রবণ থাকিয়াই হাত পা মেলিয়া শরীরকে দীর্ঘে মুড়াইয়া উঠিয়া বসিয়া নিজার কৈফিয়ত দিল—“কাল রাত একে বারে বসিয়া কাটাইয়াছিলাম, একটা ডিউটি (duty) ছিল। ভূমিতো এই আসিলে। আশা রাম কখন হে?”

“আমি আপনার এই টাইমপিসের ১টা ৪৭ মিনিটে আসিয়াছি।”

“বেশ, বেশ, বসো।” বলিয়া শৈলেন বসি হাতে লইয়া বাহিরে গেল।

নগেন আশাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—“কি হে আশা

আশা সজ্জিত হইয়া বলিল—“সে তো শৈলেন দাদাই ছিলেন। আপনি তো আর আমাদের বাড়ী গেলেন না?”

“ভূমিও তো আমাকে নিয়ে বাইতে আসিলে না।”

আশা ভাবিল, শৈলেনের নিকট তাহাকে দেখিয়াই বুঝি নগেন বাবু তাহাকে একথা বলিলেন।—সে কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—“আপনার ঠিকানা তো আমাকে বলেন নাই, শৈলেন দাদা আর্ট জার্নাল নিতে বলিয়া আসিয়াছিলেন—চলুন না আপনার বাসাটা দেখিয়া আসি।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“তা বেশ, শৈলেন আমুক, তারপর চল বাই, তোমাদের বাড়ীর ওঁরা সব আছেন কেমন? আমাদের কথা—”

নগেনের মুখে কথা আটকাইয়া গেল।

আশা বলিল—“সকলেই ভাল আছেন। আপনারা তো আর গেলেন না; চলুন না আজ বাই। বাবা, মা প্রায়ই তো আপনাদের কথা বলেন।”

নগেন আর কি কথা ভিজাসা করিতে বাইতে ছিল, পারিল না। কেবল বলিল—“তবে, আমাদের বাড়ী বাবে, না তোমাদের বাড়ী বাব?”

“চলুন—আজ আমাদের বাড়ীতেই বাই; আমি অনেকক্ষণ বাহির হইয়াছি—আধ ঘণ্টার জন্ত আসিয়াছিলাম—”

“এই সময় মুখ ধুইয়া শৈলেন ঘরে প্রবেশ করিল।

আশা বলিল—“শৈলেন দা আমাদের বাড়ী চলুন!”

“কেন হে?”

“বাইতে নাই কি?”

নগেন আশার পক্ষ হইয়া বলিল—“বেচারি আধ ঘণ্টার ছুটি লইয়া আসিয়াছিল—ভূমি দুই ঘণ্টা করিলে।”

“আচ্ছা তবে চল—এই তোমার আর্ট জার্নাল দু খানা লও।” বলিয়া শৈলেন চিকুণী লইয়া কেশ বিভাগে রত হইল।

নগেন ও শৈলেন রবিবার বিকালে একবার দুর্গাদাস বাবুর বাড়ী বাইবে স্থির করিয়াছিল। আশার অনুরোধ উপরন্তু নাই।

স্মৃতির বিচার।

(Shelleyর to the music হইতে)

গীতের লহর চাহে চিরকাল গীতের সাথেই হইতে দেখে, স্বরগে কিন্তু প্রতিপলে পলে বাজি উঠে তার সুরের রেশ। মল্লিকা তার মরণ সাঁকে মৃত্যু আঁধারে অঙ্গ ঢাকে, অমির মধুর গন্ধ টুকু মন্দ অনিল জড়ারে রাখে। গোলাপ বধন শুকায় শোকে পাপড়ী ওপু ধুলায় বসে, প্রেমিকা তাহে কুঁড়িয়ে রাখে শব্দাপাশে বস্র করে। প্রিয়ার মরণ মর্মে কভু হয়না প্রেমিক পরাণ মাঝে, স্মৃতির স্মৃতি ভুলিয়ে তারে মত্ত রাখে সকাল সাঁকে

প্রমোদচন্দ্র চৌধুরী।

ইতিহাসের কয়েকটি কথা।

বর্তমান সময় ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ নানাবিধ গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা অতীত ভারতের গৌরব-ময় যুগের বিস্তৃত কাহিনী—রীতি-নীতি ও সভ্যতার আদর্শ পুনরুদ্ধার করিয়া আধুনিক উন্নত-মার্গে প্রতিষ্ঠিত জাতি সমবায়ের সমক্ষে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই শুভ প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান সভ্য জগতের সমক্ষে প্রমাণিত হইয়াছে যে আধুনিক সভ্যতার লীলাভূমি নবীন আমেরিকা এবং প্রাচীন ইউরোপ বধন মহারণ বন্ধে লইয়া কেবল অরণ্যের পশু পক্ষী ও বর্ষের জাতির আবাস স্থলে পরিণত ছিল, তাহারও বহুপূর্ব হইতে এই আর্ধ্যভূমিতে সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নানা-বিধ বিষয়ে অতি উচ্চ আদর্শ স্থাপিত ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে মধ্যযুগে ভারতের কীর্তিগৌরব আধুনিক সভ্য সমাজের নিকট বাহারা অজ্ঞান রাখিয়া ছিলেন, সেই সকল নৃপতি কিংবা মহাপুরুষগণের ইতিবৃত্ত বিশেষভাবে ও বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া এখনও প্রকাশিত হইতেছে না, অর্থাৎ সেই সকল মহা-পুরুষের কাহিনী জানিবার আবশ্যকতা প্রতিদিন অনসৃত হইতেছে।

বর্তমান সময়ে একটা কথা সকলেই বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধযুগের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই আমাদের সামাজিক, কেবল সামাজিক কেন, আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ও স্বাভাবিক শক্তি শিথিল হইয়া সর্বপ্রকারে জাতীয় সংহতি শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ বহাটা এইরূপ দাঁড়ায় যে ধর্ম ও সমাজের শক্তি প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া তদানীন্তন মহাপুরুষগণ রাজনীতির দিক্‌টা অবহেলা করিয়াছিলেন অথবা প্রাচীন রীতি নীতির উপর প্রতিষ্ঠা রাখিয়া বধন নুতন করিয়া কিছু কড়াকড়ি ভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন হইতে আমাদের সমাজে যে জাতি বিষয় জলিয়া উঠে, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও আমাদের সংহতি শক্তি লুপ্ত হইয়া যায় এবং ব্রৌদ্ধ ধর্মের পতনের সময় হইতেই আমাদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ আরও একটি কথা এখন আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে ; এবদল তাত্ত্বিক বলেন যে ভারতবর্ষ অতীতকালে যতই কেন উন্নতির মার্গে আকৃত হইয়া থাকুক না কেন তথাপি প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার রীতি নীতি ও শাসন পদ্ধতিতে একটা কোথাও এমন দোষ ছিল, যে কারণে ভারতবর্ষ বধনই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সামরিক শক্তির সহিত সংঘর্ষে আসিয়াছে, তখনই ঐ পাশ্চাত্য শক্তির নিকট আধ্যাত্মিক পরাভব স্বীকার করিয়া বিজয়ী বিজয়-বৈজয়ন্তী আপন স্বর্গে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে এই সকল অভিযোগ বড়ই গুরুতর এবং কঠিন বিচার সাপেক্ষ। আমাদের প্রবন্ধের বিষয় বিহীন হওয়ায় আমরা এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় বিরত রহিলাম, কিন্তু অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব।

যদি একটা জাতি আপনার শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োগ দ্বারা বহু বাধা বিয় অতিক্রম করিয়া সার্কসেইম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে, এবং সেই জাতিতে প্রতি শতাব্দীতে যদি এইরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি আবির্ভূত হইয়া সুবহুং রাজ্য সংস্থাপন করিতে

সমর্থ হন, তবে সেই জাতিকে কি রাষ্ট্রীয় হিসাবে মৃত কিংবা বিধ্বস্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়? বৌদ্ধ যুগের অবসান কালের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের গৌরব যুগ চলিয়াছিল ইহা স্বীকৃত সত্য। এখন দেখিতে হইবে যে বৌদ্ধ ধর্মের যখন পতন আরম্ভ হইল, তখন হইতে এইরূপ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা এবং দ্বিতীয় কথা এই যে এই সকল রাজত্বের কোনটি আধুনিক সভ্যতার সহিত কিংবা বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিল কি না?

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের দ্বারা বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে এই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বহু প্রতাপশালী নৃপতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত সম্মানে বৈদেশিক কিংবা আভ্যন্তরিক বিজয়ী মহারথীগণের দোদণ্ড প্রতাপ বিধ্বস্ত করিয়া স্বীয় বিজয় পতাকা সর্বত্র উত্তোলন করিতেছিলেন। এই ধারাবাহিক ইতিহাসে নিম্নলিখিত কয়েকটি গুরু দেখিতে পাওয়া যায় :—

(১) খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত মৌর্য সাম্রাজ্য, এই বংশে মহাপুরুষ অশোক জন্মগ্রহণ করিয়া সুদূর আফগানিস্তান হইতে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ;

(২) খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্য,—এই বংশে ভারতের নেপোলিওন সমুদ্রগুপ্ত, বিজ্ঞানুরাগী চন্দ্রগুপ্ত, প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইহারা জনগণের স্বর্গ করিয়া আধ্যাত্মিক, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সার্কসেইম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ;

(৩) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সর্বজনবিদিত বর্দ্ধন বংশের গৌরবে বিশেষতঃ হর্ষ-বর্দ্ধনের কীর্তিসমূহ যেন ভারতের লুপ্ত গৌরবের পুনরায় জয় ঘোষণা করিয়াছিল ;

(৪) খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট ও চালুক্যবংশে নররাজ গোবিন্দ, বীরাগ্রগণ্য দ্বিতীয় পুলকেশী প্রভৃতি কণকময়্য মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব দ্বারপ করিয়াছিলেন ;

(৫) ভারতের সমুদ্র উপকূলে দক্ষিণ সীমান্তে নবম হইতে চতুর্দশ শতাব্দীতে চোলবংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে রাজরাজনন্দন রাজেন্দ্র চোল (১০১৩—১০৪২) কলিঙ্গদেশ, দক্ষিণ লাটদেশ, বাল্লাল দেশ জয় করিয়া মহাবীর বঙ্গেশ্বর ধর্মপালের মনেও ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত তাঁহার বিজয়ভেরী নিনাদিত হইয়াছিল;

(৬) খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গের পাল ও সেনরাজবংশ—এই পালবংশের সম্রাট ধর্মপাল হিমালয় হইতে বিজয়গিরি পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশ স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন এবং এই পাল-বংশেরই নরপতি পৌড়াধিপ দেবপাল উৎকল প্রদেশের গৌরব বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং ছন গর্র খর্ব করিয়া জাবিড়াধিপতি ও গুজরাধিপতির পতাকা বাহুবলে অবনত করাইয়াছিলেন।

যাহারা অমুমান করেন ভারতের স্বাধীনতার ও গৌরবের ইতিহাস হর্ববর্দ্ধনের রাজত্বের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া কেবল মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিবর্গের রাজত্ব পর্য্যবসিত হইয়াছিল এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারাও দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাদের এ অমুমান ভ্রমপূর্ণ। আধুনিক বঙ্গীয় ও ভারতের অস্তিত্ব প্রদেশের মুসলমানগণের উৎসাহে ও চেষ্টায় বঙ্গের পালরাজগণের, দাক্ষিণাত্যের চোল রাজগণের এবং মধ্য ভারতের অধীশ্বর বিজয়-নগরাধিপতি নরেন্দ্রবর্গের যে ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে মধ্যযুগের বিজয়ী মহাপুরুষ বিজয়নগরাধিপতিগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও পালরাজগণ ও চোলদেশাধিপতিগণ সার্বভৌম সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনায় কৃতকার্য হইয়া সুবিশাল রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা সম্মানে, আধিপত্যে, ক্ষমতায় এবং প্রতিপত্তিতে হর্ববর্দ্ধনাদি কিংবা চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। সুতরাং ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ইতিহাস, সামাজিক উন্নতির ধারা, ধর্মের পরিপুষ্টি কিংবা বাণিজ্য ও শিল্পের ক্রমবিকাশ ইত্যাদি যে সকল বিষয়

অতীতের গৌরবের স্থল অধিকার করিয়াছিল তাহা বর্দ্ধনবংশের পতনের সঙ্গেই সপ্তম শতাব্দীতে বিলুপ্ত হয় নাই। পরন্তু যখন দিল্লী, আজমীর, লাহোর, ওজবর প্রভৃতি প্রদেশে রাজপুত মহাপতিগণ মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের উত্তর প্রদেশে শৌর্য্য, বীর্য্য ও প্রতাপের পরীক্ষা দেখাইয়া মাতৃভূমি রক্ষাকল্পে প্রকল্পবদনে আত্মোৎসর্গ করিতেছিলেন এবং শোণিত তর্পণে দেশ-মাতৃকার পূজা করিয়া আত্মদমন বর্দ্ধন করিতেছিলেন, তখনও একাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ব প্রদেশে পালরাজগণ এবং দক্ষিণে চোলরাজগণ আর্ধ্য-ভূমির সমৃদ্ধিভাণ্ডার—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও স্থপতি বিদ্যায় পূর্ণ করিতেছিলেন। সুতরাং পূর্ব ও দক্ষিণের এই দুই রাজবংশকে সর্বতোভাবে সার্বভৌম নৃপতি হর্বের কিংবা বর্দ্ধনরাজবংশের উত্তরাধিকারী বলা যাইতে পারে। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে—এখানে অমুমানের স্থান নাই।

(৭) চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের ষাটরক্ষক কাশ্মীর নরপতিগণের কীর্ত্তি ও কাহিনী সুন্দর-ভাবে “রাজতরঙ্গিনী” ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহা হইতে হরিরাজ, ললিতাদিত্য, জয়াপীড় প্রভৃতি মহাপুরুষগণের বিজয়গাঁথা পাঠ করিলে মনঃপ্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

(৮) খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বিজয়নগরাধিপতিগণের রাজত্ব। চূর্ত্তাগ্রক্ৰমে এই প্রদেশের প্রতাপশালী নরপতিগণের প্রমাণ যোগ্য ইতিহাস অজাবধি বিশদভাবে লিখিত হয় নাই। যখন বিজয়ী মুসলমান মহাপুরুষগণ দুর্জয় বিগ্র অতিক্রম করিয়াও ভয়োৎসাহ না হইয়া প্রবল বজ্রার তায় ক্রমে ক্রমে ভারতের উত্তরখণ্ড অধিকার করিতেছিলেন এবং অবশেষে দাক্ষিণাত্যের উপর লোলু-পদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তখন তদ্রূপ বাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু নরপতিগণ আনৈক্যে প্রদেশের নরপতির পতাকার নিম্নে সমবেত হইয়া মুসলমান আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিয়াছিলেন। আনৈক্যে অধিপতি ক্রমে ক্রমে একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়

কৃষ্ণদেব রায় প্রভৃতি মহাপ্রতিগণ মন্ত্রণাগৃহে, বুদ্ধক্ষেত্রে, সমাজ প্রতিষ্ঠার এবং মন্দিরাদি সংস্কার কার্যে উন্নত আদর্শের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা তদানীন্তন বৈদেশিক পর্য্যটকের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল।

(২) অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাধোজী পিন্ডিয়া, বাজীরাও, বালাজী বাজীরাও প্রভৃতি পেশোয়াগণ কি অকুত বীর-শ্বেত সহিত বিগ্রহাদি সংঘটন করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসের পাঠক মাঝেই অবগত আছেন ; এবং

(১০) অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহী-শূরাধিপতি টিপু সুলতান রণ চাতুর্য্যে ও বুদ্ধি কোশলে কেবল যে একটি প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এমন নহে পরন্তু তাহাতে তদানীন্তন শক্তিশালী ব্রিটিশ ও ফরাসীজাতীর মনেও ভীতি সঞ্চার হইয়াছিল।

ইতিহাসের স্তর নিরূপণ ফলে আমরা বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দবংশ পর্য্যন্ত আলোচনার বিরত রহিয়াছি এবং তৎপরেও সময়ে সময়ে যে সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের কথাও আলোচনা করিলাম না, কারণ উক্ত নরপতি সমূহ প্রায়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু আমাদের সর্বদাই ইহা মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহাদের ইতিহাসও অতি নগ্ন নহে।

সুতরাং দেখা গেল বৈদেশিক আক্রমণে প্রতিহত হইয়া সর্বদাই যে ভারতবাসী রাজত্ববর্গ বিপর্য্যস্ত হইয়া-ছিলেন এমন নহে; পক্ষান্তরে ইতিহাসের বিস্তৃত পৃষ্ঠাগুলি একটি একটি করিয়া মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে অতীত কালে দারায়ুস, আলেকজেন্দার প্রভৃতি মহারথিগণ ভারত আক্রমণ করিলেও ভারতের রাজত্ববর্গের অসীম বীরত্বের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপনের লিপ্সা ত্যাগ করিয়াছিলেন। শক ও চনগণ বারংবার আর্ঘ্যভূমি আক্রমণ করিলেও অবশেষে সাম্রাজ্য স্থাপন তো দূরের কথা পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে তাহাদের জাতীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মুসলমান সম্রাটগণও উত্তর প্রদেশ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া যে পর্য্যন্ত এক একটি করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে রাজ্যগণকে পরাভূত না

করিয়াছিলেন, ততদিন দিল্লির সিংহাসনে নির্ঝরে উপবিষ্ট হইতে পারেন নাই। সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজির সেনা-পতি মালিক কাকুর “৩১২৮ হস্তী, বিশ্বেশিত সহস্র অশ্ব, এবং ১৬,০০০ মন স্বর্ণ এবং বহুবিধ রত্ন মুদ্রাদি” দাক্ষিণাত্য অভিযানের “দ্রব্যাদি স্বীয় প্রভুকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন” (ফিরিস্তা) একরূপ লুণ্ঠন সন্ধ্যোও প্রায় দুই শত বর্ষকাল বিজয় নগর-হিন্দু রাজত্বের উপর আলাউদ্দীন আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। এবং পর্তুগীজ বণিকগণও কোনও কৌশলেই বিজয় নগরে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে নাই। এই সকল বিষয় বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, বিজয়ো-ন্নত বিদেশীয় মহাপুরুষগণ আক্রমণ করিয়া মাঝেই যে আর্ঘ্য অধিবাসীবৃন্দ ভারতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আগন্তুককে সাদর সম্ভাষণ করিয়া তাহাদিগের নিকট নতক অবনত করিয়াছিলেন—এই কথা সত্য নহে; পক্ষান্তরে বৈদেশিক আক্রমণকারীর পুনঃ পুনঃ পরাভবের চিত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন ছনবিজয়ী দেবপালের নাম কল্পনার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে; কুমার ওপ্ত, শশাঙ্ক প্রভৃতি নরপতিগণ নামে মাত্র পর্য্যাবসিত হইয়াছেন, বিজয় নগরের রাজ্যের ইতিহাস “Forgotten Empire” পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। কলে ভুলিতে ভুলিতে আমরা একটা “অশ্রু বিস্মৃত” জাতি হইয়া পড়িয়াছি; আমাদের জ্ঞানের, আমাদের বিজ্ঞানের, আমাদের বীরত্বের অর্ধাৎ আমাদের বিশেষত্ব যাহা কিছু ছিল, সকল বিষয়ের কথাই আমরা ভুলিয়াছি। আমরা তথা কথিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্মত যে ইতিহাস পাঠ করিতেছি, তাহা ভারতের জাতীয় সম্পত্তি নহে; উহাতে ভারতের গৌরব গাথা তো গীত হয়ই নাই। পরন্তু ভারতবাসীর অবসাদেও ও আশ্রয়হীন বিচিত্র চিত্র এমন নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে, যে সেই বিস্তৃত বিবরণী পাঠ করিয়া ভারতের আবালবৃদ্ধ বনিতা-বলিতে শিথিয়াছে মহাকদ-ই-বখতিয়ার অষ্টাদশ অশ্বারোহী মাত্র সমতিবাহারে “নোদীরা” আক্রমণ করিলে তাহাদের তরে ভীত হইয়া অশীতিপর বৃদ্ধ “রায় লখননীরা” পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু ইতিহাস লেখক কেহই বিচার করিলেন না যে মিন্‌হাজের “বিখ্যাতী লোকের” বিবরণ কতদূর সত্য কিম্বা “নোদীয়া” কোনও সময়ে বাঙ্গালার অধীশ্বরের আবাসভূমি ছিল কি না, কিম্বা বখ্‌তিয়ারের বিজয়কালে লক্ষ্মণসেন জীবিত ছিলেন কি না? বাচা হউক, ইহাই এখন আমাদের বিস্তৃত বিচারে ইতিহাস!! এইরূপ কত ঘটনার উল্লেখ করা যায়। বর্দ্ধন বংশের অপতিহত প্রতাপের গতিরোধ করিয়া যিনি বৌদ্ধধর্মের ত্রয়মন্‌ ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পুনঃ জাগরণ করিয়াছিলেন সেই কর্ণসুবর্ণাধিপতি শশাঙ্ক বিদেশীয় পর্যটকের নিকট “ছট্টায়া” বিশেষণে ভূষিত হইয়াছেন, “বলের শেষবীঃ” প্রতাপাদিত্যও বিজ্রোহী বলিয়া ঘোষিত হইতেছেন এবং শিবাজীও দস্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এইরূপ ইতিহাস পাঠ করিলে জাত্যাভিমান জাগ্রত হয় না, মনে শক্তির সঞ্চার হয় না, আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় না, নিজের কার্য-দক্ষতার উপর বিশ্বাস থাকে না। এইরূপ ইতিহাস পাঠ করিলে “আত্মবিস্মৃত”ই হইতে হয়। এত শত ঘটনা ইতিহাসে বর্ণিত থাকিতেও “ভারতের ইতিহাস” পণেতা Vincent Smith লিখিয়াছেন “India remained unchanged; She continued to live her life of isolation” যেন ষাত প্রতিবারেও ভারত পরিবর্তন পরিবর্তনাদি দ্বারা নিজকে গড়িয়া তুলিতে পারে না; Mathew Arnold লিখিয়াছেন:—

“The East bowed low before the blast;
In patient deep disdain;
She let the legions thunder past;
And plunged in thought again”

যেন রাজনীতি ক্ষেত্রে উদাসীন থাকিয়া, বৈদেশিক শক্তির নিকট মৌনে পরাভব স্বীকার করিয়া, ভারত গভীর ধ্যানে পরমার্থ বিজ্ঞার আত্মসমর্গ করিয়া পার্শ্বব চিন্তা বিনা বাক্যব্যয়ে ত্যাগ করল। ইহাই কি ইতিহাস? বৈদেশিক মনোবিগণের ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে ইতিহাসের দ্বারা সমস্তে আমাদের গতির কতকগুলি বন্ধ সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে—যাহাকে Historical Orthodoxy বলা যায়, ইহা ইতিহাস পাঠের একটা গুরুতর

বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদেরকে সেই সকল বিশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোনও ঘটনাকে বিচার পূর্বক স্বীকার করিয়া দাঁড়াইয়া জ্ঞান প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে—আমাদের ইতিহাস গঠিত হইবে না, জাতির শক্তির পুনর্গঠনও হইবে না। সত্যবটে ‘Nation makes history’ কিন্তু তদপেক্ষা অনেক সত্য “History makes nation”

বড়ই আশার কথা যে আধুনিক শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধার ও জাতীয় শিষ্টতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটা সাড়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে অল্পাল্প বিষয়ের সঙ্গে ইতিহাস কেন্দ্রেও একটা আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ফলে আমাদের সম্মুখে এত বিবিধ বিষয় উপস্থিত হইবে যে কে, কি, রামস্বামী আয়েজার মহোদয়ের মত Lord Acton এর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে হয় যে এখন “Less danger of a draught than of a deluge”.

শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

অজানা দেশ।

(ছত্রিক চিত্র)

আবাদ মাস। মধ্যাহ্ন কাল, প্রথমে সূর্যের উত্তাপে সমস্ত রামপুর গ্রাম ধানি যেন ঝা ঝা করিতেছে, মাতের জ্বালন তৃণ পর্যন্ত সূর্য-উত্তাপে পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। রুটির কণা মাত্র নাই। কৃষককুল ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় পাগল প্রায় হইয়া উঠিয়াছে; চাষ আবাদ বন্ধ উপায় নাই।

রামপুর গ্রামে খোঃসেদ সেখের বাস। তাহার কিছু জমি আছে, তাহাই চাষ আবাদ করিয়া এ পর্যন্ত দিন শুকরাণ করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু এখন দেশের যেকোন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিয়া সে মাথার হাত দিয়া বাসিয়া পড়িয়াছে।

মা সরস্বতীর সহিত খোরসেদের পূর্ব পুরুষের কোন সম্বন্ধ ছিল না, সুতরাং সেও আর নতুন করিয়া ঐ দেবীর সহিত কোন বান্ধব সম্পর্ক স্থাপন করা সমস্ত মনে করে

নাই। সে তারার বাপ দাদার মতখর গৃহস্থালী করিয়া, গৃহস্থের সে সনাতন প্রথা বজায় রাখিয়া, সেই গোরক্ষণ—
গ্রামের কাজ প্রতিই তাহাদের একমাত্র কর্তব্য কর্ম—
এই শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

সে বধন ছোট ছিল, তখন প্রাতঃকালে উঠিয়া বিশেষ কোন কাজ করিত না। একটু বেলা উঠিলে 'পান্ডা' ভাত ও বাহা কিছু 'ছালুন' থাকিত তাহাই মুখে শুভ্রিয়া গরুর পাল লইয়া মাঠে যাইত। মাঠে গরু চড়াইয়া, তাহাকে ভরিয়া বেশ মুখে সময় কাটাইত। আড়াই প্রহর বেলায় সময় বাড়ী আসিয়া তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া আবার মাঠে যাইত, অপরাহ্নে গরুর পাল লইয়া বাড়ী আসিত। তারপর সন্ধ্যার পর গ্রামের রায় বাড়ীতে পুত্রী বাল্যইয়া গান বাজনা করিত। রাত্রি দেড় প্রহরের সময় নিদ্রা যাইত। এইরূপে তার দিন কাটিয়া ছিল। তারপর বধন বড় হইল, তখন বাপ খুড়ার সহিত তাহাদের চাষ আবাদ কাজে সহায়তা করিত।

বোম্বলেন পিতার একমাত্র সন্তান, স্ত্রতরাং আবহুল ও তাহার পত্নী ছেলেকে বড়ই ভালবাসিত, ছেলের জন্ত কত কি আনিয়া দিত। ধোরসেদও পিতামাতার আজ্ঞা-বহু ছিল। জমির বাহা আর হইত, তাহাতে তাহাদের ছোট সংসার খানা বেশ সুখেই চলিতেছিল।

এক বৎসর খুব শুষ্ক জম্মা হইল। কৃষকেরা বলিল, গত পঁচিশ বৎসরেও এমন শস্ত জন্মে নাই। সেবার ধান বিক্রয় করিয়া আবহুল দুই পরগা ঘরে আনিল। বাড়ী খানি একটু বেশ ঘেরামত করিয়া দুই খানা নূতন ঘর তৈয়ার করিল। পর বৎসরও পাটের দর বেশ চড়া হইয়া উঠিল। আবহুল এবারও কিছু নগদ টাকা হাতে পাইল। এইবার তাহার জী ধরিয়া বলিল, যে এই বার ছেলের বিবাহ দিতে হইবে। ছেলের আর এখন নাবালক নহে, তাহার বয়স আঠার পার হইয়াছে। শরীরের কথা বলা যায় না, কখন কি হয়।

একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া আশ্বাদ আশ্বাদ করিবার জন্ত আবহুলের জী স্বামীকে বড়ই চাপিয়া ধরিল। আবহুল পত্নীর এই সন্ত জ্ঞাপ উপেক্ষা করিতে পারিল না। অনেক অশ্রুসিক্ত করিয়া আট কোশ দূরবর্তী এক

গৃহস্থের বয়স্ক স্ত্রী কন্যার সহিত ৮০ টাকা নগদ পণ দিয়া ধোরসেদের বিবাহ স্থির করিল।

টাকা গরম অনেকেই সহ্য করিতে পারে না। যে পারে সে সংসারে কৃপণ বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সমাজ তাহাকে হেয় চক্ষে দেখিতে সাহস পায় না; আর যে পারে না, সে সমাজে সম্মান বাড়াইবার জন্ত হাতের টাকা খরচ করিয়া দিনে দিনে হেয় হইয়া পড়ে, ও পুরুষাত্মকে ফল ভোগ করিয়া থাকে। আবহুলেরও তাহাই হইল। সে একমাত্র পুত্র ধোরসেদের বিবাহে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিল। ধান ও পাট বিক্রয় করিয়া যে ২১০/১৫ আনা পাইয়াছিল তাহাতে তাহার বোল আনা ব্যয় কুলাইয়া উঠিল না। সে গ্রামের মহাজন হরকিশোর দাস হইতে মাসিক শতকরা ২০ টাকা সুদে আরও দুইশত টাকা ধার করিল। আবহুল মনে করিল, এবার যেরূপ পাট পাইয়াছি, আর দুই বৎসর একরূপ পাট পাইলেই মহাজনের ধারত শোধ হইবেই, অধিকন্তু বাড়ীর পূর্বের ভিটার এক খানা বড় টানের ঘরও হইবে।

যদি সময়ে বিবাহ হইয়া গেল। গ্রামের অনেক আত্মীয় কটুখ আসিয়া বিবাহে যোগদান করিল। আবহুল মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিল। সকলে বলিল, ইহা বিবাহে খুব ঘটাই করিয়াছে। আবহুলের সাতটা, পাঁচটা ছেলে নাই, এই এক ছেলে ধোরসেদ। তাহার বিবাহে এই ২কম দুই পরগা ব্যয় না করিলে কি ভাল দেখায়?

আবহুল এই অর্থব্যয় সার্থক মনে করিল।

মানুষ ভাবে এক, বিধাতা ঘটান আর। আবহুল মনে ভাবিল, আগামী দুই বৎসরও খুব শস্ত হইবে, তাহার ধার শোধ হইবে, তাহার পূর্বের ভিটার বড় টানের ঘর উঠিবে। যিনি মানুষের সকল ভাবনা অলক্ষ্যে বসিয়া দিনরাত ভাবিতেছেন, তিনি ভাবিয়া স্থির করিলেন অজ্ঞ প্রকার। আবহুলের আশায় ছাই পড়িল। পর বৎসর ইয়ুরোপে মল্যসমর আরম্ভ হইল। পাট আর কেহ ধরিল না। ২১০ টাকা মনে পাট বিক্রয় হইতে লাগিল। আবহুল মাথার হাত দিয়া বলিয়া

পড়িল। ক্ষেতে যে কিছু শস্য জন্মিল, তাহাতে সম্বৎসরের খোরাকী চলাই ভার হইল। শুধু আবহুল বলিয়া নয় সকলেরই মুখে এক কথা—এবার কি উপায় হইবে?

বিপদ কখনও একা আসে না। বিপদ চাইয়াই বিপদ আসে, ইহাই বিধাতার বিধি। এই সময় একদিন আবহুলের অর হইল। অর হইয়াছে, তার আর কি? দুই এক দিন উপবাস দিলেই সারিয়া যাইবে। গরীব মুসলমান আর কথায় কথায় ডাক্তার কবিরাজ ডাকেও না, ডাকার তাহাদের সামর্থ্যও নাই। তাহারা অরে ভোগে, উপবাস করে, পাড়ার মাঝার লোকে যাহা বলে, তাহা খায়, সেই সকল টোটকা ব্যবহার করে। বড় বেশী হইলে পোষ্টাপিস হইতে দুই পয়সার কুইনাইন আনিয়া খায়, শেষে পরধার খাকিলে বাঁচিয়া উঠে। নতুবা জীবলীলা শেষ হয়। আবহুলের অরেও সেই ব্যবস্থা হইল। দিন দুই উপবাসের পরও যখন অর গেল না তখন প্রতিবেশী বৃদ্ধ রহিম মণ্ডল কি একটা টোটকা দিল ও দুই দিন আসিয়া মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়িয়া দিল। তাহাতেও অর গেল না, বরং আরও বাড়িয়া উঠিল। তারপর এক দিন রাত্রিতে আবহুল সকলকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল।

সংসারে মাতা ও যুবতী পত্নী, ঘরে অন্নভাব, সন্ধ্যাপরি মহাজনের ঋণ। খোরসেদ বড় বিপদ গণিল। সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। এই দুঃখ ও বিপদের সময় প্রতিবেশীরা সকলেই মুখে সহানুভূতি দেখাইল। সকলেই বলিল “মাথার উপর আল্লা আছেন।” এই প্রাণিগুলিকে ভাতের অভাবে মারিবেন না।” আশ্বাস বাক্যে খোরসেদ মনে বল পাইল।

যথা সময়ে দুইটা ভালগর বিক্রয় করিয়া খোরসেদ পিতৃকার্য শেষ করিল। মহাজন ইহার মধ্যে দুই দিন টাকার তাগাদা করিয়া গিয়াছেন। খোরসেদ বলিয়া দিয়াছে দাঁস মহাশয় টাকা মারা যাইবেনা, তবে কিছু দেবী হইবে। আমি বাজির ধার রাখিব না, যেমন করিয়া হউক শোধ করিব।” কিন্তু কেমন করিয়া যে সে সংসার প্রতিপালন করিয়া ধার শোধ দিবে, তাহা

কৃষক পল্লিতে অনেকেরই সে বৎসর অতি কষ্টে দিন চলিল। যাহাদের কিছু ধান সঞ্চিত ছিল, তাহাদের এক-রকমে বৎসর কাটিল, যাহাদের সঞ্চিত কিছুই ছিল না, তাহারা ২৪টা গরু বেচিল, কেহবা ষটি বাটী বন্ধক দিয়া কোন প্রকারে দিন চালাইল। খোরসেদের ভিনটী গরু ও বাড়ীর দক্ষিণের ভিটের ঘর খানা এই দুইদিকে ক্ষেতার বাড়ীতে গেল। উপায় নাই। সপরিবারে ভ আর না খাইয়া মরিতে পারে না। সকলে ভাবিল, আগামী বৎসর অবশ্যই কিছু জন্মিবে; কিন্তু পরের বৎসরও অন্না হইল, মাঠের ধান গাছ মাঠেই শুকাইয়া গেল। এক বিন্দু বৃষ্টি হইল না। চারিদিকে হাহা-কার উঠিল। কেমন করিয়া দিন পাত করিবে ভাবিয়া কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া বসিল। রামপুর পল্লির অধিকাংশ কৃষকই মহা বিপদ গণিল। খোরসেদ শেষে দিন মজুরী আরম্ভ করিল।

(২)

কালের ক্রোড়ে আরও তিন বৎসর গড়াইয়া পড়িয়াছে। খোরসেদের মাও সেই আত্মানের মুখে যথারীতি স্নায় দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখনও তাহার সংসারে ভিনটী প্রাণী। লালল ধরিয়াজাৰ আবাদ করিয়া মুখে না হউক, শান্তিতে না হউক, কোনরূপে তাহার দিন পাত হইতে-ছিল। খোরসেদের স্ত্রী তাহার অল্পসত্তা এবং একান্ত সুখী। সমস্ত দিন পরিশ্রমেও তাহার মুখে কথাটী ছিল না। রূপ অপেক্ষা তাহার স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্য অধিক মাজার ফুটিয়া উঠিত। খোরসেদের আর্থিক ঠিক নেশার মত ছিল, কিন্তু সেজন্ত কোন দিন তাহাদের কর্তব্য কর্ত্ত সম্পাদনে কোন বাধা হইয়া নাই।

যৌবনের মোহ দীর্ঘকাল থাকে না। এবং সংসারের সুখও ক্ষণস্থায়ী। মালেকার অনেক বরস পর্য্যন্ত সুখ না দ হয় নাই। বিশ বৎসরের সময় তাহার পুত্র সামসু ডু'মঠ হইল।

বড়ী দেবী অনেক সময় মাসুকের উপর অবাচিত ভাবেও কটক বাড়াইবার জন্য অহুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকেন। সামসু ডু'মঠ হইবার এক বৎসর পরে খোরসেদের একটা

সহ সাধ হইল কতাকে দুই গাছি বালা প্রস্তুত করিয়া
কিন্তু খোরসেদ তার সে সাধ পূর্ণ করিতে পারেন
না। যথেষ্ট সে আকর্ষণ নিমজ্জিত। মহাজন যখন তখন
আহাঙ্কে বলিয়া থাকে—খোরসেদ দেনা শোধের কি
করিয়াছ। সুদে আসলে যে অনেক টাকা হইয়া গেছে,
কোয়ার বাড়ী ঘরেরও ত আর্গ দশ। আমি আর এত
টাকা ফেলিয়া রাখিতে পারিব না। বদ সংকে টাকা
শোধ না দেও, তবে আমাকে ধাং হইয়া আদালতের
আগর নিতে হইবে।”

খোরসেদ সবিনয়ে বলিত “আর দু চার মাস অপেক্ষা
কর, আসে চৈত্রে তোমার সব টাকা শোধ করব।”
কিন্তু শোধ যে কোথা হইতে হইবে, তাহা খোরসেদ
বুঝিত না, চিন্তায় তাহার মুখ শুকাইয়া যাইত।
সেইরূপে তাহার মনের প্রকৃতি, উৎসাহ, উত্তম—সব
চলিয়া গেল।

যুদ্ধাধম নাই সুতরাং দেশের এক কোণ হইতে অপর
কোণ পর্যন্ত একটা অভাবের সাড়া পড়িয়াছিল। এই
ভূভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। পর যুদ্ধাপেক্ষীর
বাছা হয়, বালালার সে সময় দেই দুর্গত ঘটিল।
আর নাই, বস্ত্র নাই, তৈল নাই, ঘন দীপ জ্বালাইবার
উপায় পর্যন্ত বন্ধ হইল। যে প্রমজীবি দৈনিক আট
পয়সা উপার্জন করে, তাহাকে সন্ধ্যার বৎসরও চারি
টাকা মনে চাউল কিনিয়া সংসার চালাইতে হয়। খোর
সেদ দেখিল এক মন মোটা চাউল কিনিতে ২০ টাকার
কমে হয় না। প্রত্যেক রোজ এক বেলা খাইলেও তাহার
মাসে এক মন চাউলের কম চলিতে পারে না। কিন্তু
কোন মাসে সে পাঁচ ছয় টাকার অধিক উপার্জন কপিতে
পারে না। ক্রমে এমন হইল যে তাহার দুই বেলা আহার
চলে না।

মহাজনের পীড়াপীড়িতে উপায়ান্তর নাই দেখিয়া সে
তাহার চাষ আবাদে মগল গরু ২টি ও বিক্রয় করিবে
হিস্ত করিল কিন্তু তাহাতেও মহাজনের সূনের টাকার
অর্ধেক ও শেষ হইবে না। কিন্তু যে হুঁচি গরু ছিল,
তাহা একটা গাভী ও একটা বলদ। গাভীটি কিছু দুধ

উপায় ছিল, কিন্তু কি করিবে সে? উপায় নাই।
মহাজনকে বাধা রাখিতে হইবেতো? নতুবা যে সে
ভিটা চাড়া করিবে।

সে দিন রাত্রে খোরসেদ দুইটা কাঁঠালের
কোষ বুধে দিয়া এক ঘটি জলে ক্ষুধা নিবৃত্তি
করিয়া শুইয়া তাহা কু টানিতে লাগিল। মালেকা
নিকটেই এক খানা মাদুর বিছাইয়া তাহার দুই দিকে
দুইটা সন্তান লইয়া পড়িয়া আছে। তাহার আর সে
ক্ষুষ্টি নাই, রুক্ষ কেশ, মলিন বস্ত্র, অগ্ন্যভাবে দেহ শীর্ণ,
চিন্তায় মন অবসন্ন। কেবল স্বামী ও পুত্রের মুখ চাহিয়া
সে সকল যাতনা সহ করিত, কোন দিন রাত্রে সে মুষ্টি
চাউল চিবাইয়া ক্ষুধার অসহ যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ নিবারণ
করিত, কোন দিন হয়ত ঘরে চাউল থাকিত না দুটা
একটা কাঁঠালের বীচি ভাজিয়া খাইয়া রাত্রি কাটাইয়া
দিত। বাড়ীতে কর্ণাটা কাঁঠাল গাছ ও কলা গাছ
ছিল তাই রক্ষা।

(৩)

মা! মা! কোন শব্দ নাই। পাঁচ বৎসরের শিশু
আবার ডাকিল ‘মা’। তেমন নিস্তর। নিকটে
মাপেকা মাদুরে শুইয় ছিল। শিশু একবারে মায়ের
পিঠের উপর আসিয়া পড়িল এবং বুকেরিয়া পড়িয়া
নিজের মাথাটি মায়ের গায়ের উপর রাখিয়া তাহার
কোমল কর পল্লবে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া
আধ আধ স্বরে বলিল? “মা ভূমি কাঁদ। বাবা কি
বুকে?”

মালেকা সত্য সত্যই কাঁদিতেছিল। এবার প্রবল
বেগে চোখের জল তাহার দুই গাল বহিয়া ঝরঝর করিয়া
গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে মাকে জ্বালাইবার লজ্জা
বলিল “মা বড় ক্ষুধা হুধ খাব।” মায়ের হৃৎ সন্মুদ্র
আরো উথলিয়া উঠিল মালেকা ছেলেটিকে জড়াইয়া
বুকে লইয়া বলিল “বাচা ভূমি কেন এই হতভাগিনীর
পেটে জন্মিয়াছিলে। আমি এমন পাপিষ্ঠা যে তোমাদের
তাই বোনকে পেট ভরায়া দুই বেলা ভাত খাইতে দিয়াও
বাচাইতে পারি না। আমা, তোমার মনে এই ছিল?

খোরসেদ দাবার বসিয়া তামাক টানিতে ছিল, কলিকার আগুণ অনেকক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে ; সহসা এই কথা শুনি তাহার শরীরে যেন একটা অগ্নি কণা ছড়াইয়া দিল—মনের মধ্যে তাহার যে কি বাধা লাগিয়াছিল, তাহা বাহারা দুই বেলা খাইতে পায়, তাহাদের অকৃত্রিম করিয়ার শক্তি নাই।

চারি বৎসরের শিশু দুধ চাহিয়া চাহিয়া মায়ের কোলের কাছে মাটিতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার মাখা ম'য়ের কোলের উপর ছিল ; মালেকার অজ্ঞাতসারে কয়েক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু ছেলের মুখে গড়াইয়া পড়িল।

মেয়েটির এখনও দুই বৎসর পূর্ণ হয় নাই। যত দিন পাকীটী ঘরে ছিল, যে দুধ টুকু হইত, ছেলে মেয়েকে খাইতে দিত। এখন আর পুরু নাই, একবার ভাত খাইয়া আর ছেলে মেয়ে থাকিতেও পারে না। তাই সে ভাতের ফেন খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল কোন দিন একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া, কোন দিন একটু শুষ্ক গুলিয়া তাহা মিষ্ট করিয়া দিত। আজ রায় বাড়ীতে মালেকা একটু গুর চাহিয়া আনিতে গিয়াছিল, বাড়ীতে আসিয়া দেখে, একটা কুকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার ফেন টুকু নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে।

ছেলেটির বুদ্ধি হইয়াছিল। সে বলিত—মা এ দুধ ভাল নয়, আমি এ খাব না। আমি আমাদের লাল গাধার দুধ খাব। আমাদের লাল গাধা কই গেছে মা, তাকে কেনিয়া গেছে, আমি তার দুধ খাব। মালেকার মুখ নিষ্কল অশ্রু বিসর্জন ভিন্ন আর এসকলের কি উত্তর দিবার আছে ?

তাত্র মাসের মধ্যভাগে এক দিন খোরসেদকে সপরিবারে উপবাস থাকিতে হইল। মালেকা এ পর্যন্ত সকল বস্তু নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছে। আজ আর পারিল না। রাত্রে কাতর ভাবে স্বামীর নিকট বলিল “এতদিনে বুঝি অনাহারে ছেলে মেয়ে দুটা মারা যাবে। আমরা না হয় না খাইয়া মরলাম, ছেলে মেয়ে দুটা যে মারা যায়, তার উপায় কি ? ছেলেটা বলিল “মা কিছু খাইতে দে, পেটে যে বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। মেয়েটা

তাহার মুখ দিয়া ক্রন্দন স্রবিত্তেছিল না। সে কোঁকাইয়া কাঁদিতেছিল, আর তার চক্ষু দুটা দিয়া জলধারা পাল বাহিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত দিন ক্ষুধার তাড়নার চীৎকার করিয়াই এমন অবসাদ আসিয়াছে। মালেকার উপবাসে উপবাসে কথানা অগ্নি মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তখন দুই কোথা হইতে আসিবে ?

মাখুষ এ বাতনা চক্ষে দেখিতে পারে না। খোরসেদ ও পারিল না। বাহির হইয়া গেল। কতক্ষণ পরে সে কতকগুলি কচি বেল লইয়া আসিল। মালেকা তাহাই জলে সিদ্ধ করিয়া একটু লবণ মাখিয়া তাহার মাখা ও পুত্রকে খাইতে দিল কিন্তু তাহার পেট ভরিয়া দিতে পারিল না। মালেকা নিজে উপবাস থাকিয়া বেরেরীকে কোলে লইয়া সেই সিদ্ধ বেল একটু একটু তাহার মুখে দিতে লাগিল। খোরসেদ আহারান্তে ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কিছু খাইলে না ? মালেকা নীরব। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসায় সে মুখ নত করিয়া বলিল—“সবতো সিদ্ধ করি নাই, যে টুকু সিদ্ধ করিয়া ছিলাম তাহা আর মাই, সকালে উঠিয়া ছেলে মেয়ের মুখে কি দিব ? তাই কিছু রাখিয়া দিয়াছি। আমার জন্ত ভাবনা কি ? ঘুমাইলেই রাত কাটিয়া যাইবে।” খোরসেদ কাতর ভাবে বলিল “একরাত কাটিলেই কি চলিবে ? আবার যে রাত আসিবে। কাল কি করিয়া সংসার চলিবে ?” খোরসেদ স্থির করিল যে প্রকারে হয়, কাল একটা ব্যবস্থা করিতেই হইবে ; ছেলে মেয়ের প্রাণ বাঁচাইতে হইবে তো ?

(৩)

প্রভাতে খোরসেদ কালের সন্ধানে বাহির হইল। গত বৎসর প্রবল বস্তার মাঠের সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়াছিল। এবার বৃষ্টির অভাবে বোর ধান প্রভৃতি না হওয়ায় দেশের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। চাউল প্রতি মণ ৮০ হইতে ৯০ টাকা। অধিকাংশ লোকেই ‘আলু’ খাইয়া কোন প্রকারে দিন বাপন করিতেছে। দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। চারি পরশা দিয়াও কেহ মজুর লয় না। দরিদ্র গ্রামবাসীগণ অপেক্ষাকৃত সম্বল অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘারে ঘারে ঘুরিয়া কাল জুটাইতে

কালের সন্ধ্যানে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কাজ জুটাইতে পারিল না। তখন অবসর প্রাণে গ্রামপ্রান্তে বসিয়া আপন ভবিষ্যৎ ভাবিতেছিল, আর ভগবানকে বিদায় দিতেছিল। সহসা তাহার মর্মভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ও তৎসঙ্গে একটা অব্যক্ত শ্বনি মধ্যাহ্ন বায়ুতে মিশিয়া গেল। সে কাতরকণ্ঠে একবার ডাকিল “এ আন্না।”

মানসিক বহুগায় তাহার প্রাণ ছটফট করিতেছিল। গৃহে দুইটা শিশু জুবার তাড়নায় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। যদি সে কাছে থাকে, তাহা হইলেও তাহার কতকটা শান্তি হইতে পারে—তাঁবিয়া সে দুটিয়া বাড়ীতে চলিল।

বাবাকে আসিতে দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে বালক বলিল “কি আনিয়াছ বাবা, মাও, আমার যে বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। আজ যে আর কিছু খাই নাই, এই দেখ পেট।” ছেলে তাহার পেট দেখাইল। বালিকাও পিতাকে দেখিয়া একবার সকাতির চাহিল। কিন্তু সর্বসেবা সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি মালেকা কোন কথা বলিল না, একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মন্তক নত করিয়া আঁচলে চক্ষু মুছিল। সে বুঝিয়াছিল, ধোরসেন খালি হাতেই ফিরিয়া আসিয়াছে, কোন সংস্থান হয় নাই।

ধোরসেন আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার চক্ষু হইতে টস টস করিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। “আর সহ্য হয় না, আচ্ছা দেখি ভিক্ষা করিয়া দুমোটা চাউল মিলাইতে পারি কি না?”

ধোরসেন উদ্ভ্রমের জ্বর ছুটিল। বালক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হেলিয়া ছলিয়া দৌড়িয়া গেল, বলিতে লাগিল “বাবা আমাকে নিয়া যাও, বড় ক্ষুধা, আমাকে নিয়া যাও, আর কাদবো না, বাবা।”

বালকের কঠোর দূরে ধোরসেনের কর্ণে পুনঃ পুনঃ শ্রবিত হইতে লাগিল। ধোরসেন আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিল—“এ আন্না।”

মালেকা পাছে পাছে বাইরা পথ হইতে পুত্রকে

ঘরে প্রবেশ করিয়া ছেলটাকে কোল হইতে নামাইয়া ফিরিল, তখন দেখিল ২৩টা ভদ্র যুবক মাথার চাউল লইয়া তাহার ঘারে উপস্থিত।

যুবক দুটা বিজ্ঞাসা করিল “ধোরসেন সেখের এই বাড়ী?”

প্রত্যুত্তরে মালেকা বলিল “হাঁ,” তারপর আগ্রহের সহিত বলিল—বাবা তোমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছ?”

“আমরা তোমাদের জন্ত খাবার ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছি। তোমরা কত জন? প্রত্যহ কতটা চাউল প্রয়োজন, আমরা জানিতে চাই।”

মালেকা তাহাদের কথা শুনিয়া হাতে যেন স্বর্ণ পাইল। তাহাদের প্রতি স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করিতে বাইরা কাদিয়া ফেলিল, সজলনেত্রে স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল “আমরা চারি জন।”

যুবকগণ যথারীতি চাউল রাখিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল আমরা প্রত্যহ আসিয়া তোমাদিগকে চাউল দিয়া যাইব। তোমরা ভয় করিও না, কোন চিন্তা করিও না। আমরা রামকৃষ্ণ মিসন হইতে আসিয়াছি। তাহারা অল্প পাড়ায় চলিয়া গেল।

মালেকার হৃদয় আকুল যে কি অনির্বচনীয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল, তাহা বলিবার নহে। আজ সে যে পত পুত্রকে পেট ভরিয়া খাওয়াতে পারিবে, ভুক্তভোগী ব্যতীত সে আনন্দ কে বুঝিবে?

মালেকা উঠিয়া হাঁড়তে চাউল বণাইয়া দিল। ভাত হইলে হেগে মেথেকে বেশ করিয়া খাওয়াইয়া দিল। কিন্তু ধোরসেন যে এখনো ফিরল না? সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল; তথাপি ধোরসেন ফিরল না, মালেকা উপবাসী পতির জন্ত ভাত প্রস্তুত করিয়া বাসিয়া আছে। ধোরসেন নাই। বুঝিবা ক্রীপুত্রের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় নির্ধারণ করিবার জন্ত সে কোন অজানা স্থানে চলিয়া গিয়াছে।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইল, তথাপি

ভাদিয়া পড়িল। অনাহারে অবসন্ন প্রাণে মালেকা বিছানা লইল। শেষ রাত্রিতে একবার মালেকা জাগিল, কিন্তু দেখিল তখনও খোরসেন্দ আসে নাই। মালেকার প্রাণ ছটফট করিতেছিল একবার উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, অবসন্ন প্রাণে পড়িয়া রহিল।

অনেক বেলাতে ছেলে মেয়ের আর্দ্রন দে প্রতি-বেশীরা আসিয়া যখন দরজা খুলিল, তখন তাহারা বুঝিতে পারিল, মালেকাও প'তর সন্ধানে সেই অচেনা দেশে চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সঙ্কলন ও সংগ্রহ।

চিনির নূতন উপকরণ।

ইক্ষু, খেজুর, বিট, আলতাতরা, প্রভৃতি হইতে চিনি বহুকাল যাবত তৈয়ার হইতেছে; অধুনা কিন্তু এক অতিনব জিনিষ হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার জোগার হইতেছে। ইংলণ্ডে ইহার বিশেষ আলোচনা চলিতেছে, বোধ হয় ইহার চেউ ভারতেও আসিয়া প'হ'ছবে। এবার চিনি তৈয়ারের চেষ্টা হইতেছে—করাতের গুড়া হইতে, পূর্বে উহা বোতল শিশি পেক করতে কিম্বা বরফ আবিক্ত ভাবে দীর্ঘ সময় রক্ষা করিতে ব্যবহৃত হইত। প্রথমতঃ করাতের গুড়া হইতে মদ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা ছিল; কিন্তু আইনের ফের মদ তৈয়ার করা তত সহজ নহে মনে করিয়া উহা দ্বারা চিনি তৈয়ার করার চেষ্টা হইতেছে। করাতের গুড়া জল মিশ্রিত সালফিউরাস্ এলিডে ভীর্ণ করতঃ ৬ কিম্বা ৭ বায়ব চাপের দ্বারা উহার শক্ত করা ২৫ অংশ চিনিতে পরিণতঃ হয়, ইক্ষু করিলে পচন ক্রিয়া দ্বারা এই চিনির ৫ ম অংশ মদে পরিণত করা যায়।

সঙ্গীতে ব্যয়।

অর্থ ব্যয়ের দ্বারা দেশের অবস্থা বুঝিতে হইলে আমেরিকাকে সঙ্গীত প্রধান দেশ বলা যাইত। জন ক্রিয়ার্ড বিয়াছেন যে, সমস্ত যুক্ত প্রদেশে বৎসর ১২০, ০০০, ০০০ পাউণ্ড সঙ্গীতাদিতে ব্যয় হয়। আমেরিকাতে

সামরিক ও নৌ সেনাতে মাত্র ইহার এক তৃতীয়াংশ খরচ হইয়া থাকে। যে জার্মান দেশ সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধ, তথায় সঙ্গীতাদির ব্যয়ের দশ ভাগ সামরিক ও নৌ সেনাতে খরচ হইয়া থাকে। আমেরিকাতে সঙ্গীত ও বাদ্য যন্ত্রাদিতে তৎকালগ্নে বৎসর ১০, ০০০, ০০০ পাউণ্ড খরচ হইয়া থাকে। বৎসর ২৭, ০০০, ০০০ পাউণ্ডের পিয়ান, ২০০০, ০০০ পাউণ্ডের অর্গেন, ১৩, ০০০, ০০০ পাউণ্ডের গ্রেমফোর্ডকর্ড ও ২, ১০০, ০০০ পাউণ্ডের সঙ্গীত পুস্তক বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহার শত করা ৭০ হইতে ৭৫ পাউণ্ড মহিলা গণ ব্যয় করিয়া থাকেন।

মনুষ্য শরীরের উপাদানের মূল্য।

এক জন জার্মান রাসায়নিক, এক অদ্ভুত তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। মনুষ্য শরীরের উপাদান সকল বিশ্লেষণ করিয়া বাতারে বিক্রয় করিলে উহার কত দাম হয় তিনি তাহাই দেখাইয়াছেন। 'মেডিকেল প্রেস ও সাকুলার নামক কাগজে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১ মন ৩৫ সের ওজননের একটি মনুষ্য দেহের উপাদানের মূল্য ১পাউণ্ড ১১শিলিং ৩পেন্স। ঐরূপ একটি দেহে ১০শিলিং ৫পেন্সের মদ (চরবি) পাওয়া যায়। উহাতে যে লৌহ থাকে, তাহার পরিমাণ অতি কম। উহাদ্বারা অতিকণ্ঠে ১ইঞ্চ পরিমাণ একটি পেরেগ তৈয়ার করা যায়, ইহাতে যুগ্মির একটি বড় রকমের ঘরের চুন কাম হইতে পারে ঐরূপ চুন পাওয়া যায়। সেই দেহের কস্ ফরাসের দ্বারা ২২০০ টি ম্যাচ বাতির কাগী প্রস্তুত হইতে পারে। একুটি মানব দেহে ১০০ শত ডিম্বের এলবুমেন (ডিম্বের খেত পদার্থ) পাওয়া যায়। বোধ হয় ইহাতে চাষের চামচের আন্দাজ সর্বত্র ও অল্প মাত্রে লবন পাওয়া যায়"।

প্রথম দেখিতে মনে হয় যেন এক নূতন বাণিজ্যের পন্থা উন্মুক্ত হইল।

যুত ব্যক্তিদিগকে চুণে গ্ননিগতঃ করিয়া জীবিতগণ দ্বারা কুকুট গৃহ চুন কাম করাইয়া লওয়া যত সহজ মনে হয় বস্তুতঃ ইহা তত সহজ নহে। উপাদান সকল দ্বারা প্রকৃত মনুষ্য দেহ একবার গঠন করিলে উহা বিশ্লেষণ করিতে (আমাদের) উপাদানের মূল্য ১পাউ ১১শিলিং ৩পেন্স অধিক লাগে। আমাদের মৃত্যুর পর দেহটা দোকানদারকে দিয়া যাইতে পারিনা ইহাই দুর্ভাগ্য।

আলোক পক্ষী ।

আমাদের দেশে কাহার কাহারো মুখে শুনা যায় যে রাজিতে কেহ ২ এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে আলোক পিণ্ড চলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন। আমাদের দেশে ইহার কারণ নির্দেশ করিতে আর কোন লেঠাই নাই, কারণ উহা ভূতের ঝাড়ে চাপাইয়া দিলেই সব চুকিয়া গেল। বস্তুতঃ পক্ষী কখন কখনও রাজিতে একরূপ জ্যোতিষ্মান পাখী দেখা গিয়া থাকে; কিন্তু ইহা অত্যন্ত বিরল। ১৯০৭ সনে সার ডিগব পিগট পক্ষী বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত গণের (Ornithologists) নিকট প্রকাশ করেন যে ঐরূপ একটা পাখী কেবলি জে দেখা গিয়াছে। ঐ দেশে ১৮৬৬ সনে মিঃ হার্বি ব্রাউন একটি ভ্রাম্যমান আলোক অনেক সময়ে দেখা বাইত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ কথা তখন কেহ গ্রাহ্য করে নাই; কারণ সকলেই মনে করিয়াছিল যে উহা সাধারণ গ্রাম্য লোকের ভ্রম বিশ্বাস মাত্র। সার ডিগব পিগট বলেন যে; ১৯০৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে নফেকের নিকটে একজন পক্ষী বৃক্ষক ঐ রূপ এক জোরা পাখী দেখিয়া একটিকে মারিয়াছিল। পরে দেখা গেল যে উহা একটি সাধারণ পেচক মাত্র। ১৯০৭ সনের অক্টোবর মাসে মিঃ পার্ভি এবং মিঃ সেপনসার ঐ রূপ একটা পাখী দেখিতে পান। উহা পুনরায় ১২শে ও ২২শে ডিসেম্বর দেখা গিয়াছিল। প্রথম বারে যখন দেখা যায় তখন উহার আলো অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল; কারণ উহা বৃক্ষের যে শাখাতে উপাবস্ট ছিল, ঐ আলোর প্রভাবে তাহা দেখা গিয়াছিল। বিচক্র গাড়ীর (bicycle) আলো তৎপন্ন গল হইতে বেরূপ দেখা যায়, উহার আলোও সেইরূপ ছিল। ঐ পাখী দর্শকের বিপরীত দিকে উড়িয়া গেলে উহার আলো অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে পাখীর বক্ষস্থলই আলো বিকীরণের স্থান। মিঃ হার্মেন ১৯০৭ সনের ডিসেম্বর মাসে কেম্ব্রিজের জলাভূমিতে ঐ রূপ একটা পাখী দেখিয়াছিলেন। ১৯০৭ ও ১৯০৮ সনে অনেকেই এই দৃষ্ট দেখিয়াছেন; কিন্তু ১৯১২ সনে উহা আর দেখা যায় নাই। ঐ পাখীর বক্ষের দ্বিগুণ পদার্থের দ্বারা ঐ রূপ আলো হওয়া অনুমান করা যায়, এবং পালক উঠিলেই উহা নির্মাপিত হয়।

‘সুনিদ্রা ও অনিদ্রা।

নিদ্রা একরূপ অভ্যাস মাত্র। এই অভ্যাস অনেকটা স্বাভাবিক এবং ইহা অত্যন্ত উপকারী। অমিতাচারের

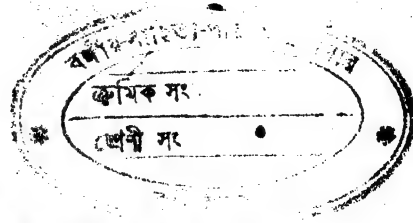
দ্বারা ইহা সহজেই নষ্ট হইতে পারে। ঔষধের দ্বারা অনিদ্রা রোগ, আরোগ্য করা সহজ সাধ্য নহে। সুনিদ্রার জন্ত ঔষধ ব্যবহার করা অনেক সময়েই বিপদ জনক এবং চিকিৎসকের উপদেশ ভিন্ন ব্যবহার করা উচিত নহে। যদি দোষিতে পাও যে তোমার সুনিদ্রা হইতেছে না এবং এই অভ্যাস ক্রমে বিনীত হইয়া উঠিতেছে তাহা হইলে বাজে কাজ অনেকটা কমা ইয়া দিয়া নিদ্রা বাইতে চেষ্টা করবে।

নিদ্রার জন্ত শরীর ও মন উভয়েরই বিশ্রামের দরকার বাহ্যিক নিদ্রা হইতে বঞ্চিত, তাহার কারণে শরীর মন কিরূপ ভাবে বিশ্রাম দিতে হয়। তাহার শয্যা শয়ন করে বটে; কিন্তু সেখানেও তাহার নানারূপ চিন্তার মগ্ন থাকে নিদ্রার জন্ত শরীর ও মনের সম্পূর্ণ অবসাদ আনিতে হয়।

নিম্ন লিখিত ব্যায়াম যথাযথ রূপ অভ্যাস করিলে অনিদ্রা রোগে বিশেষ ফল পাওয়ার সম্ভব।

শরীর সহজ ভাবে রাখিয়া সন্ধ্যাবেলা দাঁড়াও, হস্ত দুইটি দুই পার্শ্বে অঙ্গসভাবে ছাড়া দেও, এখন বীরভাবে নাসারন্ধ্র দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিতে থাক এবং সেই সঙ্গে হস্তদ্বয় দুই পার্শ্বে বীরে ২ উঠাইতে থাক। হস্ত একরূপ ভাবে উত্তোলন করিবে যে যখন যন্ত্রকের উপর হস্ত উত্তোলিত হইল উত্তর হস্তের বৃদ্ধান্তে সংলগ্ন হইলে ঠিক সেই সময়ে বক্ষস্থলে পূর্ণ ভাবে বায়ু গ্রহণ করা শেষ হইবে। সে সময়ে যন্ত্রক একটু উর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিয়া দম বন্ধ না করিয়া বীরে বীরে প্রাণায়াম করিতে থাকিবে, এবং সে সঙ্গে হস্তদ্বয় সমুদ্র তটিকে ও মিলিত ক্রমে নামা হতে থাকিবে। এই কার্যটি একরূপ ভাবে করিবে যে প্রাণায়াম ফেলা শেষ হইবার সঙ্গে ২ হস্তদ্বয় দেহের দুই পার্শ্বে নামিয়া অঙ্গসভাবে রুলিতে থাকিবে। এই সকল ক্রিয়া অত্যন্ত ধীর ভাবে করিলে হইবে যেন কোনরূপ আয়াস করিতে না হয়। অধিকাংশ সময় বাসনা থাকার দরুন যদি অস্থির ভাব হয় তাহা হইলে নির্মল বায়ুতে কিছু শারীরিক পরিভ্রম করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। অত্যন্ত শ্রান্ত জনিত অনিদ্রা দ্বারে ২ বাহিরে ভ্রমণ ও গভীর শ্বাস প্রাণায়াম দ্বারা দূরীভূত হয়। সুশীতল বস্ত্র শয্যা শয়ন করিয়া সমস্ত দেহের ভার শয্যা ছাড়িয়া দিবে। মনে করিবে যে শয্যা তোমাকে ধারণ করিয়াছে কিন্তু তুমি শয্যাকে ধারণ কর না। নিদ্রা হইতেছে না বলিয়া উদ্বেগ হইও না। স্থির হইয়া কিছু সময় থাকিলে নিদ্রা আপনা হইতেই আসিবে।

শ্রীহরিরচন ও প্র।



সৌরভ

অষ্টম বর্ষ।

ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

টুর্গেনিভের গল্প কাব্য।

—সন্ধ্যাসী—

আমি একজন সংসার ত্যাগী পুণ্যাত্মা সন্ধ্যাসীকে চিনি। তিনি প্রার্থনার মধুরতায় মশগুল হইবার জন্যই যেন জীবন ধারণ করিতেন। শীতকালে ধর্ম মন্দিরের মেঝেতে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতে করিতে শীতে তাঁহার পা অবশ ও কাঠের মত শক্ত হইয়া গেলেও প্রার্থনা করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। এসব কষ্টকে তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁর দাঁড়াইয়া থাকিয়া কেবলি প্রার্থনা করিতেন।

আমি তাঁহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং সম্ভবতঃ তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিতও হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল, যে, তিনিও আমার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হউন; আমাকে যেন তুচ্ছ তাচ্ছল্য না করেন। আমার জন্য তাঁহার আনন্দও অগ্রশমনীয়।

তিনি নিজকে, স্বপ্ন অহংকে নাশ করিবার পন্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু আমিও —। আমি যে প্রার্থনা করি না, সেটা আত্মাহুতের জন্য নহে।

তাঁহার অহং তাঁহার কাছে যেমন, হয়তো আমার অহং আমার কাছে তদপেক্ষা বেশী ভারী ও ঘৃণ্য।

কেমন করিয়া নিজকে ভুলিতে হয়, তাহা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু আমিও তাহা পাই বটে, তবে অধ্যাত্মতত্ত্বে পাই না।

তিনি মিথ্যা কথা বলেন না; আমিও মিথ্যা কথা বলি না।

—জীবন সাপনের বিধি—

এক চালাক বৃদ্ধা জুয়াচোর আমাকে বলিল—“জানো হে, যদি তুমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেশ করে চটিয়ে তার কতি করতে চাও, তো, তার যদি কোনো ক্রটি কিম্বা কলঙ্কের কথা তোমার জানা থাকে, তবে সেই কথা উল্লেখ করে তাকে খুব কদে গাল পাড়ো। খুব রাগ দেখাও আর বেশ চটিয়ে গাল দাও।

“প্রথমতঃ, আর সকলে ভাববে তোমার নিশ্চয়ই ঐরূপ কোনো কলঙ্ক নেই।

“দ্বিতীয়তঃ, তোমার রাগটা প্রকৃত পক্ষে খাঁটি হওয়া চাই। তোমার নিজের বিবেকের বোঁচায় তোমার মনল হতে পারে।

“ধর—যদি তুমি স্বপক্ষ ত্যাগী হও, তো, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার গভীর বিদ্বেষ নেই বলে খুব তিরস্কার কর।

“যদি তোমার হৃদয়টা কৃতদাসের মত ছোট হয়, তবে তাহাও হৃদয়টা কৃতদাসের মত ছোট—একথা জোরের সঙ্গে তাকে বল। বল, যে, সে সভ্যতার দাস, ইউরোপের দাস, সমাজ সংস্কারবাদের গোলাম।”

আমি প্রকারান্তরে উল্লেখ করিলাম—“কেউ হয়তো বলতে পারেন কৃতদাসের বিরুদ্ধতার দাস।”

বৃদ্ধ জুয়াচোর আমার মতে মত দিয়া বলিল—“তুমি তা—ও বলতে পার।”

শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বৈদিক যুগে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় ।

ঋগ্বেদে আমরা তিনটি দেব সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাই । বসু, আদিত্য ও রুদ্র নামে ইহারা প্রসিদ্ধ ছিলেন । ইন্দ্র বসুদিগের প্রধান ছিলেন । অগ্নি ও অঙ্গিরাস ঋষিগণ বসু-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত । ঋত্ব নামে এক দেব বৈদিক যুগে প্রসিদ্ধ ছিলেন । তাঁহাকে সবিতা বলা হইত । কারণ তিনি দেবগণের মধ্যে স্বর্গীয় সোমরস বিতরণ করিবার অধিকারী ছিলেন । তিনিই দেব, দানব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতিকে গর্ভে আকার প্রদান করেন । এই জন্য ঋত্বদেব সর্গদা দেবী দিগের দ্বারা পরিবৃত থাকেন—বেদে বর্ণিত হইয়াছে । উষাকে তাঁহার কন্যা এবং পুষাকে তাঁহার পুত্র বলা হইয়া থাকে । ইন্দ্র পুষার জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে বেদে বর্ণিত হইয়াছেন । অতএব ঋত্বদেবই প্রাক-বৈদিক যুগে বসুদেবগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন । ক্রমে বসু পূজক আৰ্য্য সম্প্রদায়ের কোন শাখা ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠদেব রূপে গ্রহণ করে । এই সম্প্রদায়ের সহিত ঋত্ব-পূজক সম্প্রদায়ের বিরোধ উপস্থিত হয় । এইরূপে বসু পূজকগণ ইন্দ্র ও ঋত্ব প্রমুখ দেব পূজক রূপে ছই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে । ঋত্ব দিগের যে সকল বৃত্তান্ত ঋগ্বেদের ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে উভয় দলের মধ্যে বিবাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় । ঋত্বগণ ইন্দ্র প্রধান বসু সম্প্রদায়ের পূজক ছিলেন । গল্প আছে, ঋত্ব দেব একটা চমসকে চারি ভাগে বিভাগ করিতে পারেন নাই । কিন্তু ঋত্বগণ তাহা সহজে করিতে সক্ষম হন । ইহাতে ঋত্ব পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হন । বৈদিক কালে আর একটা গল্প প্রচলিত ছিল যে ইন্দ্র বল পূর্বক ঋত্বের সোম পান করেন । তাহাতে ঋত্ব ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে সংহার করিবার জন্য বিশ্বরূপ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন । কিন্তু ইন্দ্র তাহাকেও বধ করেন । ক্রমে ঋত্ব ইন্দ্রের ভয়ে কম্পাবিত হইতেন এবং ইন্দ্রের জন্য বক্র নির্যাসও করিতেন । ‘ত্র্যক্ষণে’ দেখিতে পাই—ঋত্ব বা অহি ঋত্বেরই পুত্র ছিল । এই যুক্তিকেও ইন্দ্র বধ করিয়া আৰ্য্য দিগকে জল আনিয়া দিয়াছেন । ঋগ্বেদের কোন ঋষি বর্ণনা করিয়াছেন—ইন্দ্র

উষার শকট ভগ্ন করেন ও উষাকে বিশেষ রূপে নির্যাতন করেন । এমন কি ইন্দ্র আপন মাতাকে বিধবা করেন, বর্ণিত হইয়াছে । এই সমস্ত বর্ণনা হইতে আমরা বেশ অনুভব করিতেছি যে ইন্দ্র ঋত্বের পুত্র ছিলেন, ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন । কিন্তু প্রাক-বৈদিক কালে ইন্দ্র-পূজক সম্প্রদায়ের সহিত ঋত্ব-পূজক সম্প্রদায়ের বিবাদ চলিয়াছিল ; পরে ঋত্ব-পূজক সম্প্রদায়ের কোন কোন দল যথা ঋত্ব, উষা ও পুষা-ভক্তগণ ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠদেব বলিয়া স্বীকার করিলে ইন্দ্র-পূজক দলের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় । কিন্তু ঋত্ব-পূজক দল এরূপ মিলনে স্বীকৃত হয় নাই ।

ঋগ্বেদের ঋষিগণ অহিবুধ নামে এক দেবের পূজা করিতেন । অহিবুধ অর্থে আকাশের অহি বা সর্প । আমরা অনুমান করি ঋত্ব সম্প্রদায়ও ঋত্ব ও অহিবুধের পূজা করিত ; কিন্তু ইহারা ইন্দ্রের পূজা গ্রহণ করে নাই । সেই জন্য ইন্দ্র পূজক আৰ্য্যের তাহারা শত্রু ও বেদে অহি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল । ইন্দ্র-প্রধান বসু সম্প্রদায় ইন্দ্র অগ্নি, ঋত্ব, অঙ্গিরাগণ, উষা, পুষা এই সকল দেব পূজা করিত । ইহাদের অগ্নি অঙ্গিরাস নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন ।

যে সকল জাতি আদিত্য দিগের উপাসক ছিল ; তাহারা মনে করিত দক্ষ ও অদিত্য হইতে আদিত্যগণ উৎপন্ন হইয়াছেন । ঋগ্বেদে আট জন আদিত্যের উল্লেখ আছে, যথা, মিত্র, বরুণ, ভগ, আৰ্য্যামা, অংশ, স্বর্য্য, মাতাণ্ড, ও দক্ষ । এই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ অগ্নিকে দক্ষ বলা হইত । সম্ভবতঃ ইহারা মনে করিত স্বর্য্য এই অগ্নি অবস্থান করেন । বিশ্ব সংসারে ঋগ্বেদের প্রতিষ্ঠা ও অধর্মের শাসন মিত্র, বরুণ প্রভৃতি আদিত্য গণের কার্য্য, এই সম্প্রদায় ইহা বিশ্বাস করিত । সেইজন্য আদিত্যগণ ঋগ্বেদে বিশেষ ভাবে রাজত্ব ও ক্রত্ব বিশেষণে বিভূষিত হইয়াছেন । পৌরাণিক যুগে এমন কি ঋগ্বেদের কালে ও আদিত্য পূজক সম্প্রদায় স্বর্য্য বংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে । ঋগ্বেদে দেখিতে পাই ব সঠ ও অগস্ত্য ঋষি—মিত্র বরুণের পুত্র ছিলেন । অতএব অঙ্গিরাস ঋষিগণ যেমন অগ্নি বংশীয় ঋষি ছিলেন, সেইরূপ বসিষ্ঠ ও অগস্ত্য আদিত্য বংশীয় ঋষি ছিলেন । প্রাক-বৈদিক যুগে আদিত্য সম্প্রদায়ের সহিত বসু-সম্প্রদায়ের বিবাদ হইত । ইহার অস্তিত্ব ঋগ্বেদের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

আরো অনেক জাতি ছিল, যাহাদিগকে আমরা রুদ্রোপাসক বলিতে পারি। ইহাদের শ্রেষ্ঠ অগ্নির নাম রুদ্র। মরুৎগণ ও অশ্বদ্বয় রুদ্র বংশীয় বলিয়া ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ। গাভী ও পৃথিবী ইহাদের দেবী ছিল। পুশি গাভীর গর্ভে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ জন্ম গ্রহণ করেন। বোধ হয় এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা শাখা ছিল ও ভিন্ন ভিন্ন শাখায় রুদ্র, মরুৎগণ, ও অশ্বদ্বয় বিশেষ ভাবে পূজিত হইতেন। রুদ্রকে বেদে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মনে হয়, রুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা বিদ্বান হইতেন, তাহারা ঔষধ প্রস্তুত করিতেও দ্রব্যগুণ নির্ধারণে নিযুক্ত থাকিতেন। তাহারাই সমাজে বৈজ্ঞানিক কার্যে অধিকারী হইতেন। এই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকে নৈনিকের কার্য্য করিত ও আপনাদিগকে মরুৎগণের সন্তান মনে করিত। কিন্তু উহাদের মধ্যে আর এক শ্রেণী ছিল, যাহারা অস্ত্র চিকিৎসায় পারদর্শী হইত। উহারাই অশ্বদ্বয়ের পূজক ছিল। অশ্বদ্বয়ের পূজক দিগের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক ছিল, তাহারা সারথির কার্য্য শিক্ষা করিত। রুদ্র দিগের মধ্যে যাহারা গাভী ও পৃথিবী পূজক ছিল, তাহারাই কৃষি ও গোপালনে নিযুক্ত হইত।

ঋগ্বেদের যুগে এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলনের চেষ্টা হয়। বিবস্বান পুত্র মনু ও যম কতকগুলি বনু, আদিত্য ও রুদ্র পূজক সম্প্রদায়ের মিলন দ্বারা এক নব সমাজ ও ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। মনু ধর্ম সংস্কারে এবং যম সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বনু, আদিত্য ও রুদ্র দেবগণের প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে মনু ১১টা দেব লইয়া ৩৩ দেবের পূজা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যে অগ্নি বেদোক্ত আহুতি হৃদয় করিয়া যজ্ঞ করেন, তাহা ঋগ্বেদে ইড়া নামে প্রসিদ্ধ। তাহার যজ্ঞে ৭ জন হোতা নিযুক্ত হইতেন। বোধ হয় ইহাদের অধিকাংশ বনু ও আদিত্য সম্প্রদায়ের ঋষি বংশীয় ছিলেন। কবি পুত্র উশনা মনুর যজ্ঞে ঋষিকের কার্য্য করেন, বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে যে সমাজ গঠিত হয়, তাহাই 'মানব' সমাজ নামে বিখ্যাত। যম এই সমাজে নব বিবাহ প্রথা প্রচলন করেন। বনু-সম্প্রদায়ে ভ্রাতা

ভগিনীর বিবাহ প্রচলিত ছিল। যম কিন্তু ইহা ধর্ম বিরুদ্ধ বলিয়া প্রচার করেন। তিনিই সম্ভবতঃ অগ্নি দ্বারা মৃত দেহের সংস্কার-প্রথা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা এক প্রকার যজ্ঞ। এই যজ্ঞে দেহ আহুত হইলে দেহী বর্গ লোকে যাইতে পারে। যম এই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে প্রেত লোক অভিহিত হয় এবং তিনি উহার রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন। ঋগ্বেদে বিবস্বানকে আদিত্য বলা হয় নাই। মনু ও যম বোধ হয় আদিত্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। সেই জন্ত তাহারা সূর্য্য বংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পরবর্তী যুগে তাহাদের পিতা বিবস্বান একজন আদিত্য রূপে গৃহীত হন। তাহাতে আদিত্য দিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মানব সমাজে আদিত্য ও বনুগণ সমান সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ইন্দ্র, বৃহা ও পুশাকে আদিত্য দিগের অন্তর্গত করিয়া দ্বাদশ আদিত্যের কল্পনা হইয়াছিল। এই কল্পনা ঋগ্বেদের কালে সম্পন্ন হয় নাই। মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার পরে ঋগ্বেদ রচিত হয়। ঋগ্বেদে মানব সম্প্রদায়ের ঋষি দিগের রচিত স্তোত্রাবলী। এই জন্ত এই বেদ বিশেষ ভাবে মানব জাতির বেদ।

যে সকল সম্প্রদায় মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহারা দেবপূজা করিলেও আর্ঘ্য মানব দিগের শত্রু হইয়া পড়ে। ইহারা সেই জন্ত বেদে ব্রহ্ম নামে আহুত হইত। আমাদের মনে হয় কতকগুলি আদিত্য, বৃহা ও রুদ্র পূজক জাতি (tribes) মানব সমাজে যোগ দেয় নাই। ইহাদের মধ্যে পারশ্ব দেশে জরদ্-উষ্টের ধর্ম সম্প্রদায় আদিত্য পূজক হইয়াও অঙ্গিরা-মনু প্রতিষ্ঠিত মানব ধর্মের বিরোধী ছিল। মহাত্মারতে বর্ণিত তক্ষক বা নাগ জাতি বৈদিক ব্রহ্ম বা দানব জাতির বংশোদ্ভূত। ইহারা ক্রমে প্রবল হয়, ইহারাই ইতিহাসে শক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শক গণের ধর্ম রুদ্র ও বৃহা ধর্ম-মিলনে উদ্ভূত। এই জন্ত ইহাদের রুদ্র দেবের ললাটে চন্দ্র এবং তাঁহার ভূষণ সর্প। এই সম্প্রদায়ে রুদ্রের নাম মহাদেব। ঋগ্বেদে শিব, রুদ্র প্রভৃতি নাম আছে; কিন্তু মহাদেব নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঋগ্বেদে বর্ণিত রুদ্রের দেহে সর্প নাই ও ললাটে চন্দ্র নাই। ইহা হইতে বেশ অস্ব-

ভূত হইতেছে যে কতকগুলি রুদ্র ও বৃষ্টি পূজক সম্প্রদায় মিলিত হইয়া মহাদেবের পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই মিশ্রনে তাহাদের মধ্যে নব শক্তির আবির্ভাব হয়। রাজপুতানার ইতিহাসে টড সাহেব এই নব-ধর্ম-প্রবুদ্ধ জাতির বিজয় বার্তা প্রদান করিয়াছেন।

মানব-সমাজ গঠন কালে ইহারা ঋষি পদ বাচ্য ছিলেন, তাহাদের বংশোদ্ভূত বেদবিদ সন্তানগণ যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ঋষিকের পদ প্রাপ্ত হইতেন। ইহাকে ব্রাহ্ম বলা হইত। ব্রাহ্ম নাম হইতে ব্রাহ্মণ শব্দ উদ্ভূত হইয়া ঐ সকল বংশীয় দিগকে বুঝাইত, মনে করি। অধিকাংশ অগ্নিরা বংশীয়গণ ব্রাহ্মণ উপাধি প্রাপ্ত হন। ক্রমে ইহারা ব্রাহ্মণ জাতি গঠন করেন। সেইরূপ মনু বংশীয়গণ ক্রতু ও রাজত্ব নামে প্রসিদ্ধ হইতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে কোন ২ বংশ যজ্ঞ হোতার কার্য্য করিতেন। অপর সকলে রাজ্য শাসন করিতেন। কত্রিয় জাতি এইরূপে উদ্ভূত হয়। রুদ্র বংশীয় মরুৎগণ দেব-বিশ নামে অভিহিত হইতেন। তাহাদের পূজকগণও মানব সমাজে বিশ নামের অধিকারী হন। বিশ শব্দ হইতে বৈষ্ণব শব্দের উৎপত্তি। ঋগ্বেদের কালে গৃহস্থের গৃহে দান রাখা পদ্ধতি ছিল। এই দাসগণ কোন্ জাতীয় ছিল সে বিষয়ে নানাপ্রকার অনুমান সম্ভব। প্রথম অনুমানঃ— দাস-জাতির উল্লেখ, ঋগ্বেদে বর্তমান। এই দাস জাতির সহিত আর্য্য মানব দিগের যুদ্ধ হইত। বোধ হয় যুদ্ধে বাহারা বশুতা স্বীকার করিত, তাহাদিগের মধ্য হইতে অনেককে আর্য্য দিগের গৃহে দাসের কার্য্য প্রদান করা হইত। ক্রমে ইহারা সমাজের অঙ্গীভূত হইলে শূদ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় অনুমানঃ— ঋগ্বেদের কালে একজন প্রসিদ্ধ রাজার নাম সুদাস। মরুৎগণকে সুদানব বলা হইত। যজ্ঞকে দত্তর পুত্র দানব বলিতে দেখি। ইহারা আর্য্যদিগের শত্রু ছিল। সেইরূপ অনেক দাস জাতির উল্লেখ আছে, তাহারা আর্য্যশত্রু ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, দাস ও দানব শব্দে সু উপসর্গ যোগ করিয়া আর্য্যগণ আপনাদিগের ও দেবতাদিগের নাম রাখিতে যুগ্ম বোধ করিতেন না। বসিষ্ঠ ঋষি এক হলে আপনাকে দেবতাদিগের দাস বলিয়াছেন। অত-

এব আমরা অনুমান করি আর্য্য দিগের বিশেষ মধ্যে এক সম্প্রদায় ছিল যাহারা আর্য্য ধনবানদিগের গৃহে দাসের কার্য্য করিত। ইহারা ঋগ্বেদের কালে ভিন্ন জাতি রূপে পরিগণিত হয় নাই। ইহাদের নাম হইতেই অনার্য্য আর্য্য-শত্রুগণ ‘দাস’ নামে অভিহিত হইয়াছিল। অনার্য্য দাস জাতি ও আর্য্যদিগের মধ্যে যাহারা দাস্ত বৃত্তি করিত তাহারা এক নহে। ক্রমে আর্য্য বংশীয় দাসগণ ‘দাস’ নামে বোধ হয় আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল। ইহার মীমাংসা হয় ‘শূদ্র’ শব্দের ব্যবহার দ্বারা। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে শূদ্রগণ বিগ্ৰাট পুরুষের পদদ্বয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা এই সময়ে সমাজে নির্দিষ্ট জাতিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। যখন ঋগ্বেদগণ এই মীমাংসা করেন, তখন সম্ভবতঃ অনেক অনার্য্য জাতিও আর্য্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং নবপ্রতিষ্ঠিত শূদ্র সমাজে স্থান পাইয়াছিল।

শ্রীভারাপদ মুখোপাধ্যায়।

অশ্রু ।

হেমন্ত আজ শিশির কণা
দিচ্ছে ঢেলে নয়ন কোণে,
শীতল হাওয়া হৃদয় মাঝে,
মলয় পবন ডাক না শোনে।
উষার রাব নাই সে ছবি
বিষাদে আজ আঁধার মাথা।
স্মৃতি দেবী বিরস মনে
ভুলেছে সেই চিত্র আঁকা।
হৃদয় আমার ভেঙ্গে গেছে
ছিন্ন আজি বঁগার তার।
মর্মে মর্মে বিষাদ গাঁথা
গাধনা ললিত বেহাগ আর।
সুনের মত ক্ষুণ্ণ টীত
প্রাণের যত ভালবাসা,
চাপার মত প্রেম ও প্রণয়
চাতকের তায় প্রাণের আশা,—
কোঁয়াসার তায় বিলীন হয়ে
আজ নিমেষে গেছে চলে।
বিষাদ মনে আঁধার প্রাণে,
ভাসিছে বসে নয়ন জলে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

নাস্তিক ।

মুর্শিদাবাদ এখন শুধু ভগ্ন কবরের ভয়েতন বিশ্বত প্রায় রাক্ষসী । এ পরিত্যক্ত রাজধানীতে এখনো দেখিবার মত যা কিছু ঐতিহাসিক লুপ্তাবশিষ্ট বর্তমান, তার মাঝে, আমার মতে শ্রুবে বাংলার নবাব-নাঞ্জিমদের কবর স্থানটাই এখনকার মত একমাত্র দেখিবার জিনিস । যাকে কোনো দিন অন্ধকার রাতে জাফ্রাগঞ্জের পথে মুর্শিদাবাদ হইতে জিফাগঞ্জের দিকে যাইত হইয়াছে, তিনি কখনো এ আশ্চর্য্য কবরস্থানের হৃদয় বিদারক সৌন্দর্য্যের কথা ভুলিতে পারিবেন না ।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দাল-নীল সবুজ দীপমালায় নবাব নাঞ্জিমদের শ্রেণীবদ্ধ মর্ম্মর সমাধিগুলি যখন বিচিত্র আলো-ছায়ায় রঞ্জিত হইয়া উঠে, তখন আমার মনে হইতে থাকে, যেন বাংলার ইতিহাসের এক রক্তাক্ত যুগের বিষমকর স্বপ্নে মগ্নিত হইয়া সমগ্র সমাধিভূমিটাই স্মৃতি ও বিশ্বতির মাঝে অত্যন্ত সঙ্করণ হইয়া উঠিয়াছে । কবর স্থানের যে অংশটায় রংমহলের সুন্দরীগণ আপনাদের ঝটিকাপূর্ণ জীবনের অবসানে নবাবিয়ানার স্মৃতিটুকু চিরনিষ্কার শাস্তি মাঝে জন্মের মত বিশ্বত হইবার জন্য স্নানীল ওড়নার সোণার আঁচলটা গাতিয়া রাখিয়াছেন, সে স্থানটাও নবাব নিজামদের প্রকাশ্য কবরস্থান হইতে সমুদ্র প্রাচীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন । যেন মৃত্যুর পরপারেও নিজামতের বেগমদের আকরক্ষার জন্য পরলোকগত নবাবদের সচেতন উৎকর্ষা কিছুতেই দূর হইতেছে না ।

সন্ধ্যার পর এই কবরস্থানের গভীর দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে হইত, এই কবরস্থানেই বুঝি কোনো একটা জটিল রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসার জন্য নবাবদের একটা নিস্তক্ক মজলিশ বসিয়াছে ! রাজ্যের পর রাজ্যে আবহমান কাল ধরিয়া অধবেশন চলিতেছে । মিরজাকর হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার শেষ নবাব নাঞ্জিম পর্য্যন্ত সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়াও সে সমস্যা যেন কেহ কোন সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছেন না ! এমন সমস্তা-সমস্যাতে পতিত হইয়াই যেন বাংলার নবাবগণ ছনিয়ার পাহুমিবাসগুলির সকল

মুসাফেরগণের প্রতিই অত্যন্ত জরুরী আহ্বান প্রেরণ করিয়া, তাহাদেরই আগমন প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন-চিত্তে অত্যন্ত উৎকর্ষার সহিত রাজদরবারে অপেক্ষা করিতেছেন ! যদিও আমার উপর সে দরবারের পরোয়ানা মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ীর দস্তুর মত জারি হয় নাই, তবু আমার সর্কদাই মনে হইত, —সে নীরব গভীর বিরীচি স্তব্ধ রাজ সভায় সত্যাহ দিনান্তে হাজির হইয়া হজুর দিগন্ত অন্তত একটাবার কুনিশ না জানাইয়া আসিলে, হয়ত আমার এ বেয়াদবী শেষকালের দরবারে কখনো ‘মহকুব’ হইবে না !

যদিও পোষ্টাফিসে অল্পমূল্যের কুটিনিব বিক্রি করাই আমার ব্যবসায় এবং নব্য বালার অর্দ্ধ শিক্ষিত নব দম্পতি কুলের অপরিপক্ক প্রেমালোপ সম্বলিত ভারি ওজননের চিঠিগুলির উপর পোষ্টাফিসের মার্কা মরিয়া অতিরিক্ত ডাকমাণ্ডুল আদায় করিয়া আমি এমনি দারুণ অভির্শাপ-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, যে কার্য্যস্থলে সস্ত্রীক বাস করিবার মত সঙ্গতিও আমার ছিল না, তবুও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোনো পুরুষের আমীরিয়ানার ধার না ধারিলেও, আমার মুর্শিদাবাদে বদলি হওয়ার সঙ্গেই নবাবী আবহাওয়ার গুণে আমার ভাবভঙ্গির ভিতর দিয়া এমনি সব খাস-নবাবী চাল-চলন সময়ে অসময়ে পৃচ্ছ বিস্তার করিয়া সুবেগে পেশম ধরিয়া উঠিতে লাগিল, যে আমি নিজেই অবাক হইয়া গেলাম ! যে সে লোকের সঙ্গে সহজভাবে মেলা মেসা, ওজন না করিয়া কথা বলা এবং মীরণ-মিজ্জাকরের নিরন্তরের লোকদের সঙ্গে কোনো শিষ্টাচারের সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলা আমার পক্ষে ক্রমশঃই অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল ! আমি ভাবিয়াছিলাম এই জাফ্রাগঞ্জের কবরস্থানেই আমাদের সাবেক নবাবী আমলের রাজদ্বার ইতিহাসের খশানে আসিয়া চিরদিনের মত মিলিত, হইয়াছে । আমাদের হিন্দু শাস্ত্র মতে এমন স্থানে বস্তু লাভই প্রশস্ত মনে করিয়া আমার কবরস্থানে বেড়াইবার স্তম্ভ দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ! বলিতে পারি না কেন, আমার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে নিশ্চয় কোনো না কোনো দিন এক ঈশ্বর মেঘাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না

যায়ে কোনো এক যোগল বংশীয় সম্রাট নবাব কোনো এক অদৃশ্য সমাধিতল হইতে উঠিয়া আসিবেন এবং তাঁর বহুমূল্য ক্ষিপ্রাবের জরিদার কোলা আস্তিনের ভিতর হইতে শুভ্র বলিষ্ঠ হাত দুটি বাহির করিয়া আমাকে সুপ্রচুর শিষ্টাচারের সহিত “তক্লিম” জানাইতে জানাইতে চারিদিক অত্যাৎকষ্ট শলাবি আতরের সুঘণ্ডর গন্ধে মগ্ন করিয়া দিয়া আমার সঙ্গে হাত মিলাইয়া আমার বক্ষ হীনতার সমুদয় দুঃখ এক মুহূর্তে দূর করিয়া দিবেন! মুর্শিদাবাদের মত সহরে থাকিয়া তনপেক্ষা নৌচের থাকের মনুষ্যজাতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা, ‘নৈবচ, নৈবচ!’

কথায় বলে পরম কারুণিক জগদীশ্বর মানুষের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা কখনো অপূর্ণ রাখেন না। এটা ঘোরতর সত্য কথা! কারণ এই কবরস্থানেই, এমনি এক সন্ধ্যা বেলায় আমার এক আশ্চর্য্য বন্ধুলাভ ঘটিয়াছিল।

সে দিন বিকাল বেলা আমি জাকাংগের কবরস্থানে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত পশ্চিমের আকাশটা জড়িয়া একটা সুন্দর কমলা রঙের আভা যেন ঢেউ খেলিয়া ঘাইতেছিল! আশে পাশে দুচারিটা সবুজ কোপ কাড়ের ভিতর হইতে দুই একটি করিয়া জুঁই ফুল নিঃশব্দে করিয়া পরিয়া সমাধিতলে নিঃশ্রুতা কোনো উন্মেষিত যৌবনা সুন্দরীকে চির বিরহের দুঃসহ বেদনার যাকে সচেতন করিয়া তুলিতেছিল কিনা, বলিতে পারি না, কিন্তু দুচারিটা গোলাপ অল্পর হইতে অক্ষুট সৌন্দর্য্যের জগতে সলজ্জ গন্ধজলে জড়িত মৃদু পাদক্ষেপ করিয়া প্রিয়জনের মর্ম্মর স্মৃতির উপর সাক্ষ্য রেখে নিবেদনের ছগেই বুঝি অত্যন্ত মমতার সঙ্গে বুঁকিয়া পড়িয়াছিল! একটি পত্রহীন আত্ম শাখায় বসিয়া একটি শ্রামা আপন ভাবে শিঁধোর হইয়া সমাধি ভূমি হইতে গন্ধার ধার প্রধ্যস্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া বুলিয়া ঘাইতেছিল! প্রাণপূর্ণ হৃদয় সঙ্গীতের বক্তারের মূর্কে বিস্তৃত পরলোক পুনর্জীবিত করা যায় কিনা, তারি যেন পরীক্ষা চলিয়াছে।

ঠিক সেই সময়ে, কবরস্থানের কোনো অদৃশ্য সমাধিতল হইতে কেহ সশরীরে উঠিয়া আসিল কিনা বলিতে পারি

না, কিন্তু সারি সারি কবরের ভিতরস্থিত পাথর বাঁধা সুরু সোজা পথে, দেখিতে পাইলাম, কে একজন বরাবর আমার দিকে চলিয়া আসিতেছিলেন। তাঁর মাথার টুপির উপরকার কারচুপিঝু কাঁকের উপর সন্ধ্যার আকাশ হইতে ঠিকরাইয়া পড়া কমলা রঙের কুঁড়িগুলি যেন থাকিয়া থাকিয়া জলিয়া উঠিতেছিল। তাঁর জরদার রঙের পাঞ্জাবীর ঝুলন্ত সাটিনের ঢিলা পাজামার উপর এমনভাবে নামিয়া পড়িতেছিল, এবং পাঞ্জাবীর উপর বেগুনী মকমকের ফুলদার কাবাটী এমন কায়দা করিয়াই পড়িয়াছিলেন যে তাঁকে নবাব বই আর কোনো প্রকার মনুষ্য বলিয়া ভুল করিবার কোনো ওজুহাত ছিল না। তাঁর স্বচ্ছ মুখকান্তিব উপর একটুকু মধুর গোলাপী আভা এমনি চমৎকার মিশিয়া গিয়াছিল, যে আমি বাকি রাধিয়া বলিতে পারিতাম, ইনি ছইশত বৎসর পূর্ব্বেকার কোনো ঐতিহাসিক নবাব, এ কালের সরকারি পেন্সন ভোগী নবাব বংশের কেউ নন, যদি তিনি চোখে সূর্য্য পড়িয়াছিলেন কিনা, এই টুকু নিঃসন্দেহ জানিতে পারিতাম! কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সময়ে তিনি গোঁথে নীল চসমা পরিয়াছিলেন বলিয়া চোখ দুটি ভাল দেখিতে পাই নাই; কিন্তু বাকি যে ধরি নাই সেটা বোধ হয় বুদ্ধি মানের কার্য্যই হইয়াছিল।

তিনি যখন কবরের সমুদ্র পার হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি সঠিক কে, তা ঠাহর করিতে না পারিলেও, আমি তাঁকে খাস নবাবী কায়দার সেলাম চুকিয়া সমস্ত্রমে তাঁর পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইলাম! ভদ্র-লোকটি কোঁড়হলোৎফুল্ল চোখে নীল চসমার ভিতর দিয়া আমার অদ্যোগাপ্ত ভালরকম দেখিয়া লইয়া আমাকে খাঁটি দেশী প্রথায় একটি নমস্কার করিয়া সহস্র শিষ্টাচারের সহিত জানাইলেন যে তিনি আদৌ মুসলমান নন!

আমি হাঁ করিয়া কতকণ ব্যাকুবের মত তাঁর মুখের পানে তাকাইয়া থাকিলাম। বাস্তবিক তাঁর যোগলাই পোষাকের উপর আমারি ভাবটী এমনি খাপা ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে তাঁকে মুসলমান নবাব বই আর কিছু মনে করাই তখন আমার পক্ষে তারি শক্ত। যতই ইঁতস্তস্ত করিতে লাগিলাম, ততই আমার মনে হইতে লাগিল,

যদিও খাঁচী মুসলমান ব্যতীত ভিন্ন জাতীয় কাহাকেও এমন জাঁকালো মুসলমান বেশ পরিচা বাহির হইতে কখনো দেখি নাই, তবু শুনিয়াছি আমাদেরই পিতৃ পিতামহগণ মুসলমান আমলে নাকি এই বেশেই আপনাদিগকে সন্মানিত বোধ করিতেন। মনে করিলাম, হয়ত আগকালকার বিলাতী সভ্যতার দিনেও মুর্শিদাবাদের লোকেরা নবাবী পরিচ্ছদের জাঁক জমকের আসক্তি এখনো ত্যাগ করিতে পারেন নাই! সে যাই হোক, ভদ্রলোকটী নবাব শ্রেণীর জীব নন শুনিয়া এক দিকে আমার উৎসাহ টা যেমন দপ করিয়া নিবিয়া গেল, অপর দিকে হিন্দুর বর্ণাশ্রমের সমুদয় ভেদ-জ্ঞান আমার মস্তিষ্কে টনটন করিয়া উঠিতেই আগন্তুক ভদ্রলোকটী আমার নমস্কার কিনা সে সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারায় আমি কতকটা অভ্যস্তের মতই তাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম; “আপনি ব্রাহ্মণ?”

তিনি আমার পানে সম্মুখ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,
“না, আমি নাস্তিক।”

তাঁর উত্তরটা শুনিয়া আমি বিষ্ময়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়া কতকক্ষণ তাঁর মুখের পানে তাকাইয়া থাকিলাম। যদিও আমাদের বর্তমান বস্তৃত্বতার দিনে আস্তিকতা অনেকের মধ্যেই লুপ্ত অকারের চিহ্নের মত অত্যন্ত উহা হইয়া উঠিয়াছে, তবু এরূপ উদার চেতা, স্পষ্টবাদী নাস্তিকের সঙ্গে তো ইতঃপূর্বে আমার আর কখনো সাক্ষাৎ হয় নাই! নাস্তিক শুনিয়া আমার শ্রদ্ধার অপমান যন্ত্রের পারা অনেকটা নামিয়া গেল বটে; কিন্তু নিজের স্বাধীন মতামত এতটা দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আছে দেখিয়া লোকটির সম্বন্ধে আমার কৌতুহল অনেকটা বাড়িয়া উঠিল।

ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার আলাপটা জমিয়া উঠে নাই, এমন সময় তাঁর জমকালো নবাবী পোষাক দেখিয়া কবরখানার কোরান পাড়িবার মুসী বকশিশের জন্ত সেলাম ঠুক্লেই তিনি হুই ধমকে তাকে দূর করিয়া দিলেন। অথচ সে সময় যে জীর্ণ জীর্ণ ধুনকর রাস্তা দিয়া বাইতেছিল, তাকে ডাকিয়া আনিয়া তার হাতে একটি পাঁচ টাকার নোট জুড়িয়া দিয়া বলিলেন:—‘বাপুহে,’

সন্ধ্যার পর আরো কিছু দিন তোমায় চলা ফেরা বন্ধ রাখতে হচে! ফের যদি তোমার ঠাণ্ডা লেগে নিউমো-নিয়া হয়, তবে তোমায় বাঁচিয়ে তোলা মুশ্কিল হবে।”

অমুঝানে বুঝলাম, ডাক্তারি ভদ্রলোকটির ব্যবসায়। মুনসীর উপর ধমকের চোট টা কিছু অতিরিক্ত জেরনা হইলেও, গরীব ধুনকরের উপর তাঁর সহৃদয় ব্যবহার দেখিয়া আমি একটু খুসী হইয়াই বলিলাম;—

“নাস্তিক হয়েও তো জগদীশ্বরের জীবের উপর দয়া আপনার হৃদয়ের ভিতর দিয়ে দিবি। কাজ করে যাচ্ছে! আপনার ভিতর জৈশ্বর বেঁচেই উঠছেন, ধুলো হয়ে উড়ে গিয়েছেন বলে তো মনে হয় না!”

তিনি একটা সুতীক্ষ্ণ হাসির ঝড়ে আমার মস্তব্যটা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া শেষ কালে উদার মুকুট-য়ানা ভাবে একটা কথায় উত্তর করিলেন,—“পাগল—”

আমি প্রতিবাদের সুরে যথেষ্ট উত্তেজনার সঙ্গেই বলিয়া উঠিলাম,—“শুধু আস্তি আস্তি বলে চিৎকার করার চাইতে, চুপ করে তাঁর আজ্ঞা পালন করে যাওয়ার ভিতরে তো আস্তিকতা সামান্য নয়।”

ভদ্রলোকটী প্রচুর সহৃদয়তার সহিত উত্তর করিলেন,—

“সে বিষয়ে ঘোরতর মতভেদ আছে। আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে বিচার কর্তে প্রস্তুত! কিন্তু তা হলে আপনার একবার গরীবের ঘরে পদধূলি দিতে হচে!”

আমি একটু মুহূ আপত্তির স্বরেই বলিলাম,—

“মিউনিসিপালটির যেকোনো সুবন্দোবস্ত তাতে লোকে ঘরে বসেই পদধূলির আলায় আশ্রয়, তার উপর আবার রাস্তার লোক ঘরে ডেকে নিয়ে—”

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—“সে তো স্বায়ত্তশাসনের উন্নতির লক্ষণ! কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার পূর্বেই জৈশ্বকে নিয়ে যে তর্কটা উঠেছে, তার একটা বুঝাপড়া করে নেওয়া মন্দ কি! তা হলে আজ রাত্রে ঠিক আটটার সময় গরীবের ঘরে পদধূলি দিচ্ছেন একবার?”

আমি অগত্যা রাজি হইতেই ডাক্তার আর একটা মাত্র কথাও না বলিয়া চট্ট করিয়া অন্ধকারের ভিতরে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

২

হুমায়ুন মনজিলের নিকটে প্রকাণ্ড পড়ো বাড়ীতে ডাক্তারকে পাকড়াও করিতে আমাকে বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। মুর্শিদাবাদ সহরে ডাক্তার ধীরেশচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিপত্তি। মুর্শিদাবাদ সহরটিকে কেন্দ্র করিয়া ডাক্তার এই ম্যালেরিয়া ও জ্বরিত দেশটার উপর চিকিৎসা স্ত্রে একাধিপত্য রাজত্ব করিতেন। নবাব বাড়ীর মটোর, আজিমগঞ্জের জুড়ি এবং সাধারণ লোকের ভিড় তাঁর দরজার গোড়ায় দিবারাত্রি যেন লাগিয়াই আছে।

ডাক্তার ধীরেশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হইয়া ক্রমশঃ বুঝিতে লাগিলাম, পোষ্টাফিসের দৌলতে বাংলার অনেক মূল্য নিক্রিয়ে পার হইয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়া এতদিনে এক আশ্চর্য্য ধরণের লোকের হাতে পড়িয়াছি। তাঁর সঙ্গে আমার যতই জানা হইতে লাগিল, ততই আমার মনে হইতে লাগিল, তাঁর সম্বন্ধে আমার না জানার দিকটাই ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। বাস্তবিক লোকটার চরিত্র আগাগোড়া এক দুঃস্থদায় রহস্য জালে আবৃত। লোকে বলিত তিনি ক্ল সয়া হইতে ডাক্তারী শিখিয়া আসিয়া তিস্ততের লামাদের নিকট গুপ্ত ঔষধ-বিদ্যা আদায় করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, অথচ তিনি নিজে ভারতবর্ষের সীমানার বাহিরে যাওয়াই স্বীকার করেন না। কেহ কেহ বলেন, ডাক্তার খাঁটী পূর্ব্ববঙ্গের লোক, কিন্তু কথার বার্তায় তাঁকে খাস শান্তিপুরে ভদ্রলোক বৈ আর কিছু মনে করা সহজ নয়। কেহ বলে তিনি অপভ্রষ্ট, কেহ বলে বিপত্তীক আমি কিন্তু পোষ্টাফিসের ছিজপথে তাঁর সঙ্গে কাঁচা মেয়োল হাতের চিঠিপত্র রীতিমত আনা গোনা করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি ঝড়ের বেগে রোগী দেখিয়া বেড়াইতেন। বহির্জগতের সামাজিক শিষ্টাচারের তিনি কোন একটা ধার ধারিতেন না। নবাব বাড়ীর নিমন্ত্রণ ফেলিয়া বিনা ভিজিটে রোগী দেখিতে যাইতেন। কখনো তিনি পুণ্ড্রদত্তর সাহেব, কখনো আলখেল্লা পরা ককির, আবার কখনো তিনি সাবেক দিনের আমীর ওমরাহদের উজল বেশধারী একটা যথেষ্টাচারী তরুণ নবাব। অনেক দিন তাঁর সঙ্গে মিলা মিশা করিয়াও তাঁর

চালচলনের কিছু ঠিকানা করিতে পারিলাম না, অথচ সন্ধ্যার পর, তাঁর ঘরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছি, তখন পুরু ভোষক মোটা তাকিয়া এবং সুমিষ্ট মুর্শিদাবাদের তামাকের সঙ্গে তাঁকে বাঙ্গালী কুল বাবু ভিন্ন আর কিছু বলিয়া কখনো ভুল হয় নাই।

ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ পরচরটা আরো কিছু ঘণীভূত হইলে টের পাইলাম, তাঁর প্রতিদিনের সাক্ষ্য-সমিতির একমাত্র সভ্য ছিলাম, আমি, আমি বই সে রাজ্যে আর কোন জীবিত মনুষ্যের সাড়া শব্দ ছিল না। তিনি যেন আমাদের এত বড় পৃথিবীর লোকাণ্যের মাঝেও নিতান্তই নিসঙ্গ! গোটা পৃথিবীটার দিকে পেছন ফিরিয়া তিনি যেন কখনো কখনো আমার পানেই তাঁর রহস্যময় মনের পর্দাটা ক্ষণকালের জন্য তুলিয়া ধরিতেন, কিন্তু সে অতি ক্ষণিক, এবং সে সময়েও পর্দার আড়ালেই তাঁর মনের বেশীর ভাগটা ঢাকা পড়িয়া থাকিত। যেটুকু দেখা যাইত সে টুকুও তাঁর অস্পষ্ট কুহেলী আচ্ছন্নমনের একাংশ মাত্র।

চিকিৎসা ছাড়াও তিনি যেন কি এ চটা গুপ্তসাধনার প্রবৃত্ত ছিলেন। আমাদের যে কামরায় সন্ধ্যার পর মজলিস বসিত, তার সমুখে এ চটা বারান্দার পরই ডাক্তারের লেবরেটরি। সেখানে ডাক্তার নিজে বাতীত আর কোনো জীবিত মনুষ্যের প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। হঠাৎ কোনো দিন সন্ধ্যার পর বাহিরের চপল বাতাসে লেবরেটরী ঘরের দরজার লম্বিত কালো বনাতের ভারি পর্দা একটু উঠিয়া গেলে দেখিতে পাইয়াছি, তীব্র বৈজ্ঞানিক আলোকে সারি সারি মনুষ্যের কঙ্কাল সেখানে ডাক্তারের নিশীথ অভিসারের জন্য নীরব অস্থিসার গুহ্র হাথে অপেক্ষা করিতেছে। সেখানে সে মনুষ্য কঙ্কালের নীরব সভা গৃহে, তীব্রগন্ধ আরকের আলাময় ধূমের মধ্যে, রাজ্যের পর রাজি লাগিয়া কি গভীর অনাবিস্কৃত সত্যের পেছনে একাকী ঘুরিয়া বেড়ান, লোকের নিকট সে সম্বন্ধে তিনি কোনো সঙ্কল্প দেওয়ার অংশুভতাই স্বীকার করেন না।

চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে ডাক্তার বলিয়া থাকেন যে মানুষের জীবনী শক্তিই সকল রোগের একমাত্র মহৌষধ।

এই জীবনী শক্তির অভাব হইতে থাকিলে অল্প চিকিৎসার বা ঔষধ সেবনে কবে মানুষের রোগ সারিয়াছে! চিকিৎসার মানুষের জীবনীশক্তি কখনো বাড়াইতে পারে না। চিকিৎসাটা আজ কাল আমাদের মত এক শ্রেণী লোকের জীবিকা উপার্জনের একটা অভ্যাস ছিল না হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমি বলিলাম—চিকিৎসার মূল্য যাই হোক না কেন, চিকিৎসা যে পর্যন্ত দোকানদারী ছাড়িয়া একমাত্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের অন্তর্ভুক্ত না হইবে, ততদিন দরিদ্র লোক চিকিৎসকের নিকট প্রতারিত ও লাহিত হইবে।

আমার এই মতের প্রতিবাদ করিয়া ডাক্তার বলেন যে পৃথিবী হইতে চিকিৎসার মূল্য একেবারে উঠিয়া গেলে, জীবন পারণের জন্য মানুষকে অস্ত্রের নিকট কতটা ঋণী থাকিতে হয়, সে কথাটা জগতের রোগী নিরোগ সকল মানুষই একেবারে ভুলিয়া যাইবে। অথচ সেটা সব সময় মনে থাকা সামাজিক মানুষের মত একটা শিক্ষা। বিনা মূল্যের প্রত্যাশার মানুষকে কেবল অকৃতজ্ঞতাই শিক্ষা দিতে পারে। আমাদের আকাশ বাতাস রৌদ্র বৃষ্টি প্রতিদিন বিনা মূল্যে আমাদের কত ধানি দিয়া যাইতেছে, মানুষ তাহা স্বীকৃত, যদি তার মূল্য চুকাইয়া লইবার জন্য একজন কেউ থাকিত!

ঈশ্বর সৰ্ব্বদে তাঁর মত এই যে মানুষের ভোগ তৃষ্ণা এ পৃথিবীতে তৃপ্ত হয় না বলিয়াই মৃত্যুর পরে ও পরলোকে তার তৃপ্তির কোন সুবন্দোবস্ত করা যায় কিনা স্থিতির আদি কাল হইতে এই লইয়া মানুষের চিন্তে যে সমুদয় জল্পনা কল্পনা আবিস্কৃত হইয়াছে তারি উপর নানা ধর্মের নানা মত স্থিতি হইয়াছে। মানুষের এই অতৃপ্ত ভোগ তৃষ্ণাই মানুষের অসীম ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সক্ষম একটা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বৃত্তি নিজের মনে খোঁচাই করিয়া কাল্পনিক স্বর্গ লোকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বাস্তবিক মানুষই আপন আপন ক্ষতি অল্পনায়ে মনের মত ঈশ্বর স্থিতি করিয়া রাখিয়াছে। মানুষকে কোনো ঈশ্বর কখনো স্থিতি করেন নাই।

এরূপ অতি প্রাকৃত মানুষ আর আশার কখনো চক্কে

পড়ে নাই। আমি নিজের মনে হাসিয়া ভাবিলাম, আমাদের সেকালের প্রজাপতি ঠাকুরদা বার্লক্য হেড ডাক্তারের মনের পরদা খুলি পাচাইবার সময় কোথাও এমন একটা কিছু সন্ধানক ভুল করিয়া রাখি-রাছেন, যার ফলে সকল জিনিসের ছবিই তাঁর মনের উপর উন্ট হইয়াই পড়ে। মানুষকে ভগবান অনেক দান করিয়াও তাকে তিনি ইচ্ছা করিলে কত চির-দরিদ্র করিয়া রাখিতে পারেন, সে রহস্য বোধ করি ডাক্তারের মনে পরিচয় না হইলে আমি কখনো বুঝিতেই পারিতাম না।

কখনো কখনো তাঁর নাস্তিকতা সৰ্বদে আমার মনে সন্দেহের কালো মেঘের উদয় হইত। তাঁর মনে কথা কহিতে কহিতে কখনো কখনো আমার মনে হইত বেন একটা চলন্ত চলন্ত কলের ভিতর হইতে কণকালের জন্য ডাক্তারেরই মত আরেকটা মানুষ—আমাদেরই মত রক্ত মাংসের দেহ, আমাদেরই মত আকাঙ্ক্ষা বেদনা মর মানব হৃদয় লইয়া তাঁর মনের অপোচরে বাহির হইয়া আসিয়া আমার চোখের সমুখে ভাসিয়া বেড়াইত। তাঁর দীপ্ত মুখ মণ্ডলে, তাঁর চকল নয়ন প্রান্তে এমনি একটা অশান্ত ফেনিল তরঙ্গ সমুদ্র হৃদয়োচ্ছ্বাসের বেদনা জাগিয়া উঠিত, যাহা দেখিয়া মনে পড়িয়াছে এই অশান্ত হৃদয়-সাগরের তিমিরাবৃত তটপ্রান্তে কোথাও কি একটা শিশির-সিক্ত শ্রামল বসন্ত প্রভাত কোনো তরল বর্ষ পরিয়াত আরক্ত কপোলা উবার নক্ষত্রাক্ত কনক অহুতির অন্ত পরশের অপেক্ষায় অনন্তকাল ধরিয়া আসন্ন হইয়া আছে? তাঁর চিন্তের কোন একটা অনাবিষ্কৃত দেশে যন পরাবৃত তরুজ্ঞের পুষ্প সুরভি ছায়া তলে, কত না মধুর কলকলি, কত না অনাদি কালের দ্রবর শুভ্রন, একটা মাত্র সহ্য্য ইন্দ্রিতের অপেক্ষায় বৃষ্টি চিরকালের জন্য মোন হইয়া আছে। ডাক্তার আপন হৃদয়ের মধ্যে অন্তের সন্ধান পান নাই বটে কিন্তু একবার সে চিরবসন্তের সাদা পাইলে, এক মুহূর্তে তাঁর হৃদয় মরুভূমি শ্রামল হইয়া বেদনার অশ্রুদীরে জগদীশ্বরের পদ্মাসনটা প্রক্ষুণ্ণিত করিয়া ফুলিতে পারে। কিন্তু পর মুহূর্তেই আমার মনে হইত, এ সব আমার মনের ভ্রান্তি মাত্র। তাঁর হৃদয় এক অনন্ত অশান্ত হাহাকার মর মরুভূমি মাত্র। তাঁর মনের শুষ্ক ঐশ্বর্য্য রানির

যাবে নিশিলা আনন্দের সরলতা লাগিয়া হৃদয়ের একটি তরু-শাখাও ভাঙল হইয়া উঠে নাই। ডাক্তারের হৃদয়ে অল্প নাক্ষত্রিকতা বই আর কিছুই ছিল না।

৩

সে দিন সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বেড়াইতে যখন অশ্ব-ধুরের আকৃতি বিশিষ্ট মোতিঝিলের কিনারায় আসিয়া পহুছিলাম, তখন আকাশের চাঁদ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মোতিঝিলের পুষ্পের কুঁড়িগুলি পাখুর জ্যোৎস্নায় প্রভাতের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে থাকিয়া থাকিয়া মুহূ পবনে শিহ-রিয়া উঠিতেছিল। বননীর বনানীর নিবিড় বাহু বন্ধনের ভিতরে মোতিঝিলের বসজিদের চুড়াগুলি স্বর্ণাশ্র ধারায় সিক্ত করিয়া দিয়া অগ্নের চাঁদ এক টুকরা ছিন্ন মেঘের আঁচল ধরিয়া মাতালের মত, নীলাকাশে কোনো মতে তুলিতেছিল। চারিদিকে লোকালয় হীন বনবাজির হৃদয় সুখরিত করিয়া নিশীথের ঝিল্লি রব যুতাপথের দুই ধারে এক টানা সুরের তরঙ্গ তুলিয়া পৃথিবী হইতে বরাবর বেন বগ্নলোকের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে।

একপ নীরব জ্যোৎস্নালোকে মোতিঝিলের কিনারায় কতকজন দাঁড়াইয়া থাকার পর, আমার মনে হইতে লাগিল, বেন মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের রক্তাক্ত পরিচ্ছেদগুলি সন্ধ্যার পবনে কোনো অদৃশ্য স্বপ্নলোক হইতে ভাসিয়া আসিয়া মোতিঝিলের জ্যোৎস্নামাখা নাট্যশালায় পুনরাভিনয় শুরু করিয়া দিবে!—সে আশ্চর্য্য সময়ের বেশ আর বেশী দেবী নাই।

মনে পড়িল, হয়ত এমনি এক নীরব জ্যোৎস্না রাত্রে সিরাজের দুর্ভোগে পীড়িতা বাসেটী বেগম এই মোতিঝিলেই যখন ক্লাইবের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া ইংরেজ বণিকের নিকট আপনার লাহনার কাহিনী জানাইতে ছিলেন, তখন সে মর্দবেদনাতেই বুঝি বাংলার রাজ সিংহাসন টাপিয়া উঠিয়াছিল। বুঝি বা এমনি রাত্রে সাদানা ফকির রাজ কুল বধু হতভাগিনী সুৎকউরিসার পেলব বাহুবন্ধনের ভিতর হইতে পলাতক সিরাজকে ছিন্ন করিয়া নিলে তাঁর নিরুপায় কন্ডার সমুদ্র-দ্বিত অতুল কুটী লহসা বিবের মত নীল হইয়া উঠিয়া ছিল। তারপর দেখিলাম, লাক্ষাগঞ্জের দরবারে আপনার

বিখ্যাস বাতক সেনাপতির সমুখে হতভাগ্য সিরাজ কঠোর লোহ শৃঙ্খলে বন্দী! অদূরে মীরণ উজ্জল স্বর্ণ-পাত্রে প্রদীপ্ত মণিরত্ন-রাশি পুঞ্জীভূত করিয়া যখন মহম্মদী বেগকে গুপ্তবাতকের শানিত ছুরিকা হতভাগ্য সিরাজের বক্ষে বিদ্ধ করিবার জন্য প্রেলোভিত করিতেছিল, তখন লোক চক্ষুর অন্তরালে মীরণের মাথার উপর নিয়তির কালেমেঘ প্রাণনাশী বিজ্ঞপ্তিতে ভরিয়া উঠিতেছিল।

ঠিক সেই সময়ে নিকটস্থিত জঙ্গলের ভিতরে সজীব মহুত্থের বেদনা বিধুর রোদনধ্বনি শুনিয়া আমি যেন এক-বার চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু তখনো আমি ইতিহাসের স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলাম বলিয়া আমার বাস্তবের রাজ্যে কিরিতে বিলম্ব হইল। প্রথমে সে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া আমার মনে হইল বুঝি নিবিড় বনান্তরাল হইতে কোনো তরুলতা সমাচ্ছন্ন অদৃশ্য সমাধিতল বিদীর্ণ করিয়া কৈজীর অতুল আত্মার বিপুল রোদনধ্বনি সন্ধ্যার আকাশ বাতাস বাধিত করিয়া কোন লোকলোকান্তরে ভাসিয়া চলিয়াছে! কৈজী!—দীপ্তির পুষ্পোজ্জ্বলিত অগ্নি নৈশরাগী, অনিন্দ্যমুন্দরী কৈজী! সিরাজ বাকে দীপ্তির সৌন্দর্য্যের পণ্যাশালা হইতে লক্ষ স্বর্ণ যুজীর কিনিয়া আনিয়া অবশেষে জীবন্তে সমাধিত করিয়া নারীর হৃদয়ের উপর দাসত্বের রাজকুল্য অনন্তকালের জন্ত নির্জী-রিত করিয়া গিয়াছেন। কাণ পাতিয়া বেন স্পষ্টই শুনিতে পাইলাম, তরুস্বর্ষের তারি বিদীর্ণ হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা-সঞ্জীত মুর্শিদাবাদের ধ্বংসশাশ্বর উপর দিয়া চিরকাল ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু একি শুধু অগতির রক্তরঞ্জিত নাট্যশালায় অভিনীত ইতিহাসের কাতর ক্রন্দন, একি সুধু—সচেতন সুখদুঃখের অতীত পরলোকের অনন্ত অশান্ত ক্রন্দনের স্ফীত হইতে স্ফীতর প্রতিধ্বনি মাত্র!—না-না। সে নীরব সন্ধ্যার নিরানন্দ ক্রন্দন ধ্বনির সঙ্গে যে আমাদের রক্ত মাংসের বেহমনের সুখদুঃখের সত্ত-নিহত অশ্রুধারার একান্ত যোগ ছিল। সে যে আমাদের পরি-বৃত্তমান জগতের সত্য অভিনীত ভগ্নহৃদয়ের সচেতন উজ্জ্বলিত আকুল সাহসনাহীন ক্রন্দনধ্বনি। আর আমার মনে কোথাও ইতস্ততঃ থাকিল না। ইতিহাসের বরা-লোক আমার পেছনে পড়িয়া রহিল—আমি আর

মুহূর্তেক বিলম্ব না করিয়া সে অবীর বেদনা-কম্পিত রোমন্থননি লক্ষ্য করিয়া লোকহীন সন্ধ্যার তটে থিলা কল্পিত মৃদু অঙ্গকারাচ্ছন্ন অরণ্যের ভিতর উদ্ভাসের মত প্রবেশ করিলাম।

নিবিড় জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে কতক্ষণ পাগলের মত ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া একটা ফাঁকা যায়গায় আসিয়া স্থির হইয়া নিখাস লইয়া বাঁচিলাম; সেই ফাঁকা যায়গার চারিদিকে নীল জঙ্গলের বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে তখন জোনাকজালা দীপালির আলোর হাট বসিয়া গিয়াছে! সবুজ ঘাসের উপর চাঁদের আলো যেন সবুজ রঙের হাওয়ার সাতীর মত ফাঁকা যায়গাটির অঙ্গে ছড়াইয়া জড়াইয়া গিয়াছে! তার উপর একটা সবুজ সমাধি শিশির সিক্ত জ্যোৎস্নার অত্যন্ত অশ্রু-ময় হইয়া উঠিয়াছে। কবরের এক পাশের দেয়ালের কুলুঙ্গির ভিতরে একটা মৃদু দীপরেখা অগুরুর অগন্ধি ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া চিত্রোপিত দীপরেখার মত অমুজ্জল হইয়া অলিতেছিল।

কবরের উপর অসংখ্য পুষ্পরাশি বিক্ষিপ্ত। আর কে একটা মানুষ সেই কবরের উপর একটা হাত রাখিয়া জ্যোৎস্না-সিক্ত আকাশের লুপ্ত প্রায় নক্ষত্র পুঞ্জের ভিতরে কবর যেন নিম্ন দৃষ্টি ধারার অব্বেষণ করিতেছিল! তার মুখের উপর দুটা অশ্রুরেখা মৃদু জ্যোৎস্নার স্বপ্নরেখার মত ক্রিমিক করিতেছিল। কবরের ফুলের রূপরস স্পর্শের সঙ্গে মাছুবের স্নেহ ও অশ্রু মিশিয়া গিয়া যেন মৃত্যুকেও সেখানে মধুর করিয়া তুলিয়াছিল।

লোকটির মুখের পানে চাহিয়া চিনিলাম, তিনি আর কেহ নহেন, আমার সেই জাফাগঞ্জের কবরস্থানের বন্ধু ডাক্তার ধীরেন্দ্র! বাস্তবিক কবরের উপরকার বনফুল তাঁর হৃদয়ের স্পর্শে অশ্রু হইয়া গিয়াছিল, কি তাঁর অশ্রুই কবরের উপর পড়িয়া শিশিরসিক্ত ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিছু মাত্র স্থির করিতে না পারিয়া অনেকক্ষণ আমি সেখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। আমার মনে হইল, স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝামাঝি স্থানে সে জ্যোৎস্নার সমাধি যেন ফুলের গন্ধে ও হৃদয়ের গন্ধে উৎপলিত ছিল। আমি না, সে স্মরণ স্থানে, সে থিমিস্থের জোনাকজালা আলোর নাট্যালায় প্রেমের ভিতরে ইহলোক আসিয়া পর-

লোকের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল কিনা, কিন্তু আমি সে সঙ্কল্প স্মরণ মরণের তটে ভগ্নত ভক্তের এত সাধের তপ ভঙ্গ করিয়া দিব, তত বড় নিষ্ঠুর নই! তাই ডাক্তারকে একটা মাত্র কথাও না বলিয়া সেখানে আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম।

কিছুকাল পরে ডাক্তার চক্ষু মুছিয়া পেছন ফিরিতেই আমাকে দেখিতে পাইয়া যেন একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, কিন্তু দুঃখিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। আমি একটু আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলাম,—

“জগদীশ্বরকে আমার ধন্যবাদ, যে এতদিনে তিনি আমার ভুল ভাঙ্গিলেন।” ডাক্তার স্বপ্নাবিষ্টের মত উদাস ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রকম।”

আমি উচ্ছ্বসিত ওষ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, “আপনি হিন্দু না হতে পারেন, ডাক্তার বাবু, কিন্তু আপনি কখনো নাটিক নন।”

ডাক্তার অবিচলিত ভাবে উত্তর করিল,—

“এ তোমার চোখের ভুল, আমি ঘোরতর নাটিক।”

আমি খুব জোরের সহিতই বলিয়া উঠিলাম, “আপনার মুখের কথাই চাইতেও যদি আমি স্বচক্ষে দেখা-কেনী বিশ্বাস করে থাকি, তবে আপনি আমাকে কমা করবেন। আমার ভুল বুঝিবার কোনো কারণ নেই।”

ডাক্তার একটু উদার ভাবে বলিলেন,—“আছে। কিন্তু সব কথাটা খুলে না বলা পর্য্যন্ত সহজে তোমার সন্দেহটা দূর হবে না।—”

আমি একটু সপ্রতিভ ভাবে বলিলাম,—“যদি কোনো আপত্তি না থাকে তবে”—

ডাক্তার একটু স্থান হাসিয়া বলিলেন :—

“বলতে বলতে হয়ত একাধাশী চাঁদ ডুবে যাবে।

অত রাত পর্য্যন্ত ধৈর্য্যরক্ষা করে শোনা।—

আমি অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বলিলাম :—“তোমার রাজি পর্য্যন্ত রাজীনায়া দিচ্ছি।” ডাক্তার একটু খুশী হইয়া বলিলেন :—“তবে চল, শোভিত্বিলের ঐ বাঁধা বাটটার উপরে গিয়া বসি। সেই থানেই আমার কথাটা জমবে ভালো, কারণ ঐ বাঁধা বাটেই, ‘এবনি’ জ্যোৎস্না রাজ্যে আমার জীবনের একটা অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার ঘটেছিল।”

৪

জ্যোৎস্নালোকিত গভীর রাতে মোতিঝিলের বাঁধা ঘাটের উপর বসিয়া ভাঙার বগাবিষ্টের জায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত চন্দনবাটী নামক এক পরীগ্রামে, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছি, আমার জন্ম। কিন্তু নিজের কুল সন্দেহে আমার কোনো জ্ঞান জন্মিবার পূর্বেই আমার কুল নির্মূল হইয়াছিল। পৈত্রিক উত্তরাধিকার স্বত্বে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ দৈন্যকেই একমাত্র সম্পত্তিরূপে লাভ করিয়া আমি যখন একেবারে রাত্তির আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমি উলঙ্গ শিশু-মাত্র। এই যদি তোমাদের করুণাময় পরমেশ্বরের অসীম করুণার নমুনা বলিয়া গ্রহণ করিতে চাও, তবে, তাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি যে নাস্তিক, তবু আমি তোমাদের ঈশ্বরের ঘাড়ে করুণার অতবড় একটা অলঙ্ঘ্য কুটীল চাপাইয়া তোমাদের করুণা শক্তিকে অবশ্য তিরস্কার করিতে ইচ্ছা করি না।

আমি যখন পিতামাতাকে হারাইয়া একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার অবস্থাপন্ন আত্মীয় কুটুম্বদের ঘরে আমার জন্ম মাথা রাখিবার মত এত উচ্ছৃঙ্খল বারগা পাওয়া গেল না। আমি ছাড়াও তাঁদের নিকটস্থদেরই বন্ধুত্বের অন্ত ছিল না; তার উপরে আমার মত হতভাগ্য জীবকে বহিবার সাধ বা অবসর তাঁদের কারো ছিল না, এটা বোল আনাই সত্য কথা। সমস্ত গ্রামের মধ্যে একটা নিরুপায় ব্রাহ্মণের বিধবা ছিলেন, পরের ঝগড়টি সহিবার মত মনের ক্ষমতা একা তাঁরি ছিল, কারণ তাঁর ঘরে থাকিবার মত, আর কিছুই ছিল না।

আমি জানি আমার শৈশবের পনেরোটা বছর তাঁর অপরিণীত মেয়ে দুঃখের মাঝেও কত সুখে কাটিয়াছিল। কিন্তু তাঁর মেয়ের মর্যাদা এবং তাঁর আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমি বোল-বছর বয়সে পা দিয়া তবে বুঝিতে পারিলাম বাস্তবিক জন্মের পর বাস্তবের বুদ্ধি এতই ধীরগামী হইয়া থাকে। বারা আত্মীয় হইয়াও আমাকে দাঁড়াইবার মত একটু হাদ দিতেও বিমুগ্ধ হইলেন, আমার মত গৃহহীনকে ঘরে সন্ধ্যার বিধবার বিচারের ভার গিয়া পড়িল তাঁহাদের হাতে। বাঃ! তোমাদের পরমেশ্বরের বিচারের ব্যবস্থা কি চমৎকার!

তাঁরা যে সমুদয় কাত্ত করিলেন, সে সব খুলিয়া বলিতে হইলে আবশ্য উপজ্ঞানের মত একাধিক সহস্র রজনীতেও আমার কাহিনী শেষ করিয়া উঠিতে পারিব না। সংক্ষেপে এইটুকু জানিয়া রাখ যে তাঁরা সেই চির-দুঃখিনী বিধবার মাথায় লজ্জাকর কলঙ্কের বোঝা চাপিয়া দিয়া তাকে সমাজ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। এত বড় অপরাধে তাঁরা বিধবাকে যে ফাঁসির হুকুম দেন নাই, আমি ভাবি সেই তো তাঁদের অন্তঃকরণ। বিধবা হাসি মুখে সমাজ ত্যাগ করিয়া আসিলেন, কিন্তু আমাকে কখনো ত্যাগ করেন নাই। আমাকে লইয়া সমাজের নিকট পনেরোটা বৎসর তিনি যে লাঞ্ছনা পাইয়া ছিলেন, সে সব কি তোমাদের পরমেশ্বরের দান? তোমরাই জান, তোমাদের পরমেশ্বরের কেমন!

বোল বৎসর বয়সে পা দিয়া যে দিন প্রথম টের পাইলাম যে আমারি দুইজন্ম নক্সে বিধবাকেও আমার সঙ্গে সমাজের বাহিরে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, সেই দিনই আমি তাঁর চরণধূলি মাথায় লইয়া চন্দনবাটী হইতে প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম। সে সময় আমার বিপন্ন হৃদয় ব্যতীত আমার সঙ্গে আর কেহই ছিল না,—বোধকরি তোমাদের করুণাময় জগদীশ্বরও না।

চন্দনবাটী হইতে বাহির হইয়া মনে করিলাম এবার একেবারে হৃদয়হীন, বার্ধ কলুষিত হিঁসে পৃথিবীটার বাহিরে যদি কোথাও একটু আরামের স্থান পাই, তবে একেবারে সেই খানে গিয়াই দাঁড়াইব। কিন্তু পথ চলিতে চলিতে যখন তীব্র ক্ষুধাতৃষ্ণার আমার পথ চলা বন্ধ হইয়া গেল, তখন দেখিতে পাইলাম, আমি মুর্শিদাবাদ সহরে আসিয়া পহঁছিয়াছি।

মুর্শিদাবাদ সহরে আমি কাউকে চিনি না কিন্তু সেজন্য আমার কোনো দুঃখ হইল না। কারণ আমার ৩০য়ের প্রথম চতুর্থাংশের দিন হইতে সর্বত্রই আমার আসা, অপরিচিতের মধ্যেই আসা। বিদেশে বাহির হইবার পূর্বে জন্মভূমির যেটুকু চিনিয়া আসিয়াছি, সে টুকুও আমার অচেনা থাকিলে অন্ততঃ জন্মভূমিকে ভ্রমবাসিতে পারিতাম।

সাতদিন মুর্শিদাবাদের ধূলিধূসরিত রাজপথে তৃষ্ণ-মুখে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, রাত্তির লোক চলাচলের ভিত্তি নাই। হুচারিটা তকমা পরা নকল মাছুষকে বড়

হোকের পোষা হুমানের মত হাসিতে দেখিলাম এবং একাল সেকালের রংকরা বড় বাহুবদের রাস্তার উপর আঁচর্য্য পুতুল নাচ দেখিয়া যে কিছু কোতুকও না পাইলাম তা নয়। কিন্তু বড় হোকের সহরেও বাঁটা বাহুবের হৃদয়ের সন্ধান না পাইয়া আমার কোতুকপূহা অভি সহজেই চরিতার্থ হইয়া গেল।

সে বাহা হোক, পড়ো সহরে হৃদয়ের সন্ধান না পাইলেও, পড়োঘর ও ভাঙ্গা দালানের অসুখ ছিল না। সন্ধ্যার পর যখন এমনি একটা পড়ো বাড়ীর সমুখে গিয়া বলিয়া পড়িলাম, তখন দারুণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় আমার বুক কাটিয়া বাইতেছিল। আমার বুক কাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল কিন্তু কাঁদিবার মত সজল নয়ন দ্বারা তখন আমার চোখে ছিল না। অবশেষে ক্লান্ত দেহমন লইয়া আমি যে কখন সেখানে ঘুমাইয়া পড়িলাম, সে খবর আমি দিজেই ভাল করিয়া জানি না।

যখন আমার ঘুম ভাঙিল, তখন দেখি একটা কাউ গাছের শাখা ব্যবচ্ছেদের ভিতরে চাঁদের ছবিটি অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আর দেখিতে পাইলাম, একটা সুন্দরী মুসলমান যুবতী একটা চীনায়াতীর রেকাবে কতকগুলি সুমিষ্ট ফলের গুচ্ছ লাজাইয়া আমার সমুখে রাখিয়া দিয়া, স্নেহ-বিস্ময় মণ্ডিত চোখে আমার পানে তাকাইয়া আছে। তেমন হুঁচকি চোখের ভিতর মধুরতর হৃদয়ের সংবাদ পাইয়া সে সময়ে জীবনে একটা বারের মত তোমাদের করুণাময় পরমেশ্বরের কথা আমার মনে হইয়াছিল বটে। কারণ সাত্রে নৈত্র পল্লবের স্নিগ্ধ ছায়ায় নীল নকত্রের মত তেমন হুঁচকি করুণা বিগলিত চক্ষু আমি জীবনে কখনো দেখি নাই।

সে কীণাদী মুসলমান সুন্দরী সুনীল স্নেহ দৃষ্টির ভিতরে আমি জীবনে সর্বপ্রথম নারী হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। আমার মনে হইল, সে অপরিচিতার নব বলন্তের অশ্রুট বাধুরী পূর্ণ চক্ষের মাঝে যে আনন্দ রাজ্যের সংবাদ পাইলাম, তাহা যেন এককাল আমার নিকট রুদ্ধ ছিল। আমি যেন এক মুহূর্ত্তে শৈশব হইতে যৌবনের সুমধুর বয়সরাজ্যে পরিণত করিলাম। আমার চক্ষু যেন সর্বপ্রথম পৃথিবীর প্রাণময় সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া চিরকালের মত বন্ধ হইয়া গেল।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া যুবতী তার চম্পক দামতুল্য অঙ্গুলিটা তুলিয়া সমুখের ভাঙ্গাবাটী দেখাইয়া দিয়া একটু হাসিয়া বলিল:—“এই তো আগাততঃ তোমার দৌলত খান।”—

আমি সাত্রনেত্রে যুবতীর পানে তাকাইয়া বলিলাম,—“ভাঙ্গাবাড়ীর ভাড়া দিয়ে বাস করবার ক্ষমতাও আমার নেই। এ পৃথিবীতে আমি অত বড়ই নিঃখ।”

যুবতী রাজরাণীর মত আমার প্রতি সুমধুর স্নেহের আদেশ প্রচার করিয়া বলিল, “তুমি গিয়া তোমার দৌলতখানা নির্ভয়ে দখল কর। বনের পায়রাকে মিউনিসিপালিটীর টেক্স দিতে হয় না।”

যুবতীর নাম ফিরোজা বিবি। সে আমার ভাঙ্গাবাড়ীর প্রতিবেশী, এক মুসলমান ধনকরের পালক মেয়ে। লক্ষ্মীর শোণার আঁচলের সাড়া পাইয়া দৈন্ত বোমন খিড়কী দরজা দিয়া পলায়নের পথ পায় না, ফিরোজার খোস মেজাজের মিঠা হাওয়া লাগিয়া আমার ভাঙ্গাঘরের শূণ্য ভাঙার যেন তেমন দিন দিন রাষ্ট্রদ্রোহে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। ফিরোজার স্নেহে আমার আশ্রয়তাব দূর হইয়া গেল। সে নিজে আসিয়া আমার ভাঙ্গা দালানে রীতিমত বৈঠকখানা সাজাইয়া ছিল। একদিন সে নিজামতের মুন্সীকে ডাকাইয়া আনিয়া আমাকে মণিবেগমের বিনামাইনার ইস্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিল। আমি নিরবচ্ছিন্ন দৈন্তের শিশু হইয়াও যে হৃদয়ে মানুষ হওয়ার ছরাকাজ্জা পোষণ করি, এবং সেই ছরাকাজ্জার একটা তরলই যে এক থাকায় আমাকে চন্দনবাটী হইতে মূর্খদাবাদে আনিয়া কেলিয়াছে, সে কথা আমি নিজে ফিরোজাকে কখনো বলি নাই কিন্তু সে আমার মুখ দেখিয়াই আমার সবটুকু হৃদয় যুক্তাকরহীন সংকলিত শিশু-শিক্ষার মত পড়িয়া লইয়াছিল।

ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াই ফিরোজা আজকালকার অভিজ্ঞাবকদের মত সহজে নিশ্চিত হইল না। সে নিজামতের মুন্সীকে দিয়া মাঝে মাঝে আমার শিক্ষকের নিকট বোঁক লইত, আমি রীতিমত পড়াশুনা করিতেছি কি না। কতদিন তাকে কপাটের আড়ালে লুকাইয়া আমার পড়া শুনিতে দেখিয়াছি। ভূবড়ীর মধুর ধ্বনি শুনিয়া দৃষ্টা ভুলকিনী যেমন মুগ্ধ হইয়া যায়, আমাকে মনবোগের সহিত পড়া করিতে দেখিয়া কপাটের আড়াল হইতে তাহা

নীল পদ্মের মত দুটা স্নায় চক্ষু আনন্দের সূর্যালোকে প্রকল হইয়া উঠিত। সে চোখের—আফিমের মত নেশার যদি আমার মনটা জড়াইয়া বাইত, পড়ার পুঁথির আখরের মাঝে যদি আমি ফিরোজকেই দেখিয়া আনমনা হইয়া পরিত্যক্ত, ফিরোজ কোথা হইতে বৈশাখী ঝড়ের মত আমার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ভর্জন করিয়া বলিত :—“কের যদি তোমার পড়াশুনার এমন অমনোযোগ দেখি, তবে আমি তোমার পড়ার খড়াটা সব বন্ধ করিয়া দিব।”

ফিরোজের নিকট গালি খাইয়া আমার চোখের পাতা পর্যন্ত সারামুখ লাল হইয়া উঠিত। কারণ আমি জানিতাম, পড়া না করা ছাড়াও আমার হৃদয় তাঁর সৌন্দর্যের নিকট কত বড় অপরাধী!

ফিরোজা অত্যন্ত সহনশীলতার সহিত আমার স্নেহের সমুদ্র অভিযাত্রার সহ করিয়া রণজয়ের রক্তপাতাকা উড়াইয়া প্রতিদিন চলিয়া বাইত। তার বেহের দানের অন্ত ছিল না; কিন্তু তার যেটুকু স্বপ্ন লইয়া আমার হৃদয়ে নিশিদিন গোলপী ঝড় বহিয়া যাইত, সেটা আমার চুরি। ফিরোজা তার চোরাই মালের সবটুকু স্বত্বভাগ করিয়া আমার মুখ ফুটিয়া কিছু বলে নাই বলিয়া সময় সময় আমি অভিমান করিয়া ভাবিতাম, এত দান করিয়াও সত্যি সত্যি ফিরোজা বুঝি আমাকে কিছুই দেয় নাই! অথচ আমাকে সুখী করিয়া তার যে সুখ, আমার ভূমিতে তার যে কি আনন্দ, আমার সফলতার তার যে কি ঠোঁটের, সে কথাটির মর্ম আমার মনে কখনো উদয় হয় নাই। বাস্তবিক মানুষের লোভ চিরদিনই এমন কালাল, এত স্বার্থপর! এই ফিরোজাকে লইয়া আমার হৃদয়ের অদৃষ্ট রাজ্যে যে বিচিত্র সুখ দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছিল, আমি তার ভিত্তর দিয়াই যেন তাড়াতাড়ি বরষের অধিক অনেক ধানি বড় হইয়া উঠিলাম।

ফিরোজার অজস্র করিত স্নেহ ধারায় আমি যখন একদিকে মানুষ হইয়া উঠিতে লাগিলাম, অপর দিকে তার সবপল্লবিত সৌন্দর্যের নীরব অভিযাত্রায় আমার নবোন্মত্তির তরুণ হৃদয় একেবারে রক্তাক্ত কত বিকল হইয়া গেল। একি মেহ, একি উৎপীড়ন! একি দয়া, একি মিষ্টরতা! একি স্বর্গ নরকের আশ্চর্য্য সমাবেশ। এক দিন আমি সাহস করিয়া কথার ইঙ্গিতে আমার হৃদয় বেবনা প্রকাশ করিয়া বলিলাম :—“ফিরোজা তোমার ভালো ঘরে সোণার ভাঙারটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, দেখতে আমার সাধ হয়।

ফিরোজা আস্তে আস্তে পদ্মের মৃণালের মত হাত খানা আপন হৃদয়ে রাখিয়া আকাশের পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তর করিল :—“পুরুষের দশ দিক, জী-লোকের এক হৃদয় সম্বল!”

আমি অতি মুহূর্ত্তে বলিলাম,—“আমি যদি কোনো দিন মানুষ হই ফিরোজা!”—

ফিরোজা তার মুখ খানার উপর একটু ম্লান হাসি ছড়াইয়া দিয়া বলিল—“সে দিন মানুষ করার সখ আমার মিটবে!”

আমি একবার ভাব-বিতোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম “তাতে তোমার মানুষ করার সখ মিটতে পারে কিন্তু আমি বলচি, আমার মানুষ হওয়া মিথ্যা হবে, যদি আমার হৃদয়টা তোমার পায়ের উপর জন্মের মত বিসর্জন করতে না পারি!”

মুহূর্ত্তের জন্ত ফিরোজার মুখ খানা তার পারশী মাকড়ি পড়া কর্ণমূল দুটা পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়া বীরে বীরে প্রভাতের চাঁদের মত অত্যন্ত পাংস্তুর হইয়া গেল। ফিরোজা পাখরের মত আবেগহীন চক্ষে আমার পানে চাহিয়া বলিল :—“তুমি এমন আশা কখনো মনে স্থান দিয়ো না। আমি বিবাহিতা, এক স্বামীর হৃদয় ছাড়া আর কিছু রাখবার আমার যায়গা কোথায়?”

ফিরোজার সুনীল চক্ষে একদিন আমি যে পরমে-শ্বরকে দেখিয়াছিলাম, সে এক মুহূর্ত্তের ঝড়ে ধূলিসাৎ হইয়া আমার হৃদয়হীন নাস্তিকতার মাঝে চিরদিনের মত বিলীন হইয়া গেল। আমি আগে নাস্তিক, কালো নাস্তিক, ছায়া! তোমাদের পরমেশ্বরের উপর আর কোন বিশ্বাসই রাখিতে পারিলাম না!

যথা সময়ে আমি মণি বেগমের ইন্সুলে এন্টেল পরী-কার পাশ হইয়া কলিকাতা ম্যাডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ডাক্তারি পড়িতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু কলিকাতায় ডাক্তারি পড়ার সঙ্গতি আমার ছিল না,—কিন্তু অবস্থার সঙ্গে মিল রাখিয়া জীবনের কোনো কাজ করিতেই আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ফিরোজা আমার জন্ত যা করিয়াছে, এ জগতে তার তুলনা নাই। কিন্তু আমি আর কোন মুখে তার নিকটে কলিকাতায় পড়ার খরচ চাহিব। কলিকাতা বাতায় জন্ত প্রস্তুত হইয়া ফিরোজাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলাম,—

“তবেচ ফিরোজা আমি পরীকার পাশ হয়েচি?”

ফিরোজা ঝড়ের মত খুব এক পলক হাসিয়া বলিল,—

সবস্ত শরীরটা যেন “কিবা” কিম করিয়া উঠিল। কারণ সেটা আমার চোখের ভুল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি যেন দেখিলাম, কে এক দীর্ঘাকী সুন্দরী তার কণিতা তুলত। সিন্ধু নীল বসনে সজ্জিত করিয়া যখন মোতিঝিল হইতে উঠিয়া আসিয়া অদৃশ্য কোমল চরণ দ্বয়ে আমাদের বাঁধা বাটের উপর দিয়া গেহনে আশ্রয় কুঞ্জের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন আকাশের চাঁদ অস্ত শিখরে অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া পৃথিবীর উপর মুহূর্তকালের বর্ণিকাটা নিক্ষেপ করিবার উত্তোগ করিতে ছিল।

আমি শিহরিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ভীতি-জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কি দেখছেন?” ডাক্তার স্বপ্নাদিষ্টের মত উদাস ভাবে বলিলেন,—“স্বপ্ন।

কিছুক্ষণ আমি ও ডাক্তার দুই জনেই মোতিঝিলের বাঁধা বাটে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলাম।

তারপর ডাক্তার মুহূর্তে বলিয়া উঠিলেন—এই পুণ্ড্রসিদ্ধ লক্ষ্যের হীরাটা ফিরোজাকে তার স্বামী যৌতুকের মধ্যে দিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া ফিরোজার খণ্ডর তার স্বামীকে নৈতিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্ভত হইলে ফিরোজাকে লইয়া তার স্বামী মূর্খিনাবাদে পালাইয়া আসেন। কিছুদিন পর, ফিরোজার স্বামী চলিয়া গেলেন; যৌতুকের হীরাটা বাইবার সময় সঙ্গে লিয়া বাইতে চাহিলেন কিন্তু ফিরোজা তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। যেটিয়াবুদ্ধে ফিরিয়া গিয়া তিনি তাঁর নৈতিক সম্পত্তি ফিরিয়া পাইলেন বটে কিন্তু এই হীরাটা লইয়া স্বামী স্ত্রীতে জন্মের মত বিচ্ছেদ হইয়া গেল।

ধুনকরের নিকট মৃত্যুর পূর্বে ফিরোজা আমার লজ্জা রাখিয়া গিয়াছিল, শুধু তার ছুটি সুন্দর আদেশ। প্রথম আদেশটা এই যে আমি যদি কখনো ডাক্তারী পাশ করিয়া মূর্খিনাবাদে ফিরিয়া আসি, তবে নিজ ব্যয়ে ধুনকরের চিকিৎসার তার আমাকে লইতে হইবে। স্বামীর মেহে আকস্মিক বঞ্চিত থাকিয়া যার গৃহে ফিরোজা তার দুঃখের জীবন এমন নিষ্ঠুর ভাবে শেষ করিয়া চলিয়া গেল, এই মনোরম আদেশ তাঁর ভিতর দিয়া সে সমগ্র ধুনকর সমাজের উপর তার অসাম ক্লান্ততা কি মধুর ভাবেই না চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গেল।

আমার প্রতি তার দ্বিতীয় আদেশটা আরো গভীরতর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। সেটা ছিল এই যে আমার ধর্ম্মবত বাই কেবল হোক না, আমি যদি প্রতি মৃত্যু ভিষিতে সমাধির উপর ফুলের অঞ্জলি দিয়া খোদাতার নিকট পরলোকে তার দুঃখের কাহিনী করি,

তবে তিনি তার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া পরলোকে তাকে সুখী করিবেন, এই আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস লইয়াই সে মরিবার লজ্জা প্রস্তুত হইয়াছে। তার পরলোকের দুঃখের তার আমার উপর রাখিয়া সে যেন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়াই মরিয়াছে।

আমি নাস্তিক। আমার জীবনের উপর দিয়া এই যে ঘটনার ঝড়গুলি বাহিয়া গিয়াছে, তারি ভিতরে তোমাদের ঈশ্বর আমার চক্ষে চিরকালের মত শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু একটা কথা। আমার উপর খোদাতার ডাকিবার তারটা রাখিয়া পরলোকে দুঃখের আকাঙ্ক্ষাটা লইয়া কি নিশ্চিন্ত বনেই সে চলিয়া গিয়াছে। আমার উপর তার চিরদিনের অশুভ বিশ্বাস টুকু রাখিয়াই সে এ জন্মের মত চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে। আমার মনুষ্যত্বের উপর যদি তার বেহেস্ত দাবী কিছুমাত্র থাকে, তবে আমি নাস্তিকই হই, আর বাট হই, ফিরোজার চক্ষে বিশ্বাস দাতী হইবার আমার কি অধিকার আছে। আমাকে দিয়া ইহলোকে সে যা পায় নাই, পরলোকে যদি সেইটা পাইবার আশা করিয়া থাকে, তবে তার সেই অটল বিশ্বাস টুকুর লজ্জা আমি ঈশ্বর কে কেন, সন্তানকেও অগ্রাধনা করিতে প্রস্তুত আছি। আমার ধারণা এই যে ফিরোজার চক্ষে জীবনে যরণে বিশ্বাসদাতী হওয়ার ভিতরে আমার যে অধর্ম্ম, তা আমার জন্মস্থান নাস্তিকতাও কখন সইবে না।

ফিরোজার বিশ্বাসের উপর আমার কোনো হাত নাই। কিন্তু তার আদেশ কি আমার সমুদয় নাস্তিকতা অপেক্ষাও বড় নয়? সেই লজ্জাই আজ তার মৃত্যু বাসরে যখন আমি ফিরোজার হইয়া খোদাতার ডাকিতে-ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে তোমার সঙ্গে আমার দেখা। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নাস্তিক, সে সময়ে তুমি যেন কোনো সন্দেহ আনিও না।”

তিনি যখন তাঁর সুদীর্ঘ কাহিনী এই বলিয়া শেষ করিলেন, তখন আমি আন্তিক নাস্তিকের ভিতরে কিছুমাত্র তর্ক না দেখিতে পাইয়া ভক্তির সহিত তাঁর পবিত্র পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া ভোরের আলোর সমর রাস্তার বাহির হইয়া পড়িলাম। তখনো ডাক্তার সেই মোতিঝিলের বাঁধা বাটেই বস মুহূর্তের মত লজ্জা হইয়া বসিয়া আছেন।

ঐতর্য্যকোচন্দ্র সিংহ।

মহাত্মা রামমোহন রায়।

যে কালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সঙ্কটময় যুগ-সন্ধির কাল—তখন পুণ্যকন অনবরত ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া নিঃশেষ হইতেছে, এবং নূতন স্পষ্টভাবে দেখা না দিলেও পুরাতনের ভগ্নস্থপের মধ্যে অসংখ্য গন্ধাঘাট উঠিতেছে। তখন বহু শতাব্দীব্যাপী তমোময় যুগ (Dark Age) প্রায় অবসান হইতে চলিয়াছে; এবং অপরদিকে আরেকটা নবযুগের পূর্ব সূচনার সূত্রপাত নীরবে চলিতেছে। ঐ সময়ের অব্যবহৃত পূর্বের হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ জাতির পরস্পর সংযোগ ও সংঘর্ষ হইতে যে এক দেশব্যাপী ভূম্পনের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে প্রাচীন প্রথা হুভেদ প্রচীর-ঘেরা হিন্দুসমাজের ‘অশ্রয়স্থান’ কাঁপিয়া ধাসয়া পাড়বার উপক্রম হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রের হিন্দুশক্তি বৃষ্টিপাতের প্রবল আঘাতে চূর্ণায় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্র অভ্যুত্থানের মূলে যে মহৎ ভাবটা ছিল, তাহা সমুদায় ভারতীয় সমাজের ক্ষত বিক্ষত বেদনাময় চিত্তক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বস্তুতঃ রামমোহন রায়ের আবির্ভাব কালের অব্যবহৃত পূর্ববর্তী কালটা এক বিশাল নবতর জীবনের বাজ গভে ধারণ করিয়া আসন্নপ্রায়ের অসহনীয় বেদনার খেঁচ চকল হইয়া উঠিয়াছিল। পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তির এবং ধর্মপ্রভাবের আলোড়নে তখন হিন্দুসমাজ বহুকাণের মোহনপ্রা হইতে অন্ধকারগিরিত হইয়া, একবার সুদূর অতীতের দিকে, আবার অজানিত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিতেছিল। আমার ত মনে হয়, যে সঙ্কটময় কালে বহুদা বিক্ষিপ্ত ভারতীয় সমাজের সমষ্টিগত মনের মধ্যে ঐক একটা অজ্ঞাত, অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা,—একটা নবীন জীবনের আদর্শের জন্ম প্রতীক জাগিয়া উঠিতেছিল।

দৈবীশক্তিসম্পন্ন, যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষগণের আবির্ভাব আমাদের স্থূল দৃষ্টির নিকট একটা আকস্মিক ঘটনা, একট: প্রতীক বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে,

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা বিধাতার নিগূঢ় বিধানের কার্য-কারণশৃঙ্খলে আশ্চর্য নৈসর্গিক ঘটনা মাত্র। পূর্বোক্ত ভারতীয় সমাজ যে আকাঙ্ক্ষার বেননা অন্তরে অন্তরে অস্পষ্ট অঙ্কিত করিতেছিল, যে নব জীবনাদর্শকে মনে মনে অব্বেষণ করিতেছিল, তাহাই সাকার বৃত্তি ধরিয়া রামমোহন রায়ের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছিল।

মহাত্মা রামমোহনের জীবনের কেন্দ্রগত সত্যটি কি, তিনি কোন্ বীজ প্রচার করিবার জন্ম জন্মগ্রহণ করেন, কোন্ আদর্শের প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি নিজের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন? এক কথায় বলিলে, তাহা অষ্টদেবতত্ত্ব—ঈশ্বরের একত্ব, এবং মানবের অভিন্নত্ব: একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই আছেন যিনি স্বরূপতঃ এক অপরি-চ্ছিন্ন, ত্রিঅঙ্গবিশিষ্ট, কিম্বা বহু অংশে বিভাজ্য নহেন। আর, মানুষে মানুষে প্রকৃত পক্ষে কোন পার্থক্য নাই—জাতি-বর্ণ জাতি-পুরুষের বাহ্যিক প্রভেদ সত্ত্বেও শক্তি-সামর্থ্য, অধিকার এবং জীবনের লক্ষ্য ও সার্থকতা বিষয়ে একমাত্র অপূর্ণ মানুষের সদৃশ, সমকক্ষ। এই একই কথা ভাব-রূপে বলিলে, রামমোহনের জীবনের মন্ত্র যুক্তির মন্ত্র—সর্বাপেক্ষা স্বাধীনতার মন্ত্র। মানুষ সাংসা-রিক ব্যাপারে, চিন্তাশক্তি পরিচালনে, সামাজিক কর্তব্য পালনে নিজের অন্তরগত আলোকেরই অনুসরণ করিবে, অপর মানুষের বাহ্যিক প্রতিকার করিবে না, মানুষ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে অপর মানুষের বা শাস্ত্রীয় শাসনের, কিম্বা বহুদেবতার দাসত্ব করিবে না; সে একমাত্র উপাধ্য দেব-তার অনুমতি নির্দেশ অনুসরণ করিয়া নিজের শক্তিতে নিজের পথ কাটিয়া নিবে;—এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করি-তেই রামমোহন জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাই দেখিতে পাই নূতন গণতন্ত্রের (Democracy) কনভূম আমেরিকার বুদ্ধিজীবী দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদের সংবাদে এবং ফরাসী বিপ্লবের শেষভাগে স্বাভাব্য ও সাম্য মন্ত্রের উপাসকদের বিজয়বাস্তা। প্রাণে তিনি অগুরু ভাষাগরে নিমগ্ন। এই ব্যক্তিগত মন্ত্রের ও ব্যক্তিগত সহায়িতার অনুপ্রাণিত তাহার সকল প্রকার সমাজ-সংস্কার, রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার এবং শিক্ষাবিস্তারবিষয়ক চেষ্টার মুখোমুখি কারণ। এই জন্মই হিন্দুবিধবার সহমরণ

প্রথার উচ্ছেদ, যুক্তিমূলক পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তন, জুরীর বিচার সর্বজনব্যাপী করিবার চেষ্টা, মুদ্রায়ন্ত্রের বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা, সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র পরিচালনা, প্রিমজীবী ও কৃষাজীবীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন, বঙ্গীয় হিন্দুর সম্পত্তির উপর আত্মকর্তৃত্ব অটুট রাখিবার জন্য দায়ভাগের প্রমাণ সংগ্রহ, প্রভৃতি বহুবিধ আয়াসসাধ্য কার্যে তাঁহাকে নিযুক্ত দেখি। অপরদিকে, মাস্তুমের আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ সুরল করিবার জন্য রামমোহন রায় কোন শ্রমকেই শ্রম বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। বস্তুতঃ এই বর্ষাস্থরণ এবং আবিলতায়ুক্ত সত্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা তাঁহার বহুবিধ প্রচেষ্টা জীবনের একমাত্র প্রেরক। এই প্রেরণায়ই পিতৃগৃহ ত্যাগিত, সংসারানতিভক্ত ঘোড়যাত্রায় বঙ্গীয় বালককে দুর্লভ্য হিমগিরি উত্তীর্ণ হইয়া রহস্যময় তিব্বত রাজ্যে উপস্থিত হইতে দেখি—এই প্রেরণায়ই, সেই সর্বব্যাপী অজ্ঞানতার দিনে তাঁহাকে শুধু আপনার মনীষা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে দেশীয় ও বিদেশীয় বহুতর দুর্লভ ভাষা আয়ত্ত করিয়া, নানা বিরুদ্ধ শাস্ত্রের দুর্গম অরণ্য ভেদ করিয়া সত্যধর্মের, একেশ্বরবাদের অমৃত ফল আহরণ করিয়া সর্ব ধর্মের সমন্বয়মূলক এক সার্বভৌমিক, সার্ব-জাতিক ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে দেখি। এই কারণেই তাঁহাকে নিতীকচিত্ত মহারণীর ত্যায়, অযুক্তি ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের অব্যর্থ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া, লৌকিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারক ত্রীশ্বরবাদী খৃষ্টীয় ধর্ম-যাজকদের বিরুদ্ধে, এবং সংখ্যাহীন সমাজিক কুঅথা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে দেখি।

রামমোহন রায়ের মনোপ্রকৃতিতে দুইটি, দৃষ্টান্তঃ বিরুদ্ধ শক্তির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়—একটি, তাঁহার হৃদয় বিশ্লেষণকারিণী বুদ্ধি (Analytic intellect), অপরটি, সমন্বয় মূলক গ্রাহিকা শক্তি (Synthetic Assimilation). একদিকে তাঁহাকে যেমন ধর্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক, রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনকারীরূপে দেখিতে পাই,—তু পৌরুষ সঙ্গার অসত্যের ভিতর হইতে সত্যের স্বর্ণকণিকা সংগ্রহ করিয়া অসত্যকে নিষ্ঠুর আঘাতে চূরমাণ করিয়া দিতে দেখি, অপর দিকে আবার, হৃদয়ের গভীর

শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ সকল সত্যের ধণ্ডগুলির সমবায়ে এক অঞ্চল সত্যের আদর্শ গঠন করিতে দেখি। যে রামমোহন আচার-সর্বস্ব লৌকিক ধর্মের সংহারকরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনিই আবার কি অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রহ্মহত্যের ব্যাখ্যান করিয়া ও মণ্ডকা, মণ্ডুক, কঠোপনিষদ প্রভৃতির অনুবাদ ও প্রকাশ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় সাধনার অমূল্য রত্নরাজি বিশ্বতির হাত হইতে রক্ষা করিলেন; আবার হিব্রুভাষার দুর্লভতা ভেদ করিয়া যীশুখৃষ্টের অপূর্ণ উপদেশাবলী সংকলিত করিয়া জগতের সাধারণ সম্পত্তি করিয়া দিলেন।

আমার ত মনে হয়, রামমোহন রায়ের জীবনের মর্মগত সত্য যতটা তাঁহার সমন্বয় ও সংরক্ষণকারিণী শক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে ততটা বিশ্লেষণ শক্তিতে নহে। এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শের উদ্ভাবনা ও প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় স্বরূপেই তিনি তাঁহার বিশ্লেষণ শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। সংস্কারক বলিতে আমরা সাধারণতঃ ইংরাজীতে যাহাকে Iconoclast বলে, অর্থাৎ দেবপ্রতিমা ভঙ্গকারী, পরধর্মঘোষা, সংকীর্ণচেত ব্যক্তিকে বুঝি। উদারহৃদয়, সত্যোপাসক রামমোহনকে ঐ অর্থে সংস্কারক বলিলে তাঁহার মনকে খাটো করিয়া ফেলা হয়। বস্তুতঃ মনোবীক্ষী এমার্শন প্রাচীন দার্শনিক Plato সন্দেহে যাহা বলিয়াছেন আধুনিক মহাত্মা রামমোহন সন্দেহেও সেই কথা বর্ণে বর্ণে প্রযোজ্য:—

"The Unity of Asia, the details of Europe; the infinitude of the Asiatic soul, and the defining, result-loving, machine-making, surface-seeking, opera-going Europe, Plato came to join, and by contact, to enhance the energy of each. The excellence of Europe and Asia is in his brain. The metaphysics and natural philosophy represent the genius of Europe; he substracts the religion of Asia as the base."

যাঁহার রামমোহন রায়ের জীবনের বিচিত্র চেষ্টা ও ঘটনাবলীর ভিতরকার তাৎপর্য্য ধরিতে পারিয়াছেন

তাহারা জানেন, এই মহাত্মার মনোপ্রকৃতির স্তরে স্তরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধনার বাহা শ্রেষ্ঠ তাহা যেন গ্রথিত রহিয়াছিল। বেদান্তের অষ্টতত্ত্বকে তিনি যেমন জীবনের ভিত্তি স্বরূপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, মানুষের চিন্তা ও কর্মশক্তিকে মুক্তিদিবার জন্ত, এবং তাঁহার দৈন্যপীড়িত স্বদেশের দুঃখময় ঐহিক জীবনকে হাস্যোজ্জ্বল করিবার জন্ত, মুক্তিমূলক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞান এদেশে প্রচলিত করিবার জন্ত তিনি কিরূপ প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনটি কঠোর সাধনা এবং অশ্রান্ত ত্যাগের ইতিহাস,—অর্থাৎ তিনি সংসার বিমুখা ছিলেন না, জ্ঞানোপেত ভোগ হইতে তিনি নিজেকে এবং অজ্ঞকে বঞ্চিত করিতে চাহেন না। তাই জীবনের সায়াহ্নে ইংলণ্ড প্রবাস কালে এই ধর্মপ্রবর্তককে যেমন ঐ দেশীয় ধর্মবীর ও জ্ঞানবীরদের সংসর্গ করিতে দেখি, তেমনি সে সময়কার বিখ্যাত অভিনেত্রী Mr. Kemble-এর সঙ্গে প্রীতি-সম্বন্ধ করিতে, তাহার অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়া অশ্রুবার্ণক করিতে দেখি। কারণ, রামমোহনের আদর্শ সেই প্রাচীন ধর্মির আচরিত আদর্শঃ—

অন্ধস্তমঃ প্রবিশন্তি যেষ্যবিজ্ঞাপাসতে।

ততো ভূয়ইব তে তমো য উ বিজ্ঞায়াং রতাঃ॥

বিজ্ঞাং চাবিজ্ঞাং চ যন্তুদেদ উত্তরং সহ।

অবিজ্ঞায়া মৃত্যুং তীর্জী বিজ্ঞায়া মৃতম শ্রুতে॥

ঈশাবাস্তমিদং সর্বং স্বত্বিকঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

এন ত্যক্তেন ভুজিথা, মা গৃধঃ কশা বিদ্ধনম্॥

অর্থাৎ জ্ঞানহীন কর্মসাক্ষ্য, অন্ধবিহীন জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রত্যেকটিই আমাদের ধ্বংসের হেতু। কিন্তু জ্ঞান ও কর্মের, অহুরাগ ও বৈরাগ্যের, ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্য, ঐহিক ও পারত্রিকের সমন্বয়ই আমাদের মুক্তির—ঐহিক ও পারত্রিক মুক্তির—একমাত্র উপায়।

কিন্তু এই প্রাচীন আদর্শ হইতে আমরা বহুকাল খলিত হইয়া বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম—এই আদর্শ এককাল “রাত্রিদিন জীর্ণশাস্ত্রে শুকপত্র মাঝে” রুদ্ধ হইয়া ছিল, জীবনের পরিচালনে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছিল না। তাই আজ মানুষের এত দুঃখদৈত,

এত ভয়ভাবনা। তাই, যে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তিমন্ত্র, জগৎব্যাপী গণতন্ত্রের ভাব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিতেছিল, কার্যভঃ তাহা হইতে এক সর্বসংহারক হলাহল উদ্ভূত হইয়াছে। তাই আজ “জাতিগেম নামধারী প্রচণ্ড অজ্ঞার ধর্ম্মের ভাসাতে চাহে বলের বজায়।” ফলতঃ দুর্ভাগ্যবশতঃ ভোগমূলক বিশালাকার কর্মসাক্ষ্য প্রতীককে অপব্যত মৃত্যুরদিকে দ্রুত লইয়া বাইতেছে। আর এদিকে, পরুষকারহীনতা কপট সাদৃশ্যতা ও বৈরাগ্যের ছগনায়ে সমগ্র ভারত-বর্ষকে জড়ভরতে পরিণত করিয়াছে, যাহার ফলে মৃত্যুর অসংখ্য দূত সকল—দুর্ভিক্ষ, মারাত্মক প্রকৃতি—দিবারাত্র বন্ধের শোণিত শোষণ করিয়া আমাদিগকে ককালসার করিতেছে।

এই আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে জগতকে রক্ষা করিবে কিসে? আধুনিক জগতে এই বিষম প্রশ্নের, এই জীবন মরণ সমস্তার সহস্র মহাত্মা রামমোহন রায় এক শতাব্দী পূর্বে তাঁহার জীবনের কার্যাবলী দ্বারা দিয়া গিয়াছেন। উপনিষদের রূপকের ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিলে বলিব—ভোগকর্মরূপী যে পক্ষীটি আজ পশ্চিম সমুদ্র তীরে স্নান ফলাগদনে তন্ময় হইয়া আছে তাহাকে তাহারি নিরাহারী ত্যাগরূপী সখাটির সঙ্গে আবার অচ্ছেদ্য সখ্যাত্মক বান্ধিয়া দিয়া সমাজরুদ্ধে সমারূঢ় করিয়া দিতে চাইবে। রক্ষা প্রধান, কর্মময় প্রতীচ্য সভ্যতা এবং ধ্যান-জ্ঞান-প্রধান প্রাচ্য সাধনাব পরিণয় হইতে ভবিষ্যতে যে অভিনব সভ্যতা ওজস্বী করিবে তাহার সম্ভাবনীয়তা কত ইহা কে গণনা করিবে? এই শুভ পরিণয়ের স্বরূপাত মহাত্মা রামমোহন আপনার জীবন দ্বারা করিয়া গিয়াছেন; এবং গোঃবের বিষয়, তাহারি আধ্যাত্মিক বংশধর, স্বামী শিবকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি তাঁহারি পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মানবজাতির সেই প্রত্যাশিত পরিপূর্ণ সুপ্রভাতকে নিকটবর্তী করিবার প্রয়াস করিয়াছেন ও করিতেছেন। বস্তুতঃ রামমোহন রায় শুধু নবভারতের জনক নহেন, তিনি অগতির নব সভ্যতার প্রবর্তক, যে সভ্যতা বিধাতার আশীর্বাদে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে সকলপ্রকার দ্বন্দ্বদেহ

দূর করিয়া দিয়া এক সর্বগ্রাহী প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষকে মহীয়ান করিয়া তুলিবে ।

চঞ্চল বীচিমালা দ্বারা যেমন সমুদ্রের অতলতার পরিমাপ করা যায় না, সেইরূপ কণ্ঠময় বাহ্যজীবন হইতে মহাপুরুষদের আধ্যাত্ম জীবনের গভীরতা সম্বন্ধে কোন ছিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারা যায় না—তাঁহাদের অন্তর জীবনটা আমাদের কাছে রহস্যই থাকিয়া যায় । তাই মহাত্মা রামমোহন আধ্যাত্মিকতার কোন্ সোপানে পৌঁছিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিতলেখকদের পক্ষে জোর করিয়া বলা কঠিন । তবে তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে তাঁহার ধর্মতত্ত্বের যে আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে বলা হয়, তিনি ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা, পাতা ও বিধাতা-রূপেই দেখিতেন, শক্তির আধার রূপে দেখিতেন—কিন্তু রসস্বরূপ আনন্দস্বরূপ বলিয়া দেখিতেন না । তাই মনে হয়, তাঁহার অন্তর প্রকৃতিতে জ্ঞান-বুদ্ধি যুক্তির বসতা প্রাধান্য ছিল বুদ্ধি বা শক্তির বসতা প্রাধান্য ছিল না । বস্তুতঃ তাঁহার জীবনের বাহ্য প্রধান ব্রত (mission) ছিল, তাহা স্মরণ করিলে ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই । বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও এবং শৈশব কালে তাঁহাতে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ দেখিতে পাওয়া গেলেও বিধাতার নির্দেশে তাঁহাকে অন্ধভক্তি বিশ্বাসের পথ ত্যাগ করিয়া, যুক্তির সম্বার্দীনা হস্তে যুগযুগান্তর সঞ্চিত অজ্ঞান-কুসংস্কারের আবর্জনারাশি দূর করিয়া দিয়া মানুষের প্রকৃত যুক্তির পথ সুগম করার জন্ত জীবনের চেষ্টা নিয়োগ করিতে হইয়াছিল । তাই বিজ্ঞানভাষ্য বলিয়া উপাত্ত দেবতার ধ্যানে ও সৌন্দর্য্যে একান্তভাবে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিবার অবসর তাঁহার কোথায় ছিল ? তবে জীবনের কষ্টাবসানে যুরোপ প্রবাসকালে রামমোহনের অন্তরনিহিত ভক্তিবৃত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল । ইহা Miss Collet এর লিখিত জীবনী হইতে জানিতে পারা যায় ।

মানুষের শক্তি যে অপারিসীম, তাহার অভিযান্ত্রিক দ্বারা যে অন্তহীন, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যে তাহাকে নাস্তিকতার গর্ভের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে না, যুক্তি-মূলক জ্ঞান এবং প্রকৃত ভক্তিবিশ্বাসের মধ্যে যে কোনও বিরোধ নাই—এই পরম শিক্ষা, এই মহতী আশার বাণী আজন্ম জানোপাসক নিষ্কামকর্মযোগী রামমোহন রায় আধুনিক যুগকে দান করিয়া গিয়াছেন । *

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর ।

সমস্যা ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

আশাকে দেখিয়া পাকুল বলিল—“এই বুঝি তোর আধ ঘণ্টা ?”—

পশ্চাতে শৈলেন্ ও নগেনকে দেখিয়া সে আর আশাকে কোন কথা বলিতে পারিল না ; মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিল—“আম্নন, বস্নন,—মাকে বলি গিয়া—” অভ্যর্থনা করিয়া পাকুল আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না । ভিতরে চলিয়া গেল ।

শৈলেন্ ও নগেন্ আশার আর্ট ষ্টুডিওতে বাইয়া প্রবেশ করিলেন ।

কিছুক্ষণ পরেই তাতা আসিয়া উভয়কে জানাইল—“বাবা ভিতরে বাইতে বলিয়াছেন ।”

হুর্গাদাস বাবুর আহ্বান শুনিবা মাত্র শৈলেন ও নগেন তাতার অনুসরণ করিল ।

হুর্গাদাস বাবু তাঁহার পাঠগৃহে বসিয়া টেটসম্যান পড়িতেছিলেন । তাগদিগকে দেখিযামাত্র বলিলেন—“বসো তোমরা ।” তারপর শৈলেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“তোমার বাবা কি চলিয়া গিয়াছেন ?”

শৈলেন বলিল—“তিনিতো সেই দিনই মেল ট্রেনে চলিয়া গিয়াছেন ; বাড়ীতে গিয়া পৌঁছ তত্ত্বও দিয়াছেন ।”

তাহারা দুজনে দুখানা চোয়ারে উপবেশন করিল ।

উভয়ের শারীরিক কুশলদি প্রিজ্ঞাসার পর হুর্গাদাস বাবু শৈলেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“তোমার কি প্রফ দেখিবার ভাল অভ্যাস আছে শৈলেন ?”

শৈলেন কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—“ভাল নাই, তবে কলেজ মেগার্ডিন্ চালাইবার ভার আমার উপর ছিল, তাহাতে যা একটু—”

“ভাল, দেখা যাউক কি রফম । আমার ‘Medical Jurisprudence’ এর আঃ একটা এডিশন ভাড়া-তাড়ি বাহির করিবার প্রয়োজন, এই এগারর কর্ম্মার প্রফটা তুমি, এইবার দেখিয়া দাও দেখি । আসিবা মাত্রই খাটুনির কথা, কিছু মনে করিও না কিন্তু !” বলিয়া হুর্গাদাস বাবু হাস্য করিলেন ।

শৈলেন টেবিলের উপর হইতে স্মৃতাধীনা প্রফসিট লইয়া হাসিয়া বলিল—“এ আর কি বেশী খাটুনি ।”

হুর্গাদাস বাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন—
“তাহা হইলে তুমি এই স্থানে বসিয়াই দেখ, আমরা
বারান্দায় যাইয়া বসি। যাহাকে এক কক্ষের ভার দিয়া
ছিলাম, তাহার দেখা ভাল হইতেছে না; দশটা
ফন্না ছাপা হইয়াছে, ভুলের অবধিই নাই; এই
এগারর ফন্নাটার জন্য তুমি দায়ী কিন্তু!”

হুর্গাদাস বাবু তাঁহার আদ্যাকট্টা একটু কড়া
হইয়াছে, বুকিতে পারিয়া একটু ধামিয়াই বলিলেন—
“কোন চিন্তা নাই, শেষ প্রফ আমি নিজে আর একবার
দেখিয়া দিব। তুমি পাকুলকে লইয়া দেখ; সে ছাপান
অরিজিনেল দেখিয়া পড়িয়া যাইবে, তুমি মিলাইয়া
সংশোধন করিবে।”

পাকুল ও বকুল সেইখানে ছিল। পিতার ইঙ্গিতে মূখে
কাপড় শুষ্কিয়া পাকুল টোবলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

“আইস নগেন্ বাবু, আমরা গিয়া বারান্দায় বসি।”
—বলিয়া হুর্গাদাস বাবু উঠিলেন।

হুর্গাদাস বাবুর ‘বাবু’ সম্বোধনে নগেন কুণ্ঠিত ও লজ্জিত
হইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিল—“আপনি আমাকে
‘বাবু’ বলিলে—, “আচ্ছা দেখা যাইবে।” বলিয়া হুর্গাদাস
বাবু বারান্দায় গেলেন, নগেন্ ও তাঁহার অনুসরণ করিল।

হুর্গাদাস বাবু নগেনের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত
হইলেন। তাহার বাড়ী-ঘর, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন,
অর্থ-বিস্ত, সম্পর্কে আলাপ হইতেছিল। দীর্ঘ আলাপের
পর হুর্গাদাস বাবু নগেনকে প্রশ্ন করিলেন—

“ওকালতিই তবে তুমি তোমার শিক্ষার চরম ফল
বলিয়া ধরিয়া নিয়াছ?”

“যার মুরবির জোড় নাই, তার আর কি বেশী আশা
করা চলে?”

“আমি সে দিকের কথা বলিতেছি না; সার্কিসাই
আমাদের শিক্ষিত যুবকদের সাধনার শেষ পুরস্কার—এ
আমার মত নহে।”

লজ্জা বোধ করিয়া নগেন বলিল—“কিন্তু আজকাল
সেটাই আমাদের সমাজের গর্বের বিষয় যেন হইয়াছে।
আমাদের দেশের অর্থবান জননেতারাও গোপনে তৈল
মর্দন করিতে পারিলে যেন কৃতার্থতা লাভ করেন।”

“সেটা ব্যক্তিগত হইতে পারে, নেতা মাঝেরই উপরে
একরূপ দোষাক্রম করা যায় না।”

হুর্গাদাস বাবুর সহিত এপর্যন্ত নগেনের বিশেষ
আলাপ হয় নাই; সুতরাং তিনি কোন মন্তব্যলব্ধী, তাহা
সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

এবারও নগেন লজ্জিত হইয়া কথাটা আর এক দিকে
লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়া বলিল—“বাবার ইচ্ছা, আমি
পুলিসে ঢুক, না হয় উকীল হই। আমি কোন পন্থাই
এ পর্যন্ত ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই; তাই পড়াই
চালাইতেছি।”

“তোমার বাবা সহজে অর্থ আসিবার পন্থা দেখিয়াছেন,
মুহুর্ষু কিন্তু ইহাতে—”

এই সময় একটা ভদ্রলোক একটা ছোট ব্যাগ ও ছাতা
হাতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

হুর্গাদাস বাবু তাঁহার দিকে চাহিতেই সে ভদ্রলোকটী
তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল—“কি কাণ্ডটাই হ’য়ে
গেল দেখুন দিক! লোকটাকে আদেব্বারে মার্ভার
ক’রে ফেলেন—এ্যার কি কোন রেমিডি নেই?”

ভদ্রলোকটীর কথা শুনিয়া নগেনের বিষয় বাড়িয়া
গিয়াছিল, সে বলিল—“কার, কি হইয়াছে?”

ভদ্রলোকটী বলিল—“এ লোকটা ছেলো সেই ক্লাসের
এক জীব, যার জীবকে পুষ্পল করে তুলবার জন্যে সে
নিবিড় ভাবে তার মুহূর্ত্তগুলোকে খাটিয়ে নিত পথের
মজুরগিরিতে, আর তার কাজটা হ’য়ে যাওয়ার জন্যে
আর একটা দিকে উৎফুল্ল হ’য়ে চেয়ে থাকতো আর
কতগুলো জন যাদুককে কায়মনে নিরীক্ষণ কতে
হ’তো এই হতভাগাকেই।”

নগেন বিষয়ের সহিত ভদ্রলোকটীর কথা শুনিতে
ছিল, কথা শেষ হইলে বলিল—“আপনার কথা যে
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, হইয়াছে কি? সহজ
করিয়া বলুন না?”

ভদ্রলোকটী আশ্চর্য হইয়া বলিল—“ও সব লোকের
প্রতি যে আমাদের সম্প্রতি নেই—দৃষ্টির অভাব, সেটা
কাবো ব্যক্তিগত দোষ নয়—আমাদের উদাসীন জাতীয়
ভাবেরই দোষ।”

দুর্গাদাস বাবু এতক্ষণ তাঁহার মুখের দিগে চাহিয়া
ওঁনিতেছিলেন ; এইবার বলিলেন—“কথাটা কি ?”

ভদ্রলোকটি বলিলেন “একটা ইউরোপিয়ান একটা
কাঁকা মুটেকৈ লিভারের উপর কিক্ কোরে এ্যাকেবারে
মেরে ফেলেছে ; আর কি !”

তাঁহাদের সহিত হাসিয়া নগেন বলিল—“এই কথা !
ওতে আর একটা বিশেষ রহস্য কি আছে !”

ভদ্রলোকটি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—“বল্ছেন কি
মশাই, ও কুলী মজুর বলে কি ও মানুষ নয় ? ওর
ভেতর মানুষের সোল্ নেই ? ভগবানের অজ্ঞ দানের
অধিকারী হ’তে সে এ্যাকেবারেই নিজকে অনধিকারী
কল্পনা করে নেবে ?”

নগেন হাসিয়া বলিল—“একেবারেই নাই !”

“জ্যা—ভগবান্ এর ভেতর নেই ? ও সুধ হুঃধ
ফিল্ করে না ? আপনি বলছেন কি ?” বলিয়া যেন
ভদ্রলোকটি কাঁদিয়া ফেলিলেন ।

নগেনের দয়া হইল না,—বলিয়া ফেলিল—“ভগবান্
এই টেবিলেও আছেন, এই বিড়ালটিতেও আছেন—
চেতন-অচেতন-উদ্ভিদ-মাত্রেই তার অন্তিত্ত্ব ভ বিতে
গেলে আছে, না ভাবিলে নাই । কিন্তু ভগবান্
ধাকিলেই তাহাতে আপনার কপিত সোল্ আছে,
তাহার প্রমাণ আছে কি ?”

ভদ্রলোকটি নিকটের একখানা চেয়ার টানিয়া
লইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং নগেনের মুখের দিকে
চাহিয়া বিষয়ের সহিত বলিলেন—

“আপনি কি বল্ছেন—আমি এ্যাকেবারেই গ্রেস্প
কন্তে পাচ্ছি। ও লোকটার ওই সেড্ ডেথ্ এ
আপনার ফিলিং ক্রিয়েট্ হলো না, অণুখাত্তও সিম্পেথি
হলো না—অশ্চর্য্য লোক্ দেখছি আপনি মশাই—
ওয়ান্ডার ফুল ।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“আমি বলিতেছি—লাইফ
সোল্ ধাকিলেই যে তার প্রতি সকলের হুঃধ হবে, এ ঠিক
নয় ! অন্ততঃ আপনি-আমি তাহা অনুভব প্রায় করি না ।”

ভদ্রলোকটি আশ্চর্য্যভাবে বলিল—“বলেন কি ?”

নগেন হাসিয়া বলিল—“আপনি কি আগাছা

আবর্জনা কাটিয়া ফেলিতে হুঃধ বোধ করেন ? চিন্তা
করুন, উদ্ভিদেরও কিন্তু লাইফ আছে । আপনি কুকুর
বিড়ালকেও সর্কদা স্থগা করেন—তাদেরও লাইফ আছে ।
এদিকে ডাঃ বসুর মত মহাপ্রাণ ব্যক্তির উদ্ভিদের জন্ত
হুঃধ অনুভব করিয়া থাকেন, অনেকে কুকুর বিড়ালকে
মানুষের চেয়ে বেশী আদর করিয়া থাকে, তাহাতে
দেখিতেছেনই । অথচ এগুলির মধ্যে সোল্ নাই ।
আপনি বলিতে চান মানুষের মধ্যে লাইফ ও সোল্ আছে
কিন্তু পণ্ডিতেরা সকল মানুষেরই সোল্ আছে স্বীকার
করেন না । তাঁহারা বলেন—‘পরাদীন জাতির আত্মা
নাই—ধাকিতে পারে না, সুতরাং তাহার জন্ত হুঃধ
করা নিষ্প্রয়োজন ।’

ভদ্রলোকটি স্থগার সহিত বলিলেন “ছেঃ ছেঃ ! কি
হার্ট লেস্ এক্সপ্রেসন্ ।”

নগেন—“আপনার যে ঐ ব্যক্তির জন্ত সিম্পেথি,
তাহা আপনি তাহার সম অবস্থাপন্ন বলিয়া এবং তাহারই
মত দুর্বল বলিয়া ; আপনার এ সিম্পেথির মূল্য অতি
অকিঞ্চৎকর—দুই একবার আশঃ, উহঃ করা ব্যতীত
আর কিছুই নহে ।”

দুর্গাদাসবাবু পত্রিকার উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া বলি-
লেন—“দয়াল,—দয়াল, নগেন্ ঠিক কথাই বলিয়াছে ।”

ভদ্রলোকটি বলিল—“ক্ষমা করোঁচ মশাই, সহিষ্ণুতা
ও ক্ষমা আছে আমাদের, তাই রক্ষে । আপনারও এই
রক্ত মাংসের অনুভূতির জ্বালাত্তরে সাক্ষ্য দেহ, সর্কণ
সহানুভূতি, বেপথুমান হুঃধ বেদন দুর্গিবাবু নিকটের
প্রবল উচ্ছ্বাসের ত্রায় সচেতন মূর্তি পরিগ্রহ করে আত্ম
প্রকাশ করাই ছেল এরূপ অমানুষিক পৈশাচিক
অজ্ঞায়ের প্রতিকূলে স্বাভাবিক ; সে স্থলে এরূপ হৃদয়
হীনতার পরিচয় !”

নগেন হাসিয়া বলিল—“আজকাল যে ক্ষমাকে শুণ
বলিয়া মনে করে, তাহার পক্ষে গলা ধাক্কাই পুরস্কার ।
এবং অহরহঃ তাহাই তাহার ভাগ্যে ঘটয়া থাকে ।
ঐ গলাধাক্কা হস্ত করিবার শক্তির নামই কিন্তু সহিষ্ণুতা ।
এ উভয় গুণেরই জন্ম প্রতিকারের শক্তির অভাব হইতে ।
ইহার প্রতিকূলতা হৃদয় হীনতা নয় বরং অনুভূত
ঘোরতর অপরাধ, তাহা অজ্ঞান হৃদয়ের সহায়ক ।”

ভদ্রলোক—“উত্তেজিত হবেন না,। মানবের অমূল্য জীবনকে পদম কারুণিক মঙ্গলময় পরমেশ্বর যে গুণ রাশিতে নন্দিত করে রেখেছেন, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা তার মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ—মহাদান।”

নগেন—“শক্তি ও গৌরবের বিকাশ যে ক্ষমায়, তাহা গুণ; শক্তিশালী ও গৌরবান্বিত ব্যক্তির সহন শক্তির নাম সহিষ্ণুতা। নিরুপায়ের বেদনা হজম করিবার শক্তিকে সহিষ্ণুতা বলে ন, অক্ষমের প্রতিশোধ লইবার অনিচ্ছাকেও ক্ষমা বলে না। এই সফল দুর্বল লোকের ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অন্তরালে অক্ষমতা ও চক্ষুশল মূর্ত্তিমান। সে ক্ষমা পাপ, সহিষ্ণুতা ঘোরতর অপরাধ।”

ভদ্রলোকটি ঘৃণা মিশ্রিত রাগের সহিত বলিলেন—“দুর্বল মানুষের প্রতি যে মানুষের সহানুভূতি নেই, সে পুঙ্খ বিষণ বিহীন নর-পশু।”

এ কথায় নগেন চটিল না, হাসিয়া বলিল—“সুতরাং তারও আত্মা নাই।” তারপর একটু মোগায়েম ভাবে বলিল—“দেখুন, জাতির দুর্বলতাকে সহানুভূতিতে সিক্ত করিয়া মনে করণ রসের প্রয়োগ কোন স্বাধীন জাতি দেয় না; স্বাধীন রাজপুত্র জাতি দেয় নাই, হিন্দুর পরম ধর্মগ্রন্থ গীতা তারপরে এ নীতির নিন্দাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছে।”

ভদ্রলোকটি হতাশ হইয়া বলিলেন—“Man is man only by the heart. পরের দুঃখ যে না বুকে, সে কিসের মানুষ!”

নগেন বলিল—“হিন্দুধর্মের তো বটেই, খৃষ্ট ধর্মেরও এ একটা সুন্দর উপদেশ, কিন্তু খৃষ্টের ধর্ম, আর খৃষ্টান জাতির ধর্ম, দুইটা ঠিক এক পদার্থ নহে—সেতো প্রত্যক্ষই দেখিলেন। আর পরের দুঃখ বুঝার মানে এই নয় যে তাহার দুঃখ দেখিয়া মুখে আঁহা উঃ করা বা চক্ষের জল ফেলা। আপনি ঐ রূপ চক্ষে বান না ডাকাইয়া, বক্ষে দুর্বলতার আসন না দিয়া, যদি ঐ স্থলে ঐ লোকটার পক্ষে দাঁড়াইয়া আর কিছু করিতে পারুন আর নাই পারুন, একটু বীর রসের অবতারণা দ্বারা সিমপোথ প্রকাশ করিতে, তাহা হইলেও আপনার ভিতর পরের দুঃখের অনুভূতির প্রমাণ পাওয়া যাইত; পরাধীন জাতিও যে মানুষ, তারও যে সোন্ আছে, তাহা বাহার-অস্বাকার করেন, তাহাদিগকে অন্ততঃ একটু চিন্তা করিবারও অবসর দেওয়া যাইত।”

“আপনি দেখি, আমার খুব হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু! তা হলেই আরো একটা কেসাদ ঘটে উঠত — রুলের গুঁতো আরো হাজত খানার বাস—লোকটা আপনি মন্দ নন।”

ভদ্রলোকটির কথায় ও মুখ ভঙ্গিতে সকলে হাসিয়া উঠিল।

“তবে দুর্বলের যুড়াই—বিশেষ অগম্যুই ভগবানের ইচ্ছা জানিবেন। আপনার সোণ আছে—দেখুন সিমপোথ প্রকাশ দ্বারা তাহার কোন উপকার করিতে পারেন কিনা—যত্নে কতে যদি—”

নগেন দুর্গাদাসবাবু যে সম্মুখে উপবিষ্ট তাহা বাক্য-যুদ্ধে ডুবিয়া ভুলিয়া গিয়াছিল; হটাৎ দিহ্বা কাটিয়া কথা এইখানে বন্ধ করিয়া দিল।

কথা যখন উভয়েরই মাত্রা লজ্জন করিয়া উচ্চ গ্রামে পৌঁছিয়াছিল, তখন সুরগোল শুনিয়া পাকুল, বকুল, আশা, তাতা সকলি আসিয়া একত্র হইয়াছিল। এমন এক গৃহিনীও আসিয়া পদ্মার পাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। বাদামুবাং বন্ধ হইয়া গেলে সকলেই প্রধান করিলেন।

দুর্গাদাসবাবু বলিলেন—“প্রফটা আজ শৈলেনকে দিয়াছি। বধুবাবু; আজ আর আপনাকে দেখিতে হইবে না।” বলিয়া বাড়ির দিকে চাহিয়া ‘আপনারা বসুন, গল্প করুন, আমাকে এখন সমাজে যাইতে হইতেছে।’ বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

দুর্গাদাসবাবু কাগড় লইতে হিগেন, শৈলেন বলিল—“প্রফটা দেখা হইয়াছে, একবার আপনি দেখিয়া দিলেই পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।”

দুর্গাদাসবাবু যথারীতি উদ্ভাওয়া দেখিয়া বলিলেন—“বেশ হইয়াছে। আমি এখন সমাজে যাই, আমার আসিতে একটু রাত্রি হইবে, রাত্রে আমি আর এক বার দেখিয়া কাল পাঠাইয়া দিব। প্রফ দোষেতে যদি নিতান্ত কষ্টবোধ না হয়, তবে প্রাতঃস্মিতবার আর বুৎ বারে প্রফটা কিন্তু দেখতে হইবে।”

শৈলেন তাঁহাকে কথা বলিতে না দিয়া উৎসাহের সহিত বলিল—“একটুই না, এক ফর্ম প্রফ—ছাপার কাগজ দেখিয়া কম্পোজ করা—আমসন টামসনের গোলমাল না থাকিলে খুব বেশী হয়তো আট দশে আশি মিনিটের বেশী সময় লাগিতেই পারে না। বুৎবার আর রবিবার আমিই দোষণা দিব। এখানে না পারিলে, রাত্রিতে বাসায় লইয়া গিয়া দেখিয়া দিব। এও একটা কাজ? বরং এতে আমাদের নাম কাম হই যথেষ্ট আছে।”

দুর্গাদাসবাবু সমাজে চলিয়া গেলেন ।

পারুল বলিল—“আপনার বড়ই পরিশ্রম হইয়াছে।”

শৈলেন বলিল—“তা যদি মনে হইয়া থাকে—
পারিশ্রমিক দাও।” পারুল লজ্জা পাইয়া হাসিল ।

শৈলেন বারান্দায় আসিয়া নগেন ও বিধুবাবুর সহিত
বোগ দিয়া প্রহানের উত্তোগ করিতেছিলেন । পারুল ও
বকুল বাড়িতে দিল না, বলিল—“মা আসিছেন, বসুন।”

বারান্দার সম্মুখেই গাড়ী-বারান্দার ধোলা আঙ্গিনা । ঐ
আঙ্গিনায় মাটির টবে নানা জাতীয় রন্ধ ও লতা সজ্জিত
আছে ; সূর্যাস্তের পর ঐ স্থানে বসিয়া দুর্গাদাস বাবু পুত্র
কৃত্যগণকে লইয়া গার্হস্থ্য শাস্তি উপভোগ করিয়া থাকেন ।

সূর্যাস্ত হইয়াছে দেখিয়া বেহারী ঐ স্থানে টেবিল
চেয়ার ফেলিয়া দিল । সকলে তথায় উপবেশন করিলেন ।

পারুল ও বকুল, আশা ও তাতা মিলিয়া চা ও মিষ্টি
টেবিলের উপর রাখিল ।

বকুল একটু হাসিয়া নগেন কে বলিল—“জাতিতো
সেদিনই গিয়াছে—আজ আর ভয় করি না।” নগেন ও
হাসিয়া কহিল—“উদর বড় কুম্ভটী, লোভ দেখাইলে রক্ষা
নাই কিন্তু ! জাত যাওয়ার এখন ও ঢের দেড়ি।” বলিয়া
নগেন গলার উপবাস গাছা দেখাইয়া হাসিয়া ফেলিল ।

বিধু বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—“আপনি ব্রাহ্মণ ?”
নগেন তেমনি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল “নতুন ব্রাহ্মণের
ঘরে খেয়ে ও হজম করতে পারতেছি ? আপনি ?”
“আজ্ঞে সমাজেরই একটা নগম্বা কাঁট।”
“পেসা ?”

“জগতে অস্তিত্ব রক্ষা করবার জন্তে জীবনকে যত
রকমে খাটিয়ে নেওয়া যেতে পারে, কষ্টের হচ্ছে না—
ফটোগ্রাফ আছে। টি কোম্পানী আছে, লাইফ
এন্সউরেন্স, চন্দমা আছে। দালালীও করে থাকি,
সাহিত্যচর্চায় পাগলামিতেও বাদ দিতে পারি না; তারপর
যখন যা জোটে, করে থাকি।” বলিয়া নগেনের দিগে
চাহিয়া বিধুবাবু হাসিলেন ।

নগেন হাসিয়া বলিল “আপনি দেখিতেছি জেক্স অব্
অল্ট্রিডস ?”

বিধু—“কিকরি বলুন, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা;
বসে আছি জীবনের ঐ শেষ দিনের প্রতীক্ষায়,
যে দিন নিবিড় হৃদে এসে জীবনের কর্মসূত্রকে টেনে
ধরে জানিয়ে দেবে—ওগো করছ। কতুমি, তব্ব্যতের
অন্ধ তাৎপস নিশিধিনীর—

নগেন বাবা দিয়া বলিল—“দোহাই মহাশয়, একরূপ
ছাপার অন্ধরে কথা বললে আমাদের নিরক্ষরদের
সমিত্র পোষাইবে না আপনার।”

বিধু বলিল—ক্ষমা করবেন মহাশয়, সাহিত্য চর্চা করে
থাকি কিনা; তা আপনার বুঝ সাহিত্য চর্চা নেই ?”

নগেন বলিল—“না, আমি সাহিত্য সেবী নই।”

বিধু—“ও ভারি সুন্দর আনন্দময় জীবন, যাতে কোরে
জীবনের পুলককে তার রূপ রস গন্ধ স্পর্শে তরঙ্গায়িত
করে বিমল আনন্দের দিকে অভিযান করতে পারা যায়।”

এই সময় গৃহিণী আরও একখানা থালাতে করিয়া
কিছু মিষ্টি লইয়া আসিয়া তাহাদের পায়ে দিতে লাগি-
লেন । বিধুর কথা শ্রবণা গেল ।

শৈলেন হাসিয়া বলিল “মাসী মা এত কেন ?” গৃহিণী
বলিলেন—“তোমরা তো আর বাবা রোজ আইস না।”

শৈলেন পারুলের দিকে চাহিয়া চুপে চুপে বলিল—
“একরূপ পারিশ্রমিক বরাদ্দ থাকিলে যে রোজ আসিতে
পারি।”

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন—“তা বেশ বাবারোজ সন্ধ্যা
বেলা আসিয়া মাসী মার দেওয়া চা খাইয়া যাইও; না
আসিলে কিন্তু তোমাদের খবরের দোষ।”

“তবে সেই হবে মাসী মা।” বলিয়া তাহারা তাহাদের
সম্মুখস্থ পান পাত্রের সংবর্দ্ধনা করিতে আরম্ভ করিলেন ।

চার পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে নগেন বিধু বাবুকে
লক্ষ্য করিয়া বলিল—“কতগুলি গ্রাহক আমায় সংগ্রহ করিয়া
দিব। কিন্তু মহাশয়, আপনি যদি দীর্ঘজীবী হইতে চান,
তবে—এতগুলি ফেস্‌দের হাত হইতে নিজকে রক্ষা
করিয়াই চলিবেন। আর গ্রাহক বৃদ্ধি করিতে হইলে
ও খলাপের ভাষাটা একদম নিরাসিত করিতে হইবে।”

বিধু বলিল “নিশ্চয় ! আপনার থাকা হচ্ছে কোথায় ?
ঠিকানাটা বললে—”

নগেন বিধুর কথায় মনযোগ না দিয়া রসগোল্লাটি
মুখে দিতে দিতে বকুলকে জিজ্ঞাসা করিল—“তোমরা পড়া
শুনা কব কখন বকুল।”

“রাত্রিতে ৭টা হইতে ৮টা আর প্রাতে ৭টা হইতে
৯টা। আজ সন্ধ্যার পর উপসনা হইবে। তারপর পড়িব।”

“কোথায় উপাসনা হইবে ?”

“আমাদের নীচের অঙ্গিনায় পৃথক ঘর আছে।
আপনারা থাকিবেন কি ?”

নগেন খুব আস্তে আস্তে বলিল—“না জাতি যাইবে।”
বকুল হাসিয়া বলিল—“ব্রাহ্মণের জাত কতবারে নষ্ট হয় ?”

নগেন তেমনি ভাবে বলিল—“৩৬৫ বাৎসর স্নান-
চারে ব্রাহ্মক ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট হইতে পারে।”

“আজ্ঞা দেখা যাউক, মনে রাখিবেন, আজ লইয়া
হুইবার।”

বঙ্গ সাহিত্য-পরিষৎ-প্রাণার
চৌমিক সং
শ্রেণী সং

সৌরভ

অষ্টম বর্ষ।

ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩২৬।

তৃতীয় সংখ্যা।

আধুনিক উপন্যাস ও গল্প।

অনেকের মতে—বর্তমান সময়ের বঙ্গসাহিত্যের বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর ভাষা Anglo-Bengali -, কোন রকমে কেবল ভাব প্রকাশক মাত্র; ইতিহাস কোন এক রকমে লিখিত হইলেই হয়,—এগুলির সাহিত্য সাহিত্য বলের কোন সম্বন্ধ নাই। এই অবস্থায় কেবল কবিতা এবং গল্প ও উপন্যাসই সাহিত্যের উন্নত ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই মত ঠিক নহে। সম্প্রতি পরলোকগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন; এখনও অক্ষয়কুমার ইতিহাস লিখিতেছেন; ললিতকুমারের গোধনী হইতে সমালোচনা প্রস্তুত হইতেছে। একরূপ আরও অনেক সুলেখকের নাম করা যাইতে পারে। এই সকল রচনা যেমন চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ, তেমনি ভাষার মার্ঘ্যতা ও ভাবের প্রাচুর্য্যে মনোহর। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে এই সাহিত্য ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হইতেছে; কবিতা এবং কথা-সাহিত্যই বঙ্গসাহিত্যের দুকূল প্রাবিত করিয়া বিপুল উচ্ছ্বাসে চলিয়াছে।

কবিতা এই প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশই আমাদের উদ্দেশ্য।

আলকাল যে সমস্ত সাহিত্য লিখিত ও মুদ্রিত হইতেছে, তৎসমুদয়ের শতকরা নিরানব্বই না হউক, ছিয়ানব্বই সংখ্যকই উপন্যাস ও গল্প। গত আশ্বিন মাসের প্রকাশিত নবপ্রকাশিত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে ২১২ খানা ছিল উপন্যাস ও গল্প এবং অন্ত সাহিত্য পুস্তক ছিল ১০ খানা;

ভারতবর্ষের বিজ্ঞাপনে ৩৫১ খানা উপন্যাস ও গল্প এবং অন্ত সাহিত্য ১৬ খানা। আমাদের প্রাণারম্ভ বঙ্গ সাহিত্যের এই বিপুল অংশ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার স্থায় সত্য ও যৌক্তিকতার খাতে প্রবাহিত হইতেছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

সাহিত্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য মানুষের মনে সমাজের উদ্দীপন। সাহিত্য সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা পরিবর্জন করে। যাহা কিছু উদার, পবিত্র ও মহান তাহাই সাহিত্যের বিষয়ীভূত। “সাহিত্যের যেখানে ক্ষুদ্রতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতার পোষক নহে; সে ক্ষুদ্রতা, তুলনায় মহতের মহিমা পরিষ্কৃত করিয়া দেয়, এই মাত্র।—সাহিত্যের মহত্ব প্রবর্তক,—সাহিত্যের ক্ষুদ্রতা নিবর্তক।” * গল্প ও উপন্যাস সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে সাহিত্যের এই আদর্শই আমাদের সম্মুখে রাখিতে হইবে।

উপন্যাস ও গল্পের উদ্দেশ্য মানুষের মনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা মানুষকে বুঝাইয়া দেওয়া, জন্মের প্রেম, দৈব, মমতা এবং জীবনের উদ্দেশ্য লোকচক্রের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহারদিকে মানুষের মনকে আকর্ষণ করিয়া মানুষের জীবনের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করা। এইরূপে কথা-সাহিত্য সমাজের দুঃখিত অংশ পরিহার কর্ত্ত পাঠক-বর্গকে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে,—সমাজ সংস্কার সাধিত হয়।

এই সমস্ত উদ্দেশ্য ছাড়া যদি উপন্যাস ও গল্পের অন্ত কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাহা সাহিত্য নহে। বীচ,

* সাহিত্য, তৃতীয় বর্ষ।

সর্কার এবং হীন কথা যদি ভাষার সন্নিহনেও অঙ্কিত হয়, তাহা হইলেও তাহা সাহিত্য হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র এই জন্যই বিভাসুন্দরকে সাহিত্যের “ভেদান” বলিয়াছেন। *

উপজ্ঞাস ও গল্পের উত্তরূপ উদ্দেশ্য অন্যই কোন জাতি ও সমাজের উত্থান বা পতন সময়ে সাহিত্যের ও উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকে; অর্থাৎ সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের সাহিত্যে জাতীয় ও সামাজিক যে চিত্র অঙ্কিত করেন, সমাজে ও জাতিতে তাহা প্রভাব বিস্তার করে। এই তত্ত্ব সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত, সুতরাং উদাহরণ নিম্নরোজন। ইংরাজের জাতীয় জীবনের প্রভাতেই সেক্সপীয়রের আবির্ভাব হইয়াছিল; আর মুসলমান বিলাসের সংস্পর্শে জাতীয় অধোগতির দুর্দিনে রুকনগরের বিলাসী রাজার সত্যর বসিয়া ভারতচন্দ্র সুমার্জিত অশ্লীলতা বিস্তরণ করিতেছিলেন।

অধুনা যে সমস্ত সামাজিক উপজ্ঞাস ও গল্প বাহির হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, ইহার বেশীর ভাগেরই উদ্দেশ্য কেবল পাঠকদের মনে কণিক আনন্দদান; সে আনন্দও অনেক সময় বিয়ল নহে। যে সাহিত্যের ফল কণিক অথবা দুঃখিত আনন্দ ভোগ, তাহা সাহিত্য নামের অযোগ্য।

এই সকল উপজ্ঞাস ও গল্পে ভাষার স্বাকার ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ যথেষ্ট আছে, কিন্তু এমন কোন পবিত্র চরিত্র তাহাতে অঙ্কিত হয় নাই, বাহা সর্বজন বনোহর, পবিত্র; বাহাতে প্রীত হইয়া মাত্ত্ব পুনঃ পুনঃ তদালোচনা করে, বাহাতে লাতাকাত্মা জন্মে এবং বাহার প্রতি অনুরাগী হইয়া মাত্ত্বের চরিত্র সংশোধিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এইরূপ চরিত্র সৃষ্টিতেই কথাসাহিত্যের সার্বিকতা। *

আধুনিক উপজ্ঞাস ও গল্পে যে কিছু সৃষ্টি দেখা যায় তাহা স্বভাব অনুযায়ী ও সুন্দর নহে। আধুনিক উপজ্ঞাস ও গল্প লেখকগণ বাঙ্গালীর গৃহে যে নারক নারিকা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বেশী কাগড় পরা বিলাতী সাহেব, দিবিয় কপাক্তর মাত্র। তাঁহারা যে সামাজিক চিত্র

প্রদান করিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত; তাহা শ্রীতিনীতি প্রকৃত বঙ্গসমাজে দৃশ্যাপ্য,—কদাচিত কোন ইচ্ছা সমাজে তাহা দৃষ্ট হয়। তাহাদের অঙ্কিত চিত্রের বর্ণ একরূপ উজ্জল যে, সাধারণের মন ঐ অতিরঞ্জিত চিত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়,—কিন্তু এইরূপ অতিরঞ্জিত চিত্র স্বভাব অনুযায়ী নহে বলিয়া তাহা প্রশংসনীয় নহে। কারণ “সৃষ্টি যাত্রাই প্রশংসনীয় নহে। রেনলড্‌স্ নামক ইংরাজি আধ্যাত্মিক লেখকের রচনা মধ্যে নূতন সৃষ্টি অনেক আছে। তথাপি ঐ সকল অতি অপকৃষ্ট গ্রন্থমধ্যে গণনা করিতে হয়। কেননা সেই সকল সৃষ্টি স্বভাব অনুকারিতা এবং সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট নহে। অতএব কবির সৃষ্টি স্বভাব অনুকারী এবং সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট না হইলে কোন প্রশংসা নাই।” *

আধুনিক উপজ্ঞাস ও গল্পের অধিকাংশই বিলাসিতা ও সাহেবিয়ানার উদ্ভেজক এবং পুরাণ রীতি ও পদ্ধতির নিন্দা ও শ্লেষে পূর্ণ। বিলাসিতা ও সাহেবিয়ানার উদ্ভেজক উপজ্ঞাস ও গল্প যে সমাজের অমঙ্গলকর, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আংশিক আচার নিয়ম পরিবর্তন অপরিহার্য্য। সুতরাং প্রাচীনের নিন্দা যাত্রাই দোষ নহে। কিন্তু সকল পুরাতন আচারই শ্লেষের বিষয় নহে, আধুনিক উপজ্ঞাস ও গল্প লেখকগণের সকলেই ইংরেজী শিক্ষিত, তাঁহাদের অনেকেই দেশীয় আচার নিয়ম উঠাইয়া দিয়া ইংরেজী আচার নিয়ম বঙ্গদেশে প্রবেশ করাইবার চেষ্টার আছেন। বঙ্গদেশের সমস্ত আচার নিয়মই উঠাইয়া দেওয়া উচিত কি না এবং ইংরেজী সবই বঙ্গদেশে খাপ খাইবে কি না, তাহা তাঁহাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত। বঙ্গসমাজে যে সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও সর্কারিতা আছে, তাহার উচ্ছেদ সকলেই কামনা করেন; কিন্তু দেশীয় সকল আচার নিয়মই দুঃখিত নহে। আমাদের ব্যবস্থাপকগণ আহার পরিচ্ছদ সমস্ত বিষয়ে দেশোপযোগী আচার নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, আমরা একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ব্যবস্থাপকগণ আমাদের যে সমস্ত আহাৰ্য্য নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের শরীরের উপযোগী। আহাৰ্যের যে

সহর ও প্রণালী নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের অবস্থার উপযোগী। প্রাচীন বাঙ্গালীর যে বাহ্য অঙ্গুর ছিল, তাহার কারণই এই যে, তাঁহারা আপনাদের শরীরোপযোগী খাদ্য ঠিক সময়ে ও প্রণালীতে আহার করিতেন। আমরা তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বদেশকে ভোগের আকর করিয়া তুলিয়াছি,—অর্থাৎ বাঙ্গালীর বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কতক রসনার তৃপ্তিকর খাদ্যের মোহ, কতক ইউরোপীয় প্রণালীর অনুকরণ প্রবৃত্তি, আমাদের আহার সম্বন্ধীয় পরিবর্তন সাধিত করিতেছে।

আধুনিক উপন্যাস ও গল্প পাঠ করিলে ইহাই মনে হয় যে, ইহার লেখকদের ইচ্ছা যে, বাংলাদেশ সাহেব-আনায় ভরিয়া বাউক এবং সকলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া পুরাণ পদ্ধতি ও আচার ত্যাগ করুক, মেয়েরা শাড়ী পাউনের মত করিয়া পরুক, মাটিতে বসিয়া হাতদিয়া ভাত না মাখিয়া বাঙ্গালী টেবিলে চেয়ারে বসিয়া কাটা চাষে ধরুক। এবং আদব কায়াদার সম্পূর্ণ সাহেব হইয়া বাউক। ইহারা উপন্যাস লিখিয়া বাঙ্গালীকে সাহেব করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহারা ধনী,—সাহেব হওয়া তাঁহাদের সাজে। কিন্তু তাঁহারা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, যে বাঙ্গালীর শতকরা ২০ জন দুইবেলা দুই মুঠো খাইতে পার না,—যে বাঙ্গালীর শতকরা ৭৫ জন ভাপ কপিড় কিনিতে পারেনা,—দারিদ্র্য বাহার মজাগত, তাহার কি ব্যয়সাধ্য—প্যাণ্ট পরা ও টেবিলে খাওয়া বাহ্যনীয়? কেবল কলিকাতা লইয়াই বঙ্গদেশ নহে। যিনি কলিকাতার দৃষ্ট দেখিয়া বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লয়ন, তিনি ভ্রান্ত। বঙ্গদেশের লোক যে বিলাসিতা শিখিয়া ফেলিয়াছে, তাহার দোরাণ্ডা সহ্য করাই তাহার পক্ষে অসম্ভব; ইহার উপর আবার এই সমস্ত সাহেব-আনার উদ্ভেদক উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যরূপে পাঠ করিয়া সকলে সাহেব হইয়া উঠিলে বঙ্গদেশের অবস্থা ভয়ানক হইয়া উঠিবে। অনেক উপন্যাস ও গল্পে ঘেরেঘের উচ্চ শিক্ষার প্রতি খুব প্রশংসা প্রকাশ করা হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সকল উপন্যাস ও গল্পে-চিত্রিত উচ্চ শিক্ষিতাদের অনেকেই বিলাসিনী এবং অনেকেরই জীবন প্রহেলিকাময়। লেখকগণ ইহাদের বিলাসিতা ও

প্রহেলিকাময় জীবনের প্রতিও প্রশংসা প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। বস্তুতঃ যে শিক্ষা নারীজীবন বিলাসিতা পূর্ণ ও প্রহেলিকাময় করে, তাহা ইউরোপে উচ্চশিক্ষা কিনা, আমরা অবগত নহি, কিন্তু বঙ্গদেশে তাহা অধম শিক্ষা। আমাদের গরীব দেশ—ইংরেজী কারদার অভ্যস্ত পরিবার বা ধনী পরিবারের জীবন বাস্তব চিত্র সম্বলিত উপন্যাস ও গল্পের প্রয়োজন নাই, তাহাতে সমাজের অপকার হয়। আমরা আমাদের দরিদ্র জীবনের কথা বেশী লিখি। তাহার কারণ আমাদের লেখকগণ সহরবাসী, তাহারা বাঙ্গালীর পর্ণকুটিরের সুখ দুঃখের ধবর কমই রাখেন। ইংরেজী কারদার অভ্যস্ত ও ধনী পরিবারের বিলাসিতা লইয়া যে সমস্ত উপন্যাস ও গল্প লিখিত হইতেছে, তাহার বিলাসিতা ও সাহেবিয়ানা বঙ্গ দেশীয় যুবক যুবতীর চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া এখনই অনেক গৃহ অশান্তির নিকেতন করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং এই শ্রেণীর লেখকগণ সাহিত্য লিখিয়া দেশের অমঙ্গল সাধন করিতেছেন।

গত কয়েক বৎসর হইতে আধুনিক কারদার উপন্যাস ও গল্প লিখিত হইতেছে। এই কয়েক বৎসর মধ্যেই এইরূপ রাশি রাশি উপন্যাস ও গল্প লিখিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যকে ভারগ্রস্ত করিয়াছে। আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার করিবার জন্য এই শ্রেণীর নব প্রকাশিত উপন্যাস “উত্তানলতার” সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। উত্তানলতার গ্রন্থকার চরিত্র অকন চাতুর্য্য দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তিনি বঙ্গ সমাজের যে সমস্ত দোষ দেখাইয়াছেন, তাহার সবগুলিই যে ভ্রান্ত, এমন অবশ্যই বলা যাইতে পারে না; কিন্তু তাঁহার কথাগুলি সবই এমন ভাবে বিলাসিতা ও সাহেবিয়ানার ভিতর দিয়া গিয়াছে যে, তাহা দেখিলে, ঐ পুস্তকের প্রতি আমাদের অপ্রভা হয়। যে উদ্দেশ্য লইয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহা সাধনজন্য যদি বিলাসিতা ও সাহেবিয়ানা বর্জিত বঙ্গ সমাজের চিত্র অকন করা হইত, তবে বড়ই আনন্দিত হইতাম। মনের ও হৃদয়ের প্রবৃত্তির চিত্র অকনে যাহার এত নিপুনতা আছে, তিনি যদি বঙ্গদেশের সমাজ মূলত সাধাসিদ্ধে তাবের মধ্যস্থিয়া আদর্শ নারিচরিত্র কুটাইয়া

ফুলেন, তবে বুঝিব—বঙ্গদেশে নারী প্রকৃতই উচ্চশিক্ষিতা হইবে। বঙ্গদেশে শিক্ষিতা নারীর যে চিত্র তাঁহার। হুটাইতে চেষ্টা হইয়াছেন, তাহার প্রভাব বিষময় হইবে। প্রসন্ন হইতে পারে, “ইউরোপের হাবভাব মজ্জাগত করিয়া লইলে তাহার ফল বাংলাবীর পক্ষে বিষময় হইবে কেন?” এই প্রশ্ন ৩০০ জনারায়ণ বসু মহাশয়ের “সে কাল ও একাল”, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “সোণার কাটি রূপার কাটি” এবং ৩০ জনাথ বসু মহাশয়ের “কঃ পছায়” মীমাংসিত হইয়াছে। এই চিন্তাশীল বঙ্গীর সাহিত্যিকগণ সকলেই বঙ্গদেশে ইউরোপের রীতিনীতির কুফল দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ইউরোপের বিলাসিতাপূর্ণ রীতিনীতি আয়ত্ত করিলে বঙ্গ সমাজের ধ্বংসের আর বেশী বিলম্ব হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে সমস্ত সামাজিক উপজ্ঞাস ও গল্প আধুনিক লেখকদের লেখনি হইতে প্রসৃত হইতেছে, তৎসমুদয় বঙ্গ সমাজকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিতেছে। এইজন্য এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে যাহাদের লিখিবার শক্তি আছে, তাহাদের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, তাহাদের লিখিবার শক্তি বঙ্গদেশের প্রকৃত অবস্থার ভিতর দিয়া চালনা করিয়া বঙ্গীয় সমাজকে সংস্কারে প্রবৃত্ত করিয়া বঙ্গদেশের প্রকৃত কল্যাণসাধন করেন। তাহা হইলেই তাহাদের লেখনি ধন্য হইবে এবং বঙ্গীয় পাঠক সমাজের অজস্র আশীর্বাদ তাহাদের উপর বর্ষিত হইবে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ।

ভগ্ন-মন্দির ।

মৌন যুদ্ধ চিন্তে অই ভয়জনী দেহে
সংসারে সজ্জনী সম সর্বস্ব ত্যাগিয়া
অমর প্রেমের জ্যোতি লভিবারে কিহে
পূর্বস্বত বন্ধে ধরি আছ দাঁড়াইয়া।
কিছা যোগাসনে লীন যোগিবর বধা,
উদ্ভাস্ত অন্তরে রহে বিধের বাহির;
পশেনা হৃদয়ে ক্ষুদ্র দুঃখ দুঃখ বাধা?
অনন্তে নিলাতে চারি শাস্ত দেহটার।
অন্ত ভেদি শুভ্র সৌধ কালের কুচক্রে
হরিত্র কুটীর, ছার দৈন্ত হাছাকার,
যোবহি কি অনিত্যতা? কি জানি কি মত্রে
অনন্তে টানিয়া লও অন্তর সবার।
আলো কা(ও)রা এ'রুখু বিধাতার নীতি,
এই আছে, এই নাই,—সবাই অভ্যর্থি।

শ্রীবিজয়কান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ।

সমস্যা ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

পীরপুরের সামাজিক সমস্যা জগবজ্জবাবু ধামাচাপা রাধিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। তারিণী মুখুয়া তর্করত্নকে এবার সহজে ছাড়িবে না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাই জগবজ্জবাবু—আপাততঃ কোন সামাজিক ক্রিয়া কণ্ডি নাই, সুতরাং সামাজিক দলাদলিরও সম্ভাবনা নাই—বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়া ছিলেন, তাহা নাকচ করিবার চেষ্টায় তারিণী নানা কন্দি ঝাঁটিতে লাগিলেন।

বাস্তবিকই ২১ মাসের মধ্যে পীরপুরে কোন বড় সামাজিক ক্রিয়া কাণ্ডের সম্ভাবনা ছিল না। এই দলাদলির গরম ভাব ঝাঙা হইয়া গেলে, একরূপ স্থবিশা আর সহজে আসিবে না ভাবিয়া তারিণী তাঁহার সমাজস্থ রামকান্ত চক্রবর্তীকে ধরিয়া বসিলেন—“দাদা তুমি তোমার দৌহিত্রের অন্নায়ত্ত করও।”

রামকান্ত বলিল—“আর না হইলেও ৫০ টা টাকা খরচ, দিবে কে?”

তারিণী বলিলেন—“দশ টাকায় কর। সে টাকারও কতক বরং আমিই দিব।”

এইরূপে তারিণী মুখুয়ার সাহায্যে রামকান্ত তাঁহার পৌত্রের অন্নায়ত্ত করাইয়া তর্করত্নকে ও রমণ ভাগুরীকে সমাজ চ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অন্নায়ত্তের দিন পীরপুরের বহুখা বিভক্ত সমাজ ভাঙ্গিয়া যেন দুইটা হইয়া গেল। তারিণী বাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না। তারিণীর দলে ব্রাহ্মণ সমাজের প্রায় অধিকাংশই রহিলেন; কায়স্থ, বৈষ্ঠ এবং শূত্র কেহই আসিলেন না। এদিকে ব্রাহ্মণ দুইএক খরও তর্করত্নকে পরিত্যাগ করিলেন না।

অর্থনাশ হইল, অথচ কার্যোদ্ধার হইল না, দেখিয়া তারিণী পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের পণ্ডিতগণকে লইয়া চক্রবর্তী বাড়ীতে এক সভা আহ্বান করিলেন। সভার হিন্দুধর্ম ও ভাতি রক্ষার গুরুতর গুরুতর রিজলিউশন হইল, কিন্তু ফল অধিক অগ্রসর হইল না। বরং পীরপুর সমাজের কায়স্থ-বৈষ্ঠ-শূত্র তর্করত্নকে সমর্থন করার দক্ষিণ

ব্রাহ্মণের আর্থিক অবস্থা একটু বজ্রল হইবারই উপায় হইয়া দাঁড়াইল। দেখিয়া, ব্রাহ্মণ সমাজ কোতে ও হুঃখের মরিয়া হইয়া উঠিল।

কি উপায়ে লোককে নির্ব্যাভব করিতে হয়, গ্রাম্য সমাজ পরিচালকগণের নিকট তাহা অবিস্মৃত নহে।

দলাদলি যখন চরমে উঠিল, তখন উত্তর পক্ষই আদালতে নাহিল। পনের দিনের মধ্যে মহকুমার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে পীঃপুরের শতাধিক মোকদ্দমা দায়ের হইয়া গেল।

জাল তরতক, ধান কাটা, রাত্তাবন্ধ, * * *, জীহরণ, মানহানী, মারপিট, তহবিল তরুণ, নিকাশ, চুরী, ডাকাতি—কুত্র বৃহৎ বহু মোকদ্দমায় গ্রামের নিরীহ লোকদিগকে হয়রাণ করা হইতে লাগিল। শেব এমন দাঁড়াইল যে এক চুরী মোকদ্দমায় গোপী গাজুলীর দ্বিতীয় পক্ষের সুবতী জীকে সাক্ষী মাফ করিয়া সমন দেওয়া হইল।

সমন পাইয়া গোপী গাজুলী মাথায় হাত দিয়া বলিয়া পড়িলেন।

দলাদলির ধারাই এই, সলা পরামর্শ খুব খরতর বেগে—রাত নাই দিন নাই, চলিতে থাকে; তাহাতে দলাদলি-প্রবণ লোকগুলি খুব উৎসাহ পায়; দোড় ধাপে অগুমাত্রও কষ্ট বোধ করে না, অর্থ ব্যুত্তিতেও জ্বকপ করে না। কিন্তু প্রকৃত বিপদ বাহার মাথায় পড়ে, সে যেমন আঘাত পায়, দলের পরম উৎসাহী পাণ্ডারা তেমন পায় না। সকলের মাথায় সমান আঘাত লাগিলে দলাদলি বতদূর বাড়িয়া চলে, নিশ্চয় ভতদূর চলিতে পারিত না। কেননা বাড়িবার কারণ নির্ভর করে, সহকারী ব্যক্তির সহিবার শক্তির উপর এবং সহিবার শক্তি নির্ভর করে, আঘাতের গুরুত্বের উপর।

গোপী গাজুলী যখন সবনের নোটিশের কাগজে কেবলি মরিয়া হুল দেবিতেছিলেন, তখন রমানাথ ঘোষ বলিলেন—“গাজুলী মহাশয়, এটাও একটা ভয় নাকি? এ হইলে আরও বড় সংসার চলে না। যদি বসাইতে হয়ই, বাবেন,—আমিও তো বড় এক অর্থহীন। আমরা কি তখন কোনটা দিয়া বলিয়া থাকিব?”

বিজেন ভণ্ড বলিল—“ও একটা কিছুই না, অর্থহীন, যেরূপ প্রদীপ ছিল, চোরকে চুরী করিতে বেরিয়াছি—সোজা কথা বলিয়া আসিবেন। জীণোকের সহজ জীণী হাকিম কমা করে—এর জন্য আপনি এত চিন্তিত। শত্রু হাসাইবেন না, ছিঃ!”

রমানাথ সাহেবের টর্নি—মহকুমার মাথলা মোকদ্দমা লইয়া যায়, তদ্বির করে—সে তাচ্ছল্যভাবে বলিল—“ওই—কে যে বলছিল—বিসের কথা।—আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, আজ সন্ধ্যার পরই না ঠাকুরাণীকে কি কি বলিতে হইবে, আমি গিয়া সব ঠিক করিয়া দিয়া আসিব। এতেই যদি দাবড়াইয়া যান, তবে তো পক্ষেপদে নাকাল—”

হিতাকাজী আরো অনেক লোক আরো অনেক কথা বলিলেন। পরামর্শে সাহসনা পাইলে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির সহিবার শক্তি বাড়িয়া যায়। গোপী গাজুলীর এ সকল কথা একেবারেই ভাল লাগিল না। তাঁহার সহ্য করিবার শক্তি ক্রমেই দুর্বল হইয়া আসিতেছিল। তিনি সমন থানা হাতে লইয়া জগবজ্রবাবুর কাছে আসিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

জগবজ্রবাবু সমনখানা পাঠ করিয়া বলিলেন—“আর সাত দিন আছে, এর মধ্যেই একটা কিছু করিতে হইবে বৈ কি? উদ্দেশ্য ইত্যাদি—ভ্রাতৃলোকের পরিবারকে অপমান করা। সকলেই না, বোন, জী লইয়া যান করে; ইহার প্রতিকার অবশ্যই করিতে হইবে। আদালতে হাজির হইতে কখনই হইবে না, হইতে দিব না। আপনি ভয় পাইবেন না। বিকালে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করা যাইবে, অল্প পরামর্শ মর—গ্রামের দোষিত বায়ু যে প্রকারেই হউক শোধন করিতে হইবে।”

জগবজ্রবাবুর আশাস বাক্যে বড় গোপী গাজুলীর বুক হইতে যেন জগদল পাখাণ সরিয়া গেল। গাজুলী জগবজ্রবাবুর হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। এ কালা হুঃখের মনে—কৃতজ্ঞতার।

সাহসনার গোপী গাজুলীর সহিবার শক্তি পুনঃ পুনঃ বাড়িয়া চলিল।

কর্তার হাতে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

আজ নীলপুরের ছলগৃহে অপরাহ্ন সাড়ে চারি ঘণ্টিকার সময় হিন্দু হিতসাহিনী সমিতির এক গ্রাম্য অধিবেশন হইবে। রাজনগরের রাজা সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী সভাপতির আসন অধিকার করিবেন। গ্রামে গ্রামে সজ্জিত বিজ্ঞাপন বিলি করা হইয়াছে ও বাজারে বাজারে চোলের ঘোষণা দ্বারা তাহা প্রচার করা হইয়াছে। সভাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যতদূর সম্ভব আলোচনা হইবে।

১। কি প্রকারে সনাতন হিন্দুধর্ম ও সমাজ রক্ষা করা বাইতে পারে? ২। হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমে কমিয়া বাইতেছে—বৃদ্ধি করিবার উপায় কি? ৩। হিন্দুর বিবাহ ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতির ব্যয় লাঘব করা সম্ভবপর কি না? ৪। হিন্দুর নিম্ন শ্রেণীতে বিধবা বিবাহ প্রচলন সম্ভব কি না? ৫। সাধারণ গ্রাম্য মামলা গ্রাম্য সালিস দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৬। দরিদ্র হিন্দু গৃহস্থকে সাহায্য করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে “কো অপারেটিভ খনদান ভান্ডার” প্রতিষ্ঠা।

৭। গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ও শিক্ষার ব্যবহার জন্য মণ্ডল প্রতিষ্ঠা। ৮। গ্রামে গ্রামে সেবক সমিতি গঠন। ৯। বিবিধ।

“হুট্টা না বাজিতেই সভাস্থল লোকে লোকারণ্য। বসিবার স্থান সজ্জন হইবে না বলিয়া তারিণী মুখুরী প্রস্তাব করিলেন,—“যরের সম্মুখের ময়দানে সভা হউক, সকলেই আমরা মাটিতে হুঁসার আসনে বসিয়া বাই—” অপরক্ষণে বাবু মুখুরীয়ার কথায় অমুমোদন করিয়া বলিলেন “যেহেতু তাই হউক—সভাপতির সম্মুখে সতরঞ্চ ফেলিয়া দেওয়া হউক, বাহার খুসী সেখানে বসিবে, বাহার ইচ্ছা পাড়ে দাঁড়াইয়া থাকিবে; বেঞ্চগুলিও চারিদিকে বেড়িয়া বাইবে—এ পরামর্শ মন্দ নহে। দেখুন, সকলে ‘বুঝুন।’”

সমিতির সম্পাদক সুনীলকুমার শাস্ত্রী বিভাভূষণ এম, এইচ., এইচ.এস, বলিলেন—“সেই উত্তম—তাহাই হউক।”

অননি হেলেরা বেক বাহির করিতে লাগিল।

হুট্টা ছেলে দৌড়িয়া সতরঞ্চ আনিতে গেল। হুট্টা চৌকি বাহির করিয়া সভাপতির মঞ্চ প্রস্তুত করা হইল। যরের সাজ শয্যায় যে সকল বালক মনোযোগ দিয়াছিল—তাহারা বিপরীত ব্যবস্থা দেখিয়া দেবদাক পত্র ও খেজুরের ডাঙুলি ফেলিয়া দিয়া কাপড় চাঙ্গর লইয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহাদের আর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। বাহার লাল নীল রঙের কাগজ কাটিয়া “Wel-come” প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহার যরের দরজা হইতে তাহা তুলিয়া আর কোথায় লাগান যায়, তাহার চিন্তা করিতেছিল—অবশেষে ঐ চিন্তার অন্য কাহারও সহায়ত্ব বা উৎসাহ না পাইয়া তাহারাও নিরাশ হইয়া পড়িল।

চৌর সভা আরম্ভ হইল। রাজা সত্যপ্রসাদকে ও সহরের গণ্য মান্য ব্যক্তিদিগকে দেখিবার জন্যই যে এই লোকারণ্য হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহ্য।

প্রথমতঃ সমিতির সম্পাদক সুনীল বাবু ‘হিন্দু হিত-সাহিনী সমিতি’ এ পর্যন্ত কি করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার একটা বিবরণ পাঠ করিলেন। তৎপর সমিতির প্রচারক পণ্ডিত বিবেকানন্দ তর্কচূড়ামণি বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রের বহু বচন উদ্ধৃত করতঃ সনাতন ধর্ম ও সমাজের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া কি প্রকারে এখন তাহা রক্ষা করিতে হইবে, তাহার আলোচনা করেন এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

প্রথম প্রস্তাব। পূজনীয় প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের লিখিত শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহ একদেশদর্শী, কুসংস্কাগণ্য স্বর্ণ-শীল, স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের হস্তে পড়িয়া নিজ নিজ স্বার্থ সম্পদ হারাইয়া ক্রমে কদম্বের পুঞ্জীকৃত জুপ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ পুঞ্জীকৃত জুপ হইতে প্রকৃত শাস্ত্রার্থ বাহির করিয়া লওয়া কোন এক ভাবাবিদ বা এক ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্য নহে। বেদ, কোরাণ, আবেস্তা, বাইবেল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ধর্মগ্রন্থগুলি যিনি পাঠ করিয়া ধর্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ; সংস্কৃত, আরব্য, পারস্য, পালি, পাঁজ, হিব্রু, লাতিন প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাগুলিতে বাহার সম্যক অধিকার আছে; বিভিন্ন জাতির ভাষা ভাবে, ধর্মভবে এবং জাতি ও সমাজ ভাবে বাহার সম্যক

বুৎপত্তি লাভ হইয়াছে—আমাদের বেদ ও উপনিষদগুলি এইরূপ প্রত্নাবান হিন্দু পণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা অম্লমোদন করা হইয়া প্রকাশ করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত এই মহৎ কার্য সাধন না হইতে পারিবে, ততদিন—প্রচলিত হিন্দুবিধিকে দেশ কাল ও পাত্র ভেদে সংস্কৃত ও পরি-বর্তিত করিয়া—যাহাতে আমাদের কঠাগত প্রাণ ধর্মের শেষ নিশ্বাসটী একেবারে বাহির হইয়া না যায়, অথচ পরিবর্তনের সম্মত শক্তিতে যুগপ্রায় ধর্ম ও সমাজ শক্তিশালী হইয়া আমাদের কল্যাণ সাধন করতে পারে, তাহা আমাদের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে।”

পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব পাঠ করিয়া উপবেশন করিলে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব অম্লমোদকের নাম পাঠ করিলেন—“বাবু জগবন্ধু রায়।”

জগবন্ধুবাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন—“বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার-যান-চক্র ধর্মের শব্দে বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই সময় ঐ সভ্যতার চক্র ধারিয়া আমরা যদি তাহার সমান শক্তিতে ছুটিয়া না চলিতে পারি, তবে হয় চক্র-চাপে নিষ্পেষিত হইয়া অংশপ্রাপ্ত হইব, না হয় বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিব। আমরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে আমাদের অবস্থা কিরূপ হইবে, বলিতে যাওয়া চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করা মাত্র। প্রস্তাবিত কর্মটি অত্যন্ত দুরূহ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা না করিলে যে আমাদের কল্যাণ নাই, তাহাও সত্য। সুতরাং আমি সর্বাত্মকরূপে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উত্থাপিত প্রস্তাব অম্লমোদন করিতেছি।”

“সমর্থক—বাবু তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়।”

তারিণী দাঁড়াইয়া বলিলেন—“আমি মূল প্রস্তাবটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিতেছি। ১ম—ধর্মগ্রন্থের বিশিষ্ট অম্লমোদন, ২য়—দেশকালপাত্রভেদে ধর্মবিধি পরিবর্তন করিয়া তাহার অম্লমোদন সমাজ রক্ষা। দুইটাই অত্যন্ত উপকারী ও সঙ্গত। দ্বিতীয় প্রস্তাবের ভিতর নানা ব্যক্তির নানা মত থাকিতে পারে এবং আছে। সমগ্র ব্রাহ্ম সমাজে যখন আমাদের সমাজে যতভেদ—ভ্রাতৃত্ব-মতভেদ রহিয়াছে—”

এই সময় সভাপতি মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিলেন—

‘দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে কোন্ কোন্ কার্য কর্তব্য ও কোন্ কোন্ কার্যের সংশোধন প্রয়োজন তাহার যীচাংসা স্থানীয় সব-কমিটি করিবেন। আপনি মূল প্রস্তাব অম্লমোদন করুন।’

তারিণী—“বিলাত ব্রাহ্মী সমাজে যে আপত্তি এখানকার সমাজের আছে—”

সভাপতি—“তাহা সব-কমিটিতে হইবে; আপ-নারাই পরে করিবেন।”

এই সময় রামদাস বিজ্ঞানভূষণ উঠিয়া বলিলেন—“বিলাত ব্রাহ্মীদিগকে দেহান্ত্রিক নিবন্ধন পর্বদন্ত করিতে হইবে, কিছুতেই সমাজে লওয়া যাইতে পারে না—কখনই নহে।”

তারাপদ সাম্মাল বলিলেন—“বিলাত ব্রাহ্মীদিগকে কিছুতেই পরিত্যাগ করা যায় না—যদি তাহার কৃত-প্রায়শ্চিত্ত হয়—সমাজ দুর্বল হইবে।”

এই সময় সকলেই একেবারে উঠিয়া—কেহ—“অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে।” কেহ—“কখনই নহে।” এই রূপ গোলমাল করিতে লাগিলেন।

তখন সভাপতি মহাশয় বলিলেন—“আপনারা অনর্থক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লইয়া গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণ করিয়া সভার মূল্যবান সময় নষ্ট করিলে নিরুপায় হইব।”

রাজমোহন বিদ্যাবাগীশ বলিলেন—“উপায় নাই মহারাজ—যাচিয়া করিয়া আনিয়া পৈত্রিক জাতি ও ধর্মের অন্তেষ্টি জিয়ার সহায়তা করিতে পারিব না।”

মবকুমার বিদ্যারত্ন উঠিয়া কোষের কাপড় টানিয়া পরিধান করিয়া কাছা সামলাইতে সম্মত হইতে বলিলেন—“বিদ্যাবাগীশ ঠিক বলিয়াছেন, অত্যাচিত ব্যাপার—বিলাত কেন্দ্রের সংস্কার, অপকর্ষ, জাতিধর্মের বিপর্যয়, এক্ষণ প্রাজ্ঞল ব্যাপারে কখনই হিন্দু ধর্মের সৌকর্য্য হইবে না। ভাটপাড়া, মবদীপ প্রভৃতির অম্লমতই অধিনেমে সর্বোচ্চ অম্লমোদন বটে।”

একটি কাব্য রসপ্রিয় যুবক আত্মন উঠাইয়া সুতিবন্ধ-হস্ত কল্পিত করিয়া বলিল—

“হিন্দু ধর্মে সিদ্ধান্তি দখল করে যব দীপ

তখন কোথায় ছিলেন ভট্টপতি, কোথায় ছিলেন মবদীপ।”

সকলেই তখন বাহার তাহার মতে গোলমাল করিতে লাগিল। সভাপতি সকলকে দ্বিরুক্ত করিয়া বলিলেন—“আপনারা সকলে অকারণ গোল করিবেন না। এই মূল প্রস্তাবে আমাদের সমাতন ধর্মের কোন কতিজনক ব্যবস্থা নাই। এই প্রস্তাবের বিবরণটিকে বিশ্লেষণ করিবার সময় হিতাহিতের বিচার আপনারা করিতে পারিবেন—তখন বর্ধেই বা দ্বাদশবাদেরও সময় হইবে। তারিণী বাবু, এখন আপনি প্রস্তাবটী সমর্থন করুন। আপনি বরং কাহাকে কাহাকে লইয়া স্থানীয় ট্রেডিং সব কমিটি গঠিত হইবে, তাহারও একটা প্রস্তাব করিয়া ফেলুন। আর যদি আপনি প্রস্তাব সমর্থনে অসমর্থ হন, অমুগ্রহ পূর্বক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এই কার্য্য করিতে সুযোগ প্রদান করুন।”

তখন তারিণী বাবু প্রস্তাব সমর্থন করিতে যাইয়া বলিলেন—“আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশ বিচারের জন্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটা সব কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিতেছি। এই সব কমিটি—

সভাপতি মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিলেন—“১ম প্রস্তাব আপনি সমর্থন করিয়াছেন, এখন সর্ব সম্মতি ক্রমে তাহা গৃহীত হইলে, আপনি এই দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। আপনি কণকাল অপেক্ষা করুন।”

তারিণী একটু বিচলিত হইলেন। মূল প্রস্তাবের সমর্থন কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন যদি সব কমিটির প্রস্তাবটী উঠাইতে না দেওয়া হয়, তিনি তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট কয়েকজনকে প্রতিবাদ করিতে উপদেশ দিয়া অগত্যা নিজে চুপ করিয়া রহিলেন।

সভাপতি উঠিয়া বলিলেন—“তবে উপস্থিত সভ্যগণ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন?”

রাজমোহন বিদ্যাবাগ্ধী—“এমন জাতি নাশা প্রস্তাব কেমন করিয়া গ্রহণ করি যাহারাজ।”

তখন পুনরায় গোলমাল উঠিল। কেহ বলিলেন—“কখনই গ্রহণ করিতে পারি না।” কেহ বলিলেন—“নিশ্চয় গ্রহণ করিলাম।”

সভাপতি—“বেশ, আপনারা সকলেই আসনে উপবিষ্ট হউন। তারপর বাহার প্রস্তাবে বিরোধী তাহার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করুন।”

বিজ্ঞাপনশের দল তাহাই করিলেন। তারিণী হস্ত উত্তোলন করিলেন না, দেখিয়া তাহার দলের কেহ কেহ রাগেই হউক আর না বুঝিয়াই হউক হাত তুলিলেন না।

তখন সম্পাদক শ্রীলবাবু মঞ্চে দাঁড়াইয়া এক, দুই, তিন, চার—উত্তোলিত হস্তগুলি গণনা করিতে লাগিলেন।

৬৭ জন প্রতিকূলে মত দিয়াছেন—গণনা হইল। তখন সভাপতি তাহাদিগকে হাত নামাইতে বলিয়া বাহার প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাহাদিগকে তাহাদের দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিতে উপদেশ দিলেন।

জীবন চক্রবর্তীর দল দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন, হিতসাধিনী সমিতির সভ্যগণ, এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহ হইতে আগন্ত দর্শকগণও অনেকেই হস্ত উত্তোলন করিলেন। সম্পাদক একশত পর্য্যন্ত গণনা করিয়া গণনা পরিভ্যাগ করিলেন।

সভাপতি উঠিয়া বলিলেন—অধিকাংশ সভ্যের মতে প্রথম প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল। (করতালী)

অতপর সভাপতি, তারিণী বাবুকে তাহার সব কমিটি গঠনের প্রস্তাব উপস্থিত করিতে আদেশ করেন।

তারিণীবাবু তাহার নিজ দলের পনেরটা সভ্যের নাম পাঠ করিয়া তাহাদিগের দ্বারা একটা সব কমিটি গঠনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

ধিবেন্ গুপ্ত আপত্তি করিয়া বলিলেন—“সকল সমাজ এবং সকল জাতি হইতে বাহাতে সভ্য মনোনীত করা হয় এবং এই সভা বৎসর কাল থাকিয়া এই প্রস্তাবগুলি বাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার যত্ন করে, আশা করি সভাপতি মহাশয় এই সভা হইতে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। তবেই স্থায়ী কার্য্য হইবার সভাবনা থাকিবে।”

সভাপতির আদেশ অনুসারে সম্পাদক শ্রীলবাবু তখন দুইজন ব্রাহ্মণ, দুইজন কায়স্থ, দুইজন বৈজ্ঞ—পীরপুরের এই ছয়জন, হিত সাধন সমিতির ছয় জন ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহ হইতে তিন জন ভ্রমলোকের নাম লিখিয়া তারিণীবাবুর হস্তে দিলেন। বিরূপার হইয়া তারিণীবাবু সভাপতি মহাশয়কেই প্রস্তাব উপস্থাপন করিতে বলিলেন। তাহাই হইল।

“পীরপুর-হিন্দু হিতসামিনী ট্রেডিং কমিটি” নামে পূনর জন সভা লইয়া একটি পঞ্চায়েতি সভা স্থাপিত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় এইবার তৎপরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন জন্য ব্যারিষ্টার মিঃ ঘোষকে আহ্বান করিলেন।

মিঃ ঘোষ—“বাঙ্গালীর বার্ষিক আয় গড়ে ২০৭ হইতে ৩০৭ টাকার মধ্যে। অথচ ভগবানের স্ফূর্তি আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এই আয় দ্বারা বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আমাদিগকে জীবন যাত্রার ও ক্রিয়া কর্মের ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইবে। আমরা অনাবশ্যক ব্যয় বাহ্য করিয়া, নিজকে সমাজেগণ্য করিবার প্রয়াস করিয়া তৎপরিণতি সর্বদাই নিজকে বিপন্ন করিয়া ফেলিতেছি। এক টাকার ষ্টেম্প লিখিয়া দিয়া অথবা এক আনার রসিদ টিকেট দস্তখত করিয়া আমরা লড় নাম কিনিবার জন্য আড়ম্বরের সহিত কতায় বিবাহ দিতেছি, অথবা পিতার শ্রাদ্ধ করিতেছি। তারপর ৪৫ বৎসরের মধ্যে যাত্র-হান হইয়া দ্বারেদ্বারে ঘুরিয়া ছুরদুঠের ধিকার দিতেছি—কোনটাই আমাদের পৌরুষের কার্য্য নহে * * * ইত্যাদি। অতএব—

আমি প্রস্তাব করিতেছি যে হিন্দু বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য গৃহ বাহ্য কার্য্য যাহাতে যথা সম্ভব অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইতে পারে এবং সমাজে কর্মকর্তাকে তাহার জন্য লোক নিন্দার ভাজন না হইতে হয়, আমাদিগের তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।”

“অনুমোদন—পাণ্ডিত যদুনাথ বাচস্পতি।”

“উত্তম প্রস্তাব বটে, অনুমোদন অনাবশ্যক মনে করি।”

সম্পাদক সুনীলবাবু উঠিয়া বাচস্পতি মহাশয়কে বলিলেন—“সভার রীতি অনুসারে আপনাকে—‘আমি এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছি’ বলিতে হইবে। তাহাই বলুন।”

বাচস্পতি—“হাঁ এই প্রস্তাব আমি অনুমোদন করিতেছি।”

হর্ষনাথ সেন—“সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি হইলে এই প্রস্তাবের আমি একটু amendment কি বলে—সংশোধন পাঠ দিতে চাই।”

সভাপতি—“বলুন আপনার কি অভিপ্রায়।”

“বিবাহে পণ প্রথা রহিতের প্রস্তাবটি আমি এই সঙ্গে জুড়িয়া দিতে চাই। এটি হিন্দু সমাজের দারিদ্র্য ব্যাধির একটি বিশিষ্ট নিদান।”

গোপী গাঙ্গুলী উঠিয়া বলিলেন—“আপনি প্রাণের কথা বলিয়াছেন, পূর্বপক্ষের মেয়েটা লইয়া আমি মহারাজ—” বলিয়া সভাপতির দিকে চাহিয়া গোপী কাদিয়া ফেলিলেন।

তারিণী বাবু হুজুর করিয়া উঠিলেন—“এরূপ প্রস্তাব বাহাদুরের কেবল মেয়ে-সম্বল তাহারা করিলেই চলিবে না—।”

তারিণী সঙ্গ সঙ্গ যাহাবা ছেলের বাপ, সকলেই তাহার মত সমর্থন করিয়া সংশোধনে আপত্তি উত্থাপন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় সকলকে থামাইয়া হর্ষবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “আমাদের সংশোধন প্রস্তাবটি আপনি পাঠ করুন।”

হর্ষ “এই সভা, পণ প্রথা তত্ত্ব পতিবাদ করিতেছেন এবং যাহাতে এই প্রথা হিন্দু সমাজ হইতে নিলুপ্ত হয়, তাহার জন্য যথা সম্ভব সামাজিক দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে এই সভা ও পীরপুর ট্রেডিং সব কমিটি যত্নপর থাকিবেন এবং হিন্দু বিবাহ শ্রদ্ধ ও অন্যান্য গৃহ বাহ্য কার্য্য যাহাতে যথা সম্ভব অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইতে পারে অথচ সমাজে কর্ম কর্তাকে তাহার জন্য লোক নিন্দার ভাজন হইতে না হয়, ঐ স্থানীয় ট্রেডিং সব কমিটি তাহারও ব্যবস্থা করিতে যত্নপর থাকিবেন।”

তিন চার জন সভ্য একেবারে উঠিয়া বলিলেন—“আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।”

মিঃ ঘোষ তাহার প্রস্তাবটি একটি প্রমাণ সভার হাতে পড়িয়া মাঠে মাঠে গেল দেখিয়া সভাপতির দিকে চাহিয়া অভিমান ভরে বলিয়া উঠিলেন—“তাহা হইলে আমি আমার প্রস্তাব উঠাইয়া নিলাম।”

বাচস্পতি উঠিয়া বলিলেন—“তবে, মহাশয়, এই ব্রাহ্মণের বাক্যটাই কি অরণ্যে হাহাকার করিয়া যাবিবে?”

হর্ষ বাবু বলিলেন—“মিঃ ঘোষ ভুল করিতেছেন, ইহা বৈ আপনায় নিজ ব্যক্তিগত প্রস্তাব নহে। সভার প্রস্তাব; সভ্যরূপে আপনি সভার পক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং তুলিতে পারেন কি করিয়া?”

সভাপতি বলিলেন—“ঠিক কথা।”

বাচস্পতি মনে মনে “কালী” নাম জপ করিতেছিলেন। জন সমাজে ব্রাহ্মণের বাক্য নিরালম্ব থাকিবে। এখন সভাপতির কথায় আশ্রয় হইলেন।

ভারিণী প্রকৃতি এই প্রস্তাবটিকে আর একটু মোলায়েম করিয়া—“পণপ্রধার” হুলে “দাবী করিয়া পণ লইবার প্রথা” বাক্যটি বসাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। চেষ্টা সফল হয় নাই।

প্রায় প্রতি প্রস্তাবই এইরূপ বাকবিত্ততার সহিত নিষ্পত্তি হইয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সভার কার্য শেষ হইল। সভা ভঙ্গের পূর্বে সম্পাদক সুনীল বাবু উঠিয়া বলিলেন:—

“আমরা বাঙ্গালী জ্যোৎস্নার্ষে মরিতে বসিয়াছি। এই তিন ব্যাধি—আত্মকৃত, দৈবকৃত, পরকৃত—কেবল এই পীরপুরকে নহে বাঙ্গালা দেশকে জর্জরীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। “হিতসাহিগী সমিতি” বাঙ্গালীকে এই তিন ব্যাধি হইতে কথক পরিমাণেও বদি—অন্তত কিছু কালের জন্তও বদি রক্ষা করিতে পারে, তবে তাহার অমুঠান সফল হইয়াছে মনে করিব। সভাসমিতি দ্বারা কোন কার্য হয় না—যাহারা মনে করেন, তাহার ভুল করেন। কালী ঘাটে ব্রাহ্মণ সভার অধিবেশনে এই চূড়ামণি মহাশয়েব বক্তৃতায় একদিনে ৩৪২ খানা ছিপ কোষা টাট বিক্রয় হইয়াছিল। (করতালী) আজ তাঁহার বক্তৃতায় বদি পীরপুরের দেওয়ানি ও ফৌজদারী মোকদ্দমা গুলি বিনা ভাঘিরে এক তরফা নিষ্পত্তি হইয়া যায়; পীরপুরের সামাজিক পোল মাল অন্ততঃ ৫।৭।১০ দিনের জন্তও খামিয়া যায় সভার অমুঠান বার্ষিক জ্ঞান করিব। (করতালী)।

আমাদিগের এই আত্মকৃত ব্যাধি আমাদিগকে অর্ধ হীন করে, অমানহীন করে, কর্মহীন এবং ধর্মহীন করে, আমরা পশুর স্তর হই।

দৈবকৃত ব্যাধি ও আমরা পুরুষকার দ্বারা নিবারণ করিতে—অন্ততঃ ঘুর করিবার চেষ্টা করিতে পারি।

গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক গৃহস্থের থাকি উচিত—কেননা মরিবার সময়তো আর রাজা বা ভূম্যধিকারী মরিবেন না; গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীরাই মরিবে; অর্ধবান ভূম্যধিকারীরা রাজধানীতে সুখে কাল কাটাইবেন। মরিলে উচ্ছন্ন গেলেও অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া তাহার খাজানা রেহাই হইবে না। অপর ব্যাধির কথা আর বলিবার নহে, প্রয়োজনও নাই। রাত্রি অধিক হইয়াছে। আশাকর স্থানীয় হিন্দু হিতসাহিগী সভা কমিটি অঙ্ককার সভার প্রস্তাবগুলি বাহাতে কার্যে পরিণত হইতে পারে তাহার প্রতি যশার্ঘ বস্ত্র নিতে চেষ্টা করিবেন। এবং সেই সভার কার্য বিবরণ মূল সভায় পাঠাইবেন।

অন্তঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে তিনি গাত্রোত্থান করেন। সভা ভঙ্গ হয়।

ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত ।

গত শ্রাবণ মাসের “সৌরভে” শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় “ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত” লিখিয়াছেন,—পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। অমার্জিত গ্রাম্য ভাষায় রচিত পল্লী কবীর গীতি কবিতা গুলি যে এত দিন পর, সাহিত্য সেবী শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে,—ইহা অতুল আনন্দেরই বিষয়। বাস্তবিক, গ্রাম্য ভাষায় রচিত গ্রাম্য কবিদের কবিতাগুলি ধরিয়া না লইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের পূর্ণতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত গুলির রচনা-কৌশল তত সুন্দর না হইলেও,—ভাষা—রসের সমাবেশে এক একটি গীত,—এক একটি অমূল্য রত্ন। ত্রিতাপ দক্ষ মায়া মুক্ত দুর্জল জীবের শান্তি ও চৈতন্য লাভের জন্ত, ভগবান পল্লী কবির মুখ দিয়া এই সকল প্রণারাম সঙ্গীত স্রবণ প্রসবণী থুলিয়া রাখিয়াছেন। কণকালের জন্ত হইলেও,—মোহাক্ষ মানবের জ্ঞান চক্ষু ফুটাইবার জন্ত, দম্ভা—দানবের পাষণ্ড হৃদয় গলাইবার জন্ত,—বিষদ্বাসন্ত অবিবেকী জনের মনে বৈরাগ্যের দিব্যালোক জ্বলাইয়া দিবার জন্ত এই সকল বাউল সঙ্গীত অব্যর্থ মহৌষধি।

মহম্মদসিংহের বাউল সঙ্গীত শুনিতে রাগ-রাগিণীর বিশেষ একটা আড়ম্বর নাই ;—অধিকাংশ গীতই ঐশ্বর্য-ময় ভাটিয়া রাগিণীতে গীত হইয়া থাকে । যেমন রাগ-রাগিণীর আড়ম্বর নাই,—হেম’ন,—বাণ্ড যন্ত্রাদিরও আড়ম্বর নাই । খমক, খঞ্জনী, রাম করতাল, রসমাধুরী, ও একতারা এই গীতের প্রধান বাণ্ড যন্ত্র । সময় সময় সারিন্দার ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায় ।

বাউল সঙ্গীত, বাউল প্রাণের ভাবোচ্ছ্বাস লইয়া গ্রন্থিত । সুতরাং উহা কষ্ট কবি কি শাব্দিক কবির কবিতার ছায় নীরস নহে । বাউল সঙ্গীতগুলি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত । বাউল যন্ত্র যোগে, বাউল সুরে গীত হয় বলিয়া,—গৌর,—ভজন, গুরু, মনোশিক্ষা, নাম, প্রার্থনা, দেহতত্ত্ব, মান, মাথুরা, বিবাহ, বংশী,—গোষ্ঠ, ভোর, অভিমার, মিলন, নিবেদন প্রভৃতি বহু লীলা সঙ্গীত বাউল সঙ্গীতের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে । রূপ,—জল ভরার ভো আর কথাই নাই । এখন বাউল সঙ্গীত বলিতে গেলে গ্রাম্য কবির বাউল সুরে রচিত এই সকল লীলা কীর্তন গুলিকেও বুঝায় ।

বাস্তবিক খাটি বাউল,—প্রাণের ভাব-বৈচিত্রের অস্পষ্ট অভিব্যক্তি মাত্র । সকল স্থলে তাহা বুঝিতে ও পারা যায় না । নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি লিখিতেছি ।

“মড়া মাইন্থে আহাৰ করে জীতা মাইন্থেব পেটে ।”

“সমুদ্রেতে বোপীলাম কলা তারে নিল স্নাতে । গঙ্গা মৈল জল তিরাষে, ব্রহ্মা মৈল শীতে ॥”

“আগেত জন্মিনাম আমি, পাছে জন্মিলু তাই । দেখ্তে দেখ্তে মা জন্মিল, বাপত জন্মিল নাই ॥”

“পানীর তলে পাথর ঘুসীদু তারে খাইল ঘুণে । ছুকে পড়িয়া বন্দা বেস্তের খবরটানে ॥” ইত্যাদি ।

সচরাচর এই প্রকারের বহু গান শুনিতে পাওয়া যায় ।

বাউল তাঁর বাউল প্রাণ লইয়া, কোন্ ভাব সমুদ্রে কোন্ রস—তরঙ্গে ডুবিয়া ভাসিয়া, এইরূপ অসম্ভব উচ্ছিন্ন অবতারণা করিলেন,—মায়িক জগতের মাধুর্য আমরা তাহা কেমন করিয়া বুঝিব ?

লীলা রসাত্মক বাউল সঙ্গীতগুলি একতারা, রস

মাধুরী ও খমক খঞ্জনী যোগে গীত হইয়া গঙ্গীত ময় নারীর প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিতে থাকে, মন প্রাণ উৎসাহ করিয়া তোলে । পূজ্যপার্দ শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদাঙ্কানুসরণ পূর্বক নিম্নে আমি কয়েকটি বাউল সঙ্গীত লিখিয়া দিতেছি ।

১। সরল ভাবে এক দিন গুরুর নাম নিলে না,—
কেন রে মন সরল হৈলে না ।

কয়বার আইলে, কয়বার গেলে, মন্থরে ।—

গুরুগ চরণ একবার ঠিক পেলেন না ॥

গেল সত্য, জেতা, ছাপর, ক’ল,

মন্থরে চাইব যুগে এক খান দিন পেলেন না ।

২। গোসাইজী কোন্ রঙে বেছেছ বর খানি,
মিছে কর ধাক্কা বাজী ।—(গোসাইজী কোন্ রঙে)

বালা না কাল গেল হাসিতে খেলিতে

যৌবন কাল গেল হেলে,—

বুছ না কাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে,

গুরু ভাবব কোন্ কালে । (গোসাইজী কোন্ রঙে)

দেহের মাঝারে ফুলের বাগিচা

ফুটিলে লুপ্ত কর,—লুপ্ত চাহিয়া ক’রও পিরীতি,

মৈলে যে জীয়াইতে পারে ॥ (গোসাইজী)

দস্ত পড়িল, চুল পাকিল, যৌবনে দুরাছে ভাটি,—

দিনে না দিনে খসিয়া পড়িছে রঞ্জীলা দলানের মাটি ।

(গোসাইজী)

৩। দয়াল গুরু আমায় গো :

কোন্ সময়ে কোন্ ভাবেতে কোন্ কথা বলে ।

দেহে আছে ছয়টি রিণু—ছয় জন ছয় পথে চলে ॥

বন্দাবনে আছে তিন রতি,—

কোন্ রতি সাধন করিলে, অস্তে হয় গতি,—

কোন্ রতি সাধন করিলে কোন্ রতি উজান চলে ॥

৪। আমার নাও যে গালে ডুবে না,—

আরে মাঝি খবরদার ।

মহাপ্রানের জিনিস ভরা রে,—

একটুক নিকাশ রাইখো তার ।

(আরে মাঝি খবরদার ।)

যন্ত্রলোতে কল ঘুরাইয়া আসে পাশে চাইও,—

আপ্না দেশের মানুষ পেইল্লেরে, —তারে মন খুলে দেবাইও

(যে,—আরে মাঝি)

৫। ধব্ ধব্ মন ঠিক করে ধর ।

ওল্লেরে,—চেতন গুরুর সঙ্গ কর ॥

চেতন গুরু, কল্পতরু চেতন থাক্তে স্বরণ কর,—

রাধার নামে বাদাম দিয়ে কিনারা ভিড়াইয়া ধর ।

কাম নদীতে তুফান ভারি দেখে আমার করে ডর,

গুরুর নামটি স্বরণ করে ঝট করে মন বৈঠা ধর ॥

৬। মিছা ধাক্কা বাজী ৫ সংসার, মন্বরে, ভরসা কর কার ?

ভেইবে দেখ মনে মনে তুমি বা কার ? কেবা তোমার ?

(মন্বরে ভরসা কর কার ?)

এই যে তোমার সাধের বাণী ঘর,—

পুত্র কন্যা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় নফর,

সব পড়ে রবে, দিন দুপুরে চক্ষে দেখবে অন্ধকার ॥

প্রাণান্ত কাল যখন হইবে,—

হরি হরি বলে সব বাহিরে নিবে,—

দেহ চিতায় তুল, আগুন জ্বাটলে

পুড়িয়া কর্কে অঙ্গার ॥ (মন্বরে ভরসা কর কার ?)

৭। দয়াল গুরু ভাসাইলা অকুল সাগরে ।

গুরু গো।—কেউরে দিলা ইন্দ্রপদ,—কেউরে কমল কলি ।

কেউরে দিলা রাজ সিংহাসন,—

কেউ নামের কাজ লী গো ॥

গুরু গো,—অকুল সমুদ্রের মাঝে

ছাড়িয়া দিলাম তার,—

গুরু নি হইবা আমার,—ভাঙ্গা নায়ের কাণ্ডারী গো ॥

৮। বড় আগ্নেয়গিরিকল্ গৌর চন্দের ঘরে,—

ঘরে গো সখি ।

প্রেমের ঘরে রসের তার, দেখতে লাগে চমৎকার,—

প্রেম কি মিলে গায়ের বল জোরে,—

যে ধটরাছে আসল তারে,

কর বাতাসে পায়না তারে,

অগৎ ব্রহ্মাণ্ড বেড়িয়া আছে,—তারে তারে তারে গো সখি ।

৯। মন তোর দ্বিদলে লুকায়ে বৈল করে ?

প্রেম ডোরে, বন্ধন করে,—তারে রূপের ঘরে নেব ।

চতুর্দল, ষড়দল, দ্বাদশ দশম দল,

দলের উপর দলে শোভা করে,—

উভা নালে ভাটা খেলে মৃণালের উপরে ।

১০। ধব্বেরে অধর, ধব্বে যদি মনের মানুষ,

আগে তোব পাটুনি ঠিক কর ।

ভাইরে ভাই,—দীক্ষানাই শিক্ষা নাই আগেই কল্লি বিয়া ।

বিনমুসারায় চাকর হৈল্লেরে,—চেবল গাঁইটের পয়সা
দিয়া রে ।

ভেল্লা কাঠের নৌকাশানি মাইক্ খানে তার ছঁইয়া ।

আগাপেকে পাছায় বাইতে রে ;

নায়ের গলই পড়ে থইয়া রে ॥

(আগে তোর পাটুনি ঠিক কর ।)

১১। দিন গেল, হরি বল, ওরে পাষণ মন ।

কর তাঁর নিরুপণ, হয়ে স্বচেতন,

তুমি না বুঝল আবার খুজ্ ধরে প্রেমের মহাজন ॥

(গৌর উজ্জল প্রেমেরে ।)

ও মন, মিথ খুইয়ে বুঝি বাঁকা, এলে একা যাবে একা,—

কার সঙ্গে বা হবে দেখা,

নিকাশে মিলবে যখন,—

তখন ঠেকবে ধোঁও বিপদে, হিসাব লবে পদে পদে,

গুরু চণে রাইখে হৃদে, করবে সাধা সাধন ।

নিভাই হাটের অধিকারী,

শুদ্ধ আদালত করি

ষোল আনা হিসাব কর, নিস্তিতে কার্কে ওজন—,

যে হবে ওজনে ৫মা, লাগবেরে চৌরাশি জমা,—

এবার কার খেপেতে সীমা না পাইবে যেই জন ॥

মন,—আসলে আসল রহিল,

নকল বিকায়েগেল,

ফইরা সব পইড়া বৈল,—

গোল মাগে ঠেকে এখন,—

যদি থাক রাগের ঘরে,—ছয় জনে কি কর্তে পারে,—

নিত্যানন্দের রূপা হৈলে মিস্বেরে অমুণ্য ধন ॥

১২। ঘর বানাইল কেমনে,—

এমন রঙ্গীলা ঘর কোন্ জনে ? ভাইরে ভাই,—

এক মারুইলে বাক্সা ঘর আট গোটা হুনি ।

দোক রোওয়ার চাল বাক্সিয়া চামেড়ার দিছে ছানি ॥

ভাইরে ভাই,—বিনা বাঁশে বিনা বেতে এই ঘরের বান্।

এক দিকেতে সূর্য্য ঘরের আরেক দিকে চান্।

হাঁওয়ার ভরে খাড়া।

এই হাঁওয়া ছুটিয়া গেলে

(ঘর) ভাঙা হৈব শুঁড়া ॥ ভাইরে ভাই,—

কাম করে কামেলা যেটা কামের ভানে সঙ্গি।

বানাইয়া রক্তে ঘর কামলা রৈল-বন্দী ॥

১৩। গৌর রূপ লাগিল নয়নে।

আমি কৃষ্ণে চাহিয়াছিলাম গো,—

গৌর চান্দের পানে ॥

কলসীতে নাইরে পানী,

আমি গিয়েছিলাম সুরধুনী গো,—

গৌর কেবা না জানি স্বপনে.—

একদিন জলের ঘাটে দেখে তাঁরে,—

মইরাছি পরাণে, গো সই ॥

গৌর থাকে রাজ পথে,

তোমরা কেউ যাইওনা জল আনিতে গো,—

দেখলে তাঁরে মরিবে পরাণে,—

শেষে আমার মত হবে তোরা,—গোপাল দাদে ভনে ॥

১৪। গোউর বরণ, রূপের কিরণ, লাগল নয়নে ॥

আমার গৌর অপরূপ,

কোটি মন্থ খরুপ,

নাগরী কখন চক্ষে হেরি না এরূপ,—

তাঁর বাঁকা নয়ন তেড়া কইরে,—

একদিন চাইয়াছিল আমার পানে।

(লাগল নয়নে।)

যদি গৌর কুল পাই,

আমার এই কুলের কাজ নাই,

নাগরী তিন কড়ার মূল কুলে দিলাম ছাই,—

আমি গোউর কুলে কুল মিশায়,—সদা মজেরব

তাঁর চরণে। (লাগল নয়নে।)

ভেবে জয় মঙ্গল কয়,—

আমার গউর রসময়, নাগরী,—রসেমাখা

তম্বু খানি ইয়,—

তাঁর রসে ঢুলু ঢুলু আখি,—

সদা পূর্ণ থাকে মদন বাণে ॥

১৫। গউর রূপ দেখিয়া হৈলাম পাগলিনী।

আমার প্রাণ লৈয়া লাগল টানাতানী

লো প্রাণ সজনী। (রূপ দেখিয়া হৈলাম পাগলিনী।)

যে দেখি গৌরাজ শোভা,

কোটি চন্দ্র জিনি আভা,

মেখে যেমন বল্কে সৌদামিনী,—

প্রাণ নাই সই গো,—

মেখে যেমন বল্কে সৌদামিনী,—

গোরা তেঁহা নয়নে চায়,—

প্রাণ হইরে, লয়ে যায়,—

আমার গেল নয়ন, না আইল

ফিরিয়া লো প্রাণ সজনী।

(রূপ দেখিয়া হৈলাম পাগলিনী।)

* * * * *

আমরা কুলের মুখে দিয়াছাই,—

চল্ গউরার সঙ্গে যাই.

বলে বলুক লোকে কলঙ্কিনী লো প্রাণ সজনী।

(রূপ দেখিয়া হৈলাম পাগলিনী।)

আর কত লিখিব? ময়মনসিংহের পল্লী কবিদের রচিত এই প্রকার কতকত সহস্র গীত আছে। আর

কত যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে.—তাহার সংখ্যা করে কে?

ময়মনসিংহের বিজ্ঞানসাহী রাজা জমীদারগণ কি

ধনবান্ ব্যক্তিরা আর্থিক সাহায্য করিলে,—এই সকল

গীত রত্ন সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে রাখা যাইতে পারে।

গ্রাম্য গীতি কবিতা শুলকে বাঙ্গালা সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট

করিবার জন্ত কেহ দয়া দৃষ্টি করিলেন কি?

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

একটি পরমা।

কেরানী গিরি করিয়া বাড়ী ফিরিতে ছিলাম।

লাল দীঘির সেই লাল দালানটার আমার

আপিস। সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৬টা পর্য্যন্ত গাধার

খাটুনি খাটিয়া বাড়ী ফিরি, ফিরিবার সময় পথ যেন আর

কুরায় না। দীর্ঘ পথের রেখা ধরিয়া, মোড়ের পর মোড়

কিরিয়া,—বৌবাজারের জনতা ঠেলিয়া, শিয়ালদহের মোড়ে গাড়ীর ভিড় এড়াইয়া—অনেক কষ্টে পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচাইয়া বাড়ী আসি। বাড়ী ফিরিবার সময় ক্ষুধার এবং ক্লান্তিতে চোখে শরিষা ফুল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না। এত বড় কলিকাতা সহস্রটা যেন একটা ধোঁয়ার আকার ধারণ করে। চারিদিকের উট কাঠ পাথরের নীরসতা, গাড়ীঘোড়া লোকজনের ছুটাছুটিতে মনে হয় যেন কোন এক দৈত্যপুরীতে ভূতের বেগাড় খাটিয়া চলিয়াছি।

এই প্রাণটাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্তইত আমাদের এত প্রয়াস! আমরা কেরানী, আমাদের একমাত্র কাল প্রাণটাকে কোনো প্রকারে বাঁচাইয়া রাখা, বঁচিয়া থাকা নহে। যতটুকু না হইলেই নয়, যে আলো ও যে বাতাস টুকু না হইলে চলে না, আমরা সেই অতিপ্রয়োজনীয়তার ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে দিনের পর দিন আহার, দিবা ও চাকুরী করিয়া চলিয়াছি।

নিত্য দিনের মত সেদিনও শান্ত ক্লান্ত হইয়া খেদসিক্ত কলেবরে বাড়ী ফিরিতে ছিলাম। মেঘমুক্ত আবার-সন্ধ্যার-আলোক প্রভা তখন স্নান হইয়া আসিয়াছে। গাস্‌লাইটগুলি একটি ছুটি করিয়া জলিয়া উঠিতেছে; বিশ্রাম ভবনের দিকে যাত্রাবের গতিধার চঞ্চলতর হইয়া উঠিয়াছে।—হারিসন্ রোডের মোড় ছাড়াইয়া, মির্জাপুর স্ট্রীট ছাড়াইয়া, আপার সার্কুলার রোডের ট্রাম ডিপো ছাড়াইয়া কেশব বাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিতেই দেখিলাম, একটি বৃদ্ধ প্রায় অন্ধ হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। আমার জুতার শব্দ শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল, “সারাদিন কিছু খাইনি বাবা, কিছু খেতে দে।” —চাহিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ মাটিতে যে মলিন নেকড়াটি বিছাইয়া রাখিয়াছে, তাহা একবারে শুষ্ক; —কোনো মাসের একটি পাই পরসার কুপাচিহ্নও তাহাতে নাই। অন্ধের ভাবটা দেখিয়া মনে হইল—সমস্ত দিন যেন সে কিছুই খায় নাই; আশা পূর্ণ অপেক্ষার সমস্ত দিন কাটিয়া এখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তাই তাহার মুখে নৈরাস্ত ও বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধের জন্ত কি জানি কেমন একটু কষ্ট হইল। হঠাৎ

মনে হইল, পকেটে একটি পরশা রহিয়াছে। কেরানী জীবনের ওঠের পাংশুতাকে তাহুল রাগ রঞ্জিত করিবার জন্ত পকেটে একটি পরশা ছিল। কে যেন বলিল, এই পরশা এই ভিখারীর প্রাণ্য, আমার মনও যেন তাহাতে সায় দিল; ভাবিলাম, অন্ধকে পরশাটি দিয়া আসি। কিন্তু সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে উঠি উঠি করিয়া যেমন খানিকটা সময় কাটিয়া যায় তেমনি একটা জড়তার মোহ আমাকে বেঁধেন করিয়া ধরিল, পকেটে হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া পরশাটি বাহির করিয়া আনিবার মত উত্তম যেন আমার ছিল না। বাহির করি করি করিয়া ভিখারীর কান্না ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িলাম।

কিছু দূর গিয়া মনে হইল, একজন অসহায় অন্ধকে তাহার জায়া প্রাণ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। একবার ভাবিলাম, ফিরিয়া গিয়া উহাকে পরশাটি দিয়া আসি কিন্তু শরীর ও মনের ভতরটা উত্তম তখন বর্তমান ছিল না, —বোধ হয় ততখানি মনুষ্যত্বও আমার ছিল না।

যেছোবাজারের মাথাটা ছাড়াইয়া যখন এদিককার ফুটপাথে উঠিয়াছি, তখন ঠিক হইয়া গিয়াছে যে অন্ধকে অন্ধকার মত আর পরশাটি দেওয়া হইল না। অমনি বিবেকের বৃষ্টিক দংশন আরম্ভ হইল। মনকে শাস্ত করিবার জন্ত কত কথা ভাবিলাম কিন্তু মন কিছুতেই শাস্ত হইল না।—একবার ভাবিলাম, এই কলিকাতার পথে আমরা চিরকালের পথিক, আমরা যদি দান করিতে আগ্রহ করি তাহা হইলে কেরানীগিরির বদলে লার্টিগিরি দিলেও আমাদের কুলাইবে না।—ইহার উত্তরে কে যেন বলিল, “মিথ্যা কথা; এই অন্ধকে এই পরশাটি দিলে তোমার ষোণে কি ছুন কম পড়িত? তাহা নয়, সত্য কথা এই যে কলিকাতার পথে চলিয়া তোমরা মনুষ্য হারাইয়াছ।” ভাবিলাম, তবেত দোষ এই কলিকাতার পথেরই! কিন্তু নিজেই তাহাতে সাস্থনা লাভ করিতে পারিলাম না। মনে হইল কলিকাতার পথের মত শিকার স্থান আর কোথায় আছে? মাস্তব নিজের দোষ পদের ঘাড়ে চাপাইতে এত ভালবাসে। কিন্তু মুক পথ ইহার ত কোনো উত্তর প্রদান করিল না। সেই মৌন সহিষ্ণুতার মত তাহার প্রসঙ্গ বন্ধ প্রণয়িত করিয়া

হাস্তের আলোকে সমুখের দিকে অন্তহীন রেখার চলিয়া গেল মাত্র। আমার মনে হইল সে যেন আমাকে ঠাট্টা করিল।

বাড়ী ফিরিলাম...বাড়ী বলিতে মানুষ যাহা বুকে আমার তাহা ছিল না। আমার বাড়ী আমার নিকট দুঃখহর, তৃপ্তিভরা শান্তিনিকেতন নহে। আমার বাড়ী গড় পাড়ার ক্ষুদ্র একটি ভাড়াটে কোঠা। তাহা এত ছোট যে মাথা রাখিবার স্থানটুকুও তাহাতে নাই। তবু তাহার ভাড়া পোষাইবার জন্য আমাকে একজন অংশীদার জুটাইতে হইয়াছিল। আমি ২০ টাকা দিলাম, অংশীদার ভদ্রলোকটি দিতেন ১৫ টাকা। সে বাড়ীতে মশা ছিল, মাছি ছিল, ছারপোকা ছিল, অন্ধকার ছিল,—ছিল না কেবল আলোক ও বাতাস।

বাড়ী ঢুকিতেই মেয়ে আমাকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল “বাবা!”—কি জানি কেন চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল, মনে হইল, তবে কেরানী জীবনের মরুভূমিতেও ওয়েসিস আছে! ...চার বছরের মেয়ে রানী যেন আমার হৃদপিণ্ডের একটা টুকরা। সে তাহার এমন রূপ ও এত বুদ্ধি লইয়া এই কেরানীর গৃহে কোন্ মায়া রচনা করিবার জন্য আসিয়াছে কে জানে?—রানীকে যখনই দেখি তখনই মনে হয়—ও একটা মায়া,—সংসার জীবনের দুঃখতার মাথা পাতিয়া লইবার জন্য ভগবানের একটি সুন্দর বড়যন্ত্র। ...রানীকে কখনও ভুলিতে পারি না; আপিসের কণ্ঠকুণ্ডলীর মধ্যেও তাহার মুখ, চোখ ও কণ্ঠস্বর থাকিয়া থাকিয়া যেন মনে পড়ে। যাহোক মানুষ কখনো ভুলিতে পারে না, তাহাকে পাইলে সে সব ভুলিয়া যায়। রানীর হাত ধরিয়া ঘরে আসিতে আসিতে আমি সব ভুলিয়া গেলাম।

বসিয়া বসিয়া জুতার ফিতা খুলিতেছিলাম, এমন সময় রানী বলিল, “বাবা, একটা পরস। দাও না, চিনে বাদাম খাব।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কোথায় চিনে বাদাম?” রানী বলিল, “ঐ ঘোঁড়াটা দিয়ে ডেকে যাচ্ছে।” আমি বলিলাম, “কই আমিও শুন্তে পেলুম না।” রানী জোর করিয়া বলিল, “হাঁ, ডেকে গিয়াছে, আমি শুন্তে পেলুম।” তাহাকে নিষেধ করিতে

পারিলাম না।কত পিতার নিকট চিনেবাদাম খাইবার জন্য একটি মাত্র পরস। চাহিতেছে, পিতা যদি তাহা দিতে না পারে তাহা হইলে পিতৃব্রতের মর্যাদা থাকে কোথায়? বড়লোক পিতার আত্মরে সন্তানগণ তাহাদের পিতার নিকট কত মূল্যবান জিনিষ চাহিয়া আশ্বাস করে। কেরানী-কত। বেশী কিছু চাহিল না, সে চাহিল চিনেবাদাম খাইবার জন্য একটি মাত্র পরস। কেরানী পিতা ধন-দরিদ্র হইলেও মেহ-দরিদ্র নয়; মেহজগতে ধনবান পিতা দরিদ্র পিতার অপেক্ষা অধিক ধনী নহেন। আমার কন্ডার একপরসার আবদার যদি আমি রক্ষণ করিতে না পারি তাহা হইলে মনকে প্রবোধ দিব কি বলিয়া? •

রানীকে বলিলাম, “জামার পকেটে পরস। আছে, নিয়ে যা।”—কিন্তু পকেটেই ঐ একটি পরস। ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। একটীর বেশী পরস। পকেটে রাখিতাম না, কি জানি ক্লান্ত শরীরটাকে যদি কোনো দিন ইচ্ছার বিরুদ্ধে ট্রামগাড়ীতে টানিয়া তুলি, তাই নিঃসম্বল হইয়া পথ চলিতাম। ...পান আমার অভ্যস্ত প্রিয়; এত প্রিয় যে গিন্নী আমাকে পান দিয়া বলিতেন, ‘নেও তোমার প্রাণ।’ আমিও অমনি জিজ্ঞাসা করিতাম, “কোথায় ছিল?” ইহার উত্তরে তিনি মুখ ফিরাইয়া একটুখানি হাসিয়া গর্বভরে চলিয়া যাইতেন। ...সুতরাং পান খাওয়ার জন্য সর্বদাই পকেটে একটি পরস। থাকিত।

রানী পরস। লইয়া চলিয়া গেল, তাহাকে নিষেধ করিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে কেমন একটা অসোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলাম, মন কেবলি বলিতে লাগিল, “ও কি করিলে? অন্ধের পরস। কতাকে দিয়া ফেলিলে? অকল্যাণ হইবে যে।” বুকটা সহসা ছাঁৎ করিয়া উঠিল কিন্তু বুদ্ধি প্রহরী বলিয়া উঠিল, “পরসার মধ্যে কি নাম লেখা থাকে? একটা পরস। দিলেই হইল।—তবু একটা কুপংকার,—মনের মধ্যে একটা খুঁৎ খুঁৎ,—একটা নিঃশব্দ নিশ্চিন্ততার স্বভাব!।

গৃহিণী গৃহমধ্যে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাইয়া বলিলেন “হাতমুখ ধুয়ে একটু জল খাও, অমন করে বসে কি

তাবছ ?”—“কিছু না” বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আমি উঠিয়া গেলাম, গৃহিণী গৃহকার্য্যে গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

অলবোপ শেব করিয়া ক্লান্ত দেহ বধন শয্যার উপর ঢালিয়া দিয়াছি, রাণী তখনও গৃহপ্রান্তে বসিয়া আপন মনে চিনেবাদাম খাইতেছে। সহসা গৃহিণী আসিয়া কতকগুলি চিঠি দিয়া পুনরায় বন্ধন কার্য্যে চলিয়া গেলেন। ...চিঠিগুলি পড়িলাম; চিন্তাচিন্তায় যেন যুতাহতি পড়িল। মনে পড়িল বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতা, মাতা, বিবাহযোগ্য ভগ্নী, শিক্ষাপ্রার্থী ভ্রাতা—সকলেই এই তিন কুড়ি টাকার দিকে তৃষ্ণার্ত চাতকের মত চাহিয়া আছে। একটা সংসারের ভার আমার এই দুর্বল স্বপ্নের উপর, সে গুরুভার যদি আমি বহন করিতে না পারি, তবে সে দোষ কি আমার?—নিজেকে প্রবোধ দিতে পারি বটে কিন্তু সান্ত্বনা ত দিতে পারি না। আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় যাহারা তাহাদের মন মুখ যে সঙ্গীদাই আমাকে কল্পনা করিতে হয়। মাসে ১৫ টাকার বেশী সাহায্য করিতে পারি না, সেই টাকা দিয়া মা কত কষ্টে সংসার চালায়। বাবাত হরিনামের কোলা লইয়াই ব্যস্ত, এদিকে অর্থের কোলা যে শূন্য, সেদিকে তাঁহার নজর নাই। মা বাবাকে ভাবিতে দেন না, তিনি রমণী হইয়া বেচ্ছায় সংসারের সমস্ত দৃষ্টিস্তর ভার মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। মা লিখিয়াছেন, “এত দৃষ্টিস্তর বোকা বহন করিয়াও তোমাকে চিন্তামুক্ত করিতে পারিলাম না। তুমিই এখন সংসারের কর্ত্তা সুতরাং আমি না লিখিলেও আপনা হইতে তোমার মনে নানা চিন্তার উদয় হয়। সংসারের অবস্থা তোমাকে লিখি না জানাইলে আর কাহাকেইবা জানাইব? বিমলা যথেষ্ট বড় হইয়াছে; চিন্তায় আমার রাত্রে ঘুম হয় না। কি যে করিব বুঝিতে পারিতেছি না। ঈশ্বরের কি ইচ্ছা জানি না” ইত্যাদি। শুইয়া শুইয়া মাতার চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানি কল্পনা করিতেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি মুখ আসিয়া সেখানে দেখা দিল; সে মুখ আমার বোন বিমলার। বিমলা বড় হইয়াছে, এখন সে সব বুঝে। তাহার জন্ত যে আমাদের কত দৃষ্টিস্তর তাহা সে বুঝিতে

পারিয়া লজ্জায় মুগ্ধমাণ হইয়া থাকে। তাহার ভাব দেখিলে মনে হয় সে যেন কতই অপরাধী; নিজেকে সর্বদা সন্তুচিত রাখিয়াও সে সঙ্কোচমুক্ত হইতে পারে না। অথচ তাহার অপরাধ, সে বাংলা দেশে কত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রাকৃতিক নিয়মে স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বিমলার কথা মনে পড়িয়া মনটা ধরাপ হইয়া গিয়াছিল, এমন সময় রাণী আসিয়া বলিল, “বাবা চিনে বাদাম খাবে?” আমি বলিলাম, “না”। রাণী বলিল, “কেন খাবে না? খাওনা।”

ধমক দিয়া বলিলাম, “আঃ বিরক্ত করিস্ না—বা, আমি খাব না।” রাণী মুখ ভার করিয়া বলিল, “আচ্ছা না খেলে।” এই বলিয়া চিনেবাদামের খোসা ভাল করিয়া না ছাড়াইয়াই সে উহা খাইতে লাগিল। আমি বলিলাম “করিস্ কি?” সে বলিল, “কেন, তুমি খাবে না বলেছ, তাই আমি খাচ্ছি।” আমি বলিলাম, “খোসা শুদ্ধ খাচ্ছিস্ বে!” সে গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, “আমি অমন করেই খাই।” সবগুলি চিনে বাদাম সে এই ভাবে খাইয়াছে জানিয়া কিঞ্চৎ চিন্তিত হইলাম ও তাহাকে তিরস্কার করিলাম। রাণী দুঃখিত হইয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল; তাহার সেই দুঃখ ভার দূর করিবার জন্ত এবং আমার নিজের ভারাক্রান্ত মনটাকে লঘু করার জন্ত রাণীর সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিলাম। রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “রাণী তোর বিয়ে হবে?” সে বলিল “হবে।”

আমি “ক'র সঙ্গে?”

রাণী “কেন, ঠাকুর্দার সঙ্গে।” তাহার পিতামহের সঙ্গে তাহার বিবাহ যেন ঠিকই হইয়া গিয়াছিল, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাটা সে বাহুল্য মনে করিত।

আমি “আচ্ছা বিয়ে হ'লে তুই কি করবি?”

রাণী, কেন “ভাত রাঁধিব ঠাকুর্দাকে খাওয়াব।”

বিবাহ হইলে ভাত রাঁধিয়া স্বামীকে খাওয়াতে হয়, রাণী তাহা জানিত।

আমি—“আর কি করবি?”

রাণী “আর কিছু করব না।”

কিছুক্ষণ পর রাণী সহসা বলিয়া উঠিল, “না ঠাকুর্দাকে

আমি বিয়ে করব না।" উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কেনরে?" রাণী বলিল "ঠাকুরদা চাকুরী করে না, আপিসে যায় না, কেবল মালাজপ করে।" আমি বলিলাম "তাতে কি?" সে বলিল, "চাকুরী না করলে টাকা পাবে কোথায়?" আমি বলিলাম, "তাইত তোর এত বুড়ি।" মনে মনে বলিলাম, বাঙালীর মেয়ের উপযুক্ত বুড়িই বটে। এমন সময় রাণীর মা খাইতে ডাকিলেন, রাণীকে সঙ্গে করিয়া খাইতে গেলাম।

* * * *

বর্ষা রত্নীর অন্ধকারে সুর যোজন। করিয়া গভীর রজনীতে অশ্রান্ত ধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। বর্ষারত্নীর এই ঘুমপাড়ানী গানে সমস্ত নগরী তখন সুখ নিদ্রায় বিভোর। এমন সময় গৃহিণীর ত্রাসার্ত্ত কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া উঠিলাম এবং তুলিলাম রাণীর ভেদবমি আরম্ভ হইয়াছে। ঠিক সেই সময় বিজলী চমকিয়া অদূরে একটা বজ্রপাত হইল, মনে হইল উহা আমার মাথায় পড়িলে বেশ হইত।

গৃহিণীর কাতরতা দেখিয়া রাণী অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল, তাই গৃহিণীকে তৎসনা করিলাম। কিন্তু তৎপর মুহূর্ত্তেই তাঁহার বেদনা ক্রিষ্ট বদন দেখিয়া আশ্রয় প্রাপ্তিতে হৃদয় ভরিয়া গেল।

এত রাত্রিতে, এমন দুর্ঘোষণে ডাক্তার ডাকা সম্ভব নয় সুতরাং ঘরে হোমিওপ্যাথির যে বাস ছিল তাহা হইতে একটা ওষুধ বাহির করিয়া রাণীকে খাওয়াইয়া দিলাম এবং বসিয়া বসিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। বাহিরে তখন ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, আমার মনে হইতেছিল, এই তন্দ্রানিবিড় রজনীতে যেন একটা হৃৎস্পন্দ দেখিতেছি।

ভোর হইতে না হইতেই কলেরার সমস্ত লক্ষণ দেখা দিল। ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন কিন্তু অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া চলিল। সমস্ত দিন রোগীর শুশ্রূষা করিলাম; আপিসে না গিয়া কতকটা মিয়া ব্যস্ত রহিলাম কিন্তু একটা কথা সমস্ত দিনই মনের মধ্যে জাগ্রত ছিল—অন্ধের সেই পরস। আর সেই চিনে বাধাম।

ডাক্তার বলিলেন, চিনে বাধামই এই রোগের মূখ্য কারণ কিন্তু আমার মন বলিয়াছে, অন্ধের সেই পরসাই মূখ্য কারণ, চিনে বাধাম গৌণ কারণ মাত্র।

কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি পাইতে হইলে বতখানি মনের বল প্রয়োজন সাধারণ মানুষের তাহা নাই। মানুষ দুই পাতা পড়িয়াই মনে করে সে সমস্ত অন্ধ কুসংস্কার কাটাইয়া উঠিয়াছে কিন্তু বাস্তব জীবনের পরীক্ষায় পড়িলেই বুঝতে পারে যে তাহার। যে ভিত্তিতে ছিল, সেই ভিত্তিতেই রহিয়া গিয়াছে।

সমস্ত দিন মনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিয়াও মনকে শান্ত করিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে তখন চুপি চুপি বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। উর্দ্ধ্বাধানে ছুটিয়া সেই অন্ধের নিকট গেলাম এবং তাহাকে একটি পরস। দিয়া চলিয়া আসিলাম, বুক হইতে যেন একটা বোকা নামিয়া গেল।

রাত্রে রাণীর খেচনী আরম্ভ হইল। রোগ উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সমস্ত রাত্রি চুপ্চুপ্ত বোকা লইয়া রোগীর শিয়রে বসিয়া রহিলাম। সে যে কী কালরাত্রি তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেহ বুঝিবে না।

ভোর বেলা আবার ডাক্তার আসিলেন, রোগীর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, আশা নাই এমন কথা এখনো বলা যায় না, তবে একটা চোখ সম্বন্ধে একটু সম্ভেদ হইতেছে। তখন মনে হইয়াছিল, একটা চোখ গিয়াও যদি আমার রাণী বাঁচে, তাহা হইলেই জীবনকে সহ্য করিব।

সেদিন রবিবার। সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, তবু রোগীর কোনো ভাল লক্ষণ দেখা গেল না। তাবিলাম, এ কি হইল? অন্ধকেও তার পরস। দিয়া আসিয়াছি, তবে রাণী ভাল হইতেছে না কেন? মনে হইল সবই কুসংস্কার। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই কে যেন বলিয়া উঠিল, "সে পরস।ত মেয়েকে চিনে বাধাম খাওয়ার জন্ত দিয়াছিল!"

আবার সন্ধ্যা হইয়া আসিল, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি

পড়িতেছিল। আবার আমি চুপি চুপি বাড়ী হইতে বাহির হইলাম, বীরে বীরে সেই অন্ধের নিকট গেলাম, গিয়া দেখি সে দৈর্য্যগ বঁধিয়া বলিয়া বুড়িতে ভিজিতেছে, আশা এই—বদি আরো ২।৩ টা পরসা কেহ দেয়। এমন আশার মূর্তি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। প্রত্যেকটি মুহূর্ত তাহার নিকট আশার আলোকে উজ্জ্বল, নতুবা কি সে দিনের পরদিন এমন ভাবে রাত্তার ধারে বলিয়া থাকিতে পরিত ? এই অশ্রান্ত আশার মূলে ছিল—মাহুকের করুণার উপর তাহার অদৃঢ় বিশ্বাস, মাহুকের মহুস্তরের উপর তাহার অটল আস্থা। আর মাহুকের কত বড় বিশ্বাস যাতক আমিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমি অন্ধের নিকট গিয়া বলিলাম, “আর বুড়িতে বসে ভিক্ষা কেন ? রাত হরে গেছে, এখন কি আর ভিক্ষা মিলাবে ?” বৃদ্ধ মুখ তুলিয়া আর্দ্রস্বরে বলিল, “তুমি কেপো বাবা, আমি সারা দিন কিছু খাইনি বাবা।” বুকটা হাঁপ করিয়া উঠিল ; হস্ত কতজন আমার মতই অবহেলা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাই বেচারী সমস্ত দিন উপবাসী। আমি বলিলাম, “এই নাও, এদিয়ে কিছু খেয়ে বাড়ী যাও।” বৃদ্ধ বলিল “বাবা, এ যে টাকা। ভুল করেছ বুঝি ?” আমি বলিলাম “না ভুল করিনি, ইচ্ছা করেই দিয়েছি।” বৃদ্ধ—“কেন বাবু, টাকা দিচ্ছ কেন ?”

সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া বলিলাম—“আমার অপরাধের দণ্ড দিতে এসেছি, তুমি যদি গ্রহণ না কর, তা হলে আমার মেরে বাচবে না।” ইহার উত্তরে অন্ধ বাবা বলিল তাহার অর্থ এই যে তাহার কখনো কাহাকে অভিসম্পাত করে না, তাহাদের অন্তর হইতে সমস্ত নিখিলে এক নিরবচ্ছিন্ন আশীর্বাদ মিরস্তর বহিয়া চলিয়াছে, তাহাতে সকলেরই মঙ্গল হয়, কাহারও অকল্যাণ হয় না। অমনেবে বলিল, “বাবু, আল্লা তোমার মেরেকে ভাল করবেন।” তারপর টাকাটি কিরাইয়া দিয়া সে আমাকে বলিল, “বাবু টাকা নিয়ে আমি কি করব ? আমাকে দুটি পঁয়সারীও কিছু কিনে খাই”। অন্ধকে সঙ্গে করিয়া একটি মাঝারি মোকানে গেলাম এবং তাহাকে ভোজন করাইয়াছি। সে যে কি ভক্তি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা

যায় না। তারপর তাহাকে প্রচুর দক্ষিণা দিয়া বিদায় হইলাম, মনে কেমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, রাণী এ ব্যক্তা বাঁচিয়া উঠিবে। সে রাত্রে রাণীর অবস্থা উন্নতি লাভ করিল। আমার ভিতরকার সেই অনবরুদ্ধ বাণী বলিয়া উঠিল ‘কেমন ?’

রাণী সারিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার একটি চোখ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বড় কাটিয়া গেল। আবার তেমনি ভাবে কেরানী গিরি করিতে লাগিলাম। সেই অন্ধের সমুখ দিয়া প্রত্যহ আপিসে যাতায়াত করি, সে আমাকে দেখিলেই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করে, তাহার একটি চোখ ভাল হইয়া গিয়াছে।

শ্রী অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ।

আলফোঁস দোদে।

সাহিত্য-সাধনার জীবন অতিবাহিত করিলেন তা বিয়া দোদে প্রথম যখন প্যারীতে আসিলেন তখন তাহার বয়স সত্তর মাত্র। আত্মশাস্ত্রের উপর অটুট বিশ্বাস এবং যৌবন-মূলত উৎসাহ ছাড়া তাঁহার নিজস্ব কিছুই ছিল না। তিনি ডাক্তার জন স্নেনের চেয়েও দরিদ্র ছিলেন। প্যারীতে আসিয়া দোদেলেন, তাঁহার হাতে একটাও পরসা নাই ; শুধু পকেটে আছে কয়েকটি কবিতা। সৌভাগ্য ক্রমে কবিতাগুলি তখন কার করানীরাজীর ভাল লাগিয়াছিল ; অল্পদিনের মধ্যেই দোদে Duc de Morny-র সেক্রেটারীর পদে বহাল হইলেন।

নব্য নিযুক্ত সেত্রেটারীর বিশেষ কোন কাজ ছিলনা ; অধিকন্তু দেশভ্রমণে এবং লেখনী চালনার দোদে যথেষ্টই অবসর পাইতেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্যারীর বিখ্যাত পত্র “The Figaro”তে তাঁহার কতকগুলি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম একাক্ষ নাটিকা “La Dernière Idille” অভিনয় স্বরম্ভে অভিনীত হয়। ইহার পরে তিনি আরও কয়েকখানা নাটক লিখিয়াছিলেন ; সেগুলি দর্শক-

গণের সম্বন্ধেই আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই। তিনিও আর “প্রাণ্ডলর্ডো ফলে যথা উদ্ধারিব বামনঃ” হন নাই।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই দোদে মনিবের কাজে ইস্তাফা দিয়া সাহিত্যের কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। ইতি মধ্যেই নানা পত্রে ছোটগল্প লিখিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন। ক্রমে তিনি বড় আয়তনের উপন্যাসও লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ের লেখা দুইখনি পুস্তক সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে :—“Letters de Mon moulin” এবং “Fartarin de Tarascon.” প্রকৃতির প্রতি একটা আন্তরিক টান এবং ফরাসী সুলভ ব্যঙ্গপটুতা ও লঘুবিজ্ঞপ্ত পুস্তক দুইখানাকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে।

কিন্তু দোদের যথার্থ পরিচয় আমরা সর্ব প্রথম পাই “Le Patit Chose” নামক উপন্যাসে। বাস্তব জীবন অঙ্কনের প্রয়াস এই উপন্যাসেই সূচিত হয়। কিন্তু দোদের কল্পনাদেবী তখনও সম্পূর্ণভাবে কাব্য-কুজ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর শক্ত মাটি আঁকড়াইয়া ধরিতে শিখে নাই। “La Petit Chose”—এ—বাস্তব চিত্রের সমাবেশ থাকিলেও ইহারও ভিত্তি যে একটা কল্পনা-প্রধান আদর্শের উপর স্থাপিত, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। সে যাহা হউক, বইখানির প্রধান দোষের কথা এই যে ফরাসী লেখকের স্তম্ভাব সুলভ কথা-কুশলতা এবং রচনা নৈপুণ্য দোদে ইহাতে দেখাইতে পারেন নাই। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত “Jack” সম্বন্ধেও এই কথা কতক পরিমাণে খাটে। কিন্তু “Jack” লিখিয়াই দোদে ফরাসী সাহিত্যে প্রথমশ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়েন।

“Fromont jeune et Risler aine,” “Jack” এর পরেই লিখিত হয়। অনেকে ইহাকে দোদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া—মানে করেন। এই উপন্যাসে তখনকার প্যারীর মধ্যবিত্ত সমাজের একটা জলন্ত ছবি আমরা দেখিতে পাই। কঠিন নিষ্ঠুর বাস্তবতা, সত্যের নগ্নবৃত্তি এবং পাপ ও পুণ্যের বৈষম্য ও বিরুদ্ধতা চক্ষুর সম্মুখে ছবির মতন সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠে।

গল্পের ঘটনা কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে বিশেষ নতুন

নহে। কিন্তু ঘটনার ব্যাপ্তি প্রতিঘাত এবং চরিত্রের বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ অভিনব। শুধু নায়ক নহে, উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র পাঠকের মনে এক একটা গভীর চিহ্ন রাখিয়া যায়। গো বেচারী ভাল মানুষ, দ্বীপ প্রতি অগাধ বিশ্বাস পরায়ণ, কোমল প্রকৃতি স্বামী Risler; রূপগর্ভোন্মত্তা হৃদয়হীনা হুঃশীলা স্ত্রী—Sidonie; আমোদপ্রিয় রসিক, উচ্ছৃঙ্খল George। সে বুদ্ধি বিবেচনার ধার ধারে না—“ভাবনা সাধনা বেদনা বিহীন!” বন্ধুপত্নী Sedonie কে George ভালবাসিয়াছে এবং ভালবাসার প্রতিদানও পাইয়াছে। বেচারী Risler এর মনে সন্দেহের ছায়াও নাই। Georgeএর সংচরিত্তে বিশ্বাস করিয়াই—Risler বন্ধুকে তাহার ব্যাকের সন্নিক্ত করিয়া লইয়াছিল। কালক্রমে Sidonieর বিলাসিতার বস্তার ব্যাক ভাসিয়া গেল, হুইবন্ধু তখন সর্বনাশের মুখে।

অপ্রধান চরিত্রগুলি ততটা ভাল ফুটে নাই। অনেকটা টিকিট মারা পুতুলের মত—হয় ইংরেজি ধরণে হাসে, নয় ফরাসী ধরণে কাশে! এইজন্য অনেকে ডিকেন্সের সহিত দোদের তুলনার সমালোচনা করিয়া থাকেন।

খুব সম্ভব দোদে ডিকেন্সের উপন্যাস মনোমোপের সহিত পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে উভয়ের মধ্যে মিলের অপেক্ষা গড়-মিলের প্রাধান্যই বেশী। ডিকেন্সের মানবপ্রীতি প্রবল ছিল। তাহার রক্ত-ভামাসা, ব্যাককোটকের মধ্যে হস্ত-রসের পরিমাণ অধিক ছিল। কিন্তু দোদের বেলায় “হিতং মনোহারীচ দুর্লভং বচঃ!” রাখিয়া ঢাকিয়া তিনি কিছু বলিতে জানিতেন না; যাহা বলিতেন—কানের ভিতর দিয়া নিশ্চয়ই মরমে পশিত; কিন্তু মর্ষ কশাঘাতে রক্তাক্ত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। মিছরীর ছুরি নয়, তাহার হাতে খেলিত বক্বক ইম্পাতের শাসিত তরবারি! মানুষের প্রতি তাহার যেন বরাবরের একটী হীন অবজার ভাব ছিল। পাপের ক্ষয় এবং পুণ্যের পরাজয়ই যেন তিনি দেখাইতে ভালবাসিতেন।

এই সব দোষ “Le Nabab” উপন্যাসে আরও বেশী

পরিমাণে হুটহর। তা ছাড়া আরও একটা মৃতন উপ-
নামের হুট হর এই উপজাতিঃ—ব্যক্তিগত মিন্দা।
“Le Nabab” এ পারীর বড় বড় কাউন্ট ডিউকের চিত্র
বোম্ব দশাবধি—অঁকত করা হইয়াছে, এবং চরিত্রগুলির
বাহ্যাবরণ এত পাতলা যে অতি অনারাসেই পাঠক
বুঝিতে পারে—লেখক কাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন।
কিন্তু—এরূপ ভাবিলে ভুল করা হইবে যে “Le Nabab”
বুঝি “বান্ধে তাই” বই। বাস্তবিক তা নয়। ইহার
অংশ বিশেষে দোদের মানব চরিত্র অভিজ্ঞতা, স্থল পর্য্য-
বেক্ষণ শক্তি এবং লিপি-কলা চমৎকার ফুটিয়াছে। কিন্তু
ব্যক্তিগত আক্রমণটাই উপজাতি ধানার পক্ষে সাংঘাতিক
হইয়া উঠিয়াছে। “Les Rois en Exil” নামক
উপজাতিও এই দোষ ভুল্য পরিমাণে বর্তমান।

কলকারখানার কুলি মজুরের জীবন চরিত্র অঙ্কনে
দোদে অগ্রগণ্য এবং সিদ্ধ হস্ত। তাঁহার হাতে পড়িয়া
ইহার স্বর্ণের দেবতাও হয় নাই, নরকের কীটও হয়
নাই। বস্তাব চরিত্রে যেমন ঠিক তেমনি রহিয়াছে।
ইহার অক্ষরের ফাঁদে পড়িয়াও রক্তমাংসে পড়া তাজা
কলকারখানার মানুষই বটে। সত্যকথা বলিতে দোদে
কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। কাজেই তাঁহার উপজাতি
সত্যের এরূপ অনেক কঠোর নৃতি বাহির হইয়া পড়ি-
য়াছে, বাহা সচরাচর ইংরেজী সাহিত্যে, এমন কি ফরাসী
সাহিত্যেও বড় একটা দেখা যায় না।

কিন্তু তাই বলিয়া কেহ বেন মনে না করেন,
বাস্তবচিত্র অঙ্কনে দোদে বুঝি Zola র দ্বিতীয় সংস্করণ।
জোঁলার রুচি অস্বস্ত,—তাঁহার উপজাতির আখ্যান বস্তুও
অস্বস্ত। চিত্রাঙ্কনে অবশ্য তিনি যেকোনো প্রথম শ্রেণীর
উপজাতি লেখকের সমকক্ষ। এই কথাও সত্য যে
আমাদের বিভাপতি অথবা ভাঁরতচন্দ্রের অবস্থা বিশেষের
বিশদ বর্ণনা জোঁলাতেও নাই। কিন্তু বস্তবাদী—
কুর্বেয়ারের মিত্র—দোদে ক্ষুধার সীমা কখনও উল্লঙ্ঘন
করেন নাই। অস্বস্ত রুচিবাদীশেরা যদি বলেন যে
অবৈধ প্রণয়ের চিত্র লোক সমক্ষে তুলিয়া ধরা ক্ষুধার
পরিচায়ক অথবা দণ্ডার্থ,—তবে আমরা মাতার। কিন্তু
যদি রাধা উচিত, এই দোষ ধরিলে প্রথমশ্রেণীর অনেক

উপজাতিই বাতিল হইয়া যাইবে। এই কথা অবীকার
করিবার কোনই অঙ্গুষ্ঠান নাই যে আধুনিক শ্রেষ্ঠ
উপজাতিগুলি— ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, রুশ, ইটালী,
বাহাই হউক না কেন—অবৈধ প্রণয়ের ভিত্তির উপরেই—
গড়িয়া উঠিয়াছে। দোদেও তাহাই—করিয়াছেন।
একত অমরা আধুনিক হিসাবে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত
করিতে পারি না।

শ্রীজগদীশরঞ্জন ঘোষ।

কোমর-ভাঙ্গা কুকুর।

(১)

ভয়কটি পাখের কুকুর,
পদাঘাত পেতেছে গুরু।

চোখে অশ্রুরেখা আঁকা, কত দুখ প্রাণে ঢাকা,
মানবেরা এত কি মিষ্টর!
ভূতহিতে এতই আতুর!

(২)

খায় নাই কেড়ে কারো ভাত,
তবু চাহে করিতে নিপাত।

দূর করে দিলে তারে, আসে করে বারে বারে,
তবে কেন ইচ্ছা প্রাণপাত!
ওরে পাপী, অধম নিবাদ!

(৩)

শ্রেষ্ঠ জীব মানব ধাতার,
তার করে এত অত্যাচার।

হুই মুঠো ভাত দিলে, বেঁচে থাকে এ নিখিলে,
ধান করে ফুরায় গোলায়?
তবে কেন হেন ব্যবহার!

(৪)

অতীতের পুণালোক, হার,
আসিবে কি আবার ধার।

“সর্ব ভূতে মারামণ, সেবা কর আত্মবন,”—
বিবেকের বাণী কি হেথার,
মশ্ব হতে শূণ্য উড়ে যায়?

(৫)

তা না হ'লে কে করে এমন!

নাশে রূপা পণ্ডর জীবন!

এয়া নাকি—হা দীঘর—, মাতৃবের বংশধর!—

চতুপদ পণ্ডর মতন,

দ্বিপদেরা ঘোরে অগণন!

(৬)

হারি মানে চড়ুই কুকুর,

মনে ভাবে কত বাহাদুর!

শত শত অপদার্ক, নিয়ত পূজিছে স্বার্থ,

লালসায় প্রাণ ভরপুর;

তাদেবো কি জীবন মধুর?

(৭)

দুঃখ দূর কর, ভগবান!

পাঠাও সংযমী দয়াবান!

চাহিনা মোটর গাড়ী, প্রকাণ্ড দোতারা বাড়ী,

টাকা কড়ি বিলাসের দান;

মানুষ পাঠাও, ভগবান!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সঙ্কলন ও সংগ্রহ।

কোকিল শাবকের কর্ম।

আমাদের দেশে একটি প্রবাদ চলিত আছে যে কাকের বাসায় কোকিলের ছানার জন্ম হইয়া থাকে, বস্তুতঃ কখন ২ কাকের বাসাতে ও কোকিলের ছানা দেখা যায়। আমাদের দেশে কেহ ইহর বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন কিনা জানিনা, এসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন কেবল তাহারই একটু আভাস দিব। সুবিখ্যাত জেনার সাহেব বলেন যে, কোকিল অনেক পাখীর বাসাতেই ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ইউরোপে ইহারা অধিক সময়েই চড়ুই জাতীয় একরূপ ছোট পাখীর বাসাতে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, ডিম্ব হইতে বাহির হইয়া ২১ দিবসের মধ্যেই কোকিল শাবক এক অদ্ভুত কার্য্যে ব্যাপ্ত হয়। ইহা “যোগ্যতমই জীবিত থাকিবার” নীতির আংশিক ফল মাত্র। জন্ম-বার ২১ দিবস পরেই যে পাখীর বাসায় কোকিল শাবক

জন্মে তাহাতে অল্প যে ছোট ছোট শাবক কিম্বা ডিম্ব থাকে তাহা সে ফেলিয়া দেয়। চক্ষু না ফোটার দরূপ তাহার এই কার্য্যে কোনই অসুবিধা হয় না। পালকহীন ডানা দ্বারা তোকায় তোকায় ডিম্ব কিম্বা ছানা তালাস করিয়া বাহির করিয়া লয়; তৎপর ডিম্ব অথবা ছানা যাহা থাকে, তাহা একটি ২ করিয়া পৃষ্ঠে উঠাইয়া পিছনের দিকে চলিতে থাকে। অবশেষে বাসার কিনারাতে পহুছিলে একটি ঝাঁকী দিয়া তাহাকে নীচে ফেলিয়া দেয়। তথায় একটু সময় থাকিয়া পক্ষ সঞ্চালন দ্বারা যখন স্থির বৃত্তে পারে যে তাহার বোকাটি ঠিক পড়িয়া গিয়াছে তখন একলক্ষ বাসার মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে একটি একটা করিয়া সব কয়টা ফেলিয়া দিয়া নিজে সমস্ত বাসাটি অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে এবং মাতা পাখীর দ্বারা অনীত আহার একাই গ্রহণ করে এবং একাই তাহার সমস্ত যত্ন পাইয়া থাকে। ঐসময়ে অপর পাখীর ডিম্বও ঐ বাসাতে রাখিয়া দিলে তাহাও সে পূর্বরূপে উপরে ফেলিয়া দেয়। পাখীর ক্ষুদ্র ২ ছানা শুলিকেও ঐরূপে ফেলিয়া দিতে কষ্ট করেনা। ছানা কিম্বা ডিম্ব লইয়া উঠিবার সময়ে কখন ২ তাহার বোকাটি পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যায়। তখন সে একটু বিশ্রাম করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে বহুক্ষেণে বাসার সব কয়টা ছানা ও ডিম্ব ফেলিয়া না দেয় ততক্ষণ বিরাম নাই, পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতে থাকে। কোকিলের শাবকের ১০১২ দিন হওয়া পর্য্যন্ত তাহার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না। ছোট সময়ে কোকিল শাবকের পৃষ্ঠ অনেকটা চওড়া ও একটু হুজ থাকে, তাহাতেই ডিম্ব কিম্বা শাবক বসাইয়া লইতে সুবিধা হয়। ১০১২ দিন অতীত হইলে তাহার এই হুজ ভাব আর থাকে না। কোকিল শাবক যে অপর পাখীর ছানা ফেলিয়াই তৃপ্ত হয় তাহা নহে। এক সময়ে একটি বাসাতে দুইটি কোকিল ছানা ও ঐ পাখীর একটি ডিম্ব ও একটি ছানা ছিল, প্রথমতঃ দুই কোকিল শাবকের মধ্যে তুমুল লড়াই আরম্ভ হইল। উভয়ে উভয়কে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একটি আর একটিকে পৃষ্ঠে তুলিয়া ফেলিবার প্রায় উপক্রম করিলে বোকার ভায়ে নীচে পড়িয়া যাইতে

লাগিল, তখন অপরটি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পূর্বোক্ত ভাবে পূর্বে ফেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপে বহু সংগ্রামের পরে বলবানটি জয়লাভ করিল, সে কোকিল শাবকটি সহ অপর শাবকটি ও ডিহাটি ফেলিয়া দিয়া বাণী অবসর করিয়া লইল। এবং বিমাতা দ্বারা প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

জীবজন্তুর পরমাণু।

প্রাণী জগতে তিমি মৎস্য সর্পাকো দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকে। ইহারা ১০০০ হাজার বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। হস্তী, ভাল অবস্থাতে থাকিতে পারিলে, ৪০০ চারিশত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে। বিড়াল সাধারণতঃ ১৫ পনের বৎসর জীবিত থাকে। সাধারণতঃ কাঠি বিড়াল ৭৮ বৎসর, খরগোশ ৭ বৎসর, ভল্লুক ২০ বিংশবৎসর, শূগল ১৫।১৬ পনেরদশাল বৎসর এবং সিংহকে ৭০ সত্তর পর্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। শুকর সাধারণতঃ ২০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। ঘোটক কে ৬০ বাট বৎসর দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ ঘোটক ২৫।৩০ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর জীবিত থাকে। উষ্ট্র প্রায় ১০০ একশত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে। জগল পক্ষী কখন কখন এবং দাঁড় কাক অনেক সময়েই শতাব্দী হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম হাঁসকে ৩০০ তিনশত বৎসর এবং কুর্সকে ১০৭ এক শত সাত বৎসর জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। ধমনীর স্পন্দনের সহিত দীর্ঘ জীবনের সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এখনও কোন সুকৃতি যুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নাই। দেখা গিয়াছে সিংহের ধমনীর স্পন্দন মিনিটে ৪০ চল্লিশবার ব্যাক্তের ৯৩ তিরানকই বার এবং জগল পক্ষী ১৬০ বার হইয়া থাকে। হস্তীর স্পন্দন গণনা করা অসম্ভব।

ঐহরিচরণ গুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

ভীষ্ম (উপন্যাস) শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম. এ., বি. এল প্রণীত, মূল্য ১৮০/। এখানি গ্রন্থকারের দ্বিতীয় উপন্যাস। তিনি ইত্যপূর্বে 'প্রহেলিকা' লিখিয়া উপন্যাস সাহিত্যে বর্ধিত কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। সমালোচ্য গ্রন্থখানাও তাহার পূর্বাঙ্কিত বশঃ অল্প রাশিতে সম্বর্ণ হইয়াছে। বীরেন্দ্রবাবুর রচিত উপন্যাসের বিশেষত্ব তাহা তাহা "জীবনমণ্ড" সম্যক সুপরিষ্কৃত রহিয়াছে। ঘটনা কাহল্য ও নায়ক নায়িকার অনাবশ্যক চারিত্রিক ও জ্ঞান্য লক্ষণাদিকেই তিনি একমাত্র উপন্যাসের প্রতিপাত বিষয়

বলিয়া মনে করেন না। অতীত ও বর্তমানের বাহ ভেদ করিয়া সমাজ সমস্তাগুলি কিরূপে ক্রমবিকশ লাভ করিয়া গড়িয়া উঠে এবং তাহাদের তরঙ্গাতিবাহতে সমাজ শরীর কিপ্রকারে বিপর্যস্ত হইয়া সামাজিক ব্যক্তির চরিত্র গঠিত করে সেই সকল মনোরম চিত্র বীরেন্দ্রবাবুর উপন্যাসে আমরা পাইয়া থাকি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-সভ্যতার সংঘর্ষে আমাদের সমাজের স্তরটি যে আলোড়িত হইয়াছে এবং সেই আলোড়নের ফলে আমাদের জাতির জীবনে যে কতগুলি সমস্তা সমুৎপত্ত হইয়া চিন্তাশীল সামাজিক গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা আর অস্বীকার করা যায় না। এই "যুগসন্ধির" কতিপয় সমস্তা গ্রন্থকার আমাদের সমুখে উপস্থাপিত করিয়া প্রস্তাবনা হইয়াছেন।

সাধারণতঃ সমস্তাগুলক উপন্যাসের গল্পাংশে চিত্রা-কর্ষক ঘটনাবলীর নানতা দৃষ্টি হইলেও 'জীবন' সেই অপরাধ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারিয়াছে। ইহাতে নায়ক নায়িকার চরিত্র চিত্রনে শিল্প কুশলতার অভাব নাই। সুরেশ, হেম, নলিনী, লীলা, সরোজ প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সুরেশ চরিত্রের উপর উপন্যাসের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। সুরেশ—বিশ্ব শতাব্দীর ভাবুক ও কর্মী যুবক। বিদ্যা, অর্থ, বশঃ তাহার কিছুই অভাব নাই। তথাপি "তাহার সমস্ত দেহ প্রাণ ভরে কি এক মহাক্ষুধা বিরাজ কচ্ছে, শুধু অর্থ প্রাপ্তিতে য' মিটিবে না। এ কিসের ক্ষুধা?" সুরেশ এই মহাক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই "ক্ষাপার" মত জগৎময় "পরশ পাথর" খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। অবশেষে তাহার সেই বুদ্ধিত জীবনে শান্ত আসিল—ত্যাগের পথে, বহুর ভাবনায় ও স্বদেশের উন্নতি কামনায়। সুরেশের দেশ ভ্রমের পরীক্ষা বড়ই চিত্রা-কর্ষক হইয়াছে হেম - বহু-বৎসর, যুক্তিবাদ ও উৎসাহী শিক্ষিত যুবক। মনে হয় সুরেশের চরিত্র বিশেষ ভাবে সূচাইবার জন্যই হেমের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। নলিনী সর্বাংশে হেমের উপযুক্ত গৃহিণী। তাহাদের দাম্পত্য জীবন বড়ই মধুময়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংমিশ্রণে ভারত নারীর মূর্তিতে যে অমৃতভাণ্ড সঞ্চিত হইয়াছে, নলিনীই সেই অমৃতভাণ্ড। কিন্তু লীলা ঠিক নলিনীর উপাদানে গঠিত নয়। লীলা, কাঠিন্দ্র, মাধুর্য্য, সত্য, ভ্রান্তিতে দয়া ও প্রেমের পরিপূর্ণতার অল্পরূপ। তাহার চরিত্রে মিশেনারী যেমতের চরিত্রের অনেকটা ছাপ পড়িয়াছে। কারণ লীলা মিশেনারী যেমতের হাতের বেরে—তাহাদের আবহাওয়ার লীলার চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। কাঠিন্দ্র প্রগলভতা ও লজ্জাশীলতার অভাবটাই তাহার চরিত্রে

বলী পরিচুস্ত হইয়াছে। কিন্তু সেই অল্পপাতে মাধুর্য্য ও কমলীয় ভাবের সমাবেশ তেমন হয় নাই। সুরেশ ও লীলার মিলনে লীলার চরিত্র পরিবর্তিত হইয়াছিল। সে ভারত নারীর জৈষ্ঠ্য সহধর্ম্মিণী পদকেই জীবনে বরণ করিয়া লইয়াছিল। দীনবাবু ও ভগবতী দেবীর গার্হস্থ্য জীবন শিক্ষিত বাঙ্গালীর অতি লোভনীয়। এমন পিতা মাতা যে সংসারে সেখানেই সুরেশ ও নলিনীর মত পুত্র-কন্যা জন্মিত। সর্বোজের শোকাবহ চিত্র সুরেশের জীবনে যে শুধু একটা বৈচিত্র্য আনিয়াছে তাহা নহে,— তাহার মধ্যস্থদা জীবন কাহিনী পাঠে পাঠকে অশ্রুপ্রাণিত করে। এতদ্ভাষীত গ্রন্থে ছোটখাট আরো অনেক চরিত্র আছে। গ্রন্থের ভাষা মার্জিত। সর্বত্রই ক্রিয়া পদের হ্রস্বতা সাধিত হইয়াছে। বাধাই মনোরম। পরিশেষে ইহা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে, জীবন বঙ্গের চিত্তাঙ্গীল সমাজে একটা ভাবের বৈচিত্র্য ও আদর্শের নবধারা আনিতে চেষ্টা করিয়াছে।

শ্রীমাধবাচার্য্য।

“সাধক কবি ৩/রামকুমার নন্দী মজুমদারের জীবন চরিত।”

সঙ্গীত উন্নতীকরণ সাহিত্যকে স্রোতবিনীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। নদীর তায় সাহিত্যের প্রবাহটির ইতিহাস জানতে হইলেও ইহা স্মৃতির অতীতের কোন্ জন্ম-শুভা হইতে উৎসারিত হইয়া, কোন্ কোন্ পারিপার্শ্বিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ ও গুপ্ত নিব্বার ধারায় আত্মপুষ্টি করিয়া, কোন্ কোন্ উর্বর সমাজ ক্ষেত্রের ভিতরদিয়া আপনার গতি-পথটা করিয়া নিয়া বর্তমানের বিপুলতায় ও লীলাবৈচিত্র্যে পৌঁছিয়াছে, তাহা সন্ধান করিয়া জানিতে হয়। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ প্রাদেশিক কবিদের চিত্ত হইতে নিঃসারিত হইয়া সমাজের চিত্তক্ষেত্রে সরস করিয়া উক্ত সাহিত্যের মূল ধারাটির প্রকৃতিকে অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত ও গতিবেগকে বর্ধিত করিয়াছে তাহা সর্বপ্রায়ে অস্বীকার্য্য। হারা অবগত হওয়া অত্যাবশ্যক। এই বহু আয়াস সাধ্য কার্য্য একক কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে। বহু সাহিত্যাত্মবাসী ব্যক্তি দ্বারা প্রাদেশিক কবিদের জীবনী ও কাব্যাদির পরিচর্য্যাক্রম তথ্য সংগৃহীত হইলে পর প্রকৃত সাহিত্যোক্ত-হাসের ভিত্তি পত্তন হইবে। ৩/কবি রামকুমার নন্দীর চরিত্র লেখক উক্ত কবির জীবনী ও গ্রন্থ বিবরণ প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাবয়ব-ইতিহাস রচনার সহায়তা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

তাঁহার পুস্তক হইতে কবি রামকুমারের যে পরিচয় পাই তাহা সংক্ষেপতঃ এইঃ—রামকুমার ১৮৩১ খৃঃ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ, এবং ১৯০২ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন। দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া, সেই অজানা-জন্ম যুগে কোনরূপ শিক্ষার সুযোগ না পাইয়াও তিনি শুধু চরিত্রের দৃঢ়তা, প্রবলজ্ঞান স্পৃহা, সাহিত্যাত্মবাস, এবং সহজ কবি-প্রতিভার প্রেরণায় আত্মোন্নতি লাভ করিয়া তাঁহার সুদীর্ঘজীবনকাল সাহিত্যচর্চায় নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজের জীবনে প্রাচীন ও নবীন বাংলা সাহিত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন এবং ঐ উভয় সাহিত্যের প্রভাবই তাঁহার রচনায় স্পষ্ট লক্ষিত হয়। এজন্য আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এই কবির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি ১০ম বৎসর বয়স হইতে গান রচনা আরম্ভ করেন, ১৪ বৎসরের সময় দাতাকর্ণ পালা রচনা করেন, এবং পরে কবির দলের উত্তর প্রচ্যুতর রচনা, পাঁচালী রচনা, বহু নাটকের পালা রচনা দ্বারা প্রাচীন সমাজের রস-পিপাসা তৃপ্ত করেন। আবার মধুসূদনের অত্যাচারের পর তাঁহার অশ্রুধারা “বীরাদনা পত্রোত্তর” কাব্য অমিত্রহর্ষের রচনা করিয়া বশবৎ হন এবং সেই ছন্দেই “উষোবাহ” নামক কাব্য রচনা দ্বারা প্রতিভার মৌলিকতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু কবির বহুবিচিত্র রচনাবলীর মধ্যে তাঁহার পরমার্থ সঙ্গীতাবলীই সর্বশ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মসাধনাই কবি রামকুমারের চরিত্রের মেরুদণ্ড। কবি-বিশোধিনীয়ার অশ্রুপ্রাণিত হইয়া তিনি বহু রচনা করিয়াছেন সত্য কিন্তু সাধকরূপে রাম প্রসাদের দ্বারা তিনি ধর্ম্ম সঙ্গীত রচনারই তদ্ব্যপেক্ষ ছিলেন—“তাঁহার কবি সঙ্গীতের ভিত্তর দিয়া সাধনার রাজ্যে তাঁহাকে বহুদূর লইয়া গিয়াছিল।” বস্তুতঃ ইহা আশ্চর্য্যের কথা যে, এই সেকেলে কবি অঙ্গীল কবিতাদি বা একটি প্রণয় সঙ্গীতও রচনা করেন নাই। আর পরিচয়পের কথা যে, অর্থ্যাভাব বশতঃ প্রকাশকের এবং যশোপায়কের অভাবে রামকুমারের কাজ ও ধর্ম্ম-সঙ্গীত বঙ্গীয় পাঠকসাধারণের অনায়াসে থাকিয়া অচিরকাল মধ্যেই বিস্তারিত গর্ভে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

“দেবজন্ম”—প্রবর্তক পাব্‌লিসিং হাউস, চন্দননগর।

ধর্ম্মোপদেশ ত আশ্রয় অনেকের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু অনেক সময়ই তাহা আমাদের এক কানে প্রবেশ করিয়া অপর কান দিয়া বাহির হইয়া যায়, মরমে দিয়া পৌছায় না। ইহার কারণ কি? বাহ্য সত্য, তাহা দ্বারা ত সকলেরই আকৃষ্ট হইবার কথা? ধর্ম্মোপদেশের ব্যর্থতার এক কারণ অবশ্য উপদিষ্টের স্বভাবের অস্বচ্ছতা,

পড়্যক হৃদয়ে গ্রহণ করিবার অক্ষমতা। কিন্তু ইহার অন্ততম কারণ উপদেষ্টার অব্যোপাত। যাহার উপদেশ দ্বারা আমরা চিত্তমানিত্ত দূর করিয়া তাহাতে সত্যের সন্ধান করিতে পারিল না, তিনি নিজেও ঐ সত্যকে উপলব্ধি করেন নাই, তিনি কতকগুলি 'বুলি' আওরাইয়া গিয়াছেন যাত্র। কিন্তু যিনি সত্যকে হৃদয়ের অন্তর্ভুক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সাধনা দ্বারা তাহাকে জীবনে কলাইয়া তুলিয়াছেন তিনিই প্রকৃত সত্য বক্তা, উপদেষ্টা। এইরূপ বক্তার বাক্য গুলি সত্যের অগ্রিকণা গর্ভে ধারণ করিয়া জীবন্ত, জলন্ত হইয়া শ্রোতার অন্তরে সেই অগ্র প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়।

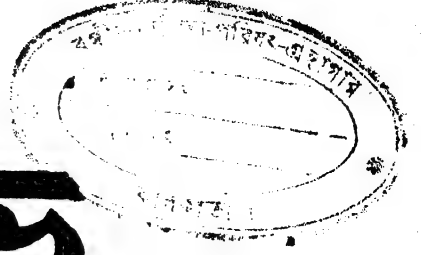
আমাদের আলোচ্য পুস্তিকা ধানির উপদেশ গুলির মধ্যে আমরা উপরোক্ত জাতীয় সত্যের সঙ্গীতের সন্ধান বহুল পরিমাণে পাইয়া পুলকিত হইয়াছি। ইহার কোথাও 'বাধি' বুলি নাই—একটি উত্তমশীল, সাধনশীল দল আশ্রয় স্বাধীন চিন্তা ও প্রত্যক্ষীভূত সত্যের স্বাভাবিক প্রকাশ সর্বত্র সুস্পষ্ট। আর একজুট লেখকের ভাষাটিও তাহার নিজস্ব—তাহা যেমন স্বচ্ছ তেমনি সত্যের, জোরালো। তাহা নিপ্রশারকের হাশ আমাদের চিত্তে প্রবেশ করিয়া আমাদের মনে উদ্ভূত করিয়া তুলে। প্রবন্ধ গুলিতে যেমন চিন্তাশীলতা, শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রাহিতা, সুবাক্য, তেমনি সাহিত্যিকতা, দৃষ্টির প্রসারতা (Wide outlook) ও উদারতা সর্বত্র সুস্পষ্ট। প্রাচীনদের গভীর আধ্যাত্মিকতা আধুনিক যুগের বিখ্যমানবতার সঙ্গে সঙ্গত হইয়া মানবের ভবিষ্যৎ সত্যতাকে কল্পিত গরীয়ান করিয়া তুলিবে, মানব জাতিকে দেবত্বের পদবীতে উন্নীত করিবে, সেই পরম আশার বাণীই পুতচরিত লেখক ১২টি প্রবন্ধে নানা রূপে প্রচার করিয়াছেন। "ভোগঃ যোগায়তে" 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য' এবং 'ভারত-প্রতিভা' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি আমাদের বিশেষভাবে প্রাধান্য যোগ্য। "ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য" হইতে একটু নমুনা উদ্ধার করিলাম :—

"ইউরোপে আছে রাষ্ট্রের প্রভুত্ব, অত্যাচার,—ভারতে আছে সমাজের প্রভুত্ব। গোষ্ঠির এই উত্তরবিধ কবল হইতেই মানুষের ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে হইবে। * ভারতীয় আশ্রয় যে চেতনা তাহা স্বাভাবিকই একটা

"অবচেতনা" (Inconscient)—অচেতনা না হইলেও তাহা অন্ধ, মুক, আপনহার, তাহা প্রাকৃত শক্তির চেতনা। ব্যক্তিরই মধ্যে তাহা প্রাগ্রত চেতনার পরিবর্তিত হইতেছে, সেখানেই সে ভাষা পাইতেছে, চক্ৰ-রান্না হইতেছে, নব নব স্বপ্নের সামর্থ্য পাইতেছে। * নব নব ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবানকে ব্যক্তি বিশেষ হইয়াই আবির্ভূত হইতে হয়,—গোষ্ঠি সত্তাও সেই রকম আপনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যক্তি সত্তার মধ্যেই বিগ্ৰহায়িত হইয়া উঠে। * * সৃষ্টি বিবর্তনের ইহাই মূল কথা। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে যে বস্তুর ধর্ম্ম করিতে চায় তাহা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ করিতে চায়। * ভারতে মোক্ষের আদর্শ এই মহাসত্যকেই ধরিয়াছে। * আজকার দিনে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পীড়নে মানুষের আত্মা যখন উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে * তখন এ সমাজের উপর আবার বিশেষরূপে ধ্যান দিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় মোক্ষবাদ একান্ত আত্ম সঙ্কল্প, প্রত্যেক ব্যক্তিই মনে করে * * তাহার মুক্তিটুকু হইলেই সব হইল। * * আর ইউরোপীয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ফল দ্বেষ, সংঘর্ষ—বৈশীরা ভাগই ইহা প্রতিবাদের তত্ত্ব, * * সামঞ্জস্য করা তাহার ধাতুতে নাই। কিন্তু আমরা যে ব্যক্তিত্বের কথা বলিতেছি তাহা হইতেছে ব্যক্তির মধ্যে ভাগবত সত্তা, সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ * * সেই মৌলিক অবলম্ব যাহার উপর ভর করিয়া সৃষ্টির বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ভাগবত ব্যক্তিত্বের ধর্ম্মই হইতেছে বহুকে একের মধ্যে ধরিয়া রাখা, এককে প্রাণীত করিয়া নানা কে কলাইয়া তুলি, ভেদের মধ্যে সাম্যকে অটুট রাখা। * আমাদের লক্ষ্য—মানব জাতিকে এই ভাগবত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে জাগরিত করা। সমাজ হউক, দেশ হউক, রাষ্ট্র হউক বর্ত্তমানে যে গোষ্ঠিবিশেষ প্রয়োজন তাহা আমরা ক্ষম্যে করিতে চাহিনা, তাহাদের সেবা আমাদের করিতে হইবে, বর্ত্তমানে তাহাতে আমাদের প্রয়োজন আছে। আমরা চাই সমাজকে, রাষ্ট্রকে, দেশকে নূতন মন্ত্রে, নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে— তাহার মূল কথা ভক্তি স্বাতন্ত্র্য। তবেই না বৈচিত্র্যের নব নব জ্ঞানের শক্তির সহজ দ্বারা খুলিয়া যাইবে, বস্তুর পরিবর্তে,—পরিবর্তে না হউক বস্তুর অন্তরালে যত্নী আসন পাইবে, উহাকে চালাইয়া লইবে, নিয়ন্ত্রিত করিবে প্রয়োজন হইলে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িবে।"

শ্রী উপেন্দ্রকুমার সেন।

সৌরভ



অষ্টম বর্ষ।

ময়মনসিংহ, মার্চ, ১৩২৬।

চতুর্থ সংখ্যা।

কবি মধুসূদন দত্ত।

মধুপ জাতীর মধ্যে পুরুষেরা নাকি বড়ই আলস্য-পরায়ণ, আর স্ত্রী-মক্ষিকারাই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম দ্বারা মধুর ভাণ্ডার পূরণ করিয়া নিকর্য্য পুরুষ-মক্ষিকাদিগের উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকে। কিন্তু পুষ্প-মধুর জ্ঞাত মানুষ পুরুষ মক্ষিকার নিকট ধনী না হইলেও মধুধাতুতে সুমধুর গুঞ্জন দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় ভৃঙ্গকুল মানুষের ক্রতিমূলে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের সারস্বত কুঞ্জের মধুকর, কবি-সমাজেও উক্তরূপ দুইটি শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। একদল কবি আছেন যাহারা প্রকৃতির হাত হইতে তাঁহারা যে প্রতিভা-ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াছেন তার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া গিনা অগ্নাসে আশ্রয় লইয়া আমাদের কর্ণে সঙ্গীত মাধুর্য্য ঢালিয়া দেন। আর অন্য শ্রেণীর কবিগণ তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রতিভাধুরকে সাধনা দ্বারা পূর্ণবিস্তারিত শতদলে ফুটাইয়া তুলিয়া কলসঙ্গীতে সঙ্গ সঙ্গ আমাদের অন্তরায়্যার-তৃপ্তির জ্ঞাত সঙ্গীতবানী সুধার ভাণ্ড উন্মুক্ত করিয়া দেন। প্রথমোক্ত কবিদের দ্বারা সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, শুধু আমাদের শ্রবণে প্রবেশের ক্ষণিক তৃপ্তি,—আর শেষোক্ত কবিগণের কাব্য-সৃষ্টি দ্বারা আমাদের অন্তরে প্রবেশের স্থায়ী ক্ষুধা। আমাদের অমর কবি মধুসূদন শেষোক্ত সাধক-কাবদের অগ্রণী ছিলেন। আজ বাংলা ভাষা ঐশ্বর্য্য-শালিনী, তাই ঐশ্বর্য্যগর্ভিতা বিলাসিনী রমনীর ছায় আজ তাহার তুলিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে, কোন্ কোন্ অনশন-ক্লান্ত প্রমত্তবীর হৃদয়ের শোণিত ও হস্তের নিপুণতায়

তাঁহার অঙ্কার এই অধরচূষী গর্ভোদ্ধত সৌধ-ভবন নিশ্চিত হইয়াছে,—কোন্ কোন্ বোদ-বৃষ্টি-পরিধিক্রমের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় তাঁহার এই অতুল বিভবরাশি সঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু কৃতজ্ঞতার খাতিরে অঙ্কার এবং ভবিষ্যতের বঙ্গীয় পাঠককে অর্পণ করিতে হইবে বঙ্গভাষা-জননী এই সৌভাগ্যোন্মেষের জ্ঞাত আমরা মধুসূদনের অসামান্য কবি-প্রতিভা এবং জীবনব্যাপী সাহিত্যিক সাধনার নিকট কি পরিমাণে ধনী। আমাদিগকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অর্পণ করিতে হইবে, মধুসূদন কি অদম্য উৎসাহে ও অবিচলিত সংকল্পে, দারিদ্র্যের পৌড়ন সহ্য করিয়া, অদৃষ্টের নিগ্রহ অগ্রাহ্য করিয়া, পারিবারিক জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া, একদিকে বাস্তবিক ব্যাপসের এবং অপর দিকে হোমার-ভার্জিল-মিটনের মহাকাব্য সমুদ্রে অগাহন করিয়া মাতৃভাষার জ্ঞাত মণি মাণিক্য আহরণ করিয়াছিলেন,—উক্ত মহাকবিগণের অপার-বিস্তার অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ কল্প-লোকে বিচরণ করিয়া তাঁহার সেই সর্বত্রগামিনী, ত্রিলোকবিহারিনী বল্লভা-শক্তিকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শুধু ভাষা ও ছন্দের অন্তরীক্ষার গাভীর্ঘ্য ও সুমহুর গতি বিষয়ে নহে, কিন্তু বাণীর প্রসঙ্গ দৃষ্টি লাভের জ্ঞাত ক্লাস্তিহীন সাধনা এবং অবশ্রাম তপশ্চর্যা বিষয়েও মধুসূদন এবং ইংরাজ কবি মিটনের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মিটনের 'Industrious and select reading' এর কথা, অর্থাৎ তাঁহার সুবিচারিত অবিশ্রান্ত অধ্যয়নের কথা লক্ষ্য ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকই অবগত আছেন। তাই প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড উক্ত কবির

কাব্যগত উৎকর্ষের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“Continually he lived in companionship with high & rare excellence, with the great Hibu poets and prophets, with great Poets of Greece and Rome”—“যাহা কিছু মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম তাহাই যিহুদের চিরসঙ্গী ছিল, তিনি সর্বক্ষণ শ্রেষ্ঠ হিব্রু কবি ও নবান্বয়গণের এবং গ্রীক দেশীয় ও রোমীয় শ্রেষ্ঠ কবি-স্বপ্নের সহঃ সংসর্গে বাস করিতেন।” আমাদের মধু-স্বপ্নেরও সাহিত্য-সাধনা নূন ছিল না। যখন মধুর সমাজে থাকিয়া মাতৃভাষা চর্চা করিবার ক্ষমতা প্রস্তুত হইতে ছিলেন, তখন তিনি কোন বন্ধুর নিকট এই মর্মে লিখিয়াছিলেন—“ছাত্রজীবনাপেক্ষা আমার জীবন অধিক অবসরহীন ও কর্মময়। আমার দৈনিক কর্মের সময় বিভাগ এইরূপ :—প্রাতে ৬টা হইতে ৮টা হিব্রু ভাষা অধ্যয়ন, ৮টা হইতে ১২টা স্থলে অধ্যাপনা; ১২টা হইতে অপরাহ্ন ২টা গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়ন; ২টা হইতে ৪টা, তেলেক ও সংস্কৃত অধ্যয়ন; ৪টা হইতে ৭টা ল্যাটিন, ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা ইংরাজি সাহিত্য অধ্যয়ন। আর কি আমার পিতৃপিতামহগণের ভাষাকে লম্বিত খালিনী করিবার ক্ষমতা উপযোগিতা লাভ করিতে উপযুক্ত চেষ্টা করিতেছি না?”—আজ কে ইহা অস্বীকার করিতে পারে? তারপর একতারতীর চরণে অঞ্জলি দান করিবার ক্ষমতা মধুসূদন যুরোপ প্রবাস কালে কি ভাবে অর্জ্য-সম্ভার আহরণ করিয়াছিলেন তাহাও এ স্থলে বর্ণন করা কর্তব্য। যুরোপ হইতে তিনি বহু বিশেষকে এই মর্মে লিখেন :—“অগম্যব্যবসার বন্ধনাদি যে আমার একজন মনের বল ও সংকল্পের দৃঢ়তা আছে যাহাতে এই অস্বপ্নের মিথ্যাত্বের মধ্যেও আমি ইতালীয়, জার্মানীয় এবং ফরাসী এই তিনটি যুরোপীয় ভাষার শিক্ষার্থ্য্যে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি। যদি ততদিন বাঁচিয়া থাকি এবং বদেষে ফিরিয়া আসিতে পারি তবে ভরসা করি আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে ঐ সকল ভাষার শিক্ষার সৌন্দর্য্য-সম্পদের সঙ্গে আমার শিক্ষিত বন্ধুবর্গকে পরিচিত করিতে পারিব।”—আজ “চতুর্দশদশী কবিতা-বলী” পাঠক জানেন মধুসূদনের সেই অস্বপ্নের বাসনা

পূর্ণ হইয়াছে কি না। শুধু তাঁহার সমসাময়িক ‘জুগুপ্ত’ কেন, সকল বঙ্গসাহিত্যসেবী চিরকাল মধুসূদনের সেই সাহিত্যসাধনালব্ধ অমৃত কল সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি (‘সাহিত্যের কথা’ এবং ‘আমাদের সাহিত্য ও সাহিত্য-চর্চা’ প্রবন্ধে *), আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বঙ্গ বাণীর একতারা যজ্ঞের জ্বালা ছিল এবং তাহা হইতে শুধু ধর্ম্মসঙ্গীত বস্তুত হইত, কিন্তু মানবজীবনের ধারাবাহিক সঙ্গীত সে সাহিত্যের কোথাও বাজিয়া উঠে নাই, তাহা যেন সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ-ভরদায়িত জীবন ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ছিল। ভারতচন্দ্র প্রভৃতির “অন্নদামঙ্গল”ে বিজ্ঞা-স্বপ্নের উপাখ্যান উপলক্ষে মানব প্রেমের চিত্র সং-যোজিত আছে বটে, কিন্তু তাহা রাজপুত্র রাজপুত্রীর প্রেমের বীভৎস ছবি মাত্র, তাহা সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে ও তাহাদের চিত্তকে মানব-প্রেমের পূতবারি-নিবেকে সঙ্গীত করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমি কবি মুকুন্দরামের কবিকল্প চণ্ডীবর্ণিত ব্যাধ-দম্বাভী কালকেতু কুল্লার বা বণিকজাতীয় ধনপতি লহনা খুলনার দাম্পত্য প্রেম-চিত্রের কথা ভুলিয়া যাউ না। কিন্তু অরণ্য রাশিতে হইবে, উক্ত কবির নায়ক নায়িকাগণ দৈব-আভিশাপ-সন্তপ্ত স্বর্গচ্যুত দেবদেবী বা অঙ্গুর অঙ্গুরী; এবং তাহারাও কাব্যের মুগ্ধ বর্ণনীয় বস্তু নহে—চণ্ডী মাহাত্ম্য-প্রচাররূপ দৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধির আত্মসজ্জিক বিষয় মাত্র। আর কবি উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের অমুরোধেই সম্ভবতঃ, নায়ক নায়িকার চিত্রগুলিকে স্থানে স্থানে এরূপ ভাবে কলঙ্কিত করিয়াছেন যে তাহাতে যেমন মানবীয়-তার প্রতি পাঠকের মনে বিকার জন্মে, তজ্জন্য মানুষের উপাস্ত দেবতার প্রতিও কবির অভিপ্রেত শ্রদ্ধার উদ্বেক হয় না। প্রথমতঃ শুষ্ঠ কবিকেই আমাদের সাহিত্যে মানবীয় ভাবের আমদানী করতে দেখি; কিন্তু তাহা কতকাংশে আদেশিকতা এবং মুখ্যতঃ হাস্য-রস বিষয়ে। আর, ঈশ্বর ও পুণ্ডরীক রসিকতা যে সাধারণতঃ আধুনিক লুপ্তি ও শীলতার অঙ্গুমোদিত নহে, ইহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রকৃত পক্ষে নাইকেল মধুসূদন দত্তই

এই ভাবে কোন কবির প্রতি পাঠক-হৃদয়ের অমূল্য প্ৰতি
বিরাগ দ্বারা তাঁহার কাব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করাকে ম্যাথু
আর্পল্ড 'False Estimate', ভ্রান্ত বিচার পদ্ধতি
বলিয়াছেন। উক্ত মনোবীর মতে কাব্যবিশেষের প্রকৃত
মূল্য, তাৎপর্য ও সৌন্দর্যের অহুসন্ধান ঐ কাব্যের মধ্যেই
নিবদ্ধ থাকিবে,—অতএব তাহার সম্বন্ধ করিতে গেলে
কাব্যালোচনা জটিল ও পঞ্চভেদ হইয়া ব্যর্থ হইয়া যাইবে।
ম্যাথু আর্পল্ড আরো লক্ষ্য করিয়াছেন যে পূর্বোক্ত
Personal estimate (কবিবিশেষের প্রতি পাঠকের
প্রীতি বা বিবেকের দ্বারা তাঁহার কাব্যের মূল্য ঠাটাই করা)
ছাড়া আরেকটি কারণে আমাদের কাব্যচর্চা পঞ্চভ্রান্ত হয়।
ইহাকে তিনি 'Historical Estimate' বলিয়াছেন।
সুদূর অতীতের প্রতি মানুষের এমন একটা অত্যধিক
শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ যে বর্তমানের কোন ব্যক্তি যদি অবাঞ্ছিত
বিষয়ে ও চানদের আচারত পন্থা হইতে চুল-পরিমাণে
সারস্বাচলাচল করিবার চুঃসাহসিকতা দর্শন করেন,
তবে মানুষ তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে চায় না,
৫৫- সে ব্যক্তির দ্বারা আচারত অভাবের সহজ পুন্যাস-
ক্তি। মূল্যে 'পন্থা' হইয়া যায়।

এতদ্ব্যতিরিক্ত কারণে মধুসূদন তাঁহার অদেখীর নিকট যে পুরুষের লাভ করিয়াছেন অল্প কোন কবির ভাগ্যে সেরূপ ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। তাই দেখিতে পাই, তাহার কাব্যের প্রায় সমুদয় সমালোচকই পরিচয় করিয়াছেন যে মধুসূদনের প্রধান কাব্য ‘মেঘনাদ বধের’ আদর্শ আমাদের জাতীয় আদর্শকে উল্লেখ করিয়াছে, হিন্দুর চিরপূজার্য রাম লক্ষণ চরিত্রে কাপুরুষতার কলঙ্ক আরোপিত করিয়া এবং অনার্য্য, মল্লভবাদক, পাপাত্মা দশানন-তনয় মেঘনাদকে উচ্চগতির আলোকে চিত্রিত করিয়া, শ্রেষ্ঠতর গুণগ্রামে ভূষিত করিয়া কবি দেবতাকে ছাড়িয়া পশুত্বের পূজা করিয়াছেন, পুণ্যকে বর্জন করিয়া অকল্যাণকে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

‘মেঘনাদবধ কাব্যের’ একটু আলোচনা করিয়া দেখিব উক্ত অভিযোগগুলি কতদূর ভিত্তিযুক্ত। প্রকৃতই কি এইকাব্য মানুষের জন্ম কোন মহতী বাণী প্রচার করে নাই?—কুসংস্কার-মুক্তমনে ধোঁসাকে অতিক্রম করিয়া ভিতরকার শক্তির প্রাণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, অপ্রাসঙ্গিকতা দ্বারা আমাদের অনুসন্ধান বিষয়কে জঙ্গাল-সঙ্কুল না করিলে সর্ব প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, এই কাব্যে কবি অদৃষ্টের দাস দুর্বল বাঙ্গালীর নিকট পুরুষকাব্যের, প্রকৃত ক্ষাত্রধর্মের, মানুষের ভিতরকার অনন্তপ্রসারণশীল শক্তির মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন। যে সকল নৈসর্গিক জড়শক্তির উপদ্রবকে মানুষ এতকাল অপ্রতিবিম্বের দৈব উৎপাত বলিয়া স্বীকার করিয়া নতশিরে সহ্য করিয়া যাইতেছিল, আজ মানুষ আধুনিক বিজ্ঞান-লব্ধ নব শক্তির বলে তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ক্রীতদাসের স্থায় তাহাদের দ্বারা আপনার প্রয়োজন সাধন করিতেছে। তাই আজ মানুষ এই নব শক্তির আশ্বাদ পাইয়া দৈবকে মানিতেছে না, নিজেই প্রকৃতির দাস বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেছে না, অপবিত্র মানবীয় শক্তিকে প্রকৃতির শাসক ও নিয়ন্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে,—নিজেকেই নিজের বিধাতা মনে করিতেছে। মানুষের এই নবজাগ্রত আত্ম-শক্তিবোধের আদর্শকেই মধুসূদন তাঁহার কাব্যের

নায়ক মেঘনাদ-চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জানি, আপত্তিকারী প্রশ্ন করিবেন, মহর্ষি বায়্যাকৌ যে স্বর্ঘ্যকুলা-বতংস রাম লক্ষণকে বীরত্বের পূর্ণ মহিমাক্রোড়িতে যুগ্মিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই পূর্বজন মাহাত্ম্য হরণ করিয়া রক্ষোবীর ইন্দ্রজীৱকে বীরের আদর্শরূপে চিত্রিত করিবার এমন কি প্রয়োজন ছিল? স্বীকার করি, যে সকল নামের চতুঃপার্শ্বে যুগযুগান্তরের সংস্কার-শ্রদ্ধা ভক্তি জড়িত হইয়া গিয়াছে তাহাদের উপর কোন রূপ হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদের ভিতর ভিন্নরূপ স্বর্ষ জুড়িয়া দিবার চেষ্টা বড়ই বিঘ্নসঙ্কুল। কিন্তু ইহা সহজেই মনে হয় যে মধুসূদনের এতটা বুদ্ধিমত্তা ছিল যদ্বারা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে রাম লক্ষণকে তাঁহাদের চিরন্তন মহত্বের উচ্চ শেখর হইতে নামাইতে চেষ্টা করা অতীব হুঃসাহসিকের কার্য। তাই, তাঁহার কাব্যগত উদ্দেশ্যের অনুরোধে অনিবার্য্য কারণেই যে এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সহজেই অস্বীকারিত হয়। সে কারণটি কি, সন্ধান করা আবশ্যিক।

বীরত্ব জাতি বর্ণ দেশ কাল নির্বিশেষে মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। আর, প্রকৃত বীরত্বের, শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বীরত্বের মহর্ষতা ভারতবর্ষ যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিল অল্প কোন দেশ আজ পর্যন্ত সেরূপ বুঝিয়াছে কি না সন্দেহহীন। যে মুক্তি ভারতীয় সাধনার ঐকমাত্র লক্ষ্যস্থল ছিল, ভারতবর্ষ জানিতে পারিয়াছিল, সেই মুক্তি উপার্জননের একমাত্র উণায় প্রকৃত বীরত্ব। তাই প্রাচীন ভারতের ঋষি জলদ-মন্ত্রে ঘোষণা করিয়াছেন—‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ’,—নির্কীর্যের দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার অসম্ভব। কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস নিঃসন্দেহ প্রমাণ করিতেছে, ভারতবর্ষের অত্যাচার প্রদেশের অসুখা যাই হউক, অন্ততঃ বাংলা দেশের বীরত্ব-গৌরব বহুকাল হয় দেশের সীমা ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্রতা, আত্মকলহ, পরহিংসা, পারষেব প্রভৃতি বাঙ্গালী জাতীকে বহুদিন হইতে নানাভাবে দুর্বলতার পাপপঙ্কে আকর্ষণ করিয়াছে। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি ত নির্দীন নোবুধ প্রদীপের অস্তিম ফুলিল-দীপ্তি মাত্র। ওয়াকুফির

এই হীনতা মধুসূদনের নবভাবোদ্দীপ্ত বীর-হৃদয়ে কি হারুণ আঘাত করিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা “চতুর্দশ পদী কবিতাবলীর” ‘আমরা’ শীর্ষক কবিতাবলিতে প্রাপ্ত হই,—

“আকাশ-পটলী গিরি দমি, গুণবলে
নির্ম্মল মন্দির যঁরা সুন্দর ভারতে,
তাদের সন্তান কিহে আমরা সকলে ?
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাবীন, হা বিধাতঃ! আবদ্ধ শৃঙ্খলে।”

এই কবিতায়, স্বদেশের বর্তমান দুর্ব্বলতায় কবি-হৃদয়ের অসহনীয় আত্মগ্লানি যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ তাহাতে ভারতের গৌরবময় অতীতের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সঙ্গে কবির বাস্তবচনা “King Porus—a legend of old” নামক বীররসোদ্দীপক ইংরাজী কবিতাটিও পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতের প্রতি ও প্রকৃত বীরত্বের প্রতি কবির কবিতার কি ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

(আগামী বারে সমাপ্য ।)

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর ।

সমস্যা ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

গ্রামের দূষিত বায়ু শোধন জন্ত জগবন্ধু বাবু প্রথমেই মহকুমার যাইয়া মহকুমা মাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহকুমা মাজিষ্ট্রেট সকল কথা অবগত হইয়া প্রচুর সহায়ত্বের সহিত তাঁহার মন্তব্য গ্রহণ করেন ও তাঁহাকে হিন্দু হিতসাহিনী সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন।

মহকুমার ১ম মুনসেফ অনাদি বাবু মহকুমার শাখা হিন্দু হিতসাহিনী সমিতির সভাপতি, জগবন্ধু বাবু তাঁহার সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সকল কথা অবগত করাইলেন এবং হিতসাহিনীর হিত চেষ্টায় কোন দ্রুপ ফল ফলিতে পারে কি না তাহার দিকে দৃষ্টি করিতে অনুরোধ করিলেন।

মুনসেফ বাবু তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ করিয়া হিতসাহিনীর সম্পাদক শাস্ত্রী বিজ্ঞাত্বণকে মহকুমায় আসিতে অনুরোধ করিলেন। শাস্ত্রী বিজ্ঞাত্বণ সম্মানিত লোক, অর্থবানও বটেন। ঘরের খাইয়া বনের মহিব তাড়ানই তাঁহার জীবনের কৰ্ম্ম। দেশ ও সমাজ-হিতৈষণা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। দেশ ও সমাজের জন্ত তিনি জিহ্বা ও লেখনী ব্যয় করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িবার লোক ছিলেন না। স্বার্থপর সমাজদ্রোহীজনগণের অজ্ঞান নিন্দা তাঁহাকে কোন কার্য্যেই পশ্চাত্তাপদ করিতে পারিত না।

তাঁহার চরিত্রে যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ লোকমুখে প্রচার হইয়াছিল, সেগুলি :—তিনি বাল্য বিবাহের বিরোধী হইয়াও নিজের বেলায় গোঁরা দানের ফল লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার দীর্ঘ টিকি থাকা সত্ত্বেও তিনি স্থান বিশেষে ইয়োগোপীয় প্রথা অনুসারে আহার করিতেন; বক্তৃতা ও প্রবন্ধে আত্ম কথ্য প্রচারই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চিন্তা করেন কম, কথা বলেন বেশী কিন্তু যাহা বলেন তাহা মূল্যবান। ইত্যাদি, ইত্যাদি। মোট কথা, শাস্ত্রী বিজ্ঞাত্বণ কাজের লোক ছিলেন। যে কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিতেন, তাহা প্রাণপণে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সময় তিনি কেন্দ্রে কেন্দ্রে শাখা সমিতি স্থাপন করিতেছিলেন। শাস্ত্রী বিজ্ঞাত্বণ মুনসেফ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উপদেশ ক্রমে পীরপুরে যাইয়া জগবন্ধু বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে লইয়া রাজনগরের রাজা বাগচরের নিকট গমন করেন।

এই প্রচেষ্টার ফল যাহা ফলিয়াছে, তাহা পাঠক পূর্বে পরিচ্ছেদে পাঠ করিয়াছেন। এই অবিশেষণে যে কোন ফল হয় নাই, তাহা বলা যাইতে পারে না। বক্তৃতার একটা ফল আছেই। এই এক সপ্তাহে পীরপুরের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদমা অর্ধেক বিনা তদ্বিরে ধারিৎ হইয়া গিয়াছে, সম্পাদক তাহার তালিকা লইয়া আসিয়াছেন।

আজ পীরপুর ষ্টেণ্ডিং সবকমিটির প্রথম অধিবেশন। সদর হইতে প্রাতঃকালেই সম্পাদক সুশীল বাবুও সহকারী সম্পাদক মাখন বাবু আসিয়া পীরপুর পহঁছিয়াছেন।

রবিবার। সূর্য্যোদয় হইয়া গৃহেই অধিবেশনের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাঁহাদের শুভ উদ্দেশ্য সফল হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা পরম উৎসাহী। সুশীল বাবু পাড়ায় পাড়ায় বাইয়া সকলকেই সভাতে যোগদান করিয়া স্বাধীন ভাবে মনের কথা বলিতে ও ধৈর্য্য সহকারে পরের কথা শুনিয়া বিচার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

গ্রামে সাধারণতঃই আহার বিলম্বে হয়, তাহার পর কাহাকেও বিকালে হাটে বাইতে হয়, কাহাকেও আহারের পর নিজা বাইতে হয়। মৌতাতের অগ্র-পশ্চাৎ সময় ত্যাগ করা বিধেয়—ইত্যাদি সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ২টার সভারস্তের সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

সভ্যগণকে ডাকাইয়া লইয়া সভা আরম্ভ করিতে আড়াইটা হইল। সভ্যগণের মধ্য হইতে বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞান বুদ্ধ কবিব্রাজ গঙ্গাধর সেন মহাশয়কে সভাপতির আসনে স্থাপন করিয়া সুশীল বাবু একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সুশীল বাবু বলিলেন—“একতাই আমাদের শক্তির উৎস। শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা, তাহাকে ক্ষয় করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। জন মতের সমন্বয়েই সমাজ শক্তি বিপুলতা লাভ করে। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট কথাগুলি নূতন না হইলেও পুনঃ পুনঃ চিন্তার বিষয়। নির শ্রেণীকে তুচ্ছ করিলে আমাদের শক্তি হারা হইতে হইবে। তাহা দিগকে সর্ব প্রযত্নে শিক্ষা দারা আমাদের উদ্দেশ্য পথে লইয়া বাইতে হইবে। সমাজের মূলশক্তি বিপুল সমাজের সহিত তুলনার তথা কথিত সংখ্যায় নগণ্য উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞান, কার্য, বৈজ্ঞানিক সমাজের ভিতরই নিহিত নহে। আমরা বাহাদের শক্তিতে দাঁড়াইয়া আছি, তাহাদিগকেই সকল শক্তিতে চাপিয়া মারা কখনই উচিত নহে। জীবির ভাবার বলিতে গেলে বলিব, “হুতলা যদি এক তলাকে পিসিয়া মারিতে চায়, তবে একতলা নিপেষিত হইবে বটে কিন্তু তাহাতে হুতলার কণ্ঠান হইবে না।” স্বাস্থ্য ও শিক্ষা জাতিকে গড়িয়া তুলে, অল্পতঃ জীবিত থাকিতে সাহায্য করে, তাহা আমরা ভুলিয়া না যাই।

আমাদের জাতির ভবিষ্যত আশার স্থল যুবক বৃন্দকে কর্তব্য পথে লইয়া বাইবার বর্তমান সমাজই পথ প্রদর্শক। যে কার্যে আমরা আজ প্রবৃত্ত হইতেছি, আশা করি, সকলে সর্ব প্রকারমতভেদ ও দশাদলি ভুলিয়া সর্বপ্রযত্নে সে সকল কার্যে একে অগ্ৰে সাহায্য ও শক্তিদান করিব।

সুশীল বাবু আসন গ্রহণ করিলে রামদাস বিজ্ঞাভূষণ বলিলেন—অগ্রে আমাদের বর্তমান সমাজ সম্বন্ধেই আলোচনা হউক।

সুশীল বাবু বলিলেন—“আপনিই বরং আপনার বক্তব্য বলুন। তারপর জন-মত বিচার—সত্য গণ করিবেন।”

তখন বিজ্ঞাভূষণ দাঁড়াইয়া বলিলেন—“বিলাত বাজি-গণ স্নেহ অগ্রাহী, স্নেহ আচার পরায়ণ, স্নেহভাবাপন্ন; তাহাদের সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের এই সকল অভিযোগ স্পষ্ট। যাহা স্পষ্ট সত্য, তাহার সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ অনাবশ্যক সূত্রায় ইহারা অবশ্যই হিন্দুসমাজের অনা-চরণীয়।

“তা বটেইতো” “ঠিক কথা” ইত্যাদি বলিয়া কয়েক জন হাততালি দিলেন।

তারাপদ সত্যাল উঠিয়া বলিলেন—“যাহারা বিলাতে গিয়াছেন—দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে, বৈদেশিক জ্ঞানের পাসবা বহন করিয়া আনিতে, জাতির কল্যান ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতে, তাহারা যত অন্বেষণ করুন যাহাদের জ্ঞান, কল্যান ও সম্পদ সঞ্চয় করিয়া তাহারা অননয়ন করেণ তাহাদিগকে অবহেলা করা তাহাদের পক্ষে অকৃতজ্ঞের কার্য। তারপর দেশে আসিয়াও যদি তাহারা স্নেহাচার ভুলিয়া যান স্নেহভাব ছাড়িয়া দেন, স্নেহের সহিত আহার বিহার না করেন ও কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইয়া সমাজকে অবনত মস্তকে মানিয়া চলেন, তবে তাহাদিগকে সমাজের মাধার করিয়া রাখাই উচিত। হিন্দু শাস্ত্র স্বার্থপরের স্বার্থ রক্ষার ছলা কলা নহে। শাস্ত্র বিধাম রক্ষা করতে বাইয়া যদি তাহাদিগকে ছাড়িতে হয়, কে ছাড়িবে? যিনি ঘরে বসিয়া গোপনে স্নেহ অপেক্ষাও স্নেহতর আচার অনুষ্ঠান করেন, প্রকাণ্ডে কোটা তলক কাড়ির গলাগল করেন, এমন লোকের সমাজ করিবে? আশা-

দের সমাজ কি মানুষের সমষ্টি লইয়া না জন্ম ইত্যর জীবের সমষ্টি লইয়া, তাহা আগে বিচার্য। যে সমাজের ব্রাহ্মণ চণ্ডাল-গমন করে; কার্যস্থ, বৈজ্ঞ, সমাজের মাধ্যম পদাঘাত করিয়া উপপত্তী রক্ষা করিয়া সম্মানিত, কোলিত্তপ্রথ, যে সমাজকে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, ভরাৎমেয়ের রক্তবে সমাজের জনগণের নাড়িতে প্রবাহিত হইতেছে—”

আঁতে আঘাত লাগায় হলধর চক্রবর্তী কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া বক্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“মুখ সামালিয়া কথা বলিও সাণ্ডালের পো”।

আর একজন বলিলেন—“দাঁও খালাকে ঝাড়ে ধরিয়া বাহির করিয়া—”

সান্তাল নিজেকে সামলাইয়া বলিলেন—“কে ঝাড়ে ধরিয়া তাহাকে বাহির করে দেখি? যদি নিম্নলঙ্ক হও, দাঁড়াও—সমাজ অবনত মস্তকে তোমার কথা গ্রাহ্য করিবে। আমাদের এই সমাজের কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিলে—এই সমাজকে কে হিন্দুসমাজ বলিবে? আগে নিজের ভিতর স্বল্প দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, পরে পরের দোষ দেখিবার বিস্তর সময় ঘটিবে। কোন্ ব্যক্তি এখানে আছেন, যিনি নিজেকে কলঙ্ক হীন বলিয়া মনে করেন। বাপের বেটা হও, তো বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া কথা বল, তখনই জানা জাইবে—কে কাহাকে ঝাড়ে ধরিয়া বাহির করিতে পারে।”

হলধর তখনও কাঁপিতেছিল। সে যে দোষ করিয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না—কেন না, এই বিষয়ে পাড়ায় বা সমাজে কোন কথা রটে নাই; তাই তাহার রাগ ও মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল, ইহার পর তাহার পক্ষে বিস্তর লোকও ছিল—ইতি মধ্যে উত্তেজনাও সে যথেষ্ট পাইতেছিল—এই বার সে অগ্রসর হইয়া বলিল—“এই যে সন্ধ্যালের পো, কোন বেটার’ কি ধলিবার আছে—বলুক দেখ। তারপর দেখা যাবে কার ঝাড়ে কত হাড়!”

সান্তাল বলিয়া গিয়াছিলেন, সুবেগে দাঁড়াইয়া জোধ্য কল্পিত কণ্ঠে বলিলেন—“তোর বাবার বাবা ঠাকুর্দা কেবলরায় চক্রান্তি ভরার মেয়ে বিবাহ করিয়াছিল—সে চাঁ ছিল চুল্লীর মেয়ে, মুখলমান, তোরা নাড়ীতে অর্ধেক

মুখলমানের রক্ত। আর তোরা দলের চাঁই ফুলিনের পো মুখুর্খোর—মামার বাড়ী জন্ম বাবার খোজ—”

আর বলিতে হইল না হলধর আশ্বিন, গোটাওয়া সান্তালের দিকে অগ্রসর হইতেই মাখন বাবু তাহাকে বাধা দিলেন। তখন সান্তালের উপর একখানা জুতা সজোরে আসিয়া পড়িল। জুতা নিক্ষেপ কারিকেও অতুল ভাণ্ডারী গভীরে লাঠি বসাইল। তখন মার মার ধর ধর রবে স্থূল গৃহ প্রকল্পিত হইতে লাগিল, সভ্য পতিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া লোক জন বাহির হইয়া পড়িল।

উভয় পক্ষেই যেন লাঠি মারিবার বন্দোবস্ত ছিল। শ্রীল বাবু ও মাখন বাবু, স্থলের যেসকল বালককে সেবক সমিতির সভ্য করিয়াছিলেন, তাহাদের সাহায্যে লাঠিমারা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন।

গোপী চক্রবর্তীর অবস্থা শকটাপন্ন হইয়াছিল। ছাত্রগণ তাহাকে কোলে করিয়া আনিতেছে দেখিয়া নিমেষের মধ্যে মারামারি থামিয়া গেল।

অনেকেই আঘাত পাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে গোপী চক্রবর্তী ও সভাপতির আঘাত গুরুতর হইয়াছিল।

অবস্থা দেখিয়া শ্রীল বাবু ও মাখন বাবু চিন্তিত হইলেন। তাহারা ছাড়িবার পাত্র নহেন। সকলকে বিদায় দিয়া গ্রামের সভ্য ছয় জনকে লইয়াই অতঃপর কার্য শেষ করিয়া যাইবেন বলিয়া পুনরায় বলিলেন।

গোপী চক্রবর্তী ও সভাপতি মর্মান্বয়ে পাক্ষিক সাহায্যে বালকেরা স্বয়ং বাড়ীতে পছন্দাইয়া দিয়া আসিল।

শ্রীল বাবু, ছাত্রগণ ও ষ্টেণ্ডিং কমিটির সভ্যগণের সম্মুখে পীরপুর গ্রামের ভবিষ্যৎ অবস্থার আলোচনা করিয়া আশা ও নিরাশার সহিত সভার কার্য শেষ করিলেন।

তাহার শেষ মন্তব্য এই—দলাদলি দোষবীর্ণ নহে; তাহা সকল অবস্থাতেই শক্ত ক্ষয় করে না—শক্ত বৃদ্ধিও করিয়া থাকে। গ্রামের উপকারের দিকে লক্ষ্য—রাখিয়া আপনারা চলিবেন। যত তেদ সকল সমাজেই আছে—এবং চিৎকাল তাহা থাকিবে—বরং তাহা সমাজের চেতনারই প্রমাণ। মাঝলা মোকদ্দমার আশ্রয়

বল কয় হয় । হাজার দলাদলি করিলেও এটা স্বরণ রাখিবেন । আর, পরকে ধরিয়া ঘরকে শাপন করিবেন না—সময়ে তাহা ভীষণ কুফল প্রসব করিবে । ইত্যাদি ।”

হুই সপ্তাহ পরে তৃতীয় অবিবেশনের তারিখ ধার্য হইল ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

পীরপুরের তারাপদ সন্ন্যাস সন্মানী লোক । তাঁহার পিতামহ রাজা রাজবল্লভের চাকুরী করিয়া বিস্তর ধন সম্পত্তি উপার্জন করেন । সমাজে তাহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা, সম্পর্কবাদেও তাঁহার ঘরের কোন নিন্দা নাই । তারাপদের পিতা স্বাধীন চেতা লোক ছিলেন । তিনি কাহারও চাকুরী করিয়া নিজকে অবনত হইতে দেন নাই । পুত্র ও পিতার অঙ্গসরণে নিজ স্বাধীন মত বজায় রাখিয়াই চলিয়াছেন । তারাপদ বাল্যে পীরপুর জুলে বাল্লালা ও ঈশ্বরকী পড়িয়া যৌবনে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তারপর অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন ।

তারাপদের পিতা মুক্ত হস্ত ছিলেন ; সে জ্ঞান পৌত্রিক সম্পত্তি অধিক বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই—নগদ তহবিলও কিছু কমাইয়া গিয়াছিলেন । তারাপদ রূপণ, তিনি মগদ সম্পত্তি বৃদ্ধির দিকে একান্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কোষ পূরণ করিয়া লইয়াছেন । তিনি বলিতেন আপোবে ক্রয় অপেক্ষা দাননের বিনিময়ে প্রাপ্তিতে লাভ বেশী । তিনি তাহাই করিতেন । পীরপুরের ছোট বড় লক্ষ্মিত্তে সকলেই তারাপদের নিকট অল্পবিস্তর ঋণী ছিলেন । তারাপদের ঋণের তাগাদাও ছিল না, রিয়াংও ছিল না । তাঁহার দাঁদনে সুদ ছিল কম, জাবিন ছিল বড় । সম্পত্তি রেহান না রাখিলে তিনি কাহাকেও টাকা ধার দিতেন না ।

তারাপদের ৪টা সন্তান—১টা মেয়ে ও তিনটা ছেলে । বড় মেয়ে প্রতিমার বয়স চৌদ্দ । পীরপুর গ্রামে প্রতিমা স্কুলের বালিয়া প্রসংশিতা । জগবজ্জ বাবুর গৃহিণী প্রতিমাকে দেখিবার পুত্র বধু করবার সাধ করিয়াছিলেন । তাঁহার মনের সাধ এখনও লয় পাইয়া যায় নাই ।

জগবজ্জ বাবু নূতন সম্পত্তি ক্রয় কালে যে পাঁচ হাজার টাকা তারাপদ সন্ন্যাস হইতে ধার করিয়াছিলেন, জগবজ্জ বাবুর ইচ্ছা—তারাপদ কন্ডাদানের সঙ্গে সঙ্গে সে টাকার তমণ্ডক খানাও ছাড়িয়া দেন । রূপণ—তারাপদ এতগুলি টাকার বিনিময়ে এত বড় পাসকরা ছেলে চায় না ; সে চায় পাঁচ সাতশত টাকার মধ্যে যেমন তেমন পাত্র ; তাই মেয়ের বয়স চতুর্দশে উঠিয়াছে ।

তারাপদ সে জ্ঞান চিন্তিত নহেন । হুই এক বৎসর সবুরে যদি ২৪ হাজার টাকা বাঁচিয়া যায়, চৌদ্দ বছরে আসিয়া যাইবে কি ? সে তো এখন ঘরে ঘরেই আছে ।

প্রতিমার ছোট-তিনটা ভাই । সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতার বয়স ২১ দিন । তাঁহার মাতা সেই নব প্রসূত শিশুকে লইয়া স্মৃতিকা গৃহে আছেন । তারাপদের বয়স ৪০, দেহ বলিষ্ঠ । তাঁহার বুদ্ধামাতা এখনও জীবিতা । বেশ সুখের সংসার ।

পীরপুরের সামাজিক সমস্য়ার তারাপদ জীবন তর্ক-রত্নের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন ।

সভার হাঙ্গামায় তারাপদ সমস্মানে করিয়া আসিতে পারেন নাই । তাঁহার পৃষ্ঠ দেশেও এক ঘা পড়িয়াছিল ; বয়স দিগকে রক্ষা করেতেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন বেশী, সেজ্ঞান আত্ম রক্ষার দিকে তাঁহার দৃষ্টি কম ছিল । যাই হউক ব্যাপার লজ্জা জনক হইলেও পীরপুরের পক্ষে তাহা মোটেই অস্বাভাবিক এবং অচিন্তনীয় ছিল না ।

সভা ভঙ্গের পর তারাপদ ও জগবজ্জ বাবু একত্রে বাড়ী যান । জ্বলের মাঠ পার হইলেই জগবজ্জ বাবুর বাড়ী, তাহাই হইতেও আর একটু দূরে সন্ন্যাসদের বাড়ী ।

জগবজ্জ ডাকিলেন “এস ভায়া ত মাকটা খাইয়া যাও ।” বলিয়া তিনি তামাক ডালিলেন ।

“না—আপনার আর, তামাকটা খেচ করিয়া লাভ কি—বাড়ী যাই, হয়ত বকে পাচ্ছা ঘাত ও পৃষ্ঠে লগুড়া-ঘাতের সংবাদ পাইয়া গৃহিণীর ধনুঃসংকার হইয়াছে ।” বলিয়া তারাপদ হাসিয়া ফেলিলেন ।

জগবজ্জ বলিলেন—“দেখ দিখি কি অমাত্মবিক কাণ্ড, ভদ্রলোকেরা বলে কি ? এ কি ভদ্রলোকের গ্রাম, না চাষা ইত্যরের গ্রাম ?”

তারাপদ বলিল—“ঐ কুলীন পুত্র-তাপিনী হারামজাদাই এ নাট্যটির শলা; হারামজাদার পিঠেও বেছুর পড়ি-
রাছে। যাক—এখন পণ প্রধার তো উচ্ছেদ সাধন
করিয়া Resolution করিয়া আসিলেন, হইয়া যাউক
না—এই বৈশাখেই—”

জগবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—“সেতো ঠিক, কিন্তু যিনি
মেয়ের বাপ, তিনি কি মেয়ের চিন্তা কিছুই করিবেন না?
ছেলেট কি শুধু তাঁর সন্তান, যেহেতু কি কিছুই নহে?”

“কিছু না, কি হাঁ—সে চিন্তা পিতা মাতার; তাঁরা
প্রয়োজন বুঝেন, তাঁদের মেয়ের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু
আপনারা যে Resolution করিলেন—তার কি?”
বলিয়া তারাপদ হাসিলেন।

জগবন্ধু বলিলেন—“ভাই বিস্তর টাকা ছেলেটার কাছে
খরচ করিয়াছি, এখনও শেষ হয় নাই। এই আবারে তার
Final পরীক্ষা; তারপর তুমি পাঠবে পাঁচটা হাজার—কাস
কেলিবার অবসুর কোথায়? চোকমুখ বুঁজিয়া ছাড়িয়া
দাও ভাই—এ কটা টাকার ক্ষতিতে সাম্রাজ্য বাড়ী
দেউলিয়া হইবে না। একটা ছেলেকে এরূপ উপযুক্ত
করিয়া নিতে কত হাজার-হজত, খরচ-পত্র এক বার চিন্তা
করিয়া দেখিয়াছ কি? দুটা ছেলে না আছে, আর একটা
হইয়াছে সেদিন—দেখিবে—ভায়া কি পর্যন্ত ষায়!”

“আমাদের আদার বাপাণীর জাহাজের খবরে আব-
শ্রুততা দেখ না, তাই সে বিষয় চিন্তা করিতেও যাই না,
বানুনের ছেলের টডাটিডি কিছু বিপত্তা হইলেই হইল;
আর বায়ুনের মেয়ের নিকটক একটা ছেলে হইলেই হইল,
তারপর—প্রজাপতির নিকটক। দাদা এখন আসি।”
বলিয়া তারাপদ উঠিয়া পড়িলেন।

জগবন্ধুবাবু বাড়ীর ভিতর যাইয়া গৃহিণীকে ও বড়
বধূকে ডাকিয়া আনিয়া জানাইলেন—তারাপদ যেন বেশ
ইচ্ছুকই দেখা যাউতেছে। আজ সে নিজ হইতেই
বিবাহের কথা জুলিয়াছিল। শৈলেন বৈশাখে আসিতে
পারিবে কি না, বোমা একটু লিখিয়া দেখুন। শৈলেন
টাকা লইতে নারাজ; আর আমরাই কোন্ টাকার দাবী
করিতেছি। তবে লোকটা যা পাইবে—তা এখন না
য়েয়াত করিলেও—যেহেতু জামাইকে একদিন য়েয়াত

করিবেই—আর নিতান্ত না করে, না করিবে। নুতন
তালুকটা না হয় তার বাড়ীতেই রাইবে। বোঁ বা ভা
হইলে আজই লিখিয়া জাহান।”

শৈলেনের মা “বৌকে বলিলেন, তাই কর বোঁ মা,
বৈশাখেই যাহাতে হয়—সেইরূপ ভাবেই লিখা
বড় বোঁ কাগজ কলম লইয়া বসিলেন।

* * *

সেই দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে সাম্রাজ্য বাড়ীতে এক
অভাবনীয় লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটয়া গেল। এই শোচনীয়
ঘটনার উল্লেখ করিতে লেখনী কম্পিত হয়, শরীর
শিহরিয়া উঠে! হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

মধ্য রাত্রিতে তারাপদ তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও জ্যৈষ্ঠ চিৎ-
কারে জাগ্রত হইয়া উঠেন। তারাপদ বড় ঘরে ছিলেন, সে
ঘরের পাকা দেওয়াল। দার খুলিতে বাইয়া দেখেন, বাহির
হইতে দ্বারের শিকল বন্ধ। বিপদ বুঝিয়া তিনিও ঘর
হইতে চিৎকার করিতে থাকেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা
বাহিরে চিৎকার করিতেছিলেন। অজ্ঞাত ঘরে যে লোক
জন ছিল, তাহারাও ঘর হইতে বাহির হইতে না পারিয়া
চিৎকার করিতেছিল। অবশেষে বাহিরের ঘরের বেড়া
ভাঙ্গিয়া চাকরেরা বাহির হইয়া আসিয়া তারাপদের ঘরের
শিকল খুলিয়া তাঁহাকে বাহির করিল।

তারাপদের জ্যৈষ্ঠ আঞ্জিনায় অচেতন অবস্থায় পড়িয়া
আছেন! বৃদ্ধা মাতা ঘরের পিছনে জ্ঞান শূন্য অবস্থায়
পতিতা, তারাপদের কন্যা প্রতিমা নাই! তারাপদ
মাতা ও জ্যৈষ্ঠ চিৎকারে বিপদ অনুমান করিয়াছিলেন;
ঘরের বাহির হইয়াই উন্মত্তের ছায় বাড়ীর পাছ দিয়া
জঙ্গল পাড় হইয়া মাঠেরদিকে দৌড়িলেন। লোক জন
চারিদিকে ছুটিয়া চলিল।

আমরা এই নিম্নলিখিত কুলের কলঙ্ক কথা আর অধিক
লিখিয়া পাঠকের হৃদয় ক্ষুর করিব না। গ্রাম্য সমাজের
পৈশাচিক কার্যের পরিচয় প্রদান জন্যই এখানে এ
ঘটনার উল্লেখ করিয়াম।

নবম পরিচ্ছেদ ।

অল্পসন্ধানে কোন ফল হইল না। তারাপদ বাড়ীতে আসিয়া বুক পিটিয়া চিৎকার করিয়া কাদিতে লাগিলেন।

ভাষার জী মূর্খ, বৃদ্ধা মাতা হতজ্ঞান।

বাড়ীর কর্মচারী থানায় শবর দিয়াছে। সুশীল বাবু বয়ং মহকুমা মাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব নিকট গিয়া জরুরী তদন্ত প্রার্থনা করিয়াছেন, অগ্নীয় স্বজন অল্পসন্ধানে ব্যাপৃত। দেশ যেন অরাজক হইয়াছে; ঘরের জী, বধু, ভগিনী, কত দিনে বিপ্রহরে ঘরের বাহির হইতে শিহরিয়া উঠিতেছে।

মহকুমা হইতে পুলিশ সাহেব জরুরী তদন্তে চলিয়া আসিয়াছেন। তিনি এজাহার লইলেন।

“গতকল্য রাত্রে তারাপদ ঘোষালের কন্যা প্রতিমা ভাষার পিতামহীর সহিত তাহার অপর দুই ভ্রাতাকে লইয়া নিজিতা ছিল। রাত্রি একটায় তারাপদ ঘোষালের বৃদ্ধা মাতা ঘটনাক্রমে বাহিরে গেলে স্থতিকা গৃহে থাকিয়া হঠাৎ তারাপদের জী তাহার কন্যার চিৎকার শুনিতে পান। তিনি উঠিয়া বাহিরে অনেক লোক দেখিতে পান, তাহারা তাহার শাশুড়ীর ঘর হইতে তাহার চৌদ্দ বৎসরের কন্যা প্রাত্যহিক ধরাধরি করিয়া লইয়া বাহিরেছে। মেয়ে একবারের অধিক আর চিৎকার করিতে পারে নাই। তিনি চিৎকার করিয়া যাইয়া মেয়েকে ধরিতে চেষ্টা করেন। এক জন লোক তাহাকে সিঁড়ির উপর ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। এই সময় বৃদ্ধাও ঘরের পাছ হইতে চিৎকার করিয়া বধু দলের পশ্চাৎ ধাবিতা হন; তাহারা তাহাকেও আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। সম্ভবত মেয়েটিকে ক্লোরফর্ম করিয়া অজ্ঞান করিয়া নেওয়া হইয়াছিল। তীব্র গন্ধ বৃদ্ধ একটা রুমাল বাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে পাওয়া গিয়াছে। (তাহা প্রদর্শিত হইল)। তারাপদ প্রথম চিৎকারেই উঠিয়াছিলেন। কিন্তু দশূরা বাহির হইতে প্রতি ঘরের দরজা আটকাইয়া রাখায় তৎক্ষণাৎ কেহ বাহির হইয়া কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। ঘটনার অল্পমান ১৫২০ মিনিট পরে বাহের বাড়ীর লোক তাহাদের ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিয়া

তারাপদ বাবুর ঘরের সিকল খুলিয়া তাহাকে বাহির করে। তখন অল্পসন্ধান আরম্ভ হয়। ঘটনার অপর সাক্ষী নাই। আসামীগণকে ফেহ চিনিতে পারে নাই। তাহাদের মাথায় কাপড় বাঁধা ছিল। পূর্ব দিনের হিন্দু হিতসাধনী সভার অধবেশন হইতেই এই আক্রোশের স্রষ্টা, অল্পমান করা যায়। ইতি।

পুলিস সাহেব এজাহার লইয়া তদন্তে চলিয়া গেলেন। আর তারাপদেগৃহ—সে দিন যেন অশানের নম্র চিত্র বৃকে লইয়া আশঙ্কার ক্রিতে লাগিল। সে কি ভীষণ অবস্থা!

* * * *

তৃতীয় দিন প্রাতে তারাপদ ঘোষাল বুক বাধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দ্রাক্ষেও মাকে বলিলেন—‘তোমাদের বাহার যত কান্না আছে কাদিয়া নাও, আমি আর ভাবি না, আর কাদব না। আমার কোন কন্যা নাই—মন হইতে তাহা দূর করিয়া দিয়াছি। যে ছিল, সে পরশ্ব রাতে মারিয়া গিয়াছে প্রাতমা বিসর্জন দিয়াছি। দুহাদিন তাহার জন্ত কাদিয়াছি, আর কত?’

তারাপদ পুলিশ সাহেবকেও জানাইলেন—“সাহেব আমাকে আর যন্ত্রণা দিওন—আমার অকলঙ্ক কুলে কালমা পড়িয়াছে, আর না! এ কন্যা আর আম পাহব না, পহতে চাইনা।—আমার মৃত প্রাণ, দ্রাক্ষে ও বৃদ্ধা মাতাকে—আর নিয়া যন্ত্রণা দিও না—সে যন্ত্রণা আরো কঠোর, তাহা আর সহতে পারিব না। প্রাণে গভীর দাগা পড়িয়াছে—আর না। আর না।”

পুলিস সাহেব অবগত হইয়া এ কথায় তদন্ত পরিত্যাগ করিলেন না।

সুশীল বাবুও তাহার “হত সাধনী” পত্রিকায় এই মোকদ্দমার সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি-পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ কারতে ছাড়িলেন না। ফল কিছুই হইল না।

তারাপদকে শত্রু দমনে পশ্চাৎ পদ দেদিয়াকেহ বালল—‘মেয়েটা বাহির হইয়া গিয়াছে। এত বয়সেও ঘরে রাখলে কি—ইত্যাদি।’

কেহ বালল—‘লোকটা হৃদ কপণ—পরমা ধরুচ দেখয়া পাছে হটিয়াছে,—ইত্যাদি।’

কেহ বালল—‘চৌদ্দ বছরের মেয়ের কলঙ্ক বাড়ে লইয়া জীবন কাটানর চেয়ে এ ভালই হইয়াছে।’

তারাপদের হৃদয়ে এক আশ্রয় অলিতেছে—সে কুজি ভোগী ব্যতাত আর কে বুঝবে?

শ্মশান বন্ধু।

(১)

অন্ত গমনোন্মুখ স্বর্ষের শেষ লোহিত আভ্যুত্থান বন্ধে নিয়া ধরস্রোতা পদ্ম নাচিতে নাচিতে কোথায় কোন প্রিয়তমের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। পথের কোন বিষই আজ তাহার মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিতেছে না। বিষম কঠোরই হউক না কেন, বাস্তবের পদ প্রান্তে তাহাকে পঁছতেই হইবে, তাই তাহার গতি উদ্ধাম, একটানা সে কেবল চলিয়াছে।

শরতের নির্মল আকাশের নীচে গোমূলের শুভ্রকণে পদ্মাতীরে বসিয়া যাদব শূন্য দৃষ্টিতে কি ভাবিতেছে? তাহার মুখ মণ্ডলোচ্ছার রেখাগুলি স্পষ্টতর হয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ধর্ম; দেখেই চিন্তার গভীরতা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যুবক বাহ্য জ্ঞান শূন্য। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, সম্মুখে অনন্ত জলবাণী, ভিতরে ও অনন্ত চিন্তা তৎসং যুবকের প্রাণের মধ্যে এক বিরাট উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছে। জাগতিক সৌন্দর্যের কিছুতেই তাহার মন আকৃষ্ট হইতেছে না—অভিসারকা পদ্মার মতই যাদবের চিন্তা স্রোত একটানা চলিয়াছে।

যাদবের সহপাঠী জগদীন্দ্র নাথ বন্ধুর ভালসেই নদীর তীরে শুড়িয়া বেড়াইতেছিল। যাদবকে তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া একেবারে আসিয়া ঘাড়ে ধরিয়া বলিয়া উঠিল “ষ্টুপিড্! তৎক্ষণ তোকে খুজিয়া হয়রান্, একলাটি বাঁসয়া বুঝি পদ্মার ডেউ গণা হইতেছে?” তাহার চিন্তা ক্রটি মুখের উপর দৃষ্টি পরিত্যেই জগদীন্দ্র নিঃশব্দ অপরার্থীর মত যাদবের মুখের দিকে ঝায়ে চাহিয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া আর বাহির হইল না।

কয়েক মিনিট পরে জগদীন্দ্র পরম আশ্রয়ের মত মেহাস্পর্শের গলা জড়াইয়া ধরিয়া জড়িত স্বরে বলিল “ভাই তোমার চোখ ছিল ছল করিতেছে কেন? এমন ত কোন দিন দেখি নাই—বিষয়টা কি বল দেখি?” যাদব কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে জগদীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—“কেন এমন হয়? আচ্ছা তুমিই বলনা, কেন এমন হয়?” “ব্যাপার কি সেটা না জানিলে কেমন

করিয়া বলিব, কেন হয়? বিষয়টা খুলিয়া বলনা”। বলিয়া জগদীন্দ্র মহা উৎকর্ষের সহিত উত্তরের প্রতীক্ষায় এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া যাদব বলিতে লাগিল—“বলিতে ছিলাম কি, একই ভগবানের সৃষ্টিতে এতটা পার্থক্য হয় কেন? বলবান্ তুর্জলকে নির্যাতন করিতে এত তৎপর কেন? কেনই বা মানুষ স্বাভাবিক শাস্তির উপর একটা অশাস্তির ছায়া ফেলিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করে? এ হীন প্রশ্ন কেন?” বলিতে বলিতে যাদবের চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বন্ধুর চোখে জল দেখিয়া জগদীন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল। যাদবকে আরও নিকটে টানিয়া লইয়া পরম স্নেহ ভরে সমস্ত বিষয়টা খুলিয়া বলিতে অহুরেণ করিতে গিয়া তাহার নিজের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আলো ও আঁধারের মহা সাক্ষ্যে এ কি স্বর্গীয় দৃশ্য। কি স্বর্গীয় সহানুভূতি!

যাদব বলিতে লাগিল “জগদীন্দ্র! তোমার নিকট সমস্তই খুলিয়া বলিব, কারণ তোমার মত শূন্য আমার দ্বিতীয়টা নাই। তোমার নিকটই পরামর্শ চাহিতেছি, সংপারামর্শ দিয়া দারুণ চিন্তা হইতে আমাকে রক্ষা কর। বাবার ইচ্ছা আমরা সপরিবারে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করি। আমার অভিপ্রায় আগামী কলাই তাঁহাকে জানাইতে হইবে। এখন উপায় কি ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি”।

“কেন? তোমার পিতা খৃষ্টান হবেন কেন?”

“কেন?—সে অনেক কথা। জানইত বাবার মত ধর্ম ভর্তুকি লোক আমাদের সমাজে খুব কমই আছে। বুঝেই পার, কতটুকু মনের কষ্টে তিনি স্বধর্ম পরিত্যাগে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন। ক গভীর বেদনা যে তাঁহার হৃদয়কে অহরহ বিদ্ধ করিতেছে, সে আমি কতকটা বুঝিতে পারি। কতদূর অবিচারে আজ এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সনাতন হিন্দুধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেছে, যাহার জন্ত পিতৃপুরুষের দারুণ অভিসম্পাতে আমাদের দক্ষ করিবে। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এক গণ্ডুষ জল পর্যন্ত দেওয়ার অধিকার আমাদের থাকিবে না। তথাপি আজ বাবা আমার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তাহার কারণ কি জান?

—কারণ তোমরা,—তোমাদের নিষ্ঠুর সমাজের তথা
কিচিত্ত নারকগণ, আর তোমাদের স্বর্ণিত ব্যবহার।
আমরা জাতীতে নমস্—আমরা নাকি আবার একটা
মাইব? কুহুরের চেয়েও হেয় এমনি তোমরা
আমাদিগকে ভাব।”

কথাগুলি জগদীশ্বরের হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিল।
সেতো বাঘবের নিকট হইতে কোন দিন এমন কথা শুনে
নাই। বিশেষতঃ কথাগুলি তাহার প্রাণের নিভৃত-তম
প্রদেশ হইতে বাহির হইতেছে। সে অস্থির হইয়া বলিল
“কি করিয়াছে আমাদের সমাজ, যাহার জন্য আজ
তোমাকে এত অধীর করিয়া তুলিয়াছে?”

“শুন জগদীশ্বরে, সমাজে আমাদের স্থান সর্ব নিম্নে
হইলেও আমাদের শরীওও রক্তমাংসে গঠিত, ঠিক
তোমাদের মতই সুখ দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি আমা-
দের আছে, গায়ে ছুরিকা বিদ্ধ করিলে আমাদের দেহ
হইতেও ভেদমনি উষ্ণ লোহিত রক্তস্রোত প্রবাহিত
হইবে। নয় কি? সকল বিষয়েই ধৈর্যের একটা সীমা
আছে। তোমাদের অত্যাচার ধৈর্যের সীমা অতিক্রম
করিয়াছে, তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতা আমার
হিন্দু সমাজের কোল হইতে সরিয়া পড়িতে চাহেন।
আচ্ছা জগদীশ্বরে! নিম্নশ্রেণী হইলেও ত আমরা ও হিন্দুসমা-
জের এক একটা অঙ্গ। হিন্দুসমাজের লোকসংখ্যা আজও
বে ভারতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেছে, সে কি কেবল
তোমাদের মুষ্টিমেয় উচ্চত্তরের দ্বারা? না আমাদের
মতই নমস্, জেলে প্রকৃতি নিম্ন শ্রেণীর দ্বারা? হাত,
পা প্রকৃতি অঙ্গ বিশেষকে হুসল রাখিয়া কেবল দেহটা
বদ্ধ হইবে, এও কি সম্ভব? এ বিরাট হিন্দুসমাজের
বিরাট এবং শ্রেষ্ঠ বজার রাখিতে হইলে সমাজের হাত,
না—নিম্ন শ্রেণী গুলিকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে কেন?
হুই দিন বাদে যে সেটা একটা মহা জড়ে পরিণত হইবে।”

বল বুকের মত জগদীশ্বরে হা করিয়া সমস্ত শুনিতো ছিল।
কথা সমাপ্ত হইলে বলিল “কি করিতে হইবে আমাকে
বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দাও; আমি বথাসাধ্য ইহার
প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিব।”

অনেক সময় মনে হয়, তোমার মত কতকগুলি
মহামুভব উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় সমাজের কণ্টক
নীত্রই দূর হইতে পারে। অবশ্যই তাহাতে বিপদ এবং
নির্যাতনের যথেষ্ট ভয় আছে। ঘটনাটা কেন
এতদূর গড়াইয়াছে তাহা প্রথমে শোন। সে দিন
আমার ছোট ভাই তোমাদের বিজ্ঞানিষি মহাশয়ের
পুকুরে স্নান করিতে গিয়া গায়ে সাবান মাখিতে ছিল।
বিজ্ঞানিষি মহাশয় দেখিতে পাইয়া কত কি যে কটুক্তি
করিলেন সেটা অবজ্ঞা। জগাই চাঁড়ালের ছেলে—
সে বেটা কিন গায়ে সাবান মাখে তাও আবার
ভদ্রলোকের পুকুরে বসিয়া। ছপাতা ইংরেজী
পড়িয়া আমরা না ক একেবারে মাথায় উঠিয়া
বসিয়াছি, তাঁদের মান সম্মান নাকি নষ্ট হওয়ার যোগাড়
ইত্যাদি কত কিছু! এতগুলি কটুক্তির উত্তরে সে কেবল
তাহার কি অপরাধ, তাই জিজ্ঞাসা করিয়া ছল। তিনি
ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের পিতামাতা শুদ্ধ চৌদপুরুষকে
পর্যন্ত ছাড়িয়া কথা বলেন নাট। আর তাঁর চাকর
দ্বারা কাণে ধরিয়া তাহাকে পুকুর হইতে উঠাইয়া দিয়া-
ছেন। ভাবদোধ, এ কেমন অবিচার? এই যে স্বপ্নার
ভাব, একি ঠিক? পূর্ব হইতেই নানা কারণে আমার
পিতাভাইার কোন খুঁই বন্ধুর উপদেশে খুঁটান হওয়ার জন্য
সামান্য ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতেন, এই ঘটনা
তাহাতে ইচ্ছন নিক্ষেপ করিয়াছে। আজ যদি বাবা
খুঁই ধন্য গ্রহণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজের প্রায়
তিনশত লোক একদিনেই স্বর্গ্য পরিত্যাগ করিতে
প্রস্তুত। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে এরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ
অবরহ ঘটিতেছে। নিম্নশ্রেণীর ভিতরে মিশনারিগণ
একটা নূতন প্রেরণা আনিয়া দিয়াছেন, একটা নূতন
আলোক সম্মুখে ধরিয়াছেন, খুঁই ধর্ম্মের নিকট, সকলেই
সমান, উচ্চনীচ ভেদ নাই, অবজ্ঞা নাই, স্বর্ণানাই।
নিম্নশ্রেণীর ভিতরে তাহার। যেরূপ ভাবে শিক্ষা বিস্তা-
রের চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতেই মিশনারীদের উপর
তাহাদের একটা কৃতজ্ঞতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে।
তোমাদের সমাজ হইতে তাহার। বিন্দুমাত্র সহানুভূতি
পায় নাই—আশাও নাই। চিরদিন কেবল অবজ্ঞাই

পাইয়া আসিতেছে? এমন অবস্থায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ কি সম্ভব পর? যাদব চূপ করিল।

যাদবের সভ্যকথাগুলি অশ্রুর নিকট নিত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও জগদীশ্বরের প্রাণের ভিতর সেগুলি আঘাত করিল। সে বলিল “সত্যি যাদব একথাগুলি কেউ চিন্তাও করে না। ঘটনা চক্রে একথা তোমার নিকট হইতে না শুনিলে হয়ত এ চিন্তা আমার ভিতরেও স্থান পাইত না। আজ আমার চক্ষু ফুটিয়াছে আজ হইতে আমার জীবনের প্রধান কর্তব্য—এ অশ্রুর প্রতিকার পক্ষে বণাসাধ্য চেষ্টা করা, এখন অদৃষ্টে বাহাট ঘটুক।”

“কাজ যত সহজ মনে কর, তত সহজ সেটা নয়”। বলিয়া যাদব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল—“দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল যুবকদের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখ, ক্রাশে আমি সমপাণীদের নিকট হইতে কিরূপ বাবহার পাইয়া থাকি? আমার একমাত্র অপরাধ আমার নীচ বংশে জন্ম। তুমি আমার সঙ্গে বিশেষ ভাবে মিশিতে চাও বলিয়া তাহারা তোমাকে কত ঘৃণা করে, সে আমি বেশই জানি। এমন অবস্থায় তুমি কি আশা করতে পার? আমরা জানে বিজ্ঞানে যে এতটা পশ্চাতে পড়িয়া আছি তাহার কারণ—তোমাদের অব-হেলা। তোমাদের কি এটা কর্তব্য নয় যে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকেও উন্নত করিয়া তুলিতে সাহায্য করা। তাহা না হইলে যে সমাজের অধোগতি অনশ্বস্তাবী। চেষ্টা করিলে আমরাও যে কতকটা শিক্ষিত হইতে পারি, একথা অমর ঘনদিন যাবৎ ভুলিয়া গিয়াছি অথবা ভুলিতে বাধ্য হইয়াছি। আজ যে কোন উন্নত জাতীর দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, তাহারা সমাজের উচ্চনীচ সঙ্কলকে শিক্ষার সমান অধিকার দিয়াছেন এবং সে পক্ষে বণাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কতই না চেষ্টা হইতেছে। আর তোমরা ভাব যে আমরা শিক্ষিত হইলে তোমাদের মান সম্মান বজায় থাকিবে না। এমনি বার্ষপর তোমরা!”

(২)

বেলা প্রায় বারটা। শরতের রোদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে। বিভাদিনী মহাশয় বৈঠক খানার বারান্দায় একখানা

ইজি চেয়ারে অর্কশায়িতাবস্থায় শুড়শুড়ের নলে তামাক সেবন করিতেছিলেন। এমন সময় জগদীশ্বরের নিকটস্থ পথদিয়া দ্রুত চলিয়া যাঠিতেছিল। বিভাদিনী মহাশয় জগদীশ্বরের জাতি সম্পর্কে জোঁঠতাঁত। তাহাকে দ্রুত চলিয়া যাঠিতে দেখিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন, এবং বাস্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে বধন শুনিতে পাইলেন যে পাড়ার রাস্তা চাঁড়ালের দ্বীর কলেরা হইয়াছে এবং তাহারই জন্য সে ঐ বধ আনিতে যাঠিতেছে। তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—“তাইত! এতদিন যাগা শুনিয়া আসিতেছি তাহাতো সত্যি। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া চণ্ডালের সেবা করিস তুই? ঘোর কলি, অগ্ন্যে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। নিধুর ঘরে একটা কুলাঙ্গার জন্মেছেস তুই ব্রাহ্মণ হইয়া ছোট লোকদের—শত্রুর মলমূত্র খাটিয়া বেড়াস; শত্রুর দত্ত জিনিস ভক্ষণ করিস। ব্রাহ্মণ তিনযুগের দেবতা। হায়! দেশ রসাতলে গেল! তাদের জন্তুইত দেশে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ লাগিয়া আছে। জানিস সমাজে তোকে নিয়া কত আন্দোলন—।” বাধা দিয়াই জগদীশ্ব বলিয়া উঠিল “জানি জেঠা মহাশয়! আমি সবটো জানি, সমাজ যে আমাকে নির্যাতন করিতে চায় তাও জানি, কিন্তু উপায় নাই। ওদের কেউ নাই জেঠা মহাশয়, তাই যত দূর পারি, শুশায়ার সাহায্য করি; সেবা করিবার মত ক্ষমতা এখনও আমার হয় নাই। আর আপনি ব্রাহ্মণ বলছেন কাহাকে? আমি তো ব্রাহ্মণ নইই, আর আমার মত যাহারা ব্রাহ্মণের কর্তব্য পালন করে না, তাহারাও সবাই এক। জিয়া কাণ্ডে আস্তা নাই, বিজাতীয় পোষাকে অঙ্গ ঢাকিয়া চূপে চূপে কালু খানসামার দোকানে ঢুকিয়া চপ, কাটলেটে রসনা তৃপ্ত করতে বাধা নাই, আর বাধা হইল, দুর্জল তাইটাকে সাহায্য করবার সময়। কেবল পূর্ব গৌরবের দোহাই দিয়া তাহাদের সমান অধিকার পাইতে চাহি। এও কি সম্ভব? আর সমাজের ভয়? সমাজের আন্তর্য কোথায়?—আর যে সমাজ দুঃখীর দুখে সহানুভূতি করিতে দেখিলে কোল হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, দুর্জলকে পীড়ন করিয়াই যে সমাজের আনন্দ, এমন সমাজ আমি চাহিনা, বরং তাহা

পুণা করি। যেহেতু দান গ্রহণে যদি পাপ হয়, তবে কিসে যে পাপ না হয়, তাহা জানি না।”

“কি? আমি বিজ্ঞানিধি! আমার উপর সমা-
লোচনা করবীর অধিকার তোর? জানিস তাকে—”
বলিয়া বিজ্ঞানিধি মহাশয় ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন।
জগদীশ্বর মুহূর্ত্তে “আসি তবে” বলিয়া গন্তব্য পথে
প্রস্থান করিল।

বাইতে বাইতে ভাবিতে লাগিল “কেন এমনটা
হয়? একটু পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্ত না হয় উহার।
একটু সাবান গায় মাখিল, একখানা পরিষ্কার কাপড়
গড়িল, তাহাতে সমাজের এত মাথাব্যথা কেন? উহার।
নোংরা থাকিয়া অকালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কালের কোলে
চলিয়া পড়ুক, আর সমাজ তাড়াই আনন্দে নিদীক্ষণ
করিবে! কোথায় শিক্ষিত সমাজ তাহাদিগকে আপনা-
দের কোলে টানিয়া লইবে, তাহাদিগকে অজ্ঞানতার
অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া সমাজের পুষ্টি সাধন করিবে,
না—তাহারা আপনাদের অঙ্গেই কুঠাওয়াত করিতেছেন।
হারি হিন্দুসমাজ! এত নীচতা না চুকিলে তোমার ধ্বংস
হইবে কেমনে?” ভাবিতে ভাবিতে সে দ্রুত চলিয়া গেল।
সমাজ নেতা বিজ্ঞানিধি মহাশয়ের ক্রোধের প্রতি তাহার
স্বাক্ষেপও নাই—।

(৩)

তিন দিন কলিকাতায় ভুগিয়া জগদীশ্বরের মাতা শেষ
রায়ে দেহ ত্যাগ করিয়া অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন।
তাহার স্নাতক চিকিৎসা পর্য্যন্ত হয় নাই।

কিছুদিন পূর্বে হইতেই জগদীশ্বর সমাজে
একঘরে হইয়া আছে। গ্রামের ডাক্তার কবিরাজ
কেহই বিজ্ঞানিধি, তর্কবাগীশ প্রভৃতি নেতৃ-
বর্গের ভয়ে চিকিৎসা করিতে রাজী হন নাই।
সুতরাং একপ্রকার বিনা চিকিৎসাতেই তাহার শেষ
নিখাস বাহির হইল। জগদীশ্বর গ্রামের প্রত্যেকের
বাড়ীতে গিয়া যারের অভ্যন্তরে ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া
দিবার জন্ত নিত্যন্ত বিনীত ভাবে অনুরোধ করিয়া
আসিল, কিন্তু পর দিবস বেলা একপ্রহর পর্য্যন্তও কেহ
আসিল না। দিকপার দেখিয়া ঘরের দরজা উন্মুক্তরূপে বন্ধ

করিয়া সে গ্রামান্তরের একটা ইংরেজী স্কুলের মেসেজ ছেলে
দের শরণাপন্ন হইল। তাহাদের কেহ কেহ জগদীশ্বরের
পরিচিত। এবং প্রায় সকলেই বিভিন্ন স্থানের স্মৃতির
তাহারা এই সমাজের ধার ধারে না। মহা উৎসাহে এই
পরোপকারের জন্ত তাহারা কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

যথা সময়ে স্মৃতির দেহ ভয়ে পরিণত হইয়া গেল।
সুবকের দল হরিধ্বনি দিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।
আর জগদীশ্বর? আজ জগতে সম্পূর্ণ অবলম্বন হীন
হইয়া সমগ্র সমাজের সহায়ত্ব হাণ্ডিয়া যে দিকে
তাহার চর্য চলিছিল, সেই দিকে পদ নিক্ষেপ করিল।

শেষ বেলায় সমাজের প্রধান প্রধান পাণ্ডাগণ
সভা করিয়া স্থির করিলেন, এ বিপদে জগদীশ্বরকে ক্ষমা
করা বাইতে পারে, অবশ্যই কতকগুলি সর্ত্তের সহিত।
সুতরাং তাহার। দল বাঁধিয়া জগদীশ্বরের ঘরের সম্মুখে
আসিয়া দেখা দিলেন। ততক্ষণে উপেক্ষিত, সমাজ
পরিভ্রান্ত জগদীশ্বর অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

(৪)

পরোপকার জনিত আত্ম প্রসাদ যিনি উপভোগ
করিয়াছেন, কেবল তিনিই জানেন—তাহাতে কত আনন্দ।
যিনি এ সুখের আশ্বাদ পান নাই, তিনি হয়ত ভাবিবেন—
মানুষ আত্মতৃপ্ত বিসর্জন দিয়া ঘরের পরসী খরচ করিয়া
কেন পরের জন্ত ছুটিয়া যায়? এ বোধ হয় মনের একটা
খেলার মাত্র! মানুষ অবিয়া দেখেনা, আজ যদি সে
অপরের বিপদে সহায়ত্ব প্রদর্শন না করে, আগামী
কাল যখন বিপদ তাহার উপর আসিয়া উপস্থিত হইতে
পারে, তখন অস্ত্রে তাহাতে কেন উপেক্ষা প্রদর্শন
করিবে না।

আজ বিজ্ঞানিধি মহাশয় স্কুল মনে বসিয়া চিন্তা
করিতেছেন। ঘরে তাহার সহধর্ম্মিণী মৃত্যু শব্দ
শায়িতা, একমাত্র পুলকিত হইয়া বাবৎ ভেদ বমন
আরম্ভ হইয়াছে। দাস দাসী ভয়ে কয়েক দিন বাবৎ
বাড়ীর সীমানার ভিতরেও আসে না। গ্রামের গ্রাম
সকলের বাড়ীতেই এইরূপ। কে কাহাকে সাহায্য
করিবে? বিশেষত কলিকাতা বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক রোগের
কাছে সহজে কেহ সঁহািতে চায় না। পিতা যেহেতু ধন

পুত্রকে পরীক্ষা পরিচাণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। কে আজ বিপদ মাধ্যম করিয়া বিজ্ঞানিধি মহাশয়ের সাহায্যে অগ্রসর হইবে? তিনি স্বয়ং বুদ্ধ, একাকি করিবেন? ডাক্তার ডাকিতে যাইবেন, না রোগীর পথ্যাদির বন্দোবস্ত করিবেন? এদিকে রোগীর নিকট বসিয়া দুইটা সান্ত্বনার কথাও বলিতে হয়। আজ তাহার মহা বিপদ। ভাবিয়া কোন কুল কিনারা পাইতেছেন না।

বিপদের মধ্যে পড়িয়া আজ তাঁহার জগদীশ্বরের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে গ্রামে থাকিলে কখনই আমার এ বিপদ উপেক্ষা করিতে পারিত না। সেত গ্রামের ছোট বড় সকলের বিপদেই প্রাণ পাত করিয়া সাহায্য করিত। আমি সমাজের নেতা, অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া তাহাকে দেশত্যাগী করিয়াছি, ভগবান আজ আমার উপযুক্ত সান্ত্বিই দিয়াছেন।”

ভাবিয়া ভাবিয়া বিজ্ঞানিধি মহাশয় নীরবে অশ্রু মোচন করিতেছিলেন। এমন সময় দরজার পদমঞ্চ শুনিয়া সেই দিকে চক্ষু ফিরাইয়াই দেখিতে পাইলেন, জগদীশ্বর নাথ সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি বিস্ময়ে স্বপ্না বিষ্টের মত জগদীশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ভাবিলেন এ স্বপ্ন। ক্ষণিক পরে যখন বুঝিতে পারিলেন, এ প্রকৃতই সত্য, তখন এক লম্ফে উঠিয়া জগদীশ্বকে বন্ধে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—এসেছি বাবা? আজ আমার—” আর বলিতে পারিলেন না। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। জগদীশ্বরের স্বন্ধে মস্তক রাখিয়া অনবরত অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগলেন। জগদীশ্বর নাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—“আসবনা? সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমি ত সমাজকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। ইহার সঙ্গেই যে আমার আশৈশব সম্বন্ধ; এই মাতৃভূমিই যে আমার জন্ম—আমার তীর্থক্ষেত্র। গ্রামের এই ছর-বহার সংবাদ গ্রামান্তর হইতে শুনিয়াই কতদূর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমার কি আর অভিমান করিবার সময় আছে! যাক সে সব কথা—সে সমস্তই তুলিয়া গিয়া আমাকে ক্ষমা করণ, আপনি যে আমার পিতৃ স্থানীয়।”

মৃত্যু যাহার ঘরে, কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। জগদীশ্বরের প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বিজ্ঞানিধি মহাশয়ের স্ত্রী অমর লোকে চলিয়া গেলেন। সাধ্বী মৃত্যুর পূর্বে জগদীশ্বকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছেন। জগদীশ্বরের স্বন্ধে চেষ্টায় বিজ্ঞানিধি মহাশয়ের একমাত্র পুত্রটি আরোগ্যের পথে দাঁড়াইয়াছে। সে যে মাতৃগণা হইয়াছে একথা তাহাকে জানিতে দেওয়া হইল না।

মৃত্যুর সংস্কার এখন মহা সমস্তার বিধায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের কেহই ভয়ে মড়া পুড়াইতে স্বীকৃত হইল না, অধিকন্তু গ্রামস্থ প্রায় সকলের বাড়ীতেই কেহ না কেহ কাতর। এই সব অজুহাতে কেহই আসিল না। জগদীশ্বর তাহার বন্ধু যাদবের এবং নিরশ্রমীর আরও কয়েক জনের সাহায্যে বাঁশ কাঠ প্রভৃতি শ্রমশান ঘাটে লইয়া গেল। তৎপরে বিজ্ঞানিধি মহাশয় এবং জগদীশ্বর একযোগে মৃত দেহ শ্রমশান ঘাটে লইয়া গেলেন।

জগদীশ্বর নাথ একাকীই সমস্ত আয়োজন করিয়া মৃত দেহ চিতায় তুলিয়া দিল। বিজ্ঞানিধি মহাশয়ের চক্ষু হইতে কৃতজ্ঞতার উৎস ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তিনি ছুটিয়া গিয়া অশ্রুচণ্ডাল যাদবকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন “বাবা! আজ আমাকে খুব শিক্ষা দিয়াছ, আমার সহস্রশ্রমীর শ্রমশান বজুর কাজ করিলে। সমস্ত দুর্ভাবহার তুলিয়া গিয়া আমাকে ক্ষমা কর। আজ শ্রমশান ভূমেই আমাদের মনের মলীনতা বিসর্জন দিয় গেলাম।”

যাদব বিজ্ঞানিধি মহাশয়ের পদধূলি মস্তকে তুলিয়া নিল। পুনরায় বিজ্ঞানিধি মহাশয় যাদবকে আলিঙ্গন করিয়া মস্তকে সহস্র চুম্বনে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন। বাবা তুমি আমারও শ্রমশানবদ্ধ।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর সরকার।

কাবুলে বাঙ্গালী।

কাবুলওয়াল লমণকারী সওদাগর দেখিয়া আমরা কাবুলের স্বভা অস্বস্ত্য করি। ফলে কাবুল দেশ নছে, উহা আফগানিস্থানের রাজধানী। এই সে দিন কাবুলের আমীর হবিবুল্লাহ হত্যার আশঙ্কা ঘরে ঘরে কাবুলের

কথা আলাপ করিয়াছি। কাবুলে কেবল মারামারি ধরাধরি হয় বলিয়া ভারতের লোক প্রায় কেহ কাবুলে যাত্রার কবুল করে না। আমার স্তায় শীতল শোণিত বাঙ্গালীও যে কাবুলে যাওয়ার কবুল করিয়াছিল তাহা আর একজন পেশোয়ার প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহস ও সহায়তা পাইয়া। বড় ভয় হইয়াছিল, কেমন করিয়া কাবুল যাইব। এক একটা পালোয়ান দেখিয়া পেটের পীড়া পর্যন্ত চমকিয়া উঠে। পেশোয়ারীদের মধ্যে কাবুলী ধাত অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। রাওলপিন্ডি, পেশোয়ার প্রভৃতি সামান্য প্রদেশে আসিল কাবুলী দেখিতে পাওয়া যায়। কাবুলের আমীর অনেক কাবুলীকেই এ সকল স্থানে নিরীকসন দণ্ড দিয়া পাঠাইয়া থাকেন। কেমন ভাদের গৌর উজ্জল কান্তি, কেমন তাদের প্রকাণ্ড দেহ! আমরা বাঙ্গালার যে সকল কাবুলী দেখিয়া থাকি তাহাদের অধিকাংশই সীমান্ত প্রদেশবাসী, কাবুল হইতে নিরীকসিত কাবুলী।

সর্ব প্রকার হীন গুণ সম্পন্ন আমা হেন নিরীকস, কীণ কেহ বাঙ্গালীর কেমন করিয়া কাবুল দেখিবার আগ্রহ হইয়াছিল, সে কথা আমি আজ নিভৃতে চিন্তা করিয়াও ঠিক করিতে পারিতেছি না। ফলে সেই প্রবাসী বাঙ্গালীর উত্তম উৎসাহই আমাকে সাহস দিয়া কাবুলে পাঠাইয়া ছিল, একথা নিশ্চিত। সেই বাঙ্গালী যুবকটিও অবশ্যই আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। আমি পেশোয়ারে যাত্রার সজ্জা করিয়াছিলাম, এই যুবক তাহারই ভ্রাতাপুত্র। যুবক কহিল, “আমি আপনার সঙ্গী হইব, আপনি কি এতদূর আসিয়া ফিরিয়া যাইবেন?” “আমার প্রাণে বল আসিল, আমি বলিলাম “তথাস্ত।”

তখন যাওয়ার কি উপায় করা যায়? বাটবার পূর্বে কি করিতে হয়, আমার গৃহস্থামীর নিকট সে সব জামিয়া লইলাম। সেখানে গিয়া কি করিতে হইবে তাহাও জানিতে বাকী রাখিলাম না। তাঁহার ভ্রাতাপুত্র বাটতে চাহিতেছে, এ কথা বলিলেও তিনি বড় বেশী আপত্তি করিলেন না।

চৈত্রমাসটার বসন্ত কাল আমাদের দেশ হইতে এক বৎসরের ভ্রম কার্ণো লইয়া বিদায় গ্রহণ করে; কিন্তু দে

হানে এই সময়ই বসন্ত বাতাস গুডমর্নিং বলিয়া সকলকে অভিবাদন করিয়া প্রবেশ করে।

পেশোয়ারে আসিয়াই ভ্রমকারীর তালিকায় লিষ্ট ভুক্ত হইয়াছি।

সীমান্তে বাঙ্গালী যেন হংস মধ্য বক। যে সকল পঞ্জাবী ও মাদোয়াড়ি বাবসা হুত্রে কাবুল যাত্রাত করে, গৃহস্থামী আমাকে তাহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া দিতে লাগলেন। একজন কাবুলীকে পাইলাম, তিনি আসাম-বেঙ্গল রেলের কন্ট্রোলার, কাবুল বাণী, বেশ ইংরেজী বলিতে পারেন। তিনি বড় ভদ্র মুসলমান। তাহার নিকট বেশ উৎসাহ পাইলাম।

কাবুলের লোক যেমন কলিকাতাকে দেশ মনে করে, আমরাও কাবুলকে তদ্রূপ দেশ মনে করি। সেটা হুবহু দেশ হইলেও আমরা কাবুলের নামে নিতান্ত কাবু হইলাম না। আফগানদের বাস বলিয়া সে দেশের নাম আফগান স্থান। যাত্রার আয়োজন করিয়া প্রথমেই পেশোয়ারের কেণ্টন-মন্ট মার্কেটস্ট্রিটের নিকট হইতে পাশ আনিলাম। উহা না লইয়াও যাওয়া যায়, তবে তাহার পাস লইয়া গিয়া মারাগেল ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া সে তত্ত্বটা এখানে আসিলে তিনি বাঙ্গালার আমাদের গৃহে সে তত্ত্বটা জানাইবেন।

পেশোয়ার হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে আমীরের কাছারী, সেখান হইতে পাশ না লইলে যাওয়া যায় না। বাবসায়ীদের পশ লাগে না, অস্ত্রের পাঁচ টাকা করিয়া ফি দিতে হয়। *

সত্যই একদিন কাবুল যাত্রা করিলাম। আমাদের পরিধানে পঞ্জাবী পোশাক, সাহেবী পোশাক পরিয়া গেলে কাবুলীরা সাহেব মনে করিয়া মারিয়া ফেলিতেও পারে। এক রাশ কাবুলী, পেশোয়ারী ও মাদোয়ারীর মধ্যে আমরা দুইজন মাত্র বাঙ্গালী। পঞ্জাবী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিত্রতা করিলাম। তারা হু'বেলা রাঁধে, বাড়ে, খায় ও খাওয়ায়। আমরা এমনই হতভাগা তাহাদের ব্রাহ্মণের হাতের রাঁধা আমরা খাই, এদিকে তাগা কিন্তু আমাদের জল টুকুও খায় না। বাঙ্গালীরা বিদেশে গিয়া আপনার জাতটাকে অজ্ঞানী করে, এতাই বিদেশীরা জানে না, বাঙ্গাল দেশেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ আছে।

আমরা খাইয়ার পাশের ভিতর দিয়া বাইতে লাগিলাম। তিনঘাছি, আরো দু'একটা পাশ দিয়াও যাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গে কাবুল গবর্ণমেন্টের অনেক গুলি স্কোপ ছিল। এই পাশে ডাকাতি হয় বলিয়া গবর্ণমেন্টের এত সাবধানতা। বোড়া, উট অথবা গাধার পৃষ্ঠে চড়িয়া যাওয়া যায়; ভাড়া খুব সামান্য। হাটিয়া যাওয়াও চলে। পথে খাড়াপি খুব মূল্যবান। আমরা দু'ঘ, বি খাইতাম বলিয়া সকলে আমাদেরকে ধনী, বড় লোক মনে করিত। ভারত সীমান্ত হইতে কাবুল আশি মাইল। মনে হয়, চার পাঁচ দিনে গিয়া পঁচছিয়াছিলাম। রাস্তা বড় দুর্গম—অত্যাচ্ছন্ন, উচ্চ অশুভ, প্রকৃতি পরীতে দেশ বেড়া। স্থানে স্থানে পরীতে হইতে করণা আসিয়া নামিয়াছে। তাহাদের জল বড় তরল, স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যকর। এ জলে লোহার ভাগ বেশী; অত্যাচ্ছন্ন বাতুর ভাগও আছে। এ জল আমাদের দেশের সালসা অগ্নিকাণ্ড উপকারী, তাই কাবুলীরা এমন বৈখ্যাণী, ভয়ঙ্কর।

কাবুল গিয়া পঁচছলাম। পঞ্জাবী ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই বাস স্থির রহিল। উহার ব্যবসায়ী। ভারত জাত ব্রহ্মাদি কাবুলে নেয়। কাবুল জাত বস্ত্র ভারতে আনে। সেখানে প্রায় ঘরই রস্তুর নিম্নিত, শীত প্রায় লাগে না। ব্রাহ্মণের পর শীতের সময় প্রতি গৃহেই আগুন করিতে হয়। বরফ গলিয়া শীত কালে রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত হয়। প্রাতঃ সূর্য্য যখন পূর্ণ গগনে লোহিতাকার হইয়া উঠে, তখন তাহার কিরণ রাশি চারিদিকে বরফের উপর ছড়াইয়া তাহা সুবর্ণ রক্ত কণিকা সূর্য্য ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতে থাকে। কি অপরূপ শোভা, বাঙ্গালার বসিয়া এমন সৌন্দর্য্য অনুমানও করিতে পারি নাই।

বসন্তাগমে নানাজাতীয় পশু, পক্ষীর আনন্দ কোলাহল ধ্বনি আমাদেরকে আর এক নব জীবনের আনন্দ দমন করিত। সেখানে বন কুকুটের অভাব নাই। এখানকার হিন্দুরা বন মুগ্ধ-ধায়। এখানে হিন্দুও আছে, উহার মুসলমানে, পক্ষে মুষ্টিমেয়। এখানকার, হিন্দুরা মাধার এক একটা টিকি রাখিয়াই বালাস। এখানে একটা কালী বাড়ী আছে। মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী সিংহী বিদ্রোহের সময় কালীর পশ্চিম প্রদেশে

প্রত্যেক সহরেই বাঙ্গালীদের লগ্ন এক একটা কালী বাড়ী স্থাপন করিয়াছিলেন তিনি কাবুলেও একটা স্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী একটা ব্রহ্মচারী তাহার সেবাইত ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর এখন কাবুলী ব্রাহ্মণেরাই তাহার সেবা পূজা করেন। উহার সেবা পূজা আমীর প্রাক্ত জায়গীর বা দেবোত্তর ভূমি দ্বারাই চলে। হিন্দুরা সংখ্যিক কম হইলেও মুসলমানেরা তাহাদের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করে না। এই কালী দেবীর কাছে হাগ বলি দেওয়া হয়। মুসলমানেরা শব্দ ঘটাদির শব্দে গোলমাল করেন না। সর্সদা পরস্পরে বিবাহাদি উৎসবে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করে। একত্রে বাসিলেও যখন মুসলমানের মসজিদে আত্মান ও হিন্দু মন্দিরে ঘটাদি হয়। তখন যে যার মত মসজিদে ও মন্দিরে চলিয়া যায়। এখানকার মুসলমানেরা গোবধ করেনা, তাহার প্রমাণ আমীর হবিবুল্লাহ ভারতে আসিয়া দেখাইয়াছিলেন। গোবধ হইবে তিনঘা তিন দিল্লীতে ইদের সময় বাইবেন না খেলায় দিল্লী ওয়ালারা গোবধ করিবে না বলিয়া জানাইলে তিনি দিল্লী গিয়াছিলেন। এখানকার হিন্দুরা শাক্ত, হর্যোপাসক, মহাপ্রভু চৈতন্য দেব এখানে তাহার ধর্ম প্রচার করেন নাই বলিয়া তাহারা বৈষ্ণব ধর্মের কথা অবগত নহে। এখানে চাতুর্ভুজ দেখিতে পাইলাম না। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রই দেখিয়াছি। তিনঘাছি কোন কোন মুসলমান ব্রাহ্মণ কস্তা বিবাহ করিয়া নিজকে গৌরবাভিত মনে করেন।

কয়েক দিন বাসের পর আমার একটা খোরাল চাপিল কেমন করিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করা যায়। আমাদের একটা বাজ বাহিরে লটকান থাকে, তাহাতে যাহারা পত্র বা আবেদন লিখিয়া দেয় তাহা তাহার সম্মুখে খোলা হয়, সে সকল জিনিষ ঘুরে পাঠ করেন। আমি তাহা জানিতে পারিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিবার প্রার্থনা করিয়া এই পত্র দিলাম। তার পরদিন সাক্ষাতের আদেশ আসিল। তখন আমীর আকবর রহমান বাটিয়া আছেন। আমি সাহেবী গোবাক পরিয়া যথাস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলে আমার দেহ পরীক্ষা হইল। আমার সঙ্গে যারায়ক অস্ত্র নাই বলিয়া

আমি সাক্ষাতের অজুমা পাইলাম । একজন কর্মচারী আমাকে আমার সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন । সেটা ইংরেজী ধরণের বৈঠক খানা । আমার সাহেব আমার পরিচয় লইলেন । তিনি আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সব কথাই রান্নীতি সংক্রান্ত ।

প্রথম যখন ইংরেজেরা সে দেশে গাণিত্য করতে গিয়াছিলেন তখন সেখানকার সদায়েতা উত্তোষিত হইয়া আমীরের নিকট গিয়া উহাদিগকে দেশত্যাগী করিয়া দিতে প্রার্থনা করিয়াছিল । আমার সাহেব সকলকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন—“ইংরেজ আমার বন্ধু আমি তাহাদিগকে বাণিজ্য ও খৃষ্ট ধর্ম প্রচার কারিতে অজুমা দিয়াছি । এখন উহাদিগকে স্থায়ী করা তোমাদের হাত । তোমরা যদি তাদের ধর্ম বন্ধুতা না শোন আর তাদের ভ্রমাদি ক্ষম না কর, তবেই আমারও বন্ধুতা রহিল, আর তাহারাও চলিয়া বাইতে বাধ্য হইবে ।” তাহাই হইল ইংরেজ ধর্ম-বাজক ও সওদাগরেরা দেখ ছাড়িয়া চলিয়া গেল ।

আমীর সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার পর হইতে প্রত্যহ আহারের জন্ত আমি সরকারী সিংহ পাইতাম । এক বেলা অন্ন ও অন্য বেলা লুচি বা রুটী পাইতাম । এতাহ কালীবাড়ী হইতে বলিদেওয়া একটা করিয়া পাঠা পাইতাম, প্রচুর দুধ আসিত, আমি-দর দুই জনের জন্ত প্রত্যহ দুই সের করিয়া মদ আসিত । এমদ থাইতে বড় সুসাহু, বেশ তৃপ্তি জনক । মহুয়া ও কবলী দ্বারা প্রস্তুত মদ পাইতাম । সে দেশীয়দের মত্ত পান করিলে দণ্ড হয় । বিদেশীদেরা মত্ত ক্রয় করিয়া থাইতে পারে ।

আমার পোষাক দেখিয়া আমীর সাহেব কহিলেন “এ ত তোমার বিদেশীয় ইংরাজী পোষাক ; তোমরা কিরূপ পোষাক ব্যবহার কর ?” আমি আমাদের ধৃতি চারের কথাটা বুঝাইতে পারিলাম না । বলিয়াই পরদিন বাঙ্গালী পোষাকে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের আদেশ করিলেন । আমি পরদিন বাঙ্গালী পোষাক পরিয়া সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি দেখিয়া পথের বালক বালিকা দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল । আমীর সাহেব আমার বাঙ্গালী পোষাক দেখিয়া অনেক প্রশ্ন

করিলেন । যখন ঐ সকল কাপড় ও বিলাতি বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন আমাদের হতভাগ্য দেশের জন্ত বড় দুঃখিত হইলেন । দুঃদর্শী আমীর সাহেবের রাজ-নৈতিক কথা শুনিয়া অবাক হইলাম । আমীর সাহেবের নিকট আমায় সমাদর দেখিয়া কাবুলীরা আমাকে ইংরেজের গুপ্তচর বলিয়া মনে করিয়া প্রকাশ্যে আমাকে খাতির করিত, যখন মনে কি ভাবিত—সে চিন্তা করি নই । আমরা দেশে বসিয়া যে সকল কাবুলী দেখি, উহারা অভয় ও ইতর শ্রেণীর । কাবুলী ভদ্রলোকেরা অতি উচ্চ দরের এখানে কয়েকটা ইংরেজী নবিশ বাঙ্গালী কর্মচারী আছেন, তাহারা পঞ্জাব প্রবাসী বাঙ্গালী, তাহারা বাঙ্গালী ভাষা, পরিচ্ছদ সব ভূমিয়া গিয়াছেন বলিতেই হয় । বাঙ্গালার কখনো আসেন না পঞ্জাবের প্রবাসী বাঙ্গালীদের সহিত বিবাহাদি করেন ।

আমীর আবদর রহমানের দেহ খুব বলিষ্ঠ ছিল । আমি যখন হিমালয়ের গড়োয়াল প্রদেশে দেরাচুন ও দ্বিধিকেশ প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলাম তখন কাবুলের পূর্বতন আমীর দোস্ত মামুদ খাঁর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল । তিনি আমীর আবদর রহমানের পিতৃব্য, তিনি তখন বন্দী অবস্থায় ছিলেন । দোস্ত মামুদকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । তিনি দ্বিধিকেশ অঞ্চলে শিকারে বাহির হইয়াছিলেন, বহু অশ্ব, হস্তী তাঁহার সঙ্গে । কয়েকজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ তাঁহার রক্ষী ছিল ; বহুসংখ্যক সৈন্য তাঁহার কাগাগার, সাম্রাজ্য রক্ষণ করত । সেই সময় কাবুল হইতে অনেক লোক ভারতের পেশোয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে মিকাসিত হইয়াছিল । এখন সে দোস্ত-মামুদ ও আবদর রহমান কেহই পরাধামে নাই । আমি আমীর দোস্ত-মামুদকে তাঁহার প্রাচীন অবস্থায় দেখলছি, উপকাক্ষন সদৃশ রূপরাশি দেখিয়া বাস্তবিকই ভক্ত হইয়াছিল । দোস্ত-মামুদের এই ব্যয়টা কাবুল গবর্নমেন্ট হইতে ইংরেজ রাজের হাত দিয়া আসিয়া থরচ হইত ।

কাবুলের ভাষা পুস্ত, উহা উর্দু বা হিন্দির সঙ্গে মিলেনা । তবে কাবুলীরা উর্দু ও হিন্দি কিছু কিছু বুঝেন । প্রায় সকল ভদ্রলোকই কিছু হিন্দি জানেন । কাবুলে

নদী, করণা, ঝিল ও কুয়া প্রভৃতির জলই ব্যবহৃত হয়। এখানে পরদানশিন ও বেপারদা উভয় শ্রেণীর স্ত্রীলোকই দেখিতে পাওয়া যায়। রমণীরা শুন্দরীও অপেক্ষা কৃত লম্বা। প্রকাশ্যে বেশ্য বড় দেখিতে পাওয়া যায় না, বগুহেই অনেকে বেশ্যা পোষণ করে। সাধারণতঃ কাবুলে বেশী রুগি না হইলেও ফসল বেশ হয়। মাত্রী উর্বরা।

এখানকার আদালতে আমাদের ছায় কথার কথাট কোর্ট ফি দিতে হয় না। কাবুল সহরটী যেন, পুরানো সহর, সাবেকী ধরণে নির্মিত। নতুন সহর ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। দেশ যুদ্ধের বাদী। একদিন আমরা হুর্গ ও দৈত্যাগাস দেখিতে গিয়াছিলাম। Croop co. নির্মিত বহু অস্ত্র ও গোলাগুলি সেখানে রাখিয়াছে। কাবুলী দৈতদের পোষাক সাধারণ কাবুলীদের মত নহে। তাহারা তুর্ক দৈতীয় দৈতের জায় পোষাক পরিয়া থাকে। এ দেশে প্রচুর শীত বলিয়া এক একজন বহু শীতবস্ত্র গৃহে রাখিয়া থাকেন। স্বাস্থ্য বড় ভাল বলিয়া কোন রোগ এ দেশে দেখা যায় না।

এ দেশের গাভীগুলি প্রচুর দুগ্ধ দেয়। অজ্ঞাত গরু গরুও আকারে বহু বড় হইয়া থাকে। আমাদের দেশী ছাড়া অজ্ঞাত দেশী লোকেরাও কাবুলে বাণিজ্য করিতে আইসে। এখানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, উচ্চ বিদ্যালয় বেশী নাই। কাবুলে এখন একটী মাত্র উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। পুস্ত্র ব্যতীত অল্প ভাষার বিদ্যালয় নাই। উচ্চ বংশের লোকেরাই উচ্চ রাজকার্য্য পায়। আফিম আদালতগুলি সেকালে ধরণের হাকিম ফরাসে বসিয়া কাছারী করেন। উকীলের হাটু গাড়িয়া বহুতা করে। বাদী, বিবাদী দাঁড়াইয়া থাকে। স্বেচ্ছাচারী রাজ্য বলিয়া এ দেশে যে জাধিক অত্যাচার, অবিচার হয়, এমন মনে হইল না। এক রাজ হেকিমেরাই এখানে চিকিৎসা ব্যবসায়ী। আমাদের স্নেহে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ছিল, অনেককে বিনামূল্যে দিয়াছি। তাই আমি সেখানে ডাক্তার সাহেব বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলাম। আমি কাবুলের পশ্চিম-উত্তর সীমান্ত, কুশিয়ার সীমা পর্য্যন্ত

গিয়াছিলাম। পশ্চিম সীমান্তে কাবুল গবর্ণমেন্টের সৈন্যগণ আছে। যদি কোনো কুশ বা পারস্ত এ দেশ আক্রমণ করেন - তখনই এই সতর্কতা। সে দেশে আমাদের দেশের মত পাট কাটার আছে। সে সকল বাঙ্গালীর অপর নাম নাই, কেবল বারের নামে বাঙ্গালী পরিচিত।

বাহির চাহার সেখানকার কাবুলী হিন্দু, মুসলমান একই দরমের। আমীর হবিবুল্লা যখন ভারতে আসিয়াছিলেন তখন তাহার সঙ্গে কয়েক জন কাবুলী হিন্দুও আসিয়াছিল। হিন্দুদিগকে আমীর অত্যাচার অবিচার করেন না। কাবুলী ভদ্রলোকেরা অনেকই নর্মিভাষী, বিনয়ী। তাহাদের গৃহে পেট পরিয়া ফলাদি আহার করিয়াছি। অল্পসী পরিয়া আতুর থাকিয়াছি। চন্দ্র, বাসে খুব মস্ত। আমাদের দেশী এক পরমায় একসের চন্দ্র ও দুইপয়মায় একসের ছাগমাসে পাওয়া যায়। যে কাবুলী কনট্রাক্টরের কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তিনি আমাকে অনেক স্থানে লইয়া গিয়া দেখাইয়াছিলেন।

কাবুলে কোন কালে যে হিন্দু বসতি ছিল তাহা সে দেশের গাঁমের নাম শুনিয়াই বুঝা যায়। নাস্তি কোটাল, যমরুদ, রামকুণ্ড প্রভৃতি গ্রামের নাম শুনিয়া ইহা অসুমান করা সহজ। নন্দী এখানে কতোয়াল ছিলেন বলিয়া নাস্তি কোটাল ও যমরুদ হইতে যমরুদ এবং রাম কুণ্ডত সংজ্ঞেই বুঝা যায়। আর যদি সেখানে হিন্দু না থাকিবে তবে মহাশয় কখনও কখনও প্রায় শতাব্দী পূর্বে কাবুলে কেন দেবী কালী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিবেন?

আমি কাবুলে খুব সুস্থ ছিলাম। একদিন একটা হাঁচি পর্য্যন্ত হয় নাই। আমার দেহ ওজনে অনেক বাড়িয়াছিল। অনেকটা ফরসা ও বলিষ্ঠ হইয়াছিলাম। কাবুলে যে আনন্দ ও সুখ অসুতব করিয়াছিলাম এ দেশে এমন হইবার নহে। জীবনে আর তা হইবে না বলিয়া এখনও চুঃখিত আছি।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

কপোতী ।

বকুল গাছের উচ্চ শাখে,
 সবুজ পাতার আড়ে
 খড় কুটা আর শুক তৃণ
 বকুল ফুলের কাড়ে
 দীর্ঘ দিবার শ্রম-পীড়িত
 কপোত কপোতীর
 কত আকাশ কুসুম গাথা
 বাধা অধের নীড় ।
 কাগুন মাসের সূর্য্য ডোবা
 রদিন আকাশ ধামা,
 কির কিরিয়ে বইছে বায়ু
 কুসুম গন্ধ-ছানি ।
 শান্ত মধুর সাঁঝের কোলে
 দম্পতি যুগল
 বসে ছিল মুখে মুখী
 শান্ত অচঞ্চল ।
 বৃকের পাশে দুইটী ছানা
 যেন জীড়াল দিয়ে
 বিপদ সীমার যোজন দূরে
 রেখেছে লুকিয়ে ।
 সাক্ষ্যের সে মহানন্দে
 পরিপূর্ণ হিয়া ।
 দৃষ্টি মাঝে পুলক যেন
 উঠছে উছলিয়া ।
 ধরা যেন পূর্ণ-সুখের
 মহেক অধিকারী,
 তাই তরিতের হাতে ওঠে
 দাবান্নি উদগারি ।
 অলক্ষ্যেতে কোথা হ'তে
 ব্যাধের তীক্ষ্ণ-শর
 পড়লো এসে বহু সম
 দম্পতির উপর ।

আকুল ভয়ে কপোত হেরে
 কপোতী সে শরে,
 রক্ত রাগ! বকুল তলে,
 হির দৃষ্টে পড়ে ।
 কপোতী সে নীরব দৃষ্টি
 ক্ষণেক সেখা তুলি
 শেষ দেখা তার দেখে নিল
 পাত, পুত্রগুলি ।
 সে দৃষ্টি হায়, প্রকাশিল
 কতই কথা তার,
 কতই স্নেহ কতই ব্যথা
 কতই হাহাকার ।
 কতই প্রাণের গোপন কথা
 ছিল তারি মাঝে,
 শেষ কথা সে বলে গেল
 প্রিয় পতির কাছে ।
 বলে ছিল বুঝি কেঁদে
 আমার প্রাণের ধন
 যাছি সখে, তোমার দিগ্রে
 আজ কি শুভক্ষণ !
 বিবের শর এ— অহুদ আমার
 তোমাদের সব দেখে,
 তাগ্য আমার কাছে এসে
 মিল আমার ডেকে ।
 ধন্য আমি, এমন মরণ
 বদ আবির পাই
 আবার ফরে মিলবো প্রিয়,
 আজকে ভবে যাই ।
 ব্যস্ত কার প্রাণের কথা,
 নীরব দৃষ্টি ভরে
 কপোতী সে ক্লান্ত নয়ন
 হুঁসল চির তরে ।

শ্রীযুক্তাবতী সেন্দ্র

প্রাচীন কবিগান ।

প্রাচীন কবিগানগুলিকে বাঙ্গলা গীতি সাহিত্যের একটা অঙ্গ বা অংশ বলিলে,—কথাটা বোধ হয় সাহিত্য সেবী সজ্জন গণের অপ্রীতি কর হইবে না ।

এই গীত রত্নগুলি সাধারণ ধূসিবৎ অথবো উপেক্ষিত হইয়া ধীরে ধীরে সাহিত্য সংসার হইতে চির দূর হইয়া চলিয়া বাইতেছে । দুর্দৈব বশতঃ কেহ দেখিয়াও দেখিতেছেন না,—জানিয়াও জানিতেছেন না ।

এই প্রকারে যে আমরা অবহেলার বশীভূত হইয়া কত শত সহস্র গীত-রত্ন হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাহার সংখ্যা করিবে কে? এই উজ্জল রত্নগুলি কেন যে অজ্ঞাপিত বাণী ভাঙারে স্থান পাইতেছে না, আমি ইহার কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না ।

বর্তমানে যে সকল গীত ভগাবস্থায় অবশিষ্ট থাকিয়া প্রাচীন কবিগানের অস্তিত্ব প্রকার প্রয়াস পাইতেছে,—কুড়াইয়া লইলে তাহাও অপ্রচুর নহে । এবং যত্ন সহকারে খুঁজিয়া দেখিলে, দুই চারিটা অমূল্যরত্নও যেন মিলিবে,—এমন নহে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে,—আগ্রহাদুঃস্বাদানের অভাবে ধীরে ধীরে এগুলিও ধ্বংসের দিকেই চলিয়াছে ।

অত্যাচ্ছ গীত, কবিতা, টপ্পা ও পদাবলীর যেমন মুদ্রিত পুস্তক আছে,—কবি গানের তেমন কোন পুস্তক নাই । সুতরাং ইহার বিনাশ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে ।

অধিকাংশ কবিগানই গ্রাম্য সভাব কবির মানস কল্পতরুর বসন্তে জাত অমৃত ফল । সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য,—রস-আশ্বাদে অতুলনীয় । তবে রুচির তার-তম্যে কাহারও নিকট কটু-বচন বা তিক্ত ও বোধ হইতে পারে । কিন্তু নিরপেক্ষ রসনার চ্যাকিয়া দেখিলে ইহার আশ্বাদন যে অতিশয় মধুর, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারবেন না ।

নিম্নে সংক্ষিপ্ত সমালোচনার সাহিত্য দুইটা প্রাচীন কবিগান “সৌরভের, পাঠক গণকে উপহার প্রদান করলাম ।

(সদর ।)

চিত্তান,—রাই শ্রামের নিত্য লীলা নিত্য বৃন্দাবনে ।

পরাণ,—নিধু বনেগিয়ে, কুঞ্জভঙ্গ দিয়ে,—

প্রভাতে কাহ্ন চলেই দেখুন সনে ॥

লহর,—বিপিনে;—চম্পকের ফুল দেখে আকুল,

শ্রাম চিন্তামণি, মনে ভাবলেন আপনি,—

এইরূপ আমার চম্পক বরণী,—

তখন মাধুর্য্য ভাব পড়ে মনে, অধৈর্য্য শ্রাম ধরাগনে,

সুবল সখা ভেনে মনে, আনুতে ঘায় কমলিনী ।

মিল,—সুবল আপন বেশ রাইকে দিয়ে পাঠায় বনে,—

তীরে না চিনে বলেন কৃষ্ণ কেলে সোণা ।—

মহড়া,—ওরে সুবল সখা, কেন এলে একা,

প্রাণের প্রিয়া কি দেখা দিবে না ?

ধূয়া,—আমি চাঁপার ফুল অঙ্গে পবে, রাধারূপ মনে করে,
হলেম অচেতন,—

আমার চেতন করে, আনুতে তীরে কলে গমন,—

এখন ভাই বিরস মনে, এলে তুই কি কারণে,

আবার প্রাণের ধন রাধা বিনে প্রাণ বাঁচেনা ।—

(ওরে সুবল সখা,—ইত্যাদি)

খাদ,—সুবল প্রিয়নী বিনে আমার প্রাণ হবে না ।

লহর,—সুবল রে, সখা ভাবে তোমা সবে,

সখা ভ্রজেতে,—বাঁচাও বিপক্ষের হাতে,—

সুখে থাকো আমার সুখেতে,

ওরে আজকেন তোর মন উদাত্ত, শশীমুখে নাইয়ে
হাস্ত,

মিলন দেখি এ চক্ষুস্ত মববৎস বক্ষেতে ।

মিল,—পূর্ববৎ ।

রুমুং,—সুবল প্রিয়া কি বলেছে বল বল ।

ওরে ভাই সুবল, কথা বল সুবল, শুনে প্রাণ করি
শীতল ॥

তোমাতে ভাই পাঠিয়ে দিয়ে, আশা পথ নিরন্ধিয়ে,

প্রাণ আমার ছিল,—যেমন,—বারিশ্রু মীন,

বন পোড়া হরিণ, রাই বিনে ভাই এলি হৈল ॥

পরচিত্তান,— * * *

পরচিত্তানের লহর,— *

এই গীতটির চিত্তান হইতে প্রথম মিলের শেষ,—

“তীরে না চিনে বলেন কৃষ্ণ কেলে সোণা” পর্য্যন্ত কবির
উক্তি চলিয়াছে ।

কৃষ্ণ বামিনী বোপে নিধু বনে গিয়া শ্রীমতীর দেবা-
সাধ পূর্ণ করতঃ কুঞ্জ ভঙ্গ পূর্বক প্রভাতে রাখাল সনে

পৌটারগ করিতে বনে গমন করিলেন । পৌতের চিতান
পাঠ্যে কবি ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন ।

তৎপর চম্পক পুষ্প দর্শনে শ্রীমতীর অঙ্গ কান্তির
উদ্দীপনে কক্ষ আত্মহারা হইয়া মাধুর্য্য ভাবের অভিঘাতে
অচৈতন্যাবস্থায় ভূপতিত হইলেন । সুবল শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ
সখা । মরমের মরমী । সুভরাৎ ঘটনা বৃত্তিতে সুবলের
বিলম্ব হইল না । সুবল আর কাল বিলম্ব না করিয়া
অমনি শ্রীমতীকে আনিতে বাবটে * বাজা করিলেন ।

ভাবুক কবি, এত গুলি কথা পরাণের পর, লহরে
প্রকাশ করিয়া আপন কৃতিত্বের পরিচয়ই প্রদান
করিয়াছেন ।

সুচতুর সুবল আরান ঘোষের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া
ভাবিতেছেন, “শ্রীমতীর স্মার এমন কিশোরী কন্যাকে
দিনের বেলায় কেমন করিয়া পরপুরুষের সঙ্গ করণার্থ
কাননে পাঠাইব ? ইহার তো স্বাধীনতা কিছুই নাই ।
পরের ঘরের নব বধু । রায় বাণিজী শান্তদী ননদী
(মনস্কা) জটিল, কুটিল । তার আবার কক্ষ কলঙ্কিনী
বলিয়া গুলে শ্রীমতীর একটি অপবাদ ও আছে । হঠাৎ
কুল কামিনীকে বন কামিনী দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসা
করিলে, ইনি কি উত্তর করিবেন ?”

সুবল এইরূপ ভাবনা তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে
“রাইকে রাখাল বেলে বনে পাঠাইবেন” এই রূপ সিদ্ধান্ত
কটে উপনীত হইলেন । অগত্যা তাহাই করিলেন ।

এখানে কবি মিলের পদে এই ভাবটাই ব্যক্ত করি-
য়াছেন । যথা, “সুবল আপন বেশ রাইকে দিবে পাঠায়
বলে ।”

সুবল আপনার রাখাল বেশে শ্রীরাধাকে রাখাল
সাজিয়া বনে পাঠাইলেন, আর নিজে রাখাল সাজে রাখা
সাজিয়া গৃহে রহিলেন ।

বলা বাহুল্য, শ্রীমতী রাধিকা সুবলের সম বয়স্কা
ছিলেন । এবং তাহার (শ্রীরাধার) মুখের আকৃতি ও
অঙ্গপঠন সুবলের সঙ্গে অভিন্ন ছিল । ইহা স্ববিকল্প পণ্ডিত
পণ কর্তৃক ভাগবতাদি গ্রন্থের টীকায় নির্ণীত হইয়াছে ।

* বাবট, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গত একটি গ্রাম । এই গ্রামে রাধার
নিবাস হইয়াছিল ।

সুবল বেশ ধারিণী শ্রীমতী রাধিকা বন মধ্যে কক্ষ
সমীপে উপস্থিত হইলে, কক্ষ শ্রীমতীকে চিনিতে পারিলেন
না । তিনি বুঝিলেন, সুবল শ্রীরাধাকে আনিতে না
পারিয়া একাকী ফিরিয়া আসিয়াছে ।

কবি এই ভাবটী মিলের শেষ পদে ব্যক্ত করিয়াছেন ।
যথা, “তীরে না চিনে বলেন কক্ষ কেলোগোণ ।”
এই পর্য্যন্ত কবির উক্তি শেষ হইল । এখন হইতে পৌতের
অবশিষ্টাংশ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ।

সুবল রূপী শ্রীরাধাকে দেখিয়া কক্ষ কহিতেছেন,
মহড়া,—(ওরে সুবল সখা, কেন এলে একা, প্রাণের
প্রিয়া কি দেখা দিবে না ?)

শ্রীকৃষ্ণ রাধা রূপের উদ্দীপনে অচৈতন্যাবস্থায় ভূপতিত
হইলে সুবল কক্ষের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াই শ্রীরাধাকে
আনিতে গিয়াছিলেন । এই কথাটা পূর্বে লহরে কি
মিলে প্রকাশ না করিয়া কবি ভাবিলেন, “কক্ষকে অচৈতন্য
আবস্থায় বন মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া সুবলের চলিয়া
যাওয়ার কথাখনই সম্ভব নহে । কারণ, সুবল অন্তরঙ্গ প্রাণ
সখা । সুবল কক্ষ গন্ত প্রাণ । কবি এই সং সিদ্ধান্তে
উপনীত হইয়া দোষ খণ্ডনের জন্য ধূয়ার পদে কক্ষোক্তিতে
বলিতেছেন, “আমি চাপার কুল অঙ্গপরে, রাধা নাম
মনে করে, হলেম অচেতন, আবার চেতন করে আস্তে
তীরে কল্লি গমন, ইত্যাদি ।

ধূয়ার পদে শ্রীমতী যে শ্রীকৃষ্ণ কে পরীক্ষা করিয়াছেন,
এরূপ ভাবের একটুকু ছাড়া পাঁচ আছে । শ্রীমতী সুবল
বেশ ধারণ করিয়া যে কেবল গুরুজনকে কি সর্ব সাধা-
রণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এমন নহে ;
তিনি কক্ষকেও কিছু কালের জন্য ভুলিয়া রাধিকার
উদ্দেশ্যে, বিফল মনোরথ প্রভাগত সুবলের বিষম ভাবে
বদন মণ্ডল ঢাকিয়া লইয়াছিলেন । তাই কক্ষ বলিতেছেন
“আবার তাই বিরস মনে, এলে তুই কি কারণে ।”

শ্রীমতী সুবলের বেশ ভূষণ ধারণ করিয়া সুবল
সাজিলেন । সাজিলেন বাটে, কিন্তু রাখাল সাজে ভদ্র
বৃন্দ চাক্ষুষ হইতে পারে কি ? কবি ধূয়ার পর লহরে
তাহার উপায়-কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন । “নব বর্ষস
বকেতে ।” শ্রীমতী সুবল সাজিয়া দেখিলেন, রাখাল

বেশে শুনঘর অনারত থাকে। অমনি একটা নববৎস
বন্ধে লইয়া বাহির হইলেন। বোধ হয় এই বাছুরীটা
সুচতুর সুবল ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পূর্বেই সঙ্গে লইয়া ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে চিনিতে না পারিয়া সুবল জানে
বলিতেছেন, “সুবল, শ্রিয়া কি বলিয়াছে, বল, বল।
তুমি আমায় প্রাণ শীতল করি। তোমাকে পাঠাইয়া
দিয়া আমার প্রাণ আশা পথ নিরীকণ করিতেছিল। রাধা
বিনে আমার প্রাণ বারি শূন্য মীন বা বন পোড়া হরিণের
মত হইয়াছে।” গীতের অন্তরায় (ঝুঁরে) কবি এইরূপ
উপমা দ্বারা দীপ্তিতে অতি সুন্দর করিয়াছেন।

এই সদর গীতটি একদলে গাইলে, বিপক্ষ পক্ষ
তাহার উত্তর করিবে। উত্তরটা সুবল রূপধারিণী
কমলিনীর উক্তি হইবে। যথা,—

“প্রাণেশ্বর! আমি সুবল না। আমি তোমার
প্রেমাবিনী পদসেবিকা শ্রীমতী রাধা। সুবল যুখে
তোমার অবস্থা এষণ করিয়া সুবল বেশে দিনের বেলায়
বনে প্রবেশের সুযোগ করিয়াছি মাত্র।”

এই প্রকার উত্তর হইলে পর শ্রীমতীর প্রতি
কৃকোস্তিতে যে আর একটা গীত হইবে, তাহার নাম
সদরের পাল্টা বা দোসরা। দোসরা গীতটি এই,—
চিতান,—না চিনে সুবল জানে কত বল্যাম তোমায়।
পরাণ—সুবল আছে প্রাণে,—তুমি সুবল সেজে,

এসেছ বিপিন মাঝে, দেখতে আমার।
লহর,—শ্রীরাধে! সুবল যুখে শুনে আমার হৃৎকের
কাহিনী

হয়ে হৃৎকের দুর্গাধনা (দেখতে এলে আপনি)
বিনোদ বেশে রাই বিনোদিনী,—
তোমার নাম শুনে হই পরম সুখী,
দেখা দিলে চন্দ্রমুখী,

এত দয়া না হৈলে কি, মধুর তাবের ভাবিনী?
মিল,—তোমার নাম মধুর, প্রেম মধুর,—বাক্য মধুর,—

আমি না ভেনে বাঁশিতে কি ঐ শুণ গাই?—
মহড়া,—প্রিয়ে, এস এস আমার বায়ে বস,
আমার ভাপিত প্রাণ শীতল করি রাই।

ধূলা,—বনে তোমার রূপ পড়ে মনে,
অধৈর্য্য হৈলাম প্রাণে, যেমন ব'রেছিলাম,—
তোমার দেখতে পেয়ে,—তাইতে আবার জীবন
পেলায়।

বিলম্বের কাজ কি প্রিয়ে, মন-প্রাণ সমর্পিয়ে,
এ'স শ্রীকৃষ্ণে অঙ্গ দিয়ে এ প্রাণ জুড়াই।

বাদ,—তুমি বিনে গো রাধে! আমার আর কেহ নাই।
লহর,—শ্রীরাধে, আমার প্রতি রসবতী যে দয়া তোমার,
আমি মন বুকেছি তার, এজন্মে কি শোধব তোমার ধার,
তোমার ঐ মধুর প্রেম ঋণের দারে, জন্মান্তরে তিথারী হয়ে,
করেতে করজ নিয়ে ভিক্ষা মেগে শোধব ধার।

মিল,—পূর্ববৎ।

ঝুঁর,—আমার কাছে এস এস বিধুমুখী!—

ও প্রাণ রাধিকে, তোমার রূপ দেখে
রূপ সাগরে ডুবে থাকি।

রূপ মাধুর্য্য দরশনে, অধৈর্য্য হয়েছি প্রাণে,
যেমন চাতক পাখী,—

করে মিলন বরিষণ, বাঁচাওহে জীবন,
চক্ষে হেরে বন্ধে রাধি।

পরচিতান,— * * * * *

লহর,— * * * * *

সদর গীতটি অপেক্ষা পাল্টা গীতটি বেশী সুন্দর
ও মধুর রসায়ক হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতা দর্শনে
রাধারূপিনী শ্রীরাধা অনেকরূপ কপটতার অন্তরালে
লুকাইয়া থাকিতে না পারিয়া স্বীয় পরিচর প্রদান করিলে
বিস্ময়াভিত্তিত শ্রীকৃষ্ণ বাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি
লঘুর হইবারই কথা।

ভাবময়ী শ্রীরাধিকার নিছাম ভাববাসার প্রতিশোধ
দিবার জন্ত ভবিষ্যতে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) দীনাতিদীন হইয়া
ধারে ধারে ভিক্ষা করিবেন,—পাল্টার দ্বিতীয় লহরে
তাহার পরিশূট-আভাস প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

“তোমার এই মধুর প্রেম-ঋণের দারে,—জন্মান্তরে
তিথারী হয়ে, করেতে করজ নিয়ে, ভিক্ষা মেগে
শোধব ধার।”

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেম-ঋণ পরিশোধের জন্ত যে
কলিতে গৌরাক হইবেন,—তাবাবিষ্ট কবি এখানে
এই কথাটির আভাস দিয়া গীতটিকে অতি সুন্দর
করিয়াছেন।

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

নিয়তি ।

(১)

কোণে রাশি, কুহকিনি, বিস্তারিয়া বিকট বদন
ধীর বিভীষিকাময়, শতশত বজ্রের ক্ষুণ্ণ,
বল্লভাত ঝঞ্ঝাত তুলু করি প্রাসিতে মানবে
শত বাধা অতিক্রমি ছুটে বাও বিকট আরবে,
কালের কুটিল গতি অতিক্রমে ভেদি অকস্মাৎ
মানবের সাধনার ছবিখানি কর অস্মাৎ ।
নিষিদ্ধ জোছনাময়ী নিশীথিনী তোমার মায়ায়
প্রলয়ের ধন ঘোর অন্ধ কারে শুক হ'য়ে যায় ।

(২)

শত সাধনার বীণা মুরছনা তুলিয়া মধুর
চালে হবে শান্তি ধারা উজলিয়া হৃদয় মুকুর—
ভয়র হৃদয় হবে সুখ সুখা সদা করি পান
ভনে নাই এ সংসারে কভু গো সে হৃথের আহ্বান,
অলুকিতে হৃদায় কোথা হ'তে ভীম বেশে আসি,
গলকে হৃথের সুখা নিঃশেষিত কর তুমি হাসি';
কোটা কোটা অমুনর কাতরতা ম'ধা অশ্রুজল
পশে না প্রবণে তব, হে ববিরে, সকলি বিফল !

(৩)

সুখ হৃৎ প্রদানের শক্তি তব বিধাতার দান,
সুখ দানে হে রূপণে, সুবিরল তোমার আহ্বান ।
কালের পেছনে থাকি সদা ফের হিত্র অবেষিয়া,
অবলর গেলো দাঁও মানবের হৃদয় পেষিয়া ।
কিছু ধীর ধর্ম্মে নিষ্ঠা ; প্রাক্তনের শুভ কর্ম্মচয়
পরশি করেছে কিছু শুভ শাস্ত পবিত্রতা নয়—
তার কাছে সদা তব প্রকটিত মোহন মুরতি ;
তোমার আলোক রাশি সদা তাঁর করিছে আরতি ।
শ্রীমৎসঙ্গনাথ কাব্য-ব্যাকরণভীর্ণ ।

গ্রন্থ সমালোচনা

গান—শ্রীবিহারীশাল সরকার কর্তৃক প্রণীত ।

উক্ত কবি প্রাণের আবেগে এই গান রচনা
করিয়াছেন। তাহার গানগুলি হিন্দুমাত্রেরই প্রাণ
স্পর্শ করিবে। যেমন রচনার মাধুর্য্য তেমনি ভাবের
গাভীর্ঘ্য। আমরা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

তুলি—প্রমোদ চৌধুরী—(কবিতা গ্রন্থ)

কাগজ ছাপা সুন্দর। লেখায় সুন্দর ভাব আছে।

মর্ম্মগাথা—শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ।

কবি যতীন্দ্র প্রসাদ সৌরভের পাঠক পাঠিকার নিকট
অপরিচিত নহেন। তাহার মর্ম্মগাথা যে তাহার সুনাম
বহন করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। “আমার চশমা”,
“আমার চাকরি” ও “চায়ের গান” ইত্যাদি পড়িবে,
তাঁহার মুগ্ধ হইবেন।

পুষ্পহার—শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস প্রণীত ।

মূল্য ১০/০ আনা।

পুষ্পহারের গ্রন্থকার সমাজের এক একটা সমস্যার
পূরণ করিতে বাহিয়া এক একটা গল্প
লিখিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য মহৎ। লেখক নবীন,
চেষ্টা করিলে কালে নিঃসন্দেহ সিদ্ধি লাভ করিতে
পারিবেন। গল্পগুলি সুন্দর হইয়াছে।

মহাভারত—আদিপর্ক ১ম, ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত
গিরিশ্বর বিহারীক বিদ্যারচিত। ৫০ নং হরি বৌদ্ধ ষ্ট্রীট
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

উত্তম প্রশংসনীয়। মূল মহাভারতের অনুবাদ
বাহাতে সকলে বাঙ্গালা কবিতায় পড়িতে পারে, তাহার
ব্যবস্থা করিয়া লেখক যত্নবাদের পাত্র হইয়াছেন।
স্বর্গীয় কবি রাজকৃষ্ণ রায় এই চেষ্টা অনেক দিন পূর্বে
করিয়াছিলেন। এই চেষ্টা সুসম্পন্ন করিতে পারিলে
বাঙ্গালা সাহিত্যের অভাব দূর হইবে সন্দেহ নাই।



সৌরভ

অষ্টম বর্ষ।

ময়মনসিংহ, কল্কন, ১৩২৬।

পঞ্চম সংখ্যা।

কবি মধুসূদন দত্ত।

(২)

একদিকে স্বদেশের এই শোচনীয় অহা। অপরদিকে মধুসূদন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এবং ইরোপীয় সভ্যতার অন্তর্দেশে প্রবেশ করিয়া দেখতে পাইলেন, প্রাচীন ভারতের সেই জ্ঞান-পরিমিত, সেই মহুত্বের সর্ব বর্তমান ভারত সাগরের উপকূল ভাগ করিয়া পাশ্চিম দেশকে বরণ করিয়াছে। তিনি মুগ্ধ দেখিতে পাইলেন, শৌর্য্যবাহ্য কক্ষণ স্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, এসকলি আজ সেই পাশ্চাত্য দৃষ্টিকে মহাশয় গরীয়ান্, ঐশ্বর্য্যবান্ ও অগ্র্য্য করিয়াছে, যাঁহাদিকে এখনো আমরা অস্পৃহ স্নেহ লাগিয়া বশেষিত করিয়া নিজেদের হীনতায় পরিচয় দিয়া থাকি।

তবে পতিত বাংলা সমাজে মধুসূদন যে কোন স্থানের পরিচয় পান নাই, তাহা নহে। তিনি দেখতে পাইয়া ছিলেন, মানুষের কেমনকায় ভাবাবস্থা, মধুসূদনের মেহ-প্রেম, বাৎসল্য, প্রজ্ঞা, তপস্বী ভক্তি প্রভৃতি কোমলা হৃদয় ও গুল জুড় পানিমাণে এ দেশে বর্তমান আছে। কিন্তু কবি ইহাও জানিতেন যে, মানব হৃদয়ের কোমলাভাৱের সহিত, কঠোর সবলত্বের সাম্য লভ না হলে,—প্রেমভক্তির সাধবীলত শৌর্যের সকা তরুণে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া ন উঠিলে তাৎ যে অচ্যেই মূল্যহীন হইবে ইহা অবশ্যই। অতএব তম্নে হয়—বর্তমান কোমল-প্রাণ, বী-বীণীন বজ্রাকর আদর্শ এই বঙ্গীয় সমাজের অবনত আদর্শকেই মধুসূদন তাঁহার কাব্যের

রায়-চন্দ্রে অঙ্কিত করিয়াছেন। আর, যে পূর্ণাঙ্গ আদর্শকে তিনি স্বদেশের ভবিষ্যৎ সমাজে প্রতিষ্ঠা দেবিত্তে আশঙ্কিত করিয়া ন, তাহা সেই তাঁহার-কাব্যের নাটক মেঘনাদ-চন্দ্রে আঁকিত হইল। কারণ, এই চরিত্র কল্পনায় বর্তমান পাচ ও প্রাচ্যের প্রেক্ষাপে সকলো সমাবেশ দেখতে পাই।

কবি দেশের বর্তমান, আংশিকভাবে অবনত আদর্শকে যদি 'রায়' নাম না দিয়া নামান্তর দিতেন মেঘনাদ-প্রত্যক্ষণী রূপকে বদ কল্পনায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাম অভিহিত করিতেন,—এ কাব্যের নায়ক যদি রক্তকূপোত্তর না হইয়া কোন কৃত্রিম কুল পুঞ্জ বী হইতেন, তবে সম্ভবতঃ আমরা 'মেঘনাদ বধকে' সর্বত্র সুন্দর কাব্য বলিয়া গ্রহণ করতে পারিতাম। এই নামের অকম্বলতাই মনে হয়, আমাদের এ কাব্যের রসগ্রহণে ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিতেছে। কারণ 'রায় লক্ষণ' নামের চতুর্দিকে আমরা মনে মনে বিবাহিত আদর্শ চরিত্র অবলম্বন করিতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আবার, আদ্য কবি রক্তকূপকে মহুত্বের মর্যাদাক্রম গুলি বর্ণনা করিয়াছেন। তাই, সেই জাতির কোমল পুরাণ-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবিশেষ মানবীয় আদর্শ জগাবল্য প্রবেশ করিতে দেখিলে স্বভাবতই আমাদের চৈতন্যটি বটিকা থাকে। ইহার মূল অত্যন্তের প্রতি অত্যাশঙ্কিত ও পূর্ণ দৃষ্টির প্রভাব—এক কথায়, অল্পভূত কবি Historical Estimate, বস্তুতঃ যুগে যুগে মধুসূদন তাঁহার স্বদেশীয়গণ হাতে তাঁর জাতি প্রাণ্য আদ্য করিতে পারেন নাই, তাহার প্রকৃত কারণ—কবি

সামান্য আদর্শের হীনতা বা বিজাতীয়তা নহে,—কিন্তু
স্বাধীন অব্যবহিত প্রয়োজন সিদ্ধি দ্বারা অস্থায়ী খ্যাতি
স্বর্জননের প্রলোভনাতাব এবং কাব্যের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির
অভি অটল হই।

স্বাধীন নহে আদর্শ দ্বারা প্রেরিত হন, তাঁহার
স্বভাবের, অসামান্য সাধের পথে চলিতে পারেন না।
স্বাধীন পথ বরাবরই শকটে কটকাকীর্ণ। মধুসূদন
তাঁহার কাব্যের আসল উদ্দেশ্যের অজুরোধেই—তিনি
তাঁহার কাব্যের ভিতরে ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য যে
আশার ব্যঙ্গী সঞ্চিত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন তাহার
প্রমাণই—জানিয়া শুনিয়া বিয়ের পথে পা দিয়াছেন,
কিন্তু সে লজ্জাই তিনি পুরোক্ত প্রাচীন নামগুলি পরিহার
করিতে পারেন নাই। যে পার্শ্বচাপ্রবের আদর্শ মহাবী
রাজ্যিক রাম-চরিত্রে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আমা-
দের বাংলা সমাজ বহুকাল হয় অনেক নীচে নামাইয়া
কেলিয়াছে—তাই ভীষ্ম-কাত্য শূণ্যবলীর একত্র সমাবেশের
স্বাধীন বাংলায় আর ধারণা করিতে পারিতেছিল না।

ইহার সম্রাট প্রমাণ আমাদের প্রচলিত গ্রাম্য সাহিত্য।
লোক-সাহিত্যেই সমাজ প্রচলিত আদর্শ সহজে প্রতি-
ফলিত হয়। এ সাহিত্যে কি দেখি?—রাধাকৃষ্ণের
প্রেমলীলা বিষয়ক সঙ্গীত, হর গোবিন্দ গৃহস্থালী ও
দাম্পত্য সম্পর্কীয় ছড়া এবং উমা মেনকার স্নমধুর সখ্য
আশ্রয় আগামনী ও বিদয়ার গান, আর কোন কোন
রাসে বেহলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী। কিন্তু উক্ত সাহিত্যে
সামাজিক ও রাম-সর্বস্ব মহাবীর হুমানের বীরত্ব
স্বাধীনতার অভি সানাত্ত জের ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অন্য কি, সুশিক্ষিত লক্ষ্মীন্দ্র কবি মধুসূদন কাল-
চরিত্রে যে বকবীরের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে,
স্বাধীন কালের প্রভাব অতিক্রম-করিতে না পারায়, তাঁহার
সামাজিক, অবলার-অকল-বিলাসী বাংলার পৌরুষ-
স্বাধীনতার হীন আদর্শই বেশি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।
স্বাধীনমোহিত নবর সাজসজ্জিত পতীকে বীর-পত্নী হুদরা
পরিচয় করিতেছেন—

হুদরার কথা রাখ
কিছুকাল জিয়া থাক,
স্বাধীনতা রাখার সময়ের।

আর অমনি—

হুদরার কথা শুনি, হিতাহিত মনে গণি
মুকাইল বীর বাস্তবের।

এই সকল কারণেই মধুসূদন স্বর্জন-আদৃত রাম
নাথের আশ্রয়ে প্রচলিত সমাজের আদর্শকে প্রদর্শিত
করিয়াছেন এবং তাহারই পার্শ্বে প্রাচীন উন্নত বীরত্বের
আদর্শকে মেঘনাদ চরিত্রের ভিতর দিয়া পুনঃস্থাপিত
করিয়া আমাদের বহুকালমুগ্ধ চেতনাকে কঠিন আঘাতে
জাগরিত করিতে চাহিয়াছেন—আমরা যে বাস্তবিক বর্ণিত
প্রকৃত রামচন্দ্রকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার স্থলে
এক নকল রাম-মূর্তিকে বসাইয়া পূজার অর্থ্য দান
করিতেছি, এই সত্যটি উক্ত উপায়ে কবি আমাদের চিত্ত-
ক্ষেত্রে অলগ্ন নোহুলাকা দ্বারা খোদাই করিয়া দিতে
চাহিয়াছেন। আবার, আমাদের সুপ্রাচীন বীরত্বের
আদর্শ যে স্বদেশে পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন দেশে পুনর্জন্ম
গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া
আমাদের আগ্র-বঞ্চনা দূর করিবার জন্য মধুসূদন ব্রহ্মকুল-
প্রের্ত মেঘনাদকে আশনার কাব্যের নায়ক-বস্ত্রে প্রহরণ
করিয়াছেন। তাই এ কাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য যখন
বাঙ্গালী বুদ্ধিতে চোঁটা করিবে, তখন ইহাও বুঝিবে যে
মধুসূদন প্রাচ্য আদর্শকে বিসর্জন করেন নাই—তাহাকে
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, এ কাব্যের নায়ক মেঘনাদ
রামায়ণোক্ত মেঘনাদ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তিনি নর-
বাদক, পশুবলের অবতার জন্ত বিশেষ নহেন। তাঁহার
হৃদয়স্নেহ প্রতিতে তরপুর, ইহার আভাস আমরা তাঁহার
যুদ্ধ বাত্রার প্রাকালে পত্নীর সঙ্গে মিলন দৃশ্যে দেখিতে
পাই। তিনি পিতৃপরাগণ, মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, গুরু-
জনের প্রতি শ্রদ্ধাবান, ইহার পরিচয় গ্রন্থের সর্বত্রই
পাইয়া থাকি। তিনি যে স্বদেশ প্রেমিক প্রকৃত বীরপ্র-
পণ্য পুরুষ তাহা মৃত্যুর প্রাকালে পিতৃব্য বিতীর্ণের প্রতি
উক্তিভে এবং পূর্ণ যৌবনের বাবতীর অসুখ সাধ পায়ে
ঠেলিয়া, আশ্রয়িকা শূণ্যবতী রূপসী জর্জর প্রাণীকে
পশ্চাতে ফেলিয়া মাতৃভূমি এবং পিতৃ-সম্মান রক্ষার জন্ত
বাত্মার ঐকান্তিক ব্যগ্রতায়-সুপরিভূত হইয়া, তিনি

ঐশী শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসবান, তাহা নিকুন্তিলা বজ্র-
ধারের চিত্র অলঙ্কার রূপে প্রমাণিত করিতেছে।

রামচন্দ্রকে এই কাব্যের নায়ক রূপে গ্রহণ না করি-
বার আর একটি কারণও দেখিতে পাওয়া যায়। যে
মানবীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা এ কাব্যের
অন্ততম উদ্দেশ্য তাহা রামচন্দ্রকে নায়ক রূপে চিত্রিত
করিলে ব্যর্থ হইত। কারণ, রাম ঈশ্বরের অবতার রূপে
বৃগবৃগান্তর ধরিয়া ভারতীয় হিন্দুগণ দ্বারা পূজিত হইয়া
আসিতেছেন। কাব্যের এ উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ উপযোগী,
সর্ব শক্ত্যাধার দশানন তনয় দেবরাজ-বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ।
আর, এই হেতুই মেঘনাদে পৌরুষবীৰ্য্যকে উজ্জ্বলতর
বর্ণে চিত্রিত করিবার জন্য মধুসূদন রাম লঙ্ঘনের বীরত্ব
গৌরব হরণ করিয়া রামচন্দ্রকে শুধু ভ্রাতৃত্বসংল, পিতৃ-
আজ্ঞাবহ, স্বামী-কর্তব্যপরায়ণ, কোমল হৃদয় বাঙ্গালী রূপে
আঁকিয়াছেন।

মেঘনাদ চরিত্রের কোমল-কঠোরের বিচিত্র সংমিশ্রণ
প্রমীলা চরিত্রে, এবং রামচন্দ্রের কোমলতা ও কারুণ্য
সীতা চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়া কবি তাঁহার কাব্যগত
সামঞ্জস্যটি অতি নিপুণতার সহিত রক্ষা করিয়াছেন।
প্রমীলাও পতিপ্রাণা, সীতাদেবীও পতিপরায়ণতার আদর্শ
স্থানীয়া। প্রেমময়ী সীতার হৃদয়ে শুধুই কারুণ্য, শত্রু-
মিত্র, পশুপক্ষী, তরুলতার প্রতি অপার অহুকম্পা।
সীতাদেবীর অন্তর্দ্বৈশের আগা গোড়া কেবল মাধুর্য্য,
কেবল নির্দোষ প্রীতির ধারা। তাঁহাতে নারী সুলভ
ধৈর্য্য আছে, কিন্তু বীরাননার কণ্ঠকুশল কাটিয়া নাই।
তাঁহার হৃগম অরণ্যের নির্দাসন-বাসও পতি ও দেবরের
স্নেহ-ভক্তির স্পর্শে মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু
প্রমীলার যে বাহ বস্ত্রী সম্পদকালে সোহাগ ভরে স্বামীর
কণ্ঠে কুলুমের অমিয় স্পর্শ প্রদান করিত, তাহাই আবার
স্বামীর শত্রুশাসক বজ্রের কাঠিন্বে পরিণত হইত।
বস্তুতঃ, একদিকে সেই অশোকবনস্থ্য দীনা-লীনা সীতা-
বৃষ্টি, সেই দুঃস্বপ্ন চেড়ীদল বেষ্টিতা, হৃৎযন্ত্রাঘাতনতা, অব-
মানিতা, ধৈর্য্য-প্রতিমা সীতাবৃষ্টি, এবং অপর দিকে স্বামী
গৌরব পরিচীতা, প্রথম তেলবৃক্ষা, রণসজ্জিতা, বিদ্যামালা
সম্পন্ন সীতার পরিবর্তা প্রমীলার বীরাননা বৃষ্টি, তার

সেই রণাঙ্গনের ভীষণতা ভেদ করিয়া লক্ষ্য প্রবেশের
বিস্ময়কর দৃশ্যের চিত্র—নারীর এই দুই বিভিন্ন বৃষ্টির
অপূর্ব সমাবেশ পাঠককে সৌন্দর্য্যে ক্ষেত্রিমিথ লোভিত
উপনীত করে, তার ভুলনা কোথায়? আমার ত মনে
হয়—প্রমীলার সেই নারীকুলভ ওজোময়ী বীরাননা বৃষ্টি
যদি সীতা চরিত্রে আরোপিত হইত, এবং অবলম্বিত
সীতার সেই রমণী-সুলভ ধৈর্য্য-লাবণ্য-আশ্র-বিলীনতা
ও নমনীয়তা যদি প্রমীলা চরিত্রে সন্নিবেশিত হইত, তবে
সমস্ত কাব্যের ভিতরকার সঙ্গতি বিনষ্ট হইত, তার
সঙ্গীতের একতানে ব্যাঘাত জন্মিত। এ হলেও মধুসূদন
সুদক্ষ চিত্রকরের নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কিন্তু মানবীয় শক্তির অন্তহীন সম্ভাবনীয়তা প্রদর্শন
ব্যতীত, এবং তাহারি অভাবশ্রুত অন্তরঙ্গ, ‘মেঘনাদ-
বধ কাব্যের’ আরেকটি গভীরতর কথা আছে। বীর-
কুলভব মেঘনাদের, ব্যাধহস্তে কুরঙ্গের জায়, শোচনীয়
মৃত্যু ঐ কথাটির প্রতিই লক্ষ্য করিতেছে। উপর্যুপ
প্রতিষদীর সঙ্গে সমুখ সমরে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াই
মহৎ মৃত্যু, মেঘনাদের জায় বীর পুঙ্গবগণ সেরূপ মৃত্যুকেই
আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। তাই যতাবতই এই প্রশ্ন
মনে উদ্ভিত হয়, মেঘনাদের সেই বীর বাঞ্ছিত মৃত্যু ঘটিল
না কেন? এ কাব্যের অন্তরে কবি লক্ষ্যকে প্রকৃত বীর
মহিমায় মণ্ডিত করিয়া নিকুন্তিলা বজ্রধারায় শুধু এক
মুহূর্তের জন্য ভীক তরঙ্গের জায় চিত্রিত করিলেন কেন?
বীরকে হঠাৎ অনাবশ্রুত কাপুরুষে পরিণত করিবার এই
ক্রম মধুসূদনের মত কবির পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়
না। তবে এই অশটন সংঘটিত হইবার কারণ কি?
যে কারণে গাভীবধারী ধনঞ্জয়কে মিথ্যতার অন্তরালে
থাকিয়া নিরস্ত্র ভীষ্মদেবকে শরশয্যাশারী করিতে হইয়া
ছিল, যে কারণে নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে কৃষ্ণভীষ্ম
আশ্রয় নিয়া ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের মৃত্যুর উপায় উদ্ভাবন
করিতে হইয়াছিল, যে কারণে সত্যবাক ধর্ম্মরাজ
বৃষ্টিধীরকেও মিথ্যাভাস দ্বারা পুত্রশোক-কাভর নিরস্ত্র
জোণাচার্য্যের মৃত্যু ঘটাইতে হইয়াছিল, যে কারণে বীর-
শ্রেষ্ঠ হনুমানকে মিথ্যা বন্ধনাদ্বারা বাবণের মরণাঙ্ক হস্ত-
গত করিতে হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই বীর লক্ষ্যকেও

কলাই-কলাই অবলম্বন করিয়া, মাদ্রাদেবী ও গৃহশত্রু
বিভীষণের সহায়তায় যেখানের নিধন ব্যাপার সম্বন্ধে
চর্চিতে হইয়াছিল। যেখনাদ বধেব এই ক্ষুদ্র ঘটনা
বাহ্যি কবি যেমন দেখাইয়াছেন, ভীষ্ম দ্রোণের দ্বারা
যেখনাদ ও দৈব সহায় বিরচিত উপর মানবের অজ্ঞেয়
কোনো ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে মানুষ জানে, চিন্তে,
শৌচিবীর্য্যে যতই মত্ত হউক, সে যদু কর্তৃক জানেও
শৌচিবীর্য্যে বিকৃতচার্য্য কার তেও তাঁর ধর্ম্মে অনবদ্য।
কর্তৃকণা বত ভীষ্ম দ্রোণ যেমন অন্নদ তার প্রতি কৃতজ্ঞ
বিশেষ অধর্ম্মের পক্ষগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,
তখন মংকর তে যেখনাদকেও পুত্রের কর্তৃক ও দেশের
প্রতি বর্জ্যবোর অল্পবোধে পরদারপহারীর পাপ-পঙ্কের
সহায়তা করিতে হইয়া ছিল। ভীষ্ম দ্রোণ এবং যেখ-
নাদের মতের মধ্যে ঐ এক জায়গায় এটা ছদ্ম ছিল।
ভীষ্মের অবস্থার বিপাকে সামাজিক বা লৌকিক বর্জ্যবোর
সঙ্গে উচ্চতর কর্তব্যের সংঘর্ষের মধ্যে পড়িয়া ধর্ম্মের সঙ্গে
বিরোধ করিয়াছিলেন। তাই আহত ধর্ম্মে নিয়ম
উচ্চতর ব্রহ্মেই স্থাপিত ছুটি। আসিচা তাঁদের মস্তকে
নিপাতিত হইল, আনন্দ পথের যত অল্পবোধ এক
কর্তৃকণে উড়াই দিয় ধর্ম্ম আপনাকে চরিত্রী করিল।

যেখনাদ বধ কাব্যে রাণের অস্ত্রিম পরিণাম দেখাই-
বার অবসর নাই। তবু কাব্যের শেষ সর্গে রাণের
বিভীষণ অবস্থা বিপর্য্যয়ের আশ্রয় প্রদান করিতে—সেই
কোনো নিবন্ধ, ভূকরত দ্বারা উর্জ্জ্বল সর্গে পরিণাম লৌ-
কিক মানবের বক্ষুত মস্তকের দ্বারা, ধূল-বলুতিতান্ধা,
কোনো নি-পা ড়ত, শে তাহত দশ-নেও, অতম ন-শ বার
কিছু যুগমানবতা আমাদের কর্ণে উর্জ্জ্বল ঐ একই
কথা ধ্বনিত করিতেছে।

কর্ম্মকল অন তক্রমা, ধর্ম্মের বিধান অগাধ অজ্ঞেয়,
কোনো বিকৃত বাহ্যিক বা কাব্যিক, প্রভঞ্জন যুগ
কোনো ভূগর্ভের মত, নৈবেদ্য ও দত্ত মান
কোনো নিবন্ধ। ইহাই এই কাব্যের ধর্ম্ম বাণী, ইহার
কর্ম্মকল।

যেখনাদ বধ কাব্যে যেখনাদ কাব্যের যে নাম
কোনো কাব্যিক, তাহাতে ভদ্রা করি অন্তঃ এ

কথাটা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, “যেখনাদ বধ কাব্যে”
Aristotle কথিত Higher truth ও Higher Serious-
ness এর অস্তিত্ব নাই ;—ইহাও বোধকরি স্বীকৃত
হইবে যে, উক্ত কাব্য পাঠের কালে প্রথমতঃ আমাদের
বিবিধ মনোবৃত্তি ও ক্ষুদ্র বৃত্তিগুলি উদ্ভূত ও সঞ্চারিত
হইয়া, এবং অবশেষে কেন্দ্রীভূত ও সংহত হইয়া এক
অপভ্র, অভাবনীয়, বিশদিনিড়, অপরিব্র আনন্দের
সৃজন করে, যাহা সত্য ও মঙ্গল হইতে অভিন্ন। ইহাই
দমন্ত ‘আর্ট’ চরম লক্ষ্য, আর, ইহাকেই মনোবী মনো
“Final and superlative impression” বলায়ছেন।

আমি বিশ্বাস কর আমরা যতই প্রচেষ্টা কাব্যালোচনা
পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মধুসূদনের কাব্য-গ্রন্থাবলীর
আলোচনা করি, কালের দ্বারা মধুসূদনের ব্যক্তিগত
বাবসারক জীবনের খুঁটিনাটি, ও বিচ্যুতিসম্মত সংস্কার
ও অবলম্বন আমাদের মন হইতে যতই মুছিয়া বাইবে,
ততই আমরা কব-মধুসূদনের প্রকৃত চেহারা দেখিতে
পাইব—ততই বঙ্গীর পাঠকের মনঃ কোকনদে মধুর
সুমধুর কাব্য-কুসুম রাশির মধুরভাঙার অধিকতর সঞ্চিত
হইয়া তাঁহার পুণ্যময়ী স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প।

আজ সন্ধ্যাকালে আগ্নেয়গিরির প্রবল বিস্ফোরণের কথা
বিস্তৃত করণ। খ্রীস্ট ৭৯ অব্দে বিস্ময়জনক যে প্রবল
উচ্ছ্বাসে পম্পাই এবং হারকুলেনীয় নগরদ্বয় ধ্বংসিত
হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস প্রসঙ্গ। বিস্ময়জনক যেমন
কম্পিত ভাষায় নিবন্ধ ছিল। এও ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের
১৫০ বৎসর পূর্বে মল্ল বাছা প্লাটকাস ৭০ জন সহচর
সহ বিস্ময়সের গহবরে (Crater) লুপ্ত হইয়াছিল।
এবং ক্রডরস তথায় তাহাকে অববোধ করিলে সে সদল
বলে পার্শ্বত্যাগ করিয়া অবলম্বনে তথা হইতে পালিয়া
যায়। সে সময়ে কেহই ইহাকে আগ্নেয়গিরির দ্বারা বলিয়া
মনে করিত না। কেবল মাত্র ইতিহাসিক কেবল মাত্র

ডায়ডোরাস্ সিকুলাস্ প্রভৃতি কতিপয় লোক উহার প্রাচীন দক্ষিণে অবলোকন করিয়া উহাকে আগ্নেয়গিরি সন্দেহ করিয়াছিলেন। ইহার যুগের নিকট বহু শতাব্দী পল্লি সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং পূর্বতের পাদদেশে সৌধ পরিবেষ্টিত সমৃদ্ধিশালী হারকুপেনিহম ও পম্পাই নগর স্থাপিত হইয়াছিল।

এই সকল স্থানের অধিবাসীবৃন্দ যথেষ্ট কখন মনে করে নাই যে তাহারা এক আগ্নেয় গিরির উপরে বাস করিতেছিল। কিন্তু তথাপি তাহারা ভীষণ অগ্ন্যাগ্ন্যের পূর্বে অনেকবার ইহার সারা পাইয়াছে। কারণ যোগ বৎসর বাবৎ এখানে মাঝে মাঝে প্রবল ভূমিকম্প হইত। অতঃপর ৭২ সনের ২৪ শে আগষ্ট জগৎবিখ্যাত ভীষণ অগ্ন্যাগ্ন্য সংঘটিত হয়। এই অগ্ন্যাগ্ন্য সম্বন্ধে প্লিনি টেস্টিফাসের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল।

“গৃহ হইতে বাহির হইয়াও আমরা এক ভীষণ দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। আমরা যে গাড়ীতে বাইতে ছিলাম, তাহা সমতল রাস্তাতেও এরূপ আন্দোলিত হইতে লাগিল যে প্রভাতের দ্বারা ঠেক দিয়াও আমরা উহা স্থির রাখিতে পারিলাম না। সমুদ্র ভীষণ ভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং সামুদ্রিক জীৱ জীব দেশে আসিয়া ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল। অপর দিকে ভীষণ ধূম ও অগ্নি উদ্গাত হইতে লাগিল। ভয়ানক অগ্নি আমাদের মস্তকোপরি পতিত হইতে লাগিল। তখনও কিঞ্চিৎ আলো আছে দেখিয়া আমি প্রস্তাব করিলাম যে আমাদের বড় রাস্তার দিকে ফিরিয়া যাওয়া উচিত, নচেৎ অন্ধকারে লোকের চাপে প্রাণ যথার্থ সম্ভাবনা আছে।

আমরা কিয়দূর বাইতে না বাইতেই ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলাম। সে অন্ধকার মেঘচ্ছন্ন রজনীর অন্ধকার নহে, একটা অন্ধ কুঠরীর দগ্ধা বন্ধ করিলে যেরূপ হয়, এ সেইরূপ অন্ধকার। তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতার ভীষণ আর্তনাদ, ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতি গোচর হইতে ছিল না। সে সময়ে কেহ কেহ সন্ধ্যার নিকট প্রার্থনা করিতেছিল এবং কেহ বা মনে করিতেছিল যে শেষ প্রার্থনার দিন উপস্থিত, ইহার পরে একটু আলো দেখা

দিল, কিন্তু ইহা দিবালোক নহে, ইহা অগ্নি শিখা মাত্র। সমস্ত জগতের সহিত অগ্নিও বিলীন হইতেছে বলা করিয়া আমরা দদয়ে কৌনরূপ ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। অতঃপর অর্ধোদয় হইলে দেখিতে পাওয়া যায় সমস্ত বস্তুই ভগ্নাঙ্গাদিত।”

যদিও পম্পাই ও হারকুপেনিহম সে সময়েই ধ্বংস হইয়াছিল, প্লিনি তাহা কখন বর্ণনা দেন নাই। পম্পাই ৬০ ফুট উচ্চের কাল পড়িয়াছিল কিন্তু হারকুপেনিহম কর্দ্দমের দ্বারা পোষিত হইয়াছিল। ইহাও এরূপ ভাবে আচ্ছাদিত ছিল যে যথায় যথায় ইহা দেখা যাইত না।

ইহার পরেই নিম্নভিত্তির মাঝে মাঝে অগ্নি দগ্ধ হইত। কিন্তু সমুদ্র শতাব্দীর জাগরণ মত একেবারে নির্বাপিত হইয়া যায়। তখন ইহা পশ্চিম দিকের স্থান হইয়া পড়ে। ১৬০১ অব্দে ৬ মাস ভূমিকম্পের পরে ইহার পুনরায় অগ্ন্যাগ্ন্য আরম্ভ হয়; তখন এক অবলম্বিত ইহার শিখর দেশ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া ধূমরাশিগণ পরিণত হইয়া বহুশত মাইল দূর ছাড়িয়া পড়ে। অগ্ন্যাগ্নি হইতে ৭ টা গলিত দ্বারা প্রবাহিত হইয়া গ্রাম সমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলে, তন্মধ্যে ব্রেইসন গ্রাম বার্ষিক ভূগর্ভস্থ হারকুপেনিহমের উপরে নির্মিত হইয়াছিল তাহাও ধ্বংস হয়।

ইহার পরে ১৬০ বৎসর পর্যন্ত মাঝে মাঝে অগ্ন্যাগ্ন্য হইয়া পূর্বতের অনেক পরিবর্তন হয়। ১৭২০ সনে একটা স্থান ২৩০৫ ফিট কাটিয়া তাহা হইতে গলিত বাহু ইত্যাদি প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়। অতঃপর অষ্টাব্দে ৩ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে প্রায় ৫০ বার অগ্ন্যাগ্ন্য হয়।

অধুনা এই আগ্নেয় গিরিতে ১৮৭২ এবং ১৯০৬ সনে দুইটা প্রবল অগ্ন্যাগ্ন্য হয়।

বিমুণ্ডিত ভিন্ন ভূমধ্য-সাগরে এটনা, ব্রুজি, সেন্টিনে, প্রভৃতি আরও কতিপয় আগ্নেয় গিরি বর্তমান আছে।

আপানে কোবেণ্ডেইসান আগ্নেয় গিরি বিমুণ্ডিত নহে তত প্রবল নয়; সহস্রাব্দিক, বৎসর ইহা নির্বাপিত থাকাতে ক্রমকণন বৃদ্ধি চিন্তে ইহার উপর ভাষ বাস করিতেছিল। ১৮৮৮ সনে ইহাতে এক প্রবল গভীর

সকল হইয়া সঙ্গে ২ ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যোদগম আরম্ভ হইল। ইহা হইতে উদ্ভূত কর্মাদি বাহির হইয়া ২৬ বর্গ মাইল ব্যাপি স্থানের গ্রাম সমূহ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। ইহুক মাকি নামক একজন জাপানি পুরোহিত যিনি কোন রূপে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, এই ভীষণ অগ্ন্যোদগম সম্বন্ধে তিনি যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। “১৫ই জুলাই সন্দের প্রভাতে আকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। বেলা প্রায় ৮ ঘটিকার সময়ে প্রবল ভূমিকম্পে আমরা গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ব্যাপার কি উপলব্ধি করিবার পূর্বেই প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে পোয়ামাইল দূরবর্তী কোবাণ্ডির দিক হইতে ভীষণ বিদারণ শব্দ শুনা গেল। ইহার পরেই কক্ষবর্ধন রাশিতে আকাশ আচ্ছাদিত হইল। সে সময়ে আমাদের চতুর্দিকে ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড আসিয়া পড়িতে লাগিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে গিরিশৃঙ্গ ও অরণ্য বিধ্বস্ত হইবার ভীষণ শব্দে সকলকে চমকিত করিল। আমি সেই দৃশ্য জীবনে ভুলিব না। আমরা নানাদিকে দৌড়াইয়া পলাইলাম। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই মাটিতে শুইয়া পড়িতে হইল। ঘোর অন্ধকার—তখনও ভূমিকম্প চলিতেছে। কর্মম ও ভয়ে আমাদের নাক মুখ বন্ধ হইয়া গেল। তখন নড়িবার কি শব্দ করিবার শক্তি রহিল না। আমার মত্না হইয়াছে, কি স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলাম না। সে সময়ে আমার মাথার একটা পাখর পড়তে আমার জ্ঞান হইল। দুই মিকট ভাবিয়া বুকের নিকট প্রার্থনা করিলাম। ইহার পরেই পতিত প্রস্তর খণ্ড দ্বারা আমি কোমরে পূর্তে এবং উরুদেশে আহত হইলাম। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে প্রস্তর বৃষ্টি কাস্ত হইয়া আকাশ পরিষ্কার হইল। ইহাই পলাইবার উত্তম সুযোগ মনে করিয়া আমি দৌড়াইলাম এবং সকলকে আমার অনুসরণ করিতে বলিলাম। কিন্তু চাহিয়া ফারাকে ও দেখিতে পাইলাম না। অর্ধ-মাইল বাইতে না যাইতে পুনরায় ভয় ও প্রস্তর বৃষ্টি আরম্ভ হইল।”

এই উল্লেখের পূর্বে প্রবল বড় প্রবাহিত হইয়া গৃহাদি সমস্ত ভূতলশায়ী করিয়াছিল। কোবাণ্ডির অগ্ন্যোদগমে দায় প্রচণ্ড লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছিল।

এখন আমরা ভগবিখ্যাত ক্রেকেটোরার অগ্ন্যোদগমের কথা উল্লেখ করিব। ক্রেকেটোরার জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যে সাণ্ডা প্রণালীতে অবস্থিত। এই সাণ্ডা প্রণালী চীন ও ভারত সাগরকে যোগ করিয়াছে। প্রণালীর ভিতর দিয়া প্রতিবৎসর বহু জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে। প্রায় দুই শত বৎসর আগের গিরি নিভেজ থাকতে পর্তুগীজ স্রামিক বৃক্ষ জন্মে আচ্ছাদিত হইয়াছিল, অতঃপর ১৮৮০ সনে তথায় ভূমিকম্প আরম্ভ হয়। ঐ কম্পন নিতান্ত কম নহে, কারণ উহা অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর দিকেও অনুভূত হইত। ১৮৮০ সনের ২০শে মে হইতে অগ্ন্যোদগমের সূচনা হয়। তখন পর্তুগীজ যোদ্ধাদের মত শব্দ হইতেছিল তাহা ১০০ মাইল দূর হইতে শুনা যাইত। ২৬শে মে একদল ভ্রমণকারী ক্রেকেটোরার অবস্থা দেখিতে যান এবং দ্বীপটিকে ভূবার ধবল ভস্ম রাশিতে আচ্ছাদিত দেখিতে পান, তখন আগ্নেয়গিরির মুখ গল্বর হইতে যে ধূম পটল উঠিতেছিল তাহা উর্ধ্বে ১০০০ ফিট উঠিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র ২ প্রস্তর খণ্ড বর্ষিত হইতেছিল, জুন, জুলাই এইরূপ ভাবে চলিয়া ২৬শে এবং ২৭শে আগষ্ট ইহার চূড়ান্ত অভিনয় হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে সাণ্ডা প্রণালী দিয়া বহু বাণিজ্য জাহাজ যাতায়াত করিত, কাজেই সে সময়ে এই প্রণালীতে উপস্থিত কতিপয় জাহাজের কাপ্তান ও যাত্রীগণ ইহার বহু সংবাদ দিয়াছেন।

কাপ্তান উলব্রিজ লিখিয়াছেন যে ২৬শে এক ভীষণ দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। পর্তুগীজ গাজের বিশাল মেঘ খটলে বৈজ্ঞানিক প্রবাহ চলাতে উহাকে এক বিরাট মহিক্রমের মত মনে হইল। সূর্য্যাস্তের পরে মেঘ পটল রক্তবর্ণ এবং তাহার পার্শ্বদেশ নীলাভ, অধিকন্তু ভগ্নাঙ্গে বিজলী চমকিতে আরম্ভ করিল।

সে সময়ে গগনে বৈজ্ঞানিক প্রবাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। “লগুন” নামক এক খানি জাহাজের বৃহৎ মাস্তুলের বৈজ্ঞানিক শলাকার ৫৬ বার বজ্রপাত হয়। তখন যে কর্মম বৃষ্টি হয় তাহাও কোনাকীর্ণ মত বলিতে থাকে।

২৭শে তারিখে “লগুন,” “চার্লস বস” প্রভৃতি জাহাজ

খানা কাঁহাৎ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই অগ্নোদ্গমের ভীষণ বিদারণ শব্দ ৩ হাজার মাইল দূর হইতে শুনা গিয়াছিল। এই শব্দে ১০০ মাইল দূরবর্তী দালানের কাঠের জানালা ভাঙ্গিয়া দেয়াল ফাটাইয়া এবং গ্যাস নির্গত করিয়া এক বিভৎস ক্রাণ্ড করিয়াছিল। শব্দ তরঙ্গ কয়েকবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। পর্বতের বে বিশাল অংশ উৎক্লিষ্ট হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে যে তরঙ্গ উদ্ভূত হইয়াছিল উহার বেগ ঘণ্টায় ৪০০ মাইল। এই ভীষণ তরঙ্গাব্যাহতে ৩৬৩৮০ জন লোক সহ বহু নগর ও পাল্ল ধ্বংস হইয়াছিল এবং দুইটা আলোক গৃহ উৎপাটিত হইয়াছিল।

উক্ত কারণে এনজের সহরে যে ললগ্রাবন হইয়াছিল তাহাতে যে ২১ জন লোক রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে পাদরী নিলু একজন। তিনি সেই গ্রাবনের দে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

“আমি ভোর ৬ টার সময়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতেছিলাম। যদিও গত কল্যের অন্ধকার কতক বিদূরিত হইয়াছে কিন্তু তখনও পথিকার আলো হয় নাই। আমি সমুদ্রের দিকে চাহিতেই এক পাহাড়ের মত কাল জিনিষ ভীরের দিকে আসিতে দেখিলাম। তখনই আমার মনে হইল যে ঐ দিকে সাণ্ডা প্রণালীতে কোন পাহাড় পড়িত নাই। আমি পুনরায় ঐ দিকে চাহিবা মাত্র বুঝিতে পারিলাম যে উহা এক বিশাল সমুদ্র তরঙ্গ আসিতেছে এবং ভীর দেশে আসিয়া ফাটিয়া পড়িবে। তখন প্রাণ ভয়ে দোড়াইতে লাগিলাম। যদিও তখন আমার দোড়াইবার বল নয়, তথাপি আমি প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম। কিছু সময়ের মধ্যে ঐ তরঙ্গ ভীরে আসিয়া পড়ায় ভীষণ শব্দ আমার কাণে পৌছিল; চাহিয়া দেখি রাশি রাশি গৃহ চূর্ণ করিয়া ঐ তরঙ্গ প্রবল বেগে আমার দিকে আসিতেছে। আমি পুনরায় দোড়াইতে লাগিলাম। প্রাণের দায়ে দোড়াইয়া নিকটস্থ এক উচ্চ ভূমিতে উঠিলাম। মুহূর্তমধ্যে তরঙ্গটা তথায় আসিয়া পৌছিল। তখনও উট্টে টা এত উচ্চ যে তাহা দেখিয়া আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিলাম। জল স্রোত আমাকে উপরের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। তখন

আমি একরূপ জ্ঞান হীন। হঠাৎ একটা কঠিন পদার্থের সহিত ধাক্কা লাগাতে আমার জ্ঞান হইল। আমি হাতের নিকটে যে শক্ত পদার্থ প্রাপ্ত হইলাম, তাহা দৃঢ় রূপে ধারণ করিলাম। পরে দেখিতে পাইলাম, যে উহা একটা নারিকেল বৃক্ষ। প্রবল তরঙ্গাব্যাহতে হইতে বহু নারিকেল বৃক্ষের মধ্যে আমার জীবন রক্ষা করিবার জন্যই বেন এইটা রক্ষা পাইয়াছিল। ইতি মধ্যে তরঙ্গটা আমাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। ক্রমে পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া তরঙ্গটির বেগ কমিল এবং বারি রাশি সমুদ্রের দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আমি সেই ভীষণ দৃশ্য এ জীবনে ভুলিব না। আমি যখন সিক্ত ক্রান্ত অবস্থায় একটা আকরাইয়া ধারণা আছি, তখন দেখি আমার আশ্রয় বন্ধদের বহু মৃত দেহ জলের সহিত ভাসিয়া সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। গৃহ অট্টালিকা সমস্ত বিধ্বস্ত হইয়া সহরটা এক মৃতশূণ্যে পরিণত হইয়াছিল।”

এই অগ্নোদ্গমে যে গুলকণা উৎক্ষেপিত হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত ক্ষম এবং তাহা এতউর্ধ্বে উঠিয়াছিল যে উহাদ্বারা পৃথিবীর সর্বত্রই সূর্যের উদয় ও অস্তের দৃশ্য এক অভিনব সৌন্দর্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

ক্রেকেটোয়ার অগ্নোদ্গম যদিও পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে তথাপি ১৯০২ সনে মন্ট পিলির অগ্নোদ্গমে যে রূপ লোক ক্ষয় হইয়াছিল, ইহাতে তত হয় নাই। প্রশান্ত মহাসাগরের ওয়েষ্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের মাটিনিক দ্বীপে মন্টপিলি অবস্থিত। এই দ্বীপটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে একটা স্বর্ণ দ্বীপ বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না। ১৯০২ সালের পূর্বে হইতে এই দ্বীপে বিপদের সূচনা হয়। ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে পর্বত হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকে এবং ২৫শে এপ্রিল কিঞ্চিৎ ভয় উল্লসিত হয়। কারণ অগ্নুসন্ধান করিবার জন্য একদল লোক গিয়া দেখে যে, তথায় এক পুরাতন শুষ্ক বৃক্ষ জল পূর্ণ হইয়া দিয়াছে। ৩০শে সামান্য ভূমিকম্প ও বিদারণ হয়। কিন্তু এই সকল বিপদের সন্মিলনে লোকের মনে কোন রূপ আতঙ্কের সঞ্চার হয় নাই। এমনকি তথাকার প্রধান সংবাদ পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় যে ৪ টা মে তারিখে একদল

কমণ্ডাঠা পক্ষত দেখিতে বাইবেন। কিন্তু ২রা যে তারিখে প্রবল বিদারণ ও ভীষণ অগ্ন্যোদগম হইল এবং তাহাতে লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়ার পূজ প্রভৃতি বন্ধ হইল। রাত্তা ঘাট দ্বয়ে অচ্ছাদিত এবং এক নিষাক্ত গানের দরুণ বহু পানী মুত্য়া মুখ পাত্ত হইল। এই যে তারিখে পূর্ণোদয়িত হ্রদের এক পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। হ্রদ হইতে প্রবল বেগে জল বাহির হইয়া যত বাধী বৃক্ষ সমস্ত ভাঙিয়া চূড়য়া সমুদ্রে আনিয়া ফেলিল। এই জলের থাকায় সমুদ্র দুই বানা জাতক জল হয় হইয়া যায়। এই ভীষণ বাপারে লোক প্রাণের ভয়ে দৌড়াইতে লাগিল। ৮ই বেলা ৭টা ৫০ মিনিটের সময় ককর্ণ দু'খর দখিত ভীষণ বিদারণ আরম্ভ হইল। অগ্ন্যোদগমে সেটি পদারী নগর দক্ষ হওয়াতে ৩০ হাজার লোক পুয়া মায়া যায়। কিছু সময়ের মধ্যে স্বর্গোপম স্থান এক তম স্থানে পরিণত হইল। এই ভীষণ বাপারে নগরের মাত্র একটি নিগ্রা কয়েকটি অগ্ন্যাহিত পাওয়া ছিল। পুনরায় ২০৫০ মে দ্বিতীয় বার বিদারণ ও অগ্ন্যোদগম হয়। এই ভীষণ অগ্ন্যোদগমে কেবল যে বাল ভাগেই বিপর্যয় কাণ্ড ঘটয়াছিল, তাহা নহে; নিকটস্থ সমুদ্রে যে কয় নানা জাতক ছিল তাহাও ধ্বংস হইয়াছিল।

কেবল হডেস ও বেইমা নামক দুই বানা জাতক মুতাবশিষ্ট মাত্র ২৪ জন নাবিক সহ অর্ধদক্ষাবস্থাতে ভাসমান ছিল,

হেওগাই স্বপের মেউনা লোয়া (Mauna Loa) আগ্নেয়গিরিতে "অগ্নেয় গিরির রাজা" বলা হইয়া থাকে। হ্রদ দুইটি মূখ। প্রত্যেকটির পরিধি ৭ মাইলের উপর। ইহা অশাধারণ গলিত আবারে জন্ম বিখ্যাত। ১৮৪০ সনে যে আব হইয়াছিল, তাহার প্রবাহের পরিমিত ৩ মাইল, গভীরতা ১২ হইতে ২০০ ফিট এবং ইহা চার দিকে ৩০ মাইল পৰ প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছিল। এই আবহাওয়া প্রায় তিন সপ্তাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। এবং কলে অসংখ্য নবস্ত মাটয়া সমুদ্রে ভাঙ্গা উঠিয়াছিল। এই উত্তপ্ত আবার দ্বারা সমুদ্র তীব্র ২০ মাইল স্থান বাপি জল উষ্ণ হইয়াছিল। দ্বারাটি একরূপ উজ্জল ছিল যে ইহার দ্বারা অতি ক্ষুদ্র অক্ষরও

প্রাক্তিতে পাঠ করা যাইত। ১০০ মাইল দূরবর্তী জাহাজ হইতে এই অক্ষর আলো দৃষ্ট হইয়াছিল।

১৮৫৫ সনে ইহার এক প্রবল অবহর। ইহা ৩ মাইল প্রস্থে প্রবাহিত হইয়া পক্ষতের নিম্নে আসিয়া প্রায় ৮ মাইল বাসের একটি গলিত ধাতু হ্রদ স্থলন করে এবং পরে বহু ক্ষুদ্র শাখায় প্রবাহিত হয়। এই উত্তপ্ত ধারার দ্বারা বন উপবন দক্ষ হইয়া যে পাইরলিগনাস এসিড (Pyroligneous acid) বাহির হইয়াছিল, তাহা দ্বারা নিকটস্থ নদীর জল দুষ্ক বর্ষধারণ করিয়া পানের অক্ষণযুক্ত হইয়াছিল। প্রায় ১৮ মাস পর্যন্ত এই গলিত ধাতু আব প্রবাহিত হইয়াছিল এবং এই ধাতু অব ৩০০ শত বর্গ মাইল স্থান ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

আগ্নেয় গিরি, ভূমিকম্প ইত্যাদির বহু ব্রহ্মান্ত বর্ণিত হইল। এখন দেখা যাইক ভূমিকম্প ইত্যাদির কারণ কি। পৃথিবীকে আমরা যে রূপ নিবেট ও শক্ত মনে করি বস্তুর ইহা তাহা নহে। যদিও ইহার উপরি ভাগ শীতল হইয়া শক্ত হইয়াছে কিন্তু ইহার অভ্যন্তর ভীষণ উত্তপ্ত। পৃথিবীর উপরি ভাগের ও নানাবিধ পরিবর্তন চলিতেছে। একদিন যে স্থানে মহাদেশ ছিল তথায় সমুদ্র এবং বিশাল গারিষির স্থলে মহাদেশ উদ্ভূত হইতেছে। ভূপৃষ্ঠের এইরূপ উত্থান পতন ভিন্ন ইহা কারণ বিশেষে হঠাৎ কম্পিত হইয়া উঠে। চন্দ্রের আকর্ষণে দিবসে দুই বার সমুদ্রের যেরূপ উত্থান ও পতন হয়, সেই রূপ ভূপৃষ্ঠেরও দুই বার উত্থান ও পতন হইয়া থাকে, বায়ু মণ্ডলের চাপের পরিবর্তনও ভূপৃষ্ঠ অস্থলব করিতে পারে। রেল ইঞ্জিন কামান গর্জন ইত্যাদির দ্বারা ভূপৃষ্ঠ প্রাতি মত কম্পন অনুভূত হয়। যখন মেইনজে ১২৫ মন বারুদ জালিয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহার দ্বারা ১০০ মাইলের অধিক দূরে পর্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল। বর্তমান মহাযুদ্ধ অতিক্রম কামানের গর্জনে ইহা বিশেষ রূপে পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে যুদ্ধ যন্ত্রের দ্বারা অগ্নির তাড়নায় যে কম্প হয়, এমনকি কুবের প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীর গতিতে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাও অনুভূত হইয়া থাকে

ভূগর্ভস্থ নৈসর্গিক কারণে যে কম্পন হয়, তাহাকেই

ভূমিকম্প বলা হইয়া থাকে। কখন এই কম্পনের দ্বারা সামান্য গৃহ সামগ্রী আন্দোলিত হয় এবং কখনও বা অট্টালিকা সম্বন্ধিত নগর বিধ্বস্ত হইয়া থাকে।

ভূমিকম্পের কারণ নির্দেশ করা বস্তুতঃই দুঃস্বপ্ন। সকল দেশেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইহার কারণ বর্ণিত হইয়াছে, আমাদের দেশের বাঙ্গালীর শির-কম্পন ঐ রূপ কারণের একটি উদাহরণ। বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ২ ইহার ২১৩ টি কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে। আয়েয়াগরি কিম্বা ভূগর্ভস্থ গহ্বরে প্রস্তুত ধসিয়া পড়াতে সামান্য ভূমিকম্পের উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রবল ভূমিকম্প পৃথিবীর উপরিস্থ শক্ত আবরণ কাটিয়া কিম্বা ভূগর্ভস্থ বিশাল স্তর ধসিয়া পড়াতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। ভূগর্ভে বিশাল ফাটল পূর্ণ হইতেই বর্তমান আছে, যখন কোন কারণে উহার পার ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখনই ভূকম্পের উদ্ভব হয়। এইরূপ ফাটলের পার ধসিয়া যে ভূমিকম্পের উদ্ভব হয়, তাহার ব্যাপ্তি স্থান অনেকটা লম্বালম্বি। ১৮২৪ সালে কনষ্টেটিনোপলে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহা ১০২ মাইল দীর্ঘ ও ২৪ মাইল প্রস্থ স্থানে অনুভূত হইয়াছিল। অনেক সময়ে এইরূপ ভূমিকম্পের আন্দোলনের সহজে বিরাম হয় না। জাপানের গিফুতে (Gifu) যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে ২ বৎসরে ক্রমান্বয়ে ৩৩৬৫টি কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। অনেক সময়ে কম্পনের গতি দ্বারা ফাটলের স্থান নির্দেশ করা যায়। কখন কখন ফাটলের একদিক ফাটলের বহির্দেশের নিম্নে প্রবল বেগে প্রবেশ করিয়া থাকে। ১৮২৭ সনের আসামের প্রবল ভূমিকম্প এই কারণে উদ্ভূত হইয়াছিল।

সাধারণত গিরিশ্রেণীর সমস্তরাল কিম্বা লম্ব ভাবে এইরূপ ফাটল ধসিয়া পড়ে। পৃথিবীর বহিরাবরণ যেখানে অভ্যন্তর উচু নীচু সে স্থানেই এইরূপ ধসিয়া পড়া স্বাভাবিক। যদি ও ধসিয়া পড়াতে প্রবল ভূমিকম্পের উদ্ভব হয়, তথাপি সকল ধসিয়া পড়াতেই প্রবল ভূমিকম্প হয় না। এই কম্পন নির্দেশ করিবার কল যন্ত্র যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার নাম সিস্মোগ্রাফ (Seismograph)। এই যন্ত্র দ্বারা

দেখা গিয়াছে যে কম্পন তিন প্রকারের হইয়া থাকে। সাধারণ কম্পন বৃহৎ হইতে ক্রমে প্রবল হইয়া থাকে। আর এক শ্রেণীর কম্পন বৃহৎ ভাবে হইয়া থাকে, অর্থাৎ একটীর সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা কম্পন হয়, তৃতীয় শ্রেণীর কম্পনকে মিশ্র কম্পন বলা যায়; উহার গতি নানারূপ। প্রথমোক্ত কম্পন ৪ হইতে ৮ সেকেন্ড স্থায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্পনের স্থিতি ইহার দ্বিগুণ এবং মিশ্র কম্পন কতিপয় মিনিট স্থায়ী হইতে পারে। কোন ভূমিকম্পে পদতলস্থ ভূমি যেন একবার উপরে উঠিবে এবং একবার নীচে নামিতেছে, এরূপ বোধ হয়; যদিও প্রচুর ক্ষতি হইতে পারে, তথাপি এইরূপ কম্পনের দ্বারা অতি সামান্য। কোন কোন ভূমিকম্পে যেন হয় ভূমি পাশা পাশি টানিতেছে; ইহার সাধারণ দ্বারা ১ ইঞ্চির কম, কিন্তু কখন ২ ইহার দ্বারা ১০।১২ ইঞ্চিও দেখা গিয়াছে। রায়বেম্বাতে (Risbamba) এক ভূমিকম্পে ১৭৪৭টি বৃহৎ দেহ কবর হইতে উপরে উঠিয়া ফেলিয়াছিল। কথিত আছে ১৭২৭ সালে কুইটো (Quito) তে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে কোন কোন লোককে ১০০ ফুট উর্দ্ধে উদ্ধিষ্ট করিয়াছিল। পোর্ট রয়নের ভূমিকম্পে বাজারের সকল লোককে সমুদ্রতীরে আনিয়া ফেলিয়াছিল। এই কম্পনের বেগের গতি সেকেন্ডে কয়েক শত ফিট হইতে কতিপয় সহস্র ফিট পর্যন্ত হইয়া থাকে। যুক্তিকার প্রকৃতির উপরে এই কম্পনের ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে। নরম ভূমিতে কম্পনের ফল অতি ভয়ানক হইয়া থাকে কিন্তু প্রস্তর ময় ভূমিতে তত হয় না। এই ভূমিকম্পে ভূপৃষ্ঠ কাটিয়া যায়, কখন কখন গৃহ অট্টালিকা প্রোথিত হইয়া পড়ে। কখন কখন এই ভূমিকম্পের পূর্বে একরূপ গুরু গভীর শব্দ হইয়া থাকে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

সমস্যা ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কলেজে গিয়াছিল, কলেজ হইতে আসিয়া কাকের চিঠি পাইল। চিঠি খানা তাহার বো-
লির বাতের লেখা। সার্ট খুলিয়া রাখিয়া হাত পাখায়
দিতে দিতে চিঠি খানা পড়িয়া ফেলিল।
খিস্তিরি লিখিয়াছেন।

গৌরপুর।

৭ চৈত্র, রবিবার।

প্রিয় ঠাকুর পো।

তোমার চিঠি খানা অনেক দিন পাইয়াছি।
দলিলতা বেহু উত্তর দিতে পারি নাই। সেজন্য কমা
বুঝাই করিতে হইবে। না করিলেও উপায় নাই।

তুমি যে বাবার উপর সকল ভার গুস্ত করিয়া দিয়াছ,
কিন্তু তাই বড়ই বুদ্ধিমানের কাজ হইয়াছে। পুত্র
পিতৃ হইলে পিতার যেমন গৌরব, সেই পুত্র যদি
পিতাকে অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে পিতার তেমন
নগৌরব। তুমি বলিবে এসব কথা কেন? আমি বলি,
তুমি যে আমাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছ, তাহা যে
আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, সে জ্ঞাত। ইহা—ধন্যবাদ,
উপবেশ নহে।

তুমি পণ লইবার পক্ষপাতি নও, বেশ কথা। পাঁচ
টাকার টাকা ঋণ যদি মাথায় লইতে সাহস পাও,
আমাদের কি আপত্তি?

দুর্ভাগ্যবশত আজ নিজেই আসিয়া বিবাহের কথা
কহিয়াছিলেন। টাকা না লইতে হইলে বৈশাখে
বিবাহ হওয়া যায় মত। এখন তুমি বৈশাখে আসিতে
নাহিলেই হয়।

প্রতিমা—ঐক প্রতিমা খানার মতই নিখুঁত ছন্দর।
বৈশাখ বুধ হইলাম। গত রবিবার কোন প্রকারে
আসিয়াছিলাম। কি ছন্দর! বস্ত্র তোমার দৃষ্টি শক্তির।
দুর্ভাগ্যবশত যে একেবারে কিছুই দিবে না, এও কিন্তু
আমাদের মনে হয় না। বাক, তুমি বধন চাও না, তখন
আমাদের ভাগেই থাকিবে। ভাগ্য মহতের
স্বপ্ন। সত্যত, সর্ব ভাগ্য—পাগলের।

বৈশাখ মাসেই বিবাহ হওয়ার মত স্থির করিয়া
উত্তর লিখিবা। আমরা উত্তরের আশায় চাহিয়া রহিলাম।
মা ও বাবা ভাল আছেন; ছেলে মেয়েরা একরকম
কুশলেই আছে। তোমার কুশল চাই। ইতি—

তোমার স্নেহের বোদি।

চিঠি খানা টেবিলের উপর চাপা দিয়া রাখিয়া
শৈলেন দুর্গাদাস বাবুর পুস্তকের প্রকট টানিয়া লইয়া
বসিল। কাল রাত প্রক দেখা শেষ হয় নাই।

ষেতিন পৃষ্ঠা বাকী ছিল, তাহা দেখিয়া উঠিয়া সে
বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে
ছিল, এমন সময় পণ্টু আসিয়া “বাবু, ছাপাখানাকা
কাগজ।” বলিয়া হাজির হইল।

পণ্টু দুর্গাদাস বাবুর দারোগান। পণ্টুর হাতে এক
খানা টুকরা কাগজ ছিল; শৈলেন তাহাকে প্রফের
কাগজগুলি দিয়া ঐ টুকরা খানা লক্ষ্য করিয়া বলিল—
“ও ক্যা হায় রে?”

“চিঠি হায়।” বলিয়া তাহা তাহার সম্মুখে ধরিল।
শৈলেন দেখিল, দুর্গাদাস বাবু নগেনকে বিকালে
৫ টায় সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছেন।

সে কাগজ খানা দারোগানের হাতে ফেরত দিয়া
বলিল “ওনকা পাভা পচান্তে হো?”

“সাসট বউবাজার, ও পুছকে চেলে যায়গা।”

“বহত আচ্ছা।”

একাদশ পরিচ্ছেদ

“এইবে, Good morning নগেন বাবু।”

“আমুন, আমুন, আসিতে আজ্ঞা হউক।” বলিয়া
নগেন বিধু বাবুকে তাহার মেসের দ্বার হইতে লইয়া
তাহাদের মেসে প্রবেশ করিল।

নগেন জিজ্ঞাসা করিল “তারপর এ দিকে কোথায়?
আমাদের মেসে আপনার খানা কেহ আছে নাকি?”

“আমি যে আপনার খুঁজে কিছুই—মহার,
আপনার সাথে একটা Private talk ছিল, তা আমার
সময় হয়তো আপনার খোঁজ পাইনে, আপনি থাকুন তো
আমি নেই।” বলিয়া বিধু বাবু হাসিয়া ফেলিলেন।

নগেন তার কোঠার বাইরা বিধু বাবুকে লইয়া বসিল। “আমার সঙ্গে Private talk! ব্লুন দেখি কি?”

“একটু Rest নিব না বলছি।”

“আপনার Policy কি রকম সংগ্রহ হইতেছে?”

বিধুবাবু তার কথার মনোযোগ প্রদান না করিয়া বলিলেন “দেখুন নগেন বাবু, জীবনকে রূপে রসে গন্ধে নন্দিত করে আনন্দের অভিযুখে চালিয়ে নেওয়াই যদি তাহাকে সার্থকতা দান করবার একমাত্র উপায় হয় তো তার দিকে লক্ষ্য রেখে চলাই যে মানুষের প্রধান কণ্ডব্য, যে বিষয়ে বোধ হয় কারো সন্দেহ থাকবার অবকাশ নেই।—”

নগেনও গম্ভীর হইয়া বলিল—“আপনার কোকিল কলাপাচাল যে মনোচলানিল তাহাতে করিয়া আমার উচ্চলঙ্করভাষ্যনিবন্ধঃকণাঙ্কর হইয়া আসিতেছে, এ বিষয়ে বোধ হয় গুরুতর সন্দেহ আপনার থাকিতে পারে; কিন্তু আমি এ বিষয়ে কিং কণ্ডব্য বিমূঢ়।”

বিধু হাসিয়া বলিল—“কিছুই যে বুঝে উঠিতে পার্লাম না নগেন বাবু!”

নগেনও হাসিয়া বলিল—“আপনি সাহিত্যিক হইয়া বুঝিতে পারিলেন না, আশ্চর্য্য! এ যে অষ্টাদশ আর বিংশ শতাব্দীর—মৃত্যুঞ্জয়ী ও রবিয়ানা সংযোগ।”

বিধু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“যাক্ আপনি আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবেন না একটু ধৈর্য্য ধরে শুনুন—প্রিয়।”

নগেন—“এরূপ ধৈর্য্যের পথে কাঁটা নিয়া উপস্থিত হইলে কিরূপে ধৈর্য্যটাকে ধরিয়া রাখিব বলুন, সে বোঝারি দোষ কি।”

বিধু বলিল—“আচ্ছা বিনি মুখবন্ধে সংক্ষেপেই বলছি, অনুগ্রহ করে শুনুন—আপনি আমাদের সাংগেটিক্ এসোসিয়েসনের কথা অবিশিষ্ট জানেন,—এবার সাংগেটিক্ এসোসিয়েসন পঁচিশ জন যুবককে শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য জার্মেনি, আমেরিকা, ইংলন্ড, জাপান প্রভৃতি স্থানে পাঠাচ্ছেন। পাঁচ জনের

জনের পাট এসপেন্স বহন করবেন, আর কতক জনের অনুলি ট্রেভেলিং এসপেন্স দেবেন। আপনি যদি এ গরীবের জন্য একটু চেষ্টা করেন, তাহলে এ মর্যাদা জীবনটাকে কোন মতে নন্দিত করে, করিয়ে কবিতা নেবার মতন করে তুলতে পারি।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“আমাকে উকীল ধরিতে চান কোর্ট কোথায়? কার কাছে বক্তৃতা করিব? মোকদ্দম টাইবা কি? সবই ভাবিয়া বলুন এবং সরল ভাষায় বলুন তবে।”

“হুর্গাদাস বাবুর নিকট বল্লই হবে; তিনি এসোসিয়েসনের একজন সভ্য।”

“তা বেশ! কিন্তু উকীল বধন ধরিয়াছেন, তখন সব কথাই পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে, বেন বক্তৃতা করিতে যাইয়া ভুল না করি, বেকুব না হই। আপনি কি বিদেশে যাইতে চান?”

“ঠিক ধরেনে মস্য। এবার এদিকে সরে আসুন, আমিই যেতে চাই।”

“কেবল যাইতে চাহিলেইতো হইবে না। আপনাকে এসোসিয়েসন কেন ধরচ দিবে? আমি কাননে দেখিয়াছি যে, কোন বিষয়ের Specialist দিগকেই শুধু এসোসিয়েসন ধরচ দিবেন। আপনার এডুকেশনাল কুয়ালিফিকেশন কি ও কোন বিষয়ে আপনি বিশেষজ্ঞ তাহা আমাকে বলুন।”

“আমি কোন বিষয়ের স্পিসিয়ালাইট নই, কুয়ালিফিকেশনও বিশেষ কিছু নেই—আই এ ৩ বার কেল্ করেচি—আমি অবশিষ্ট এসোসিয়েসনের সম্পূর্ণ ব্যয়ই পেতে দাঁড়া করিনে। আমি চাচ্ছি কি জানেন। আমি হুর্গাদাস বাবুর কনট্রিবিউশনটা চাচ্ছি; সেই-টে আপনি করিয়ে দিন।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“আরও একটু মন খুলিয়া বলুন। হুর্গাদাস বাবুর কি কনট্রিবিউশন, আমাকেই বা কি করিতে হইবে?”

“হুর্গাদাস বাবুর দুটো টাইপেট আছে, তার একটা আপনি আমাকে লইয়ে দিন।”

“তিনি কেন দিবেন, আপনিইবা কি লুপ্তে চান, তাহাও বলিতে হয়।”

বিধু বলিলেন—“ঠিক বলেছেন। ইউ আর কোরাইট
কিউ—ঠিক বলেছেন। তিনি হুটী ছেলেকে খরচ দিয়ে
কিউয়ে বার্ষিক করে এনে, বুঝলেন, তাদের হাতেই তার
মিউ হুটীকে বে দেবেন, এই হচ্ছে তাঁর ইচ্ছে।” বিধু
শিউপি শেষ কথা কর্তী বলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

“বটে, আপনি তাহা হইলে দুর্গাদাস বাবুর জামাই
কিউর কেভিডেট।” বলিয়া নগেন্ও উচ্চ হাস্ত করিল।

বিধু—“ঠিক ধরেছেন কিন্তু ; আপনি সেই টে করে
কিন। জীবন টাকে নন্দিত করে আনন্দের—তাঁর
জীবন চরণের পানে ধাবিত করবার উপায় করে দিন।”

নগেন—“খায়ুন না, ! দুর্গাদাস বাবু দুইজন কে
কিউইবেন ? আর এক জন কে ?”

“বতীন্ড ভোস—ঐ বে ছোকরা, নেহাৎ অরসিক,
ইকোনিক, আমাদের সঙ্গে চা খায়—সোনার চসমা—
স্বাক্ষরের আইভেট টিউটার—।”

“বতীন্ড ভো এন্ড, এস সি, খুব ভুখার ছেলে, Presi-
dencyতে রিহাস-ক্লার ছিল, ওকে তো দেওয়া
কিউই। আপনাকে দুর্গাদাস বাবু দিবেন কেন ?
আইডিয়াক বলিয়া কি ?

“ওর নিকট দিন না, ওতে আমার একেবারেই
আপত্তির কারন নেই কিন্তু দেখুন, বোধ হয় ও হচ্ছে না।
কিন্তু মেয়েরা মোটেই পছন্দ করে না। বিদ্যান হ’লে
কিন্তু হয় বাবা ? ওও চিন্তা করে, কিসে কোন্ কয়লার
সুন্দর প্রভাব হ’তে করোগেটেট আরবনকে রক্ষা করা
কিন্তু পারে ? কলের চিমনি কি হ’লে ধুম ছড়াতে না
পারে। তবে তেতর কি রসের চাব আছে ? না প্রেমের বীজ
কিন্তু ? রলহীন বিচ্ছেদটাবে বক্ষা নারীর মত নিষ্ফল।
কিন্তু, ভিত্তিতে এক জনকেই নেবেন, আমি আর এক
জনকে কেভিডেট।” বলিয়া বিধু খুব হাস্ত করিলেন।

“কিন্তু গভীর ভাবে বলিল—‘ব্রাহ্ম সমাজে উপযুক্ত
সুন্দর প্রভাব নাই। এত উপযুক্ত লোক থাকিতে
দুর্গাদাস বাবু আপনার নিকট মেয়ে বিবাহ দিবেন ?’

বিধু হাস দেখাইয়া বলিল—“তুল আপনার ব্রাহ্মসমাজে
কিন্তু উপযুক্ত আছে—এ জন আপনার এক দম Quita

মেই। গড়ে এখন গ্রেজুয়েটের সংখ্যা বোধ হয় ছেলে
আপেক্ষা মেয়েই বেশী হচ্ছে।

“আপনার এরূপ মন্তব্যের কারণ কি ?” বলিয়া
নগেন হাসিয়া বিধু বাবুর মুখের দিকে চাহিল।

“জানেন—তার এক মাত্র কারণ ব্রাহ্ম সমাজ তার
সম্পূর্ণ এনার্জি ঐ ত্রীশিক্ষার ভেতর প্রয়োগ করেছেন।
সমাজে যান—কেবলি শুনবেন ত্রীশিক্ষা ! ত্রী শিক্ষা !
ছেলে শিক্ষার দিকে এটেনশন্ ওদের একে-
বারে নেই বলিতে, কিছুই নেই। ফলে, ছেলেগুলো
হচ্ছে সব বাজে মার্কার। একি আপনারা দেখছেন
না ?”

নগেন একটু ধীরে ধীরে বলিল—“দেখিতেছি বটে,
কিন্তু দুর্গাদাস বাবু যে যারতার হাতেই মেয়ে তুলিয়া
দিবেন, তাও কিন্তু আমার মনে হয় না।”

বিধু হটাৎ রাগ করিয়া বলিল—“তবে তিনি কাকে
দেবেন ? কে তাঁর মেয়েকে বে করবে ?

নগেন্ “কেন, ব্রাহ্ম সমাজে তাঁর বরূপ প্রতিপত্তি,
তাঁর মেয়েকে কে না আদর করিয়া নিবে ?”

বিধু—“তবে আপনি ব্রাহ্ম সমাজের কিছুই জানেন
না, কি—ছুই—জানেন না। বলে দিলাম—তারি aris-
tocratic feeling ও সমাজে কিন্তু ; বাক, ও বিষয়ে
আপনার চিন্তা নিশ্চয়োজন।”

নগেন আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল “aristocra-
tic feeling তাঁর মানে বুঝিতে আমার গোল হইতেছে
আপনারাও ভিতর কি জাতি ভেদ আছে ?”

বিধু হাসিয়া বলিল—“খুব খুব। কোন ব্রাহ্ম
কারণ কি দুর্গাদাস বাবুর মেয়ে বে করবে ? কখনো
নয় ! ব্রাহ্ম সমাজকে আপনারা বের থেকে দেখছেন।

“দুর্গাদাস বাবু কি জাতি, আপনিই বা কি
আমরাতো জানিতাম, ব্রাহ্ম সমাজে সকলি এক।”

বিধু হাসিয়া বলিল—“দুর্গাদাস বাবু মুন্ড, তাঁহার ঐ
ব্রাহ্মণ ; আমি নমঃব্রাহ্মণ। আমাকে তিনি পেলে
বাপেঠাকুর বলে গুণিয়ে নেবেন।” বলিয়া বিধু
খুব গর্বের সহিত নগেনের দিকে চাহিয়া ফেলিল।

নগেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—“আপনার ভিতর যে এত তাত্তো আমি জানি না! তা বাক্। এখন কথা—কোন মেয়েকে আপনি বিবাহ করিতে চান?”

বিধু বলিল—“তা বাক্ তঁরা ইচ্ছে করেন। সেটা তাদের Selection এর উপরই নির্ভর করবে।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“তথাপি তো আপনার ও একটা Choice আছে। বলুন, বলিয়া ফেলুন, সব কথাই শুনা বাড়িক। উকিলকে সব কথাই খুলিয়া বলিতে হয়।”

বিধু হাসিয়া বলিল—“পারুলকে বতীনই বে করবে, বকুলকেই আমি মেব বরণ।”

নগেন—“সেটা মন্দ হবে না, সেও একটু সাহিত্যিক, বেশ গান রচনা করে কিন্তু।”

“সেও কিন্তু আমারই শিকা।” বলিয়া বিধু সহাত্রে নিজ পকেট হইতে একখানা নোটবুক বাহির করিয়া বলিলেন—“রাখুন, পরে দেখে যাবেন আপনি, এখন কথা শেষ হয়ে বাক।”

নগেন নোটবুকের কয়েক খানা পাতা উন্টাইয়া দেখিয়া বলিল—“বেশ গান! আপনার লেখা?”

বিধু—“হা, এর বাকেই পড়ে ফেলেন! আশ্চর্য্য লোক আপনিতো?”

নগেন—“কবিতায় ছন্দ গতন কেন হয় আপনার এত?”

বিধু—“ও তে আজ কাল দোষ নেই, ও “বেয়ন ভেমন ছন্দ” রবিবাবুরও ওরূপ ছন্দ ভঙ্গ হয়। ও তে দোষ নেই।”

নগেন—“আপনার কোন উপাধি নাই?”

বিধু—“না।”

নগেন—“ছুটাকা দিলেই তো হয়, নিন না? একটা বিভাগাগর, কি কবি সত্রাট—।”

বিধু উর্দ্ধবিক্ষেপে প্রাণাম করিয়া জিজ্ঞাস্য কামর দিয়া বলিলেন—“বিভাগাগর!—সে একজনই ছিলেন।”

নগেন হাসিয়া বলিল—আপনি এখন বাঙালা ভাষার লিখিত ভবন উপাধি হওয়া উচিত আপনার বলা-

নগেন—“আজ হইতে আপনি বিধুবাবু নাম রাখিবেন।”

বাড়িক, বলুন আপনি কি Subject নিয়া কোথায় পড়িতে চান?”

বিধু খুব একদম হাসিয়া তারপর বলিল—“আমি সাবান শিখতে আপান যেতে চাই। খরচ কম লাভও বেশী।”

নগেন বলিল—“আমি, কিন্তু তাহা হইলে আপনাকে কৈটোরির মানেজার হইব।”

বিধু একটু চিন্তা করিয়া বলিল—“আপনি আমায় উকিল হবেন। মানেজার হ'লে চলবে না।” আপনাকে সহিত আমার প্রতি কথার মতভেদ হয়ে যার।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“আপনার সরলতাকে ধন্যবাদ। এই সময় পণ্ট চিঠি লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

পণ্টকে বিদায় দিয়া নগেন বিধুকে বলিল—“বায়না চাই। প্রথম উকালতি, বায়না ছাড়া হইতে পারে না।

“সেতো অবশিষ্ট।” বলিয়া বিধু চলিয়া গেল। পণ্ট মিনিটের মধ্যে একটা ঝেঞ্জা ভরিয়া মিষ্টি লইয়া আসিল।

বিধু বলিল—“বায়না আপাতত এই, কাজ শুদ্ধি হইলে Full payment হবে।”

নগেন পরীবের দণ্ড করিয়া মনে মনে বড়ই লজিত হইল। যুখে বলিল—“আপনার মন ভাল, কাজ হইয়া যাইবে।

সাবাস্তাশিখিতে এক বৎসরের অবিক থাকিবে হয় না। তারপর কিন্তু আপনার বাড়ীতে আমার বাস হইবে। সেখানে থাকিয়াই বি, এলু দিব।

দেখুন, বড় কষ্টে আছি—প্রাতে বিকালে ছেলে পড়াইতে হয়—

বিধু আগ্রহের সহিত বলিল—“সে কথা আর বলবেন না, তবে, সেটা Law College থেকে অনেকটা হইবে।”

নগেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—“সে কি, কবিতা লেখা বাসাও ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন নাকি?”

বিধু—“সে কি আপনি জানেন না? বাসি গল্পে যে হুর্গাদাস বাবু মেয়েদের জন্তে বাসি বাড়ী প্রস্তুত করে রেখেছেন, সে বাড়ী ওপো যে এখন তাঁরই আছে।”

নগেন একটু আশ্চর্য্য হইল। বলিল—“আমি জানি না, সে কি হইবে।”

বিশ্বাস করুন। বলি—জুগীদাস বাবুর
এতই টাকা।”

বিধু—“দুই লক্ষ টাকা তার জ্বর নামে * * * বেছে
লি—“দুই মেরের নামে দশ হাজার করে দিয়েছেন,
টাকার কুমীর। লোকটা টাকার কুমীর।”

মগেন—“জুগীদাস বাবু তো খুব খরচ পত্র করেন
লোকটা হলো কেমন করিয়া?”

বিধু—“কোথায় তাঁর খরচ পত্র? এই যে চা
বাবু সন্দেহ, এইতো?—এ হচ্ছে ফাঁদ! ফাঁদ!
কিছুটা বেজায় মাইজার। তার কাছে গরীব দুইটা
কি, ভিজিট বোন টাকা—একটা পরমা কম—
বাপের বাড়ি! যা বোক, করেছে লোকটা এক জীবনে
বিধু। মা হলে আমার মত লোকও তার বাড়ী যেতে—”

মগেন—“ব্রাহ্ম সমাজের সকলেরই বেশ অবস্থা
হাল। অবস্থা ভাল করবার একমাত্র উপায় খরচ
পত্র খুঁজা—এটা ব্রাহ্ম সমাজে বেশ দেখিতে পাওয়া
যায়। অপব্যয় ও অত্যাচার ব্যয় তাহারা খুব কম
করেন। বোধ হয় মেয়েদের শিক্ষাই তাহার কারণ।”

“অপব্যয় করলে উপায় নেই, তাই। ব্রাহ্ম সমাজে
বিধির ভাঙ নেই—কেউ জিজ্ঞাসা করে না।”

মগেন—“সহানুভূতির প্রথাটা ব্রাহ্ম সমাজে খুব
খালি বলিয়াই মনে করি। হিন্দু সমাজের বাওয়া
কিই মারামারির ভাবটা সেখানে নাই।”

বিধু—“ব্রাহ্ম সমাজে বার বার পুত্রের তের চুলা।
কিন্তু আপনি আজ বিকেলেইতো যাচ্ছেন। আজই
কিছুটা শেখ করে আসবেন। আমি সন্ধ্যার পর
কিভাবে বাব, ততক্ষণ অপেক্ষা করবেন।”

মগেন দেখিল যান আহ্বারের সময় যাইতেছে, সে
বিলি—“তবে আপনি এখন আসুন—আমার কলেজ
কিছু। সেখানেই দেখা হইবে।”

বিধু বলিল—“আর এতই কি time হয়েছে?”

মগেন নিজ watchটা দেখাইয়া বলিল—“এই যে
টা, আপনার কি বাড়ি নাই?”

বিধু—“ওতে attentionএর বেজায় বাজে খরচ
কিন্তু আমি রাবি না—।”

মগেন—“সে কেমন?”

বিধু—“He that keeps a watch has two
things to do
To pocket his watch and watch his
pocket too.”

—“কক, ওড়্ বাই।” বলিয়া হাসিতে হাসিতে বিধু
কিছু কলার ছাতাটা ও একোঙ্গার ব্যাগটা লইয়া উঠিয়া

“জলকে” ।

(১)

আয় আয় রাই জল আনিতে রাই,

হেলায় বাড়িবে বেলি,

মেজর সমীরে ন হত লহরে

করিব লো জল খেলা।

তরুণ অরুণে কনক বরণে

যমুনার কলতান,

চল চল ধনি রাই বিনোদিনী

সে তানে মিলাব গান।

(২)

উজ্জ্বল ছল ছল লাল যমুনা জল,—

পাগল ধেরল রাই দেহ,

হাসিছে ধল ধল চঞ্চল সখিদল

দিক্ত নয়নে জল কেহ।

গাহে পাণিয়া পিক মধুকর নিকর

বন্ধারে কমলবন ভুলে,

সরম ভরম নাহি আকুলা কিশোরীকুল

কুলে না চাহিল আঁখি ভুলে।

বীর সমীর বণে কুমুম সুরভি সহ

কানন জাগিল প্রেম গানে

উজ্জ্বল ছল ছল নীল যমুনা জল

গাওল ললিত কল তানে।

(৩)

কমল মুকুল ভুলে দ্বকুল তামসী খুলে

বোঁপিল অরুণ নীল জলে—

রজিনী সখিদল বাচিমালা চঞ্চল

শত রবি হাসে ধল খলে।

মুকুতার পাতি কি রে দশনে মাগিছে রবি

মগয়া খুঁজিয়া মরে মধু

কঙ্কন কণ কণ মঙ্গল গীতি গানে

নন্দিত করত প্রাণ বধু।

নবীন নীরদ জালে থিরা দামিনীঘেরি

জল কেলি করে অবসান

মৃণালে বাঁধিয়া ধলে কলসী ভরিয়া রে

বীর সমীর বহে কুহুম স্বরভি সহ
কানন জাগিল প্রেম গানে,
উজ্জ্বল ছল ছল নীল যমুনা জল
গাওল ললিত কল তানে।

(৪)

গাগরী সলিলে ভরি ব্রজবালা কিশোরী
বসাওল যমুনার কূলে,
পীত বসন পর মোহন চূড়া শিরে
বনমালী নীল তরু মূলে—
আড় নহনে চাহে ; নিরখিল সখিগণ
কহে লাহে ‘ছি ছি একি রক্ত’,
কাঁখে গাগরী তুলি চঞ্চল চরণে চলে
সিক্ত বসনে কাঁপি অঙ্গ।
রূপ সাগরে মরি বি খোঁজা ধরিল রে
বসনে বসান দিল তাহে,
ধির বিজুরি ধারা পরায়ে চলিল রে
কান্ধাইয়া অনিমিখে চাহে।

(৫)

রক্ত কমল মুখ কম্পিত কমল বুক
কোকিল চরণ তলে,
কণ্ঠ চাপিল কেবা হৃদয়ে পাষণ দিয়া,
চলিতে চরণ নাহি চলে।
আনমন রঙ্গিনী উলটি চাহিল পুনঃ
কলসী পড়িল ভূমিতলে,
“সখি ! কি বাঁচল পায়—নয়নে পড়িল কিবা
গাগরী তুলিয়া ধীরে চলে ॥
ঝকারে মধুকর গায়েছে পাপিয়া পিক
বনপথে কুহুমের রাশি ;
সহসা মূধর করি মধুরে কুজবন
সুকারিল মোহন বাণী।
নীলব বিহগকুল মধুকর গুঞ্জন ;—
পলকে চরণ পথে বাধে,
বীর সমীর বহে যমুনা মথিয়া কিরে,
হুর মুখা “জয় জয় রাধে।”

ত্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গলার পাখী।

(২) বুলবুল।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই বুলবুল নামে এক প্রকার পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। বুলবুল দেখিতে বড় সুন্দর ; মাথায় কটী ও পুচ্ছের নিম্নভাগে স্বরবৎ দাঁড় পালকে আবৃত। ইহাদের পরস্পরের যুদ্ধ দেখিবার জন্যই সৌখিন লোকেরা ইহা প্রাপ্যপালন করিয়া থাকে। লক্ষ্মী, দিল্লী, বাবানসী, প্রয়াগ প্রভৃতি এবং এখানকার ঢাকা সেরপুর প্রভৃতি নানাস্থানে যুদ্ধার্থ বহুলপরিমাণে এই পাখী প্রতিপালিত হইত। তজ্জন্ম ইহাদের মূল্য অল্প ছিল না। যে কালে পৌষ সংক্রান্তির দিন বিশেষ ভাবে বুলবুলের লড়াই দেখিবার জন্য নানাস্থানে প্রায় দর্শক সমবেত হইত। পৌষ সংক্রান্তির মেলা-মধ্যে বুলবুলের লড়াই অত্যন্ত আমোদ জনক ব্যাপার বলিয়া মধ্যে একটি বর্ণনা গণ্য হইত। এখনও মেলা প্রভৃতি যদিও পূর্বেপাখ্যে বাসিয়া থাকে, তথাপি পূর্বের তার জমকাল হয় না এবং পশুপাখীর কাড়া প্রদর্শনের জন্যও লোকের আর উৎসাহ নাই। কালেই উৎসবের এই অঙ্গটি একেবারে বলুপ্ত হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বুলবুল ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। চৈত্র ও বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ইহাদের সন্তান উৎপাদনের সময়। জন্ম জাতীয় ছোট ছোট বৃক্ষে ইহঁদেরা কুলার নির্মাণ করিয়া থাকে। তারা বৃক্ষের ছোট ছোট ডাল স্বরবৎ পদার্থ দ্বারা জড়িত করিয়া লড়াইরার ঠিক বাতীর আকার গুলি নির্মাণ করে এবং বৎসরে দুই তিন বার সন্তান উৎপাদন করে। প্রতিদিন এক একটি করিয়া ক্রমান্বয়ে তারি পাঁচটি পর্য্যন্ত অণু প্রসব করিয়া ১৮ দিন তা দেওয়ার পর ইহাদের বাক করিয়া থাকে। এক সন্তানের মধ্যেই ইহাদের পক্ষোদগম হইয়া থাকে। প্রায় তিন সন্তানের মধ্যে উত্তরা উড়িয়া বেড়াইতে পারে। মাতার পুনঃ গর্ভধারণের সময় নিকটবর্তী বা হওয়া পর্য্যন্ত পিতা মাতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয় ইহারা আহাধাধেয় ও আনন্দের উপায় শিক্ষা করিতে থাকে। ইহারা কীট পতঙ্গ

কোমল অংশ আহার করিয়া জীবন ধারণ

শীতকালই এই পাখীর বৃদ্ধ দেখিবার প্রকৃত সময়। শীতকাল হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ইহাদের জীড়া করণের ঠিক সময় বলা যাইতে পারে। নানা উপায়েই এই পাখী অরণ্য হইতে ধৃত হইয়া থাকে। বট জাতীয় গাছের রস অগ্নির উত্তাপে গাঢ় করিয়া বৃকের ডালে রাখিয়া রাখিলে ঐ ডালে পাখী বসিলেই পা ও ডালকে তাহা লাগিয়া যায়, তখন শিকারী যাইয়া উহাকে ধরিয়া আনে। এই উপায়ে পাখী ধরিলে অনেক পাখীই পালক ছিড়িয়া যায় এবং বৃদ্ধকালে নতুন পালক লাম হইলে তাহাতে অঙ্গপক্ষী আঘাত করিলে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে ও তজ্জন্ত বৃদ্ধে বিব্রত হইয়া পড়িয়া যায়। ঐ পাখী ধরার অল্প উপায় এই যে, যখন ছিড়িতে উহা বৃকে বসিয়া থাকে, তখন দুইটী বংশ দণ্ডে উহা ধরিয়া বৃকের চারিদিকে এইরূপ চারিখানা জাল দিয়া ঘেরিয়া একটি লম্বা বাস দিয়া পাখীকে উড়াইয়া ধরিলে সে অন্ধকারে জাল দেখিতে না পাইয়া গিয়া গুলি খালে পড়ে; তখন দুই দিকের দুইটী বংশ দণ্ড একত্র করিয়া তাহা ভূপাতিত করিলেই পাখী হস্তগত হইতে পারে। এই ভাবে পাখী ধরিলে প্রায়ই পক্ষাদির অনিষ্ট হয় না। পাখী মনুষ্য হস্তে পড়িবা মাত্রই ভীতিজনিত শিলাসার ইহাদের আকর্ষণ শুদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং ধৃত পাখীকে তৎক্ষণাৎ জলপান করিতে দেওয়া সঙ্গত।

বৃদ্ধের জন্য বয়স্ক পাখীই অধিক উপযোগী। শীতের সময় হইলে পাখীগুলি শীত নিবারণের জন্য উচ্চ বৃক্ষ হইতে নামিয়া সন্ধ্যার সময় পত্র বহুল গুল্মে ও ঝোপে আশ্রয় করে। এক একটী ঝোপে বা গুল্মে অনেকগুলি পাখী একত্রে বাস করে। পুংজাতীয় পাখীই বৃদ্ধার্থে প্রয়োজন হইয়া থাকে। পুং পাখীগুলির মস্তক বড়, মাথা সরু ও বড় এবং পশ্চাত্তের হৃৎকণ্ড লাল পালক দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। আঁড়িপালকপূর্ণ ইহাদিগকে তিনপ্রকার আঁড়িপালক দ্বারা বিভক্ত থাকে—ছেয়া, তোরখা ও সফেদী প্রকৃতি।

আঁড়িপালকগুলি বুলবুল বদলে অনেক না। ইহাদের আঁড়িপালকগুলি সফেদী প্রকৃতি পক্ষিমূলক দেখিতে পাওয়া

যায়। বদলেদ্বারা পাখীকে বর্ণ ও আকারে অনেক প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ ধরনের বদলেদ্বারা এবং আকারেও ছোট। ছেয়া ও সফেদী বদলেদ্বারা অনেক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যে পাখীর পৃষ্ঠের অধিক রেশা গুলি শুভ্রাভ তাহাকে সফেদী বলে। তিন বৎসর বয়স অতীত হইলে ইহাদের পায়ের নালি উচ্চ ও জলার দুই একটি ক্ষুদ্র পক্ষ স্বেচ্ছা লালাত হইয়া থাকে। ইহারা বৃদ্ধ বয়সেও ১০-১২ দিন মাত্র প্রতিপালিত হইলে আর সহসা মনুষ্য আবাস ছাড়িয়া যাইতে চায় না এবং ছাড়িয়া দিলেও আর পলায়ন করিতে ইচ্ছা করে না।

অরণ্য হইতে আনিয়াই পাখীগুলিকে পেট্টী বাধিয়া নিতে হয়। কোমল হৃৎকণ্ডের নীচে দিয়া আনিয়া বৃকের উচ্চ অস্থির উপর দুইটী গিরা দিয়া, দুই দিকের হৃৎকণ্ড পাকাইয়া নিয়া তিন, চারি অনুলী লম্বা করিয়া তাহা একত্রে পাকাইয়া পুনরাবৃত্তি গিরা দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। তৎপরে ঐ গিরা দেওয়া স্থানে হৃৎকণ্ড ও লম্বা হৃৎকণ্ডের বাধিয়া পিতল বা লৌহ নির্মিত চকলা বাধিয়া রাখিতে হয় এবং অল্পে অল্পে পাখীকে বসে আনিয়া খাদ্যাদির অভ্যাস করিতে হয়। নবধৃত পাখী-গুলিকে অতি সাবধানে রাখা প্রয়োজন। বাহাতে তাহাদের পাখা ছিড়িয়া না যায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ইহাদের ক্ষুধা অপেক্ষা পিপাসা সাধারণতঃ প্রবল ও সহজে অসহনীয় হইয়া উঠে। সুতরাং খাদ্য একরূপভাবে নির্দিষ্ট হওয়া কর্তব্য যে তাহা বেশ তরল থাকে। অর্থাৎ বুটের সাড়ুর সহিত জল ও কমলার রস, দুধ, আমের রস বা কাঠাল ইত্যাদি কলের রস মিশাইয়া তরল করিয়া পুনঃ পুনঃ যুগের মিকট ধরিলে ক্রমে স্বাদ পাইয়া তাহা খাইতে আরম্ভ করে। বতই অধিক পরিমাণে খাইতে আরম্ভ করিলে, ততই খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া ও তাহা ক্রমে গাঢ় করিয়া প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। তারপর ক্রমে কেবল সাড়ু মাত্র খাদ্যরূপে পরিণত করা আবশ্যক।

পোবা বুলবুল মনুষ্য সংসর্গে থাকিতে ভালবাসে। তখন উহারা মনুষ্য দেখিয়া আর ভয় পায় না। পক্ষমূলক আহার দাতাকেও বুলবুল মনুষ্যের নিকটে যাইবার

নিশ্চিতে উপবেশন ও আহার গ্রহণ করিয়া থাকে। এমন কি তখন হস্তাদি দ্বারা অঙ্গস্পর্শ করিলেও আর উদ্ভিন্না পালাইতে চেষ্টা করে না। এই সময় হইতে অল্প অল্প করিয়া ইহাদিগকে বুদ্ধ শিক্ষা দিতে হয়।

দারুণ ঝঠরানলই পৃথিবীর অনেক অনর্থের মূল। মনুষ্যের স্বাৰ্ধপরতার মূলেও অমুসন্ধান করিলে সেই ক্ষুরিগুণের বীজ নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুরিগুণের জন্মই মানবগণ সর্বপ্রকার ধর্ম ও নৈতিক জীবন হইতে খলিত হইয়া নানারূপ দুর্কর্মের অহুতান করে। হৃদয়িক প্রপীড়িত ব্যক্তিদের ব্যবহার পরিদর্শন করিলেই অনায়াসে ঝঠরানলের প্রভাব জনিত কুকার্য্য-দুর্ভানেন্দুর্ভুত অন্তঃ করা সহজ সাধ্য হইবে। পশু পক্ষীদের মধ্যেও এই ঝঠরানলের জন্ম নানা অনর্থ ঘটিতে দেখা যায়। বুলবুল জাতীয় পাখী সাধারণতঃ একটি অস্ত্রটিকে দেখিয়া প্রীতিভাবই অবলম্বন করে। অর্থাৎ অস্ত্র পাখী দেখিয়া জিহ্বা নাড়িয়া পাখা সঞ্চালন করিয়া বক্তৃ-ত্বের পূর্ণ পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু, বুদ্ধিক্রিয়া অবস্থায় একটি অস্ত্রটিকে দেখিলে তাহাকে আক্রমণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না।

একটা নির্দিষ্ট স্থানে অল্প পরিমাণে কোনও খাদ্য—চিনি বা মিশ্রি পান্না প্রতিদিন দিলে সেখানে সহসা অস্ত্র পাখী দেখিলেই একে অস্ত্রকে অক্র-মণ করে। এইরূপে নির্দিষ্ট স্থানে বুদ্ধ শিক্ষা দিলে পাখী প্রায় অস্ত্রস্থানে গেলেই ভীত ও হীনসাহস হইয়া পড়ে। নির্দিষ্ট স্থানে বুদ্ধ শিক্ষা দেওয়ার একে 'টাঁহি' বলে। নানা স্থানে প্রতিদিন আহার দিলে আর পাখী তেমন ভীত বা চকিত হয় না। প্রথম দুই দিকে দুইটা পাখীকে একরূপ ভাবে স্তরের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে হয় যে যেন একটি পাখী আক্রমণ করিলেও অস্ত্রটির অঙ্গস্পর্শ না করিতে পারে। এইরূপ ভাবে মধ্যস্থলে খাদ্য রাখিয়া দিলে বুদ্ধ পক্ষ পাখী একটি অস্ত্রটিকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করে, এইরূপে ক্রমে লড়াই করিবার অভ্যাস কিছু দিন শিক্ষা দিয়া যখন পাখী দেখিলেই—আক্রমণ করিতে রাগিবে, তখন আহারীয় জব্য এইরূপ পাতলা

পাইতেছে অথচ খাইতে পারিতেছেনা, তখন দুই পাখী ছাড়িয়া দিলে পরস্পর বৃদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। এক বৃদ্ধে অক্ষম হইয়া পলায়ন করিলে বিজয়ী পাখীটি তৎ-তিন চারিটা পাখীকে হারাইয়া দিতে পারে; কে-তখন তাহার সাহস বৃদ্ধি হইয়া যায়।

বুদ্ধার্থী পাখীদিগের খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক লইতে হয়। আহার পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া আরম্ভ করিলে তিন চারিবার খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া যখন দেখা যায় পাখীটি বেশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তখন খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিয়া আবশ্যক; ক্রমে প্রাতে অল্পপরিমাণ আহার দিয়া বৈকালে পূর্ণখাদ্যের খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। কেহ আহারে শরীর বিশেষ পুষ্ট থাকিলে বুদ্ধকার্য্যে তত পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে না। এই খাদ্য হ্রাসের সহিত সঙ্গ প্রচুর পরিমাণে জলপান করিতে দিয়া পক্ষীদের অধিকাংশ সময় পাখীকে রোজে রাখিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

আমাদের দেশে অনেকেই পশু পাখী পোষণ করিবার আন্তরিক অভিলাষ সম্বন্ধে উহাদের পোষণ প্রণালীর অভিজ্ঞতার অভাবে নিরতই অকৃতকার্য্য কতিগ্রহ হইতেছে। এই সম্বন্ধে বলভাষার আশির্বাদ উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে বাহাদের এতৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আশ্রিত তাহারা যদি সাধারণের অবগতির জন্ত এসকল সাময়িক পক্ষে লিখেন, তবে বোধকরি আমাদের এক অভাব দূর হইতে পারে।

শ্রীশিবকৃষ্ণ সিংহ।

দিদি মা।

জমিদার গিরীণ বাবুর দিদি মা অক্টোবর কলিকাতা আসিয়া একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গলায় স্নান করিয়া জিকোটা বুল উদ্ধার করিবার দুর্দ্দমনীয় আকাজক। এই পুণ্য লেপ্তাভূরা দিদি এতদিন মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন, তাহার আকাজক। কলিকাতার বাসার ভুলসীতলা ও পোষার

সকাল হ্রাসের পর যুদ্ধ হইতেই একেবারে নিবৃত্ত হইলেন। এখন তাঁহার প্রাণ কলিকাতার আকাশ, সূর্য, কোলাহল-গণগোল হইতে প্রাণ পাইবার জন্য ভ্রমণে অধীন হইয়া উঠিয়াছে।

একই এক দিন অপেক্ষা করিয়াই তিনি গিরীণকে ডাকিলেন—“বনি, আমার বে আর এখানে কুলায় নারে, একটু গোধর নাই, একটু মাটি নাই, একটা তুলসী চাই নাই, উঠানের বংশ নাই—সিঁড়ি আর ছাদ, দলান আর বঁকা—আমাকে আজই পাঠাইয়া দাও, দাদা আমার।” গিরীণ বলিল—“সে কি হয় দিদিমা? আসাটা কিম্বা আশা করিবা মাত্রই হয় নাই, বাওরাটাও তেমনি হয় নাই। মাত্রই হওয়া ছুঁর। বিশেষ এখন বাজীর মত কিছু, বাইতেতো পারিবেনই না, বাক্যথেকে একটা কলার বাঁধিয়া উঠিবে; তখন টাকাও ব্যয় হইবে, আরও বাড়িও দোষ দিবে—ছুটারই অপব্যয় হইবে। বনির কাছেই বড় দিনের আমোদ, তারপর সকলে এক সঙ্গেই চলিয়া যাইব। “উঠ যেরে তোর বিয়ে”—ও চিনা। এই—আর কটা দিন মাত্র।”

দিদিমা সন্তুষ্ট হইলেন না। একদিন তাঁহার জেদ আরও উঠিল। তিনি বলিলেন “সচীন্কে লইয়া আমি একাই যাইতে পারিব; তোমাদের জমিদারী সাজিতে আমাদের পরীষ ব্রাহ্মণের কির কুলাইবে না, আর আজই চলিয়া যাইব। সংক্রান্তির পূর্বে আমাকে বিছিতেই হইবে। আমার সংক্রান্তির ব্রত পাণি কি হইবে? আমারই বায়নার থাকিয়া পণ্ড করিতে পারি? আমার একটা পূজার বায়ন, না আছে ছুটা কুল বেল ফল?”

গিরীণ বাবু অগত্যা সীকৃত হইতে বাধ্য হইলেন। তিনি বা পটল ভাণ্ডারীকে লইয়া আজই রাত্রি দশটার এক গাড়ীতে বাড়ী রওনা হইবেন।

কালীঘাটে লাইয়া কালীমাতা দর্শনের আয়োজন হইল। সকল বস্তু পূজা দেওয়া হইল, তারপর পাথর পূজার পরিস্কার হইল না। রান পূজার পর বনি বা দিদিমাই ঘোঁকানে ঘোঁকানে বাইয়া খাদ্য পাথর, পূজার বস্তু, পানীয়, দাওন দাওনীরের লত খেলা

ইত্যাদি—বা কিছু তাঁহার চখে পড়িল—ক্রয় করিয়া গাড়ী বোঝাই করিলেন।

বনি এক সময় ত্রীক্ষেত্র, কালী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে হাটিয়া গিয়া পূজা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন, কালীঘাটের পূজা সঞ্চয় ও বেগতি ক্রয় তাহার নিকট তো অতি নগণ্য।

(২)

জমিদারী চালের রীতি বাহা, দিদিমার বাজার বন্দোবস্ত ঠিক নেইরূপই চলিয়াছিল। কলে, দিদিমাকে সিংগলদেহে লইয়া বাইয়া পঁহুঁহাইতে ও টিকিট খরিদ করিয়া গাড়ীতে তাঁহাকে ভর্তি করিয়া দিতে সচীষ কর্মচারী দুটি হইতে স্মারক করিয়া তাড়াচীয়া গাড়ীর কোচম্যানের পর্যন্ত গলদবশ্য হইতে হইয়াছিল। এবং এই বিরাট হৈ চৈর পরিণামে বাহা সাধারণতঃ হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে তাহাই হইল, শেষে দিদিমাকে একলাটাই রেল বাজী হইয়া গোয়ালন্দ পানে ছুটিতে হইল।

সচীন্ বহু কছরত করিয়াও কোন গাড়ীতেই স্থান করিয়া লইতে পারিল না। কর্মচারী স্বয়ং একে অল্পকৈ ডাকিয়া ডাকিয়া হতাশ হইতেছিলেন। তাহাদের দারিদ্র্য দিদিমাকে গাড়ী হ করা, তাহা বধন হইয়া গিয়াছিল, তখনই তাহাদের মাথার বোকা নামিয়াছিল। গাড়ী প্লেট ফরম ছাড়িয়া গেলে বধন পাড়ে জী বলিল ‘এ বন্ধি বাবু, সচীন্ তো উঠেন সেকা নেই, ক্যা করগা ছামতো উনকা লটক পটক গাড়ীমে ভর দিয়া—।’

বন্ধি মহাশয় ও মূলী মহাশয় শুনিয়া বিপদ গণিলেন। তখন সচীনও আসিয়া নিজের অকৃতকার্যতার কারণ স্বরূপ নিজ দেহে আছার খাইয়া পড়ার দাগ দেখাইয়া সেই মূলি বা ডুয়া ফেলিতে লাগিল।

সচীক্ষের পাছেই ছিল, বেল পুলিশের স্টেশন পার্শ্ব। সে বলিল—“তোমাকে স্টেশন মাটার খরিয়া নিতে বসিয়াছেন, জল্দ চল।”

শান্ত্রে বলে * * ধনক্ষয় হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। তারপর কর্তব্য? মূলি ও বন্ধি পরামর্শ করিয়া দিদিমাকে নারায়ণপু হইতে বিজে আসিয়া লইয়া বাইবার লত বালাবাড়ীর প্রাথম কর্মচারীকে এক সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম করিয়া বিলেন।

(৩)

শীতের রাত! রাত থাকিতে আসিয়া মেল ট্রেন
পোরালন্দ পহছিল। মেয়ে গাড়ীর বাত্মীদিগকে তাঁহা-
দের বহু অভিভাবকগণ আসিয়া নামাইয়া লইয়া
বাইতে লাগিলেন। দিদিমা নিশ্চিত মনে সচীনের অপেক্ষা
করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন মেয়েগাড়ীর সকল
ক্রীলোকই নামিয়া গেল, তবু সচীন ভাণ্ডারীর আবির্ভাবের
কোন সাদা পাওয়া গেল না, তখন দিদিমা গরদের ঘোমটা
পর্য্যন্ত তাঁহার উকি চিত্রিত মুখ ও রুদ্রাক্ষ বেষ্টিত গ্রীবা
খানা জানালা দিয়া বাহির করিয়া দিয়া সচীনের অন্তিমের
প্রমাণ লইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোথায় সচীন?

জমিদার বাড়ীর চাকর বাকরের স্বভাব দিদিমার
নিকট বিলম্বণ পরিচিত ছিল। দিদিমা যখন নিশ্চিত
হুইলেন, সচীন, বাসাবাড়ীর পালকে শুইয়াছে বলিয়া
মনে করিয়া কোনও কোঠার উপরের তাকে নিশ্চিত
মনে মাক ডাকিয়া বুসাইতেছে, তখন তিনি তাঁহার
নিজের কপ মালার পেটিকাটা সম্বন্ধে হস্ত লইয়া বীরে
বীরে নামিয়া পড়িলেন এবং সাহসে ভর করিয়া
একটা একটা করিয়া কোঠা দেখিয়া দেখিয়া বাইতে
লাগিলেন।

এক দিকের সকলগুলি কোঠা বিশেষ করিয়া
দেখিয়াও যখন সচীনের কোন সন্ধানই পাইলেন না,
তখন দিদিমা আর নিশ্চিত থাকিতে পারিলেন না;
টিমারের দিকে তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলেন। টিমারে
বাইবার সময়ও পুনরায় তিনি গাড়ীগুলি দেখিয়া
সচীনকে ডাকিয়া ডাকিয়া চলিলেন।

টিকেট কালেক্টর চাহিল—“টিকেট?”

দিদিমা বলিলেন—“আমার সন্দের লোককে পাই-
তেছি না, তাহার নিকট আমার টিকেট।”

সম্মত মহিলা দেখিয়া টিকেট কালেক্টর টিকেট
লব্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন—

“কোথায় বাইবেন আপনি?”

দিদিমা বলিলেন—“ময়মনসিংহ।”

টিকেট কালেক্টর নারায়ণগঞ্জের টিমার দেখাইয়া

(৪)

দিদিমা আমাদের আজকালকার মোমে পড়া দেয়
ছেলের মত স্বর্ঘ্যতাপে গলিয়া বাইবার মেয়ে ছিলেন
তাঁহার ঘরে চোরে চুরী করিতে বাইতে পর্য্যন্ত
পাইত। একবার তিনি এক চোরকে বাহুবলে ধরা
রাইয়া ধরিয়া তাহার হস্ত হইতে স্বীয় কণ্ঠহার ছিনতাই
লইয়াছিলেন।

এ হেন দিদিমা টিমারে আসিয়া বথাসাথা অসুস্থ
করিয়াও যখন সচীন ভাণ্ডারীর কোন অসুস্থতাই পাই-
লেন না, তখন তাহার জন্ত তাঁহার বেতর ও আশ্রয়
হইয়াছিল, তাহা মহা বিরক্তি ও রাগে পরিণত হইল।
দিদিমা রাগ করিয়া বলিলেন—“বাউক, হস্ততাপা, বাউ
বাড়ীতে, তারপর দেখা বাটবে।”

দিদিমা মেয়ে-কামরার গিয়া খুব ভিড় করিয়া বসিয়া
জমাইয়া লইলেন। কথা প্রসঙ্গে নারায়ণগঞ্জ প্রবাসী
এক ডাক্তার গৃহিনীর সহিত তাঁহার খুব আলাপ
হইল। ডাক্তারের ছোট ছেলেকে দিয়া তাহার বাবাকে
ডাকাইয়া আনিয়া আশ্রয় পরিচয় প্রদান করিলেন এবং
তাঁহাকে স্বস্থানে পহুঁছবার বন্দোবস্ত করিয়া দিকে
অসুস্থরোধ করিলেন।

ডাক্তার দিদিমার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পার
পড়িয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। এবং তাহার
বাসায়ও দিদিমাকে পদধূলি দান করিতে অসুস্থরোধ
করিলেন।

দিদিমা বলিলেন “দেখি।”

বেলা বারটার নারায়ণগঞ্জের ঘাটে টিমার লাগিল।
ডাক্তারের অসুস্থরোধ দিদিমা এড়াইতে পারিলেন না।
ময়মনসিংহের গাড়ী বাইবে সন্ধ্যা চারিটার। স্মরণে
ডাক্তার দিদিমাকে নিজ বাসায় লইয়া গিয়া আহার
করাইয়া বথাসময়েই আনিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া
গেলেন।

ডাক্তার দিদিমার সঙ্গে নিজ কম্পাউন্টারকে দিতে
চেষ্টা করিয়াছিলেন, কুপন স্বত্বা দিদিমা ডাক্তারের
সে সাগ্রহ ইচ্ছা ব্যর্থ করিয়া দিয়া নিজের সাইন-শক্তির
পরিচয় দিলেন।

ডাক্তারও দিদিমা চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া বাসা
খির ঠিকানায় একখানা টেলিগ্রাম করিয়া দিয়া নিজ
কক্ষের ও গাধা চেষ্টার পরাকর্ষ্য প্রদান করিলেন ।

গিরীণ্ বাবুর প্রধান কর্মচারী নারায়ণগঞ্জ পহিছাবার
পূর্বেই দিদিমাকে লইয়া নারায়ণগঞ্জের গাড়ী
বন্দনসিংহ বাজা করিল ।

(৫)

ডাক্তারবাবুর ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞতা বসন্তঃ
ঋতু অথবা টেলিগ্রাম আফিসের ভুলেই হটক
ইনিগ্রাকটী ছিল যাত্র ছুটি কথায় নিবন্ধ “Didima
gone” অর্থাৎ দিদিমা চলিয়া গিয়াছেন ।

ডাক্তারের এই টেলিগ্রাম বখন গিরীণ্ বাবুর
ইংরেজী নবীশ কর্মচারী তর্জমা করিয়া গিরীণ্
বাবুর জীকে শুনাইলেন, তখন বাড়ীতে মহা আর্দ্রনাদ
ধ্বনিত পেল ।

গিরীণ্ বাবুর জী ব্রহ্মলীলা দিদি শান্তুড়ীর কক্ষ
ধ্বনিত আহাড খাইয়া পড়িয়া কাদিতে লাগিলেন ।
কিন্তু ঐর উচ্চ চীৎকার তাহারও উপরে চড়িয়া
নিম্নায় গৃহকে এক নিরবস্থির শোক পুরীতে
নিপতিত করিয়া তুলিল । বৃদ্ধ সরকার মহাশয়
মালিকা হইতে প্রেরা ফেলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে
বলিলেন—“দিদিমার অধোগতি হইল, গঙ্গার তীর
পাড়িয়া আসিয়া নারায়ণগঞ্জের ডাক্তার খানায়
গিয়াছেন । দিনটী ছিল তিথিদক্ষা দোষে হুট ।
কিন্তু অজায় কাকটাই হইল- সঙ্গহীন—আশ্রয় বীন
হইয়া বসিলেন ।”

ইংরেজী নবীশ কেরাণী বলিল—“ও কিছু নয়,
যায় ভরণ বেখানে, নাও করিয়া যায় সেখানে’ বৃদ্ধ সর-
কার বলিল—“সকলি অদৃষ্ট, নতুবা আমাদের কিসের
সম্ভাব ? আর দিদি মাকে হয়ত পুড়িল কিনা ভোমে !
কানিত্ত করিয়া বিশেষ শ্রদ্ধ করিতে হইবে । এমন
কিন্তু যার কুন্তেও স্থান নাই, ভূমি নাই । তাহার কাছে
আবার বসন্তেরও বলা নাই । ব্রহ্মদৈত্য হইয়া থাকা
কিন্তু পুণ্যলোক লাভের মোটেই সম্ভাবনা থাকে না ।”

কি কীকিৎ কীকিতে বাহিরে আনিয়াছিল । বৃদ্ধ

সরকারের মন্তব্য শুনিয়া সে আরো উচ্চ স্বরে চীৎকার
করিয়া বাইরা—দিদিমাকে ভোমে স্পর্শ করার তাহার ব্রহ্ম
দৈত্য হইবার সংবাদ বাড়ীর ভিতর প্রদান করিল ।
মেয়েরা তখন আরো ভয়ানক ও শোকাক্ত হইয়া উঠিলেন ।

(৬)

শোকে মুহমান হইয়া যে যে স্থানে পড়িয়া ছিলেন,
সে সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন । রাত্রা ঘরে আর আগুন
জ্বলিল না । এমন শোচনীয় দুর্ঘটনার পর কি আর সে
দিকে কাহারও দৃষ্টি থাকে ? শিশুগুলি কাদিয়া কাদিয়া
ঘুমাইয়া পড়িল । শোকের পুরী শ্মশানের জ্বর নীরবতা
বন্ধে লইয়া হাহাকার করিতে লাগিল ।

রাত্রি সাড়ে দশটার দিদি মা টেসনে নামিয়া নিজেই
গাড়ী ভাড়া করিলেন : এ তাহার পরিচিত সহর, আপন
স্থান । ইঙ্গিত মত গাগোয়ান তাঁহাকে আনিয়া গিরীণ্
বাবুর বাসাবাড়ীতে পহিছাইয়া দিল ।

দিদিমা ঘরে আঘাত করিয়া ডাকিলেন—“দরজা
খোল শ্রামা ।”

শ্রামা ঐর চ’খে নিজা ছিল না । শ্রামা তখন দিদি-
মার শোচনীয় ভবিতব্যতা ভাবিয়া পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া
উঠিতেছিল । হায় হায় ! দিদি মা যদি নিতান্তই ভোমে
ছোয়া ব্রহ্মদৈত্য হইয়াই যান, আর পথে বাটে শ্রামার
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, আর সে দিনকারক গঙ্গার
প্রতিশোধটাই লইতে উদ্ভূত হুন—শ্রামা শিহরিয়া উঠিল ।

ঠিক এই সময় রাত্রির হিমে-আওরাজ ধরা গলার
চিটি করিয়া দিদিমা ডাকিলেন “ও শ্রামা দরজা খোল ।”

“ও মা—গ্লো” বলিয়া শ্রামা চীৎকার করিয়া বাইয়া
গিরীণ্ বাবুর জীর চৌকিতে পড়িল । তাহার একটু
তজ্জা আসিয়াছিল, অকস্মাৎ এ আবার কি ঘটিল, বুঝিতে
না পারিয়া তিনি তাহার ছেলে মেয়েকে বৃকে লইয়া
বাট বাট করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন “ও কি, কি
হইয়াছে, হইয়াছে কি ?”

কি কীপিতেছিল, বলিল—“রাম নাম লও, বউ
ঠাকুরাণ, রাম রাম রাম—হুর্না হুর্না হুর্না—

কপাটে, পুনরায় করাঘাত করিয়া দিদিমা ডাকিলেন

—“শ্রামা ।”

সরকার দুর্গা নাম জপ করিতে করিতে সে কোঠার শিকল খুলিয়া দিয়া দ্রুত পথে ভিতরে গিয়া ভিতরের শিকল আটীয়া দিলেন। সে দিনের জন্ত সে কোঠার ভূতের আশ্রয় দিলেন বলিয়া পরদিন প্রভাতেই পুরোহিত ডাকিয়া নৃত্যরান ও শিব পূজা করাইয়া লইবেন, স্থির করিলেন।

শে ঠান্ডে আর কাহারও ঘুম হইল না। প্রাতঃ-
কালের পাড়ীতে প্রধান কর্মচারী মহাশয় নারায়ণগঞ্জ
হইতে কিরিয় আসিয়া দেখিলেন, দিদি মা ব্রহ্মপুত্র হইতে
আভ্যাসান করিয়া আসিয়া উচ্চৈশ্বরে মন্ত্রঙ্গণ করিতে-
ছিলেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

ভূতের মুখে গুরু মন্ত্র শুনিয়া ক্রমে সকলেরই সাহস
হেঁচা দিল।

ভাষা এখন বুঝিল—দিদিমা ভূত হইলেও ছিল
জ্ঞানী, এবং এখন জীবন্ত প্রতিশোধ।

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ

ব্রহ্মগুপ্ত।

ব্রহ্মগুপ্ত একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ছিলেন।
কথিত আছে যে ব্রহ্মগুপ্ত ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। এবং বিজ্ঞানের অসুমান করেন যে ইনি খৃষ্টীয়
৬০০ অব্দে জীবিত ছিলেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি
করিয়া ইনি অশেষ যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত
পৃথিবীর অস্থির গতি স্বীকার করেন নাই। ইনি মনে
করিতেন যে চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ উপগ্রহাদি অহোরাত্র
পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ব্রহ্মগুপ্ত ৬২৮ খৃষ্টাব্দে
রসনিদ্রান্ত বা ব্রহ্ম-ফুট সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণয়ন
করেন। ইহা সংস্কৃত পদ্যে লিখিত। এই জ্যোতিষ গ্রন্থের
ই অধ্যায়ে পাটীগণিত, বীজগণিত ও ত্রিকোণমিত্র
সম্বোধনা করা হইয়াছে। কোলব্রুক সাহেব (H. T.
Colebrooke) এই দুইটি অধ্যায় ইংরেজীতে অনুবাদ
করিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লন্ডন নগরে প্রকাশ করেন।

ব্রহ্মগুপ্ত তাঁহার পাটীগণিতে ত্রৈয়াশিকের সাহায্যেই
বিবিধ প্রস্তার সমাধান করিয়াছেন। ইহাতে সরল
সমীকরণ (অর্থাৎ ১ম ক্রম) সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নের সমাধান
করা হইছে।

তাঁহার বীজগণিতে সমান্তর শ্রেণী (Arithmetical
progression), সমগুণ শ্রেণী (Geometrical progres-
sion), ও বর্গীয় (অর্থাৎ দ্বিতীয় ঘাতের) সমীকরণ
(Quadratic equation) প্রভৃতির আলোচনা করা

হইয়াছে। কিন্তু সমীকরণে তিনি যে যে রাশির মূল
নিষ্কাশন করিয়াছেন তাহাদের কেবল ধনাত্মক মূল
(Positive root) গ্রহণ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ
নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উল্লেখ করা যাউতেছে।

একটি পাহাড়ের উচ্চতার—উ ; ইহার উপরে দুইটি
মন্ডর অবস্থিত ছিল। ইহাদের একটি পাহাড় হইতে নামিয়া
গ উ দূরস্থিত একটি গ্রামে গেল, এবং অপরটি ঠিক ঠাড়া
ভাবে ক উচ্চ উঠিয়া আবার সরল রেখায় সরাসর ঐ
গ্রামে যাওয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু উভয়েই সমান দূরে
গেল। ক, এর দূরত্ব বাহির কর।

এই পাহাড় ও গ্রামের দূরত্বের নক্সা অঙ্কিত করিলে
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে একটি সমকোণী ত্রিভুজ অর্থাৎ
একটি সমকোণী ত্রিভুজের গর্ভে বহিয়াছে। উইক্লিডের
জ্যামিত্রির প্রথম খণ্ডের ৪৭ প্রতিজ্ঞার সাহায্যে অতি
সহজে এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারা যায় *। ব্রহ্ম
গুপ্তের মূল প্রশ্নে উ এর মূল্য ১০০ ও গ এর মূল্য ২ ধরা
হইয়াছে। কথা প্রসঙ্গে তিনি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন
যে সূর্যী জনেরা ঋণাত্মক (negative) মূল্য পছন্দ
করেন না।

কোন কোন উচ্চ অঙ্গের সমীকরণ (indeterminate
equation) এরূপে সমাধান করিয়াছেন যে বর্তমান
সময়েও তাহা হইতে ভাল পণালী আবিষ্কৃত হয় নাই।
গক^২ + ১ = ৮^২, + তিনি এই সমীকরণের সমাধান
করিয়াছেন $k = \frac{2t}{t^2 - g}$; $g = \frac{t^2 + g}{t^2 - g}$ কিন্তু

$$* \sqrt{(গউ)^2 + (উ+ক)^2} + ক = গউ + উ$$

$$\sqrt{(গউ)^2 + (উ+ক)^2} = \{গউ + (উ-ক)\}$$

$$(গউ)^2 + (উ+ক)^2 = \{গউ + (উ-ক)\}^2$$

$$গ^2উ^2 + উ^2 + ক^2 + ২উক = গ^2উ^2 + (উ^2 + ক^2 - ২উক) + ২গউ^2 - ২গউক$$

$$২উক = ২উক + ২গউ^2 - ২গউক$$

$$২ক = -২ক + ২গউ + ২গক$$

$$৪ক + ২গক = ২গউ$$

$$২ক + গক = গউ$$

$$ক(২+গ) = গউ$$

$$ক = \frac{গউ}{গ+২}$$

$$+ nx^2 + I = y^2; \left(x = \frac{2t}{t^2 - n}, y = \frac{t^2 + n}{t^2 - n} \right)$$

কিন্তু এই সমীকরণ সমাধান করিতে হয়, তাহার প্রণালী তিনি লিখেন নাই। তবে এইমাত্র বলিয়াছেন যে এইরূপ একটি সমীকরণের সমাধান বাহির করিতে পারিলেই অজ্ঞাত সকলগুলিরই সমাধান বাহির করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে ফার্মেন্ট (Ferment) নামক পণ্ডিত ওয়ালিস (Wallis) ও লর্ড ব্রোঙ্কার (Lord Brouncker) ঠিক এই সমীকরণই সমাধান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। ব্রোঙ্কারও ১৭শ শতাব্দীতে ঠিক ব্রহ্মগুপ্তের সমাধানের মত একটি সমাধান বাহির করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত ইহাও বলিয়াছেন যে প কে দুইটি অখণ্ড সংখ্যার বর্গের যোগফল দ্বারা প্রকাশ করিতে না পারিলে ক ও খ এর মূল্য অখণ্ড সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। ব্রহ্মগুপ্ত তিন প্রাচীন গ্রীক, হিন্দু, আরব অথবা রোমান গণিতবিৎ পণ্ডিতগণের কেহই সাধারণ সমীকরণ হইতে উল্লিখিত সমীকরণ সমূহের কোন প্রভেদ দেখিতেন না।

ব্রহ্মগুপ্তের মতে সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলির পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে $k^2 + x^2 = g^2$ । পিথাগোরাস এবং ইউক্লিডের মতেও তাহাই। ব্রহ্মগুপ্ত কোন বৃত্তের বধ্যস্থিত ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল বাহির করিবার সূত্র (Formula) নির্ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতেও কোন বৃত্তের ক্ষেত্রফল = ব্যাসার্ধ \times বৃত্তার্ধ = ব্যাসার্ধ $\times \frac{\text{বৃত্তের পরিধি}}{\text{বৃত্তের ব্যাস}} \times \frac{\text{ব্যাসার্ধ}}{2}$ কিন্তু বৃত্তের পরিধি নির্ণয়ে তিনি ততদূর কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাহার মতে ফাই * (গ্রীক ফাই) এর মূল $1\sqrt{5}$ । তিনি দেউল প্রভৃতিরও ঘন পরিমাণ এবং তল-পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাহার ত্রিকোণমিত্তির অজ্ঞাত অংশ এত জটিল যে স্বল্পবুদ্ধি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও তাহাতে দম্ভহুট করিতে পারেন নাই। তাহাতে বৃত্তান্তকণ্ঠি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল বাহির করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন বিষয়েরই যীমাংসা তিনি দ্বারা বাহির করিতে পারেন নাই। একই বিষয় বিভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্ত সকলগুলিই মৌলিক নহে। আর্যভট্টের গ্রহে যে ভূজ্য্যা ও কোণী জ্যায় (Sine & cosine) সারণী দেওয়া আছে, তিনি প্রায়ই তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণের দ্বারা এই যে আর্যভট্টের অব্যবহিত পর হইতে অনেক জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল; তাহাদের গ্রন্থ বর্তমানে লুপ্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ব্রহ্মগুপ্ত ঐ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন। * কিন্তু তাঁহার বীজগণিত ও পাটীগণিত যে মৌলিক, তাহাতে কেহই সন্দেহ করেন নাই। অনেকে অনুমান করেন যে মিশরের ডায়ফেণ্টাস ও হেরোর (Diophantus and Hero) গ্রন্থ আর্য ভট্ট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

উজ্জয়িনীতে যে একটি মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে, ব্রহ্মগুপ্ত তাহারই অধীক ছিলেন। ঐচাণ-বংশীয় ত্রীব্যাগারমুখ নামক রাজার রাজত্ব কালে অশ্বতী-নগরে ইনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীমুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

সত্য।

সন্ধ্যা আঁধারে

মন্দ পবনে,

ছুটিল কুম্ভ কলি।

গঙ্গা রাজের

সন্ধান পেয়ে,

ছুটিয়া চলিল অলি।

ভিমির পুত্র

কুঙ্গ কুটীরে,

জোনাকী জালিছে দীপ।

* অধ্যাপক Rose Ball বলেন—“It is likely also that some progress in mathematics had been made by Arya-Bhatta's immediate successors and that Brahma Gupta was acquainted with their work.” (ব্রহ্মগুপ্তের সারণী হইতে আর্য ভট্টের সারণীর একই প্রভেদ আছে। তাহা বুঝেই ঐ নব্বয়ের অবতারণা করা হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা।)

* ফাই। বৃত্তের পরিধি = $0.15708 \dots$ ।
বৃত্তের ব্যাস

কুলারে পাণিরা

উঠিল গাহিয়া

পুলক আকুল নীপ ।

কিঞ্জি গণের

মেঘ বজ্রারে,

মুখের বস্মী বিতান

শশ শরনে

বগ্ন মগন,

বাহুটা মোঃ সিথান ।

সুখ আঁখির

কোমল পাভায়,

কমল দুইটা ঢাকা,

কুহক যত্নে

চন্দ্র আলোকে,

শত আলিঙ্গন আঁকা ।

বিদায় লইয়া

গেল সে চলিয়া,

ফিরে চাহি বার বার ।

নিশির শিশিরে

নয়ন আসারে

হয়ে গেল একাকার ।

বরষ বরষ

পিয়াছে কাটিয়া

দরশ হবে না আর ।

বন্ধ মাঝারে

বহিতেছে শুধু

লক্ষ স্মৃতির তার ।

গহন কানন,

নীরব নিশি,

নিবিড় তিমির যন্ত ।

শব্দপনের মত

আজি সে রজনী,

বেদনার মত সত্য ।

শ্রীমদ্রূপময় রায় ।

শোক সংবাদ ।

অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ, বি, এল ।

অমূল্যকৃষ্ণের পরলোক গমনে আমরা ব্যত্যস্তভাবে
আমাদের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং সাহিত্যের একনিষ্ঠ
সেবক হারাইলাম । অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, কলিকাতার
২৫ বৎসর বয়সে যেরূপ অকস্মাতভাবে সাহিত্যচর্চার
আয়োজন করিতেছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয় ।
তিনি ছাত্রাবস্থায়ই—“প্রীতি” নামক একখানি মাসিক
পত্রের পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া যশস্বী হইয়া-
ছিলেন । সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিতে না করি-
তেই অমূল্যের সুকুল জীবন অকালে কালের কোলে
করিয়া পড়িল । বিগত ৩রা মার্চ রাত্রি ১২ই ঘটিকার
সময় কলিকাতা নগরীতে হৃৎক ইন্সকুয়েন্স ও নিউ-
মোনিয়া রোগে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন ।
তাহার পৈতৃক-বাসভবন কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত বালি-
গাঁও গ্রামে । আজিও তাহার বৃদ্ধ জনক জননী এই
দারুণ শোকের শেলাঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা বর্তমান
আছেন । শান্তিদাতা ভগবান্ তাহার শোকসন্তপ্ত
পরিবারের পতীর শোকে সাহসনা দান করুন ।

মৌলবী সেখ আব্দুল জব্বার

মৌলবী আব্দুল জব্বারের মৃত্যু সংবাদও এই একই
সময়ে আমাদের দৃষ্টে সন্মিতে হইল । তিনিও তাহার
নবীন বয়সে যেরূপ উৎসাহ ও অমূল্যজ্ঞানের সহিত ইতি-
হাসের চর্চা করিতেছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার
যোগ্য । তাহার রচিত “মক্কাশরীফের ইতিহাস” “মদিনা-
শরীফের ইতিহাস”, “বয়তুল মোকাদ্দেসের ইতিহাস”
প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী
সোমবার তিনি ইহধাম হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া-
ছেন । তাহার অমায়িক চরিত্র হিন্দু মুসলমান সকল-
কেই মুগ্ধ করিত । আমরা এই তরুণ সাহিত্যিকের
মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছি ।

আব্দুল জব্বার (মরমসিংহ) গকরগাঁও গ্রামের
জমিদার বনগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ।

সৌরভ

অষ্টম বর্ষ।

ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩২৬।

ষষ্ঠ সংখ্যা।

কামন্দকীয় নীতিসার।

প্রাচীন কালে ভারতের আর্য্য সম্ভ্রামণ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তদানীন্তন, এমন কি বর্তমান যুগের সকল লভ্যজ্ঞাত অপেক্ষা উচ্চসোপানে আকৃষ্ট ছিলেন, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সত্য বটে, কিন্তু সত্য, জগন্নিখ্যা ইত্যাদি মহামত্যের আবিষ্কার করিয়া সংসারের ক্লেব ও দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় 'পরম জ্ঞান' লাভের জন্য তাঁহার দর্শনাদি নানা শাস্ত্রের যত্ন বিষয়গুলির বিশ্লেষণ করিয়া পরমার্থ বিজ্ঞান আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাই-বলিয়া তাঁহার বৈষয়িক বিষয়ের দিক্টা উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এমন কথা আমাদের বলা চলে না। রাখাখন মহাভারতের কথা ছাড়িয়া দিলেও এখনও আর্য্যজ্ঞাতের ধর্ম্ম পুস্তক বাতাবে-কেও নীতিশাস্ত্র ও চতুষ্টয়ি ফলা বিজ্ঞা * সম্বন্ধে এত গ্রন্থ বিস্তারিত আছে এবং এত গ্রন্থের উল্লেখ আছে যে তাহা জানিলে মুগ্ধ হইতে হয়। অর্থ নীতি শাস্ত্র সম্বন্ধে এখনও কোটিপা-অর্থশাস্ত্র, কামন্দকীয় নীতিসার, শুক্র নীতিসার, নীতি ব্যবহার যমুখ নাতিপ্রকাশিকা, নীতি বাক্যামৃত প্রভৃতি নানা গ্রন্থ আর্ক্যজ্ঞানের সাক্ষ্য দিতেছে।

মহাভারতের শান্তি পর্বে (রাজধর্ম্মাশ্রয়ান পর্বে) একোনষষ্ঠিতম অধ্যায়ে অর্থশাস্ত্রের, উৎপত্তি এবং ক্রমে ক্রমে ঐ গ্রন্থ কি ভাবে সংকলিত হইয়া জন সমাজে প্রচলিত

হইল, তাহা ইতিহাস বিবৃত রহিয়াছে। তাহা এইরূপ :—“ভগবান্ কমলধোনি সুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “দেবগণ, তোমরা ভীত হইও না। আমি অচিরে উপায় চিন্তা করিতেছি।” প্রাণপতি এই কথা বলিয়া বুদ্ধি বলে একবার লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করিলেন। ঐ নীতি শাস্ত্রে অর্থ, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, দণ্ড নীতি, অমাত্য ইত্যাদি এবং কৃষি বাণিজ্যাদি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা এবং যে যে উপায় দ্বারা লোক সফল য য ধর্ম্মে অবস্থিত থাকে তাহার বিষয় সবিশেষ কীর্ণিত হইয়াছে।” মহাত্মা কমলধোনি এইরূপে সেই লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিলে বহুসংখ্যক বিশালাক ভগবান্ ভবানীপতি প্রথমে উহা গ্রহণ করিলেন এবং প্রজাবর্গো আয়ু অন্নতা অবগত হইয়া উহা সংক্ষেপে কীর্তন করতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহেশ্বর সেই ব্রহ্মকৃত নীতিশাস্ত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া দশসহস্র অধ্যায়ে পর্য্যবসিত করিলে সেই সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র বৈশাল্যাক নামে প্রসিদ্ধ হইল। তৎপরে ভগবান্ ইন্দ্র ঐ শাস্ত্রকে পঞ্চ সহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্তন করিয়া বহুদত্তক নাম প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বৃহস্পতি বহুদত্তক গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া তিন সহস্র অধ্যায়ে কীর্তন পূর্বক বার্ষ্পত্য নাম প্রদান করিলেন। অবশেষে যোগাচার্য্য ভগবান্ শুক্রাচার্য্য ঐ শাস্ত্রকে একসহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্তন করিলেন। মহাত্মা এইরূপে মর্ত্ত্যদিগের আয়ু অন্নতা অবগত হইয়া লোকান্তরোধে “সেই নীতিশাস্ত্র আরও সংক্ষিপ্ত করিলেন।” ইহা হইতেই “আমরা দেখিতে পাইতেছিবে মহাভারত গ্রন্থ যখন বিরচিত হইয়াছিল তৎ বৃহৎ অর্থশাস্ত্র অনেক পরিমাণে সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

* শ্রীমদ মহারাজ কৃষ্ণদেব ঙ্গিহ বাহাদুর বি, এ, মহোদয়ের “কীর্তন ভারতে চতুর্থী কলাবিজ্ঞা” এবং ক্রমে (সাহিত্য সংহিতা ১৯১১ সাল, প্রাণ সংখ্যা)।

নীতিশাস্ত্রের সন্ধিগত ইতিহাস তত্ত্ব নীতিশাস্ত্রে এই-
রূপ উল্লেখ আছে যথাঃ “অনুসরণ কর্তৃক পুঁঠ হইয়া
করাইবে। ওক ‘কৃত’ পুঁঠ ওকাতর্কী নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে
প্রথমে বলেন, তৎপরে বরষু উপবাস দ্বারা মতলক-
সৌন্দর্য উহা কীর্জন করেন। তৎপরে বশিষ্ঠাদি ঋষি
এবং স্মারক-লোকহিতার্থ এই তর্ক বহুল শাস্ত্র মানবের
আত্মরক্ষায় যেহু সারাগ্রহণ করিয়া কীর্জন করি-
তেছি।” এতদ্ব্যতিরেকে আমরা কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে,
মহাবীরপুত্র, ভরদ্বাজ, ঘটগুপ্ত, কাশ্যাপন পরাশর, পৌণ্ডল
প্রভৃতি প্রায় বংশে ত নীতিশাস্ত্র বদেব উল্লেখ দেখিতে
পাই। মনে হইল কোটিল্যের সময় কাল পর্যন্ত (খৃঃ পূঃ চতুর্থ
শতাব্দী) এইসকল মহাপুরুষসংগে প্রায়শঃ ভারতের পৌরব
যজ্ঞিক গ্রন্থশাস্ত্র বিরাজিত ছিল এবং আর্থিক বসণের
প্রথম জ্ঞান বিজ্ঞানের জ্যোতি বিতরণ করিয়া রাজসভা
এবং মন্ত্রণাগৃহকে সুসজ্জ করিত। চুৎপের ‘বসর আমা-
লেন্দেই সকল আলোক গ্রন্থ’ বসুপুত্র; কিন্তু বাহ্য আছে,
জাহা ও ভারতের কীর্ষি পৌরব বোধনা করিবার যথেষ্ট
হইয়াছে। এই নীতিশাস্ত্র যে কেবল নৃপতিগণেরই
জের এমন মতে পরন্তু :-

নীতিশাস্ত্র বসুপুত্র জ্যোতিঃ শাস্ত্র প্রকাশ্যম্ ।
কুটিল্য ইত্যত্র তিষ্ঠাৎ পুণ্যম্ তথেষ্টম্ ॥
অপারুণ্যে কলং বসুপুত্রস্য সত্যমুতং সত্যম্
সৌরভঃ কর্তব্যং ধীমতঃ উপাস্তা কুপ যজ্ঞিগাম্ ॥
সংক্রিয়ামু কর্তব্যং মণ্যশ্রাণ্যকীচ্যত ।
রাজ্যত বসুপুত্রার্থোঃ শাস্ত্রা ধীমতমোহু ব ॥
অরবীতবে কুটিল্যৈয়ো হিতকল প্রদঃ ।
অন্তোবাক তবেনিষ্ঠাঃ প্রয়ত্বোবান্দাত্যপি ॥
ইতি “বৃত্তিকল্পতরু” ।

নীতিশাস্ত্র বাহার বুল, জ্যোতিঃশাস্ত্র বাহার প্রকাশ্য,
প্রকাশ্য শাস্ত্র সমুৎ (বসুপুত্র আনুপুত্র) বাহার শাখা
এবং কলংক। নিয়ন্তর শাস্ত্র বাহার পুণ্য—অদৃষ্টকল যে
ভবিষ্যৎ, সেই কুটিল্য নৃপতিগণের অনুভব, যে সাধুগণ,
এবং (৩য় পৃষ্ঠা) কর্তব্য কুপাল ও যজ্ঞগণের আলোচ্য ।
এই কর্তব্য এবং অভ্যন্ত শাস্ত্র বিচার করিয়া কুটিল্য উভয়
শাস্ত্র সম্বন্ধে অর্থ তাহাই রাজ্য কর্তৃক নির্ণীত হয়।

কল এবং এইরূপ এই বৃত্তিকল্পতরু নৃপতিগণের জাতব্য
(‘বৃত্তিকল্পতরু’) রাজ্য। স্তর সর্বসাধারণেরও ইহা
কুপালক।” নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে অর্থিক কিছু লিখিয়া
অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার বিরত হইলাম। একটা প্রশ্ন
সহজে উত্থিত হইতে পারে যে, যে অর্থশাস্ত্র ভারতবর্ষে
এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং যে শাস্ত্রের আলো-
চনার এত অর্থিক প্রহালাষিত হইয়াছিল ক্রমেক্রমে
সেই শাস্ত্রের আলোচনা বিরল হইল কেন? আর্থাৎ
‘কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র’ প্রচারের পর হইতেই এই শাস্ত্রের
আলোচনা এবং তৎসম্বন্ধে গ্রন্থাদি অর্থিক লিখিত হয়
নাই কেন? সাহিত্যক্ষেত্রে অবনতিই যে ইহার কারণ
তাহা কখনও বলা যাইতে পারেনা; কারণ আর্থিক অর্থশাস্ত্র
ব্যতিরেকে সাহিত্যের প্রায় কোনও শাখাতেই অবনতি
কিংবা হীনাম্বা দেখিতে পাই না। বৌদ্ধ ধর্মের এবং
বৌদ্ধ ভাবুকতার প্রসিদ্ধি লাভের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ শাস্ত্রের
অনুগ্রহ হইয়াছিল, এইরূপ কথাও বলা চলে না।
কারণ আমরা দেখিতে পাই যে জৈনধর্মাবলম্বী সোমদেব
নীতিবাক্যামৃত গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। যদি জৈনধর্ম
অর্থশাস্ত্রের আলোচনা করিতে পারেন, তবে বৌদ্ধধর্ম
সেই পথ অনুসরণ কেন করিলেন না, তাহার উপযুক্ত
উত্তর দেওয়া চলে না। পরন্তু কোনও কোনও প্রস্তুতবাদী-
বাদী মনীষী মহোদয় কামন্দককেও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া
ধাকেন। হয়ত অনেকে ইহাও বলিতে পারেন যে
কত্বেয় রাজত্বের অবসানের পর হইতেই অর্থাৎ পু-
রাতনগণের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি
শাস্ত্রে প্রাকৃত্যব কমিয়া আসিয়াছে; কিন্তু “তত্ত্বনীতি-
সারের” কাল যদি আমরা খৃষ্টাব্দ বর্ষ শতাব্দীতে অনুমান
করি, তবে তাহাও বলা চলে না। এখন প্রশ্ন এই যে
তবে এই অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনার অবনতি সঞ্চিত হয়
কেন? আমাদের মনে হয় তদ্ব্যবহিতা এবং পৌণ্ডালিক
সাহিত্য বধন হইতে বিশেষ ভাবে গতি লাভ করিয়া
তখন হইতেই অর্থ শাস্ত্রের পৃথক ভাবে আলোচনা
কমিয়া আইসে। কল্যাণব্যাপ্ত অধ্যাপক কে, ভি,
রতনামী আরেকার মতোই এ বিষয়ে যে মত প্রকাশ
করিয়াছিলেন তাহাই স্মৃতিগত ও বসুপুত্র মনে হয়।
তাহার মতে—বর্ষম পুরাকল্পগণের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে
রাজন্যবর্ষ কুটিল্য রাজ্যের উপর আধিপত্য করিবার
অভিলাষিত্যাপ করিয়া বসুপুত্র ও সার্বভৌম যুক্ত প্রতিষ্ঠা

কল্পিত লাগিলেন, তখন অর্থশাস্ত্রের আদরও কমিয়া আসিয়াছিল এবং প্রকৃত পক্ষে বহু কাল বর্ণনাধিপত্য সুবিধিত রাণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চশকা কিংবা জাতিও পূর্ববর্তী অর্থশাস্ত্রবিদগণ দ্বারা হইয়া গিয়াছিল। যে সকল নীতিবিদগণ ইতিবাচক করিয়া তাঁহা দ্বারা পণ্ডিত জ্ঞানের এবং অতীত যুগের পরিচয় দিয়াছিলেন ক্রমে ক্রমে তাহার প্রয়োজনও কমিয়া আসিয়াছিল। অধিকতর অর্থশাস্ত্রের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি সূত্র নামে লিখিত বলিয়া উহা ঐ বিবরে সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণেরই অধিগম্য ছিল, পরন্তু সাধারণ উহা গ্রহণ করিতেই পারে নাই; সুতরাং উহার আলোচনাও কমিয়া আসিয়াছিল।

বলিও কোটিল্য অর্থশাস্ত্র, কামন্দকীয় নীতিসার ও ভক্ত-নীতিসার ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হইয়াছে কিন্তু অভ্যর্থনা বাদালা ভাষায় কোনটিরই অনুবাদ হয় নাই। যদিও অল্পজন ব্যক্তির পক্ষে নীতিশাস্ত্রের যে কোনও গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিবার চেষ্টা খুঁটনা হইলেও, আশা করি এই কার্যে একবার অবতীর্ণ হইলে সুখচিন্তনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং ভবিষ্যতে এই সকল গ্রন্থের সুন্দর অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষায় পৌরব হইতে পারে।

কামন্দকীয় নীতিসার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিতে অভিলাষী হইয়া অত এই প্রবন্ধে কামন্দক ও তাহার গ্রন্থসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিব।

গ্রন্থসম্বন্ধেই কামন্দক নিজকে “নন্দবংশ ধর্মশাস্ত্রা” বিষ্ণুগুপ্তের শত্রু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; প্রকৃতপক্ষেও “অর্থশাস্ত্র” ও “কামন্দকীয় নীতিসার” এক সঙ্গে পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝতে পাওয়া যায় যে কামন্দক সামান্য দুই চারিটি বিষয় ব্যতীতে সর্বত্রই তাঁহার আচার্যের মতানুসরণ করিয়াছেন; এমন কি অনেক স্থলে উভয় গ্রন্থের ভাষায় সৌসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক বর্তমান যুগে নানানুগুণ সংবেদন ও অনুসন্ধানের ফলে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে কোটিল্যের “অর্থশাস্ত্র” খৃঃ পূঃ ৩০০ সন মধ্যে কে কোন্‌কালে লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং কামন্দককে খৃঃ পূঃ ৩০০ শতাব্দীর পূর্বের বলা বাইতেই পারা যায় না। পাণ্ডিত্য এবং অর্থ, ভ্রামণ্যাদী

শৌচিল্যের অর্থশাস্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের সুবিধায় কামন্দক নীতিসার গ্রন্থের

বর্ণনায় বনেনা রাজা চিত্রাংকুসুকে ভুগৎ।
অর্থশাস্ত্রের নবম প্রতিলিপিতে এসাতগৎ।
লোকটি উপলক্ষ্য হওয়া নিবিয়াছেন যে কামন্দক এই লোকে বনেন শত্রু প্রযোগ দ্বারা কোনও বনেন প্রত্যক্ষে বুঝিয়াছেন এবং পূর্ব সন্ততঃ ঐ বনেন রাজ্যটি কমিত নৃপতি কনিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন সুতরাং পশ্চিম লবণ স্ত্রীমতী বনেনের অনুবাদ স্বীকার করিলে বলাতে হইবে যে কামন্দক কনিষ্ক সমসাময়িক কিংবা তাঁহার পূর্ববর্তী কালে লোকটি ছিলেন; কিন্তু উক্ত লোকটি বনেনের কনিষ্ক রাজ্যে ভাগ ‘টী’ এবং ‘বগন’ পাঠ না করিয়া একবার বৈদ্যনা পাঠ করিলে সঙ্গত সন্ততঃ ঐ বনেন বৈদ্যনা কনিষ্ক বুঝিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে একবার চিত্রাংকুসুকে ব্যতিরেকে পৌলিক যুগের নৃপতিগণের নাম ও অর্থশাস্ত্রের নামোক্ত দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং স্রীযুক্ত আর. ভ্রামণ্যাদী বনেনের ব্যাখ্যা নিম্ন লিখিত গ্রন্থে গ্রহণ করা যায় না।

ভক্তার ক্রেত বিষ্ণু বনেনের লিখিত গ্রন্থে বানী দ্বীপে “কামন্দকীয় নীতিসার” সঙ্গাপেক্ষা অল্প ও লোকপ্রিয় গ্রন্থ স্ত্রী রেক্সস এবং ক্রফোর্ড সাহেবের মত এই যে বৌদ্ধধর্মের প্রবল উত্তেজনা সময়ে বনেন অধিবাসী ভ্রামণ্যাদী হিন্দুগণ দ্বারা হৃষ্টাৎ চতুর্থ শতাব্দীতে তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ ও দৈব বৃষ্টি করিলে লইয়া বালীদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমিত হইবে যে খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে যে কোনও সময়ে “কামন্দকীয় নীতিসার” বিরচিত হইয়াছিল। এবং কোনও কোনও দ্বীপী অনুবাদ করেন যে হিন্দুগণ বালীদ্বীপে উপস্থিত হইয়া গণিত করিবার সময়ে বনেন ভ্রামণ্যাদী হইতে বজ্র করেন তখন এই গ্রন্থনাও ভ্রামণ্যাদী হইতে লয়ে লইয়া বালীদ্বীপে চতুর্থ শতাব্দীতে প্রমাণিত হইয়া বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা হইতেই এই গ্রন্থের নাম পক্ষে স্রীযুক্ত চতুর্থ শতাব্দীরও একজন বঙ্গদেশ পূর্বে লিখিত হইয়াছিল।

এই এসকল আমাদের আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। মহাভারতের শাস্তিপর্বের একশত ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে আমরা মহর্ষি কামন্দকের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। তথায় আশ্রিষ্ট ও মহর্ষি কামন্দক ধর্ম-বিবরণে আলোচনার প্রসঙ্গ আসিয়াছে। এই মহর্ষি কামন্দক যে আমাদের অর্বশাস্ত্র প্রণেতা কামন্দক নহেন, তাহা সঠিক অনুমিত হইবে। কারণ তাহা হইলে আমরা মহাভারতের বর্তমান অবস্থার রচনা কাল খৃষ্টাব্দ অষ্টম শতাব্দীতে কৈলিতে বাধ্য হইব; কিন্তু তাহা অসম্ভব ও প্রমাণ বিহীন। অধিকন্তু অর্বশাস্ত্রের গ্রন্থকর্তা কামন্দকের অল্পতম ভ্রাতাবলীর সহিত মহাভারতের মহর্ষি কামন্দকের বর্তমানে কোনও সাদৃশ্য নাই।

কামন্দকের 'নীতিসার' গ্রন্থখানি উনবিংশতি সর্গে বিভক্ত এবং প্রত্যেক সর্গই শ্লোকবদ্ধ ছন্দে লিখিত; কিন্তু ইহার প্রকৃতি পরিচয় করিতে হইবে যে ইহা শ্লোকে লিখিত হইলেও ইহাতে কবিত্ব-স্বাধীন খুব অল্পই অনুভূত হয়। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শ্লোকগুলিতে গাভীর্য এবং সংক্ষিপ্তভাবে তাব প্রকাশের চেষ্টা সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সর্গে রাজা ও রাজত্ববর্ণের প্রতি উপদেশ এবং ইন্দ্রিয় বিজয় ইত্যাদি বিষয়ে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গে বিজ্ঞানবিভাগ, বর্ষাশ্রম ব্যবস্থা এবং লগ্ন মাহাত্ম্য, তৃতীয় সর্গে রাজাপ্রজা সম্বন্ধে এবং সুবিচার ও অবিচারের ফলাফল, চতুর্থ সর্গে স্বামী, অমাত্য, কূট, জনপদ এবং মিত্র ও রাষ্ট্র-রাজ্যের এই সপ্তাদ বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চম সর্গে স্বামী এবং অসুখীবিবর্ণ সম্বন্ধে এবং ষষ্ঠ সর্গে রাজ্যের কটক শোধন ব্যবস্থা নিহিত আছে। সপ্তম সর্গে পুত্র ও কন্যাত্যাদি রূপ, বিষ প্রয়োগাদি হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়, এবং অষ্টম সর্গে মঙ্গল গঠন বিষয়ে ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই অষ্টম সর্গটি অত্যন্ত অটল হইলেও রাজনীতি হিসাবে অত্যন্ত আবশ্যিক। কোটিল্য অর্বশাস্ত্রে এই মঙ্গল পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবেই আলোচিত হইয়াছে এবং এই বিষয়ে কামন্দকও তাহার গুরু অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু শুক্রনীতিসার এবং পরবর্তী গ্রন্থসমূহে আমরা এই বিষয়ে উল্লেখ দেখিতে পাই না। ইহার

কারণ মনে হয় যে রাজ্য সংস্থাপনের প্রাথমিক পর্বের প্রয়োজন থাকিলেও পরবর্তীকালে ইহা লাভাভ্যাসুভূত ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। প্রথম মঙ্গল প্রক্রিয়ার যুক্তিতর্কের অবতারণা ভিন্ন কার্যক্ষেত্রে ইহার আবশ্যিকতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সর্গে সন্ধি, বিগ্রহ, মন্ত্রণা ও দূত প্রচার সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ সর্গে রাজব্যাসনাদি এবং তাহার প্রতিকার, চতুর্দশ সর্গে সপ্ত-বাসনাদি এবং পঞ্চদশ সর্গে যাত্রাভিযোগ দর্শন বিষয়ে বিবৃত আছে। ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং উনবিংশতি সর্গে সৈন্যসজ্জা, যুদ্ধ প্রকরণ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা আছে।

শুক্লনীতিসার গ্রন্থে যেমন সমাজ নীতি এবং সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে এই গ্রন্থে তাহার অভাব লক্ষিত হয়। অনেকে বলিয়া থাকেন যে এই কামন্দক নীতিসার গ্রন্থের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রকৃতি সর্গ নৈতিক হিসাবে অত্যন্ত বিগৃহীত ও কূটভাবাপন্ন। এই সম্বন্ধে পাঠকগণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজ নিজ মতাবলম্বন করিতে পারেন, তবে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে যেখানে কূটরাজ নীতির আশ্রয় লইবার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, সেই স্থলেই কেবল কূটনীতির প্রয়োগ দেওয়া হইয়াছে; নতুবা সাধারণতঃ দেখা যাইবে যে এই গ্রন্থের প্রতি পক্ষে, প্রতি ছন্দে উচ্চ আদর্শের নৈতিক শিক্ষার ও নৈতিক পথ-বলম্বনের জন্য নিয়মাবলী সন্নিহিত আছে।

এই গ্রন্থের প্রত্যেক সর্গের সমাপ্তিকেই সেই সর্গের আলোচ্য বিষয় সন্নিবেশিত আছে। কোটিল্য ও কামন্দকের উভয় গ্রন্থের মধ্যে কামন্দক যে যে বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহারই সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া আমরা প্রথমতঃ যদিও দেখিতে পাই যে কামন্দক তাহার নীতিসারে কোটিল্যের অর্বশাস্ত্রেরই সারাংশ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎপক্ষে কার্যকালে দেখি "অর্বশাস্ত্রের" পঞ্চদশ অধ্যায়ের মধ্যে "রাজ্যশাসন পরিদর্শন" "ব্যবহারনীতি" প্রকৃতিচারিত অধ্যায়ই পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তাহাতে যে গ্রন্থের আরম্ভই কেবল মাত্র পরিলক্ষিত

হইয়াছে, এবং নরকে প্রবৃত্ত রাজনীতি গ্রন্থ হিসাবে উহার আদর এবং মূল্যও তৎসময়কারেই হইয়াছে। কোটিলার রাজ নৈতিক প্রত্যাবল্লী সহিত কামন্দকের কতটুকু পার্থক্য কিংবা সামঞ্জস্য আছে, তাহা বারম্বারে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

অর্থনীতি শাস্ত্রের গ্রন্থকারগণ গ্রন্থান্তে সর্বপ্রথমেই দেব উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া কিংবা দেবনাম অরণ্য করিয়া তৎপরে পূর্ব পূর্ব আচার্য্যগণকে অভিবাদন করিয়াছেন। কোটিল্য সর্বপ্রথমে “ও” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; ‘শুক্ৰনীতি সারে’

“প্রণম্য জগদাধারং সর্গস্থিত্যন্তকারণম্।

সংপূজ্য ভার্গবঃ পুটৌ বন্দিতঃ পুজিত স্তুতঃ” ॥ ইত্যাদি এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন। “যুক্তিকল্পতরু”র আরম্ভেও আমরা—

“বিশ্বসর্গবিধোবধা স্তং পালয়তি যো বিভুঃ।

তদত্যয় বিধাবীশ স্তং বন্দে পরমেশ্বরম্ ॥

কংসানন্দমকুরাণঃ কং সানন্দং করোতি যঃ।

তাং দেববৃন্দৈরারাম্য নারাম্যমহন্তে ॥” এইরূপ দেখিতে পাই; কিন্তু কামন্দকের গ্রন্থারম্ভে দেবাদির আরাধনা নাই। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে কেহ কেহ অনুমান করেন যে কামন্দক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন।

খ্রীস্টোদেবীয় পণ্ডিত প্রেটো, ক্রোরেন্স নগরবাসী মেক্সিকোভেলী, ইংলণ্ডাবাসী রজার এসাম্ কিংবা জার্মানীর বিসমার্ক যেমন প্রতীচ্য দেশের “রাজগুরু” বলিয়া খ্যাত, তেমনই চাণক্য, শুক্রাচার্য্য, কামন্দক প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রবীদ মনীষীগণ প্রাচ্য দেশে প্রচলিত হইয়া রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া এবং রাজস্ববর্গকে মহাপ্রাধিকার রাজ্যশাসন, দেশজয় বিজ্ঞানে অভিজ্ঞাত করাষ্টয়া, প্রজাশাসন এবং রাজধর্ম বিষয়ে উদার নীতি সকল বিস্তারিত করিয়া তাঁহারাও “রাজগুরু” পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহা কম প্রাচ্যের কথা নহে এবং প্রকৃত পক্ষে ইহা একটা সত্যই অভিমানের বিষয় যে প্রেটো (খৃঃ পূঃ ১২০ হইতে ৩৪৭ অব্দ), এবং এরিস্টোটল (খৃঃ পূঃ ৩৮৪ হইতে ৩২২ অব্দ), প্রভৃতি অতি প্রাচীন প্রতীচ্য দেশীয় ঐতিহ্যবাহীরা প্রচলিত হইবার বহু শতাব্দী পূর্বে হইতেই এই ভারতবর্ষে সর্বশাস্ত্রবীদ পণ্ডিত

জ্ঞানী মহাপুরুষগণ অলঙ্কৃত করিয়া অধিষ্ঠিত আয়োচনার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন।

আমাদের আলোচ্য নীতিশাস্ত্র গ্রন্থ কোনও বিশেষ রাজ সভায় কিংবা কোনও বিশিষ্ট মুণ্ডিতের জন্য লিখিত হইয়াছিল কি না তাহা এখন পর্য্যন্ত জানিবার উপায় নাই কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে প্রাচীন আর্য্য সমাজে রাজনীতি, ক্ষেত্রে মহারথীগণ এবং সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কালের কৃষ্টি গতিক প্রতিকূল করিয়া যে কয়েকখানি গ্রন্থ বিজ্ঞান আছে, তন্মধ্যে ইহা একটি অত্যন্তকষ্ট এবং মূল্যবানগ্রন্থ এবং আমরাও এই ধারণার বশবর্তী হইয়া “কামন্দকের রাজ্যশাস্ত্রের আশার ন্যায়” কামন্দকের নীতিশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করিতে সাগমী হইয়াছি। কতটুকু সঙ্গী বখা-যথভাবে মূল শব্দানুযায়ী অনুবাদ করিতে বাইরা অনেক স্থলে ভাষার সৌন্দর্য্য হানি হইলেও উহাই ক্ষম্যকৃত পন্থা বিবেচনায় আমরা সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছি। মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে যে মাধুর্য্য ও আন্তরিক আনন্দানুভব করা যায়, তাহা অনুবাদ পাঠে আশা করা যথা।

শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ।

(কলকাতা)

সমস্যা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নগেনের মন আজ খুব স্থব্র নহে। বিধু বাবু চলিয়া যাইবার পর হইতে প্রায় সমস্ত দিন তাহার মনে নানা রকম চিন্তা তরঙ্গ তুলিয়া খেলিতেছিল। চুর্গাদাস বাবু এ পর্য্যন্ত কখনও তাহাকে ডাকেন নাই— সে তাঁহার নিকট কোন বিষয়ের জন্য কোন অনুরোধও করে নাই; তবে কেন তিনি জরুরী চিঠি দিয়া তাহাকে ডাকাইলেন? প্রফ দেখিতে কি? মেডিকেল পুস্তকের প্রফ—সে তো শৈলেনই রীতিমত দেখিতেছে। হেলে দুটিকে পড়াইতে? সেও তো বতীন বাবুই আছেন। বোণ হস্ত বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে খাওয়া দাওয়া আছে; সে জন্ত তিনি নিজে না লিখিলেও তো পারিতেন। মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মিসামিসিতে কোন রকম অশিষ্ট

ব্যবহার, অগ্রিম কথা লইয়া কি? অসম্ভব নহে!

তেনন তো কিছুই বুঝিবে, মনে হয় না।

কিছুই যে ভাবিয়া নাইতেছিল না; কোন সাধনাই ভাবিয়া বন্ধকে আজ-বাতি দিতে পারিতেছিল না বলিতে কি, আশক্তি অপেক্ষা হৃদয়ই তাহার মনে জাগিতেছিল বেশী। এই কাগজের টুকরা খানা আজ তাহাকে এত হৃদয়ভরা ভাৱে ফেলিলে বিধুব্বরল কথা ভাবি লইয়া নগেন আজ এক সময়ে কত রহস্যই না করিত। কত হাসিই না হাসিত।

শৈলেনও দুর্গাদাস বাবুর বাড়ীতে আসিয়া পাই আছে কিনা, জাহ্নবীর কত নগেন পঁচটা না বাজতেই বাহির হইয়া পড়িল।

শৈলেন তখনও কলেজ হাতে আইসে নাই। নগেন জাহ্নবীকে অপেক্ষা করিল। শেষ পঁচটা বাজলে উঠিয়া পড়িল।

দুর্গাদাস বাবুর বাড়ীর ভিতরে বাইতে এখন আর শৈলেনও নগেনের মনে কোন আটক লাগে না। নগেন ভিতরে প্রবেশ করিতেই সিঁড়ির মাথার তাহার সহিত পাকুলের সাক্ষাৎ হইল। নগেনের মুখে হাসি নাই। পাকুল তাহাকে দেখিয়াই হাসিয়া বলিল—“এই যে আপনাকে কাল দেখি নাই, আহুন।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“প্রতিদিনই কি দেখিতে হইবে?”

“আপুতি কি?”

নগেনের মনের ভাব একটু বেন পাতলা হইল। সে নিজস্বা করিল—“তোমার বাবা কোথায়?”

“কলে’ গিয়াছেন। এখন আসিবেন”।

নগেন হাঁটাইল দেখিয়া পাকুল বলিল “তান উপস্থিত নাই বলিয়া কি আর কার সাধে আলাপ করতে নাই? আহুন না।”

“একটু কাজ দাওয়া, আসি—” বলিয়া নগেন বাইতে উত্তর হইল।

পাকুল অভিমান করে বলিল—“আমর বুঝি আর বহুস্বামীর মধ্যেই গণ্য হইলাম না।”

“সেটা কেন?” বলিয়া নগেন করিয়া আসিয়া টেকক খানার কোঠায় বলিল।

পাকুল একখানা পাখা আনিয়া তাহার হাতে দিল।

তারপর সে বহুস্বামীর বৈদিক কাগজ খানি আনিয়া সমুখে রাখিয়া বলিল—“এই নিম্ন আলাপের পুণ্য, কথা বলিবার মত লোক না থাকে এ নিয়েই বহুস্বামী”

নগেন হাসিয়া বলিল—“আগেতো মুখ দিয়া কথাই বাহির হইত না—এখন দেখিতেছি—বৈ কোটে।”

পাকুল লজ্জিত হইল নগেনও কথা বলিয়া লজ্জিত হইল। হৃদয়ভরা তাহার মনের তাল ঠিক ছিল না। সে হাসিয়া বলিল—“আমর কথার কি লাগ করিলে পাকুল?”

পাকুল বলিল—“কিরাতি বৈ ক?”

নগেন—“আমার মনটা আজ ভাল নহে অনর্থক তোমার মনে কই দিলাম?”

পাকুল হাসিয়া বলিল—“আমার মনেতো কোন কই পাই নাই। সে চিন্তা করিয়া আপনাই বরং অধিক কই পাইলেন।”

নগেন “তোমার রাগ হইয়াছে।”

পাকুল হাসিয়া বলিল—“রাগ হইলেই কি কই হয়? যাহুধ কথার কথার রাগ করতে পারে—তাতেই কি মনে কই হয় আপনার অনুধ কি?”

পাকুল বহুলকে ডাকিয়া হাজির করিল। তারপর নিজেই প্রেরণ করিল—“আপনার আজ কিসের অনুধ—না বলিলে পুনরায় রাগ কারব।” বলিয়া পাকুল হাসিল।

এই সময় দুর্গাদাস বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগেনের মনও হুঁচকুঁচকি করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—“ব’সো, আমি আসতেছি।”

পোষাক ছাড়িয়া ভিতরের বারান্দার একখানা ইজি চেয়ারে বসিয়া দুর্গাদাস বাবু ডাকিলেন—“নগেন ভিতরেই এস, ব’স। বড় পরম বাহিরে, এ কাপাটার বাতাস বেশী।”

নগেন উঠিয়া ভিতরে গেল। বহুল একখানা চেয়ার নিয়া তাহাকে বসিতে দিল।

ভিতরের বারান্দার নীচেই একটা গোট অস্ত্রিয়া। আলাপটা এত পক্ষিয়ার। চারিদিকে ইহা নানা জাতের বৃক লতা লজ্জিত এক দিকে রাসা, বর, অপরদিকে একটু দূরে পারখানা। বাহিরে হাটের

আশা, ভাতা ও আর দুটা ছেলে বেড় বিল্টন খেলিতেছিল। উপরের বারান্দার বসরা নৃবী উরকারী কুটিকুটিলেন।

নগেনকে দেখিয়া গুণিনীও বলিলেন “বসো বাবা।”

গার্লস হুর্গাদাস বাবুর উপর পাখার বাতাস দিতে ছিল। সে বাতাস নগেনকেও স্পর্শ করিতেছিল।

হুর্গাদাস বাবু বলিলেন “বড় গরম পড়িয়াছে। চারিদিকে কলেরাও ভয়ানক টাইপে দেখা দিয়াছে।”

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—“কলেরা কেসে কল ছিল নাকি?”

হুর্গাদাস বাবু—“না আমি কলেরার যাট না, তাঁরাও বাইতে দেখে না। ও বড় কলেক্টিয়াস ডিক্স। একটা বকঃলের কেস্ আসিয়াছিল—হাট ডিক্স।”
দয়াল! দয়াল।”

নগেনের মন খিঁ খিঁ করিতেছিল। সে আর কোন কথা উত্থাপন করিল না, সংবাদ পত্রের উপর চক্ষু রাখিয়া বসিয়া রহিল।

হুর্গাদাস বাবু বিশ্রাম করিয়া পাড়ুর জলে হাত মুখ ধুইয়া শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“নগেন ওকালতিই হবে করিতে হইবে, এই ঠিক?”

নগেন কুণ্ঠিত ভাবে বলিল “পাস হইলে তো! পাস যে হইতে পারব, তাহার সম্ভাবনা খুব কম ছুবেলা ‘টিপসন’ করিতে হয়। ইহার পর ল ক্লাস ও এম. এ, ক্লাস পড়ার সময় একেবারেই থাকে না।”

“কেন ল ক্লাসটা ছাড়িয়া দিতে হয় না?”

“ছাড়িয়া দিলেই বা লাভ কি? বি, এ, পাস করিয়া বি, এল, পড়ার পরচেন অল্প দুই বৎসর চাকুরির উমেদারীতে কাটাষ্টয়াছি; একটা ৩০ টাকার মাষ্টারীর বোঝাড় হইল না। এখন কি কেবল বি, এ, র আর সম্মান আছে? আর দেশের অল্পও একটু খাটিতে ইচ্ছা হয়, তাই উকল হওয়ার ঠক্কা। বাবীন বৃত্তি, তাই বোঝা যায়।” বলিয়া নগেন খামিয়া গেল।

হুর্গাদাস বাবু—“উকিল হইয়া দেশের উপকার করার মান—গাছের মূল কাটিয়া আগার জল দেওয়া—দয় কি? তাইয়ের বকে তাইকে ছুরি ধরিতে উপদেশ

দিয়া, প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে বিবাদের পরামর্শ দিয়, পিতার নিকটে পুত্রকে উত্তেজিত করিয়া—পরীক্শার দেশের উপায়দায় মনোহী কলকে ভৈষিক উপায়দায় করিয়া দেশের শক্তি ও বক্তৃতা অপহরণ করিয়া—দেশের উপকার?”

নগেন কোন উত্তর করিল না।

হুর্গাদাস বাবু বলিলেন—“উত্তর দাও।”

নগেন ধীরে ধীরে বলিল—“উকিলের বতখানি বোঝ বলা হইল, আমি ততখানি স্বীকার করিতে পারিতেছি না যে আইনের আলোচনার দ্বারা একটা অভ্যাস সত্যতা পড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই বোধদান লইয়া ইয়োরোপের বর্তমান উন্নত সভ্যতার অনুদান করিয়াছে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারে? বাবা হউক দেশের অল্প খাটিবার ইচ্ছা থাকিলে ‘অল্প কোম’ কাজে থাকিয়া তাহা করিবার সুযোগ আছে কি? চাকুরী করিতে গেলে তো সে পথে পদ বাড়াইবারও অধিকার থাকিবে না।”

হুর্গাদাস বাবু হাসিয়া বলিলেন—“ওই ওকালতি, আর ওই চাকুরী—এই দুইটা ছাড়া কি তোমাদের চিন্তা অল্প কোথাও যায় না? সত্যতা কি এইরূপেই পড়য় উঠিবে? লম্বা বক্তৃতা করিলে আর চাকী আদার করিলে, লোককে উত্তেজনা করিলে, আর সংবাদ পত্রে article লিখিলেই কি দেশের অল্প খাটা হয়? দেখতেছি, আদালত ও ল আদালতের মুক্তি দুবকঃপের ধী শক্তি সমাধিহীন হইয়া উঠিল।”

নগেন মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—“বক্তার ও প্রবন্ধ একেবারে যেকাজু হয় না, তাহা কি বলা বাহতে পারে? রাজনীতি চর্চার অল্পও কি লোকের প্রয়োজন নাই?”

হুর্গাদাস—“আমরা পরাধীন জাতি, আমাদের অল্প সমস্ত সর্ব মধ্যম। পরাধীন জাতির আত্ম পলিটিস্, কিছুই নাই, থাকিলেও আগে অর্থ নীতির সমাধান, তার পর রাজকীয় নীতির সমালোচনা। আমরা অল্প বয়স হইয়া যুযু জাতি—অন্যান রাজী, অন্যান রাজীর কাণে—হয়নাথ আর রাজনীতির কোলাহল তুল্য।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“আমরা তো আশান বাজীর কাণে হরিনাম দিয়াই তাঁহার পূণ্যপথ বাজায় সহায়তা করিয়া থাকি। রাজনীতির উদ্ভেজনাও সেইরূপ অসার প্রাণে চিনিবের কাজ করে।”

দুর্গাদাস—“মৃতের পূণ্য পথ বাজায় সহায়তা করা ও অসার প্রাণে বল সঞ্চার করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা শরীর বাহ্যতে ক্রম না হইতে পারে তাহার চেষ্টা কি সর্বতোভাবে কর্তব্য নহে? আমাদের জাতির জীবনে পুষ্টিকর সংস্থান চাই, অন্নসমস্যা আমাদের বর্তমান প্রধান সমস্যা। যে দেশের মহাপ্রাণ লইয়া সগে মর্তে, যমে স্থানবে অধরহ বন্দ, সেখানে অর্থের প্রয়োজন অধিক। উদরকে প্রাণের দিয়া জাতিকে জীবিত রাখিতে পারিলে তো সে জাতির রাজনীতি! নতুবা তোমার কথা কে শুনিবে? কোহাকে শুনাইবে?,”

নগেন বলিল—“আপনি কি বলিতে চান যে আমরা আমাদের সকল কর্ম ফেলিয়া অর্থ অর্থ করিয়া অর্থসঙ্কর জাতিই হই! ইহাতে কি জাতির মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া হইবে?”

দুর্গাদাসবাবু হাসিয়া বলিলেন—“জগতে টিকিতে পরিলেতো জাতি, তারপরে তো জাতির মনুষ্যত্ব! আমাদিকি প্রথমে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার সংস্থান করিতে হইবে। শুধু রাজনীতি চর্চায় কেন? জাতি বলিয়া জগতে দাঁড়াইতে হইলে, তাহার সমস্ত অস্থান প্রতিষ্ঠানেই অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ দেশের জন সমুদ্রের শৌণীত শোষণ করিয়া নহে—দেশের ধূল মূঠাকে স্বর্ণ মূগ্ধিতে পরিণত করিয়া করিতে হইবে। শস্ত শামলা বঙ্গভূমির স্বর্কে স্বর্ণ রেণু লুকাইত আছে, আমাদের শতকরা ৮০ জনকেই যদি চাষ করিয়া ধাইতে হইল, তবে এ সনাতন প্রথা পরিবর্তন করিয়া লইতে হইবে। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কৃষি সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে। যে দেশের ক্ষমিতে স্বর্ণবর্ণ ফেলিলে তাহা অঙ্গার কণায় পরিণত হয়, সে দেশের সেই ভূমিতে এখন গোণা ফলিতেছে। আমাদের প্রথমেই অন্ন সংস্থান করিতে হইবে। তারপর অর্থ।” “বার্ণিশো-রুসতি লক্ষীঃ।” চকের সম্মুখেই দেখিতেছি, একমাত্র ষটি সঞ্চল মারওয়ারি দীন হীন বেশে

আসিয়া দুই মন কাপড়ের বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিতেছে; তারপর হঠাৎ সে একখানা দোকান করিয়া বসিল। তারপর একটু স্থান করিল। দশ বৎসরের মধ্যে সেই স্থানে একতলা দুতলা করিয়া স্বর্ণ পথ রোধ করিয়া পাঁচ তলা উঠিয়া পড়িল। টুপি সঞ্চল বণিক এখানে আসিয়া মাহের তেলে মাছ ভাজিয়া আমাদের বুদ্ধির তহবিল ভাঙ্গিয়া মানুষ হইতেছে, মটর হাঁকাইতেছে—জুড়ি গাড়ী দৌড়াইতেছে। আমরা তাহারই হাউসের বড় বাবু হইয়া অদৃষ্টের তহবিল তাকাইয়া বসিয়া আছি। আমাদের গৃহ শোণের আবর্জনা স্বাভাবিক বিভিন্ন দেশের বণিকগণ তাহা কনক পিণ্ডে পরিণত করিয়া লইতেছে। তাহাদের কাঁচখণ্ড আনিয়া আমাদের চক্ষে তাক লাগাইতেছে—আমাদের শৌণীত সম অর্থ তাহার বিনিময়ে শোষণ করিতেছে। আর আমরা কেরানীপিরী ও ওকালতি, মাষ্টারী ও হাকিমি সঞ্চল করিয়া কোন মতে পরিবার প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করিতেছি—মনুষ্যত্ব কোথায়?”

দুর্গাদাস বাবু থামিলেন। নগেন মনে মনে তাবিত্তে লাগিল—এই বক্তৃতা শুনাইবার ক্ষমতা কি জরুরী আবস্থান? অনেকেই এইরূপ গোঁগ আছে, প্রবন্ধ লিখিয়া পরকে শোনান, বক্তৃতা করিয়া মনের ঝাল মিটান। তাই সম্ভব।

বক্তৃতার সূচনায়ই নগেনের মনের তার একেবারে হালকা হইয়া পড়িয়াছিল। সে ধীরে ধীরে বলিল “উপায় নাই। অল্প অভিজ্ঞতাতেই যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আমার মনে হয়, আমরা নিতান্ত আত্ম-প্রবঞ্চক জাতি, স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার সম্পূর্ণ অক্ষমবৃত্ত। আমরা মাথার উপর কর্তা রাখিয়া বেশ চলিতে পারি; তখন আমাদের মনুষ্যত্বের, বুদ্ধির ও লেখনীর তেজে রাজ্য চলে, ব্যবসায় চলে, বাণিজ্য চলে, সব চলে। কিন্তু আমাদের দ্বারা কর্তৃত্ব চলে না। প্রভু হইলে এ জাতি মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়া প্রভুত্বের অপব্যবহার করে। বৌদ্ধ কারবারের কর্তা হইলে, মূলধন আত্মসৎ করিয়া বসে। এ জাতির বুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব পরের হস্ত।”

হুর্গদাস বাবু বাধা দিয়া বলিলেন—“তাই ভাবিয়া কি নিশ্চিত থাকিতে হইবে?”

নগেন্ বলিল—“জাতি প্রস্তুত করিতে হইলে সকল রকমই দরকার। ভারতবর্ষকে অখণ্ড ধরিয়া ভারতীয় জাতি গঠিত হউক। তাহার কয় বিভাগ থাকুক। যে প্রদেশ যে বিষয়ের আলোচনায় অভ্যস্ত সেই প্রদেশ সেই বিষয়ে অগ্রসর হউক। ভারতীয় জাতি গঠিত হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালী, মারহাট্টা, পাঞ্জাবী ক্ষুদ্র গণ্ডীর কি প্রয়োজন? প্রজাব শক্তির চর্চা করুক, বোম্বাই ধনের চর্চা করিতেছে করুক, মাদাজ শিল্প বিজ্ঞানের চর্চা করুক, পশ্চিমারা মজুরী করুক, কৃষিকর্ম কেরালীগিরী ও বক্তৃতা করুক বাঙ্গালী, জাতি গঠিত হইতে সকল বিভাগইতো প্রয়োজন।

হুর্গদাস বাবু হাসিয়া বলিলেন—“ছেলেমি কথা—বাঙ্গালীর ধনের প্রয়োজন নাই! আর বোম্বাইর লোকের আহাৰ্য্য সামগ্রীর জন্ত বা কেরালীর দরকার হইলে বাঙ্গালার দিকে চাহিয়া থাকবে! ছেলেমি কথা!”

নগেন বলিল—“ঠিক তা নয়, কিন্তু ব্যবসায় বাণিজ্য বা শিল্প বিজ্ঞানে যে ঐশ্বৰ্য্যের প্রয়োজন, বাঙ্গালীর জীবন যাত্রায় সে ঐশ্বৰ্য্য ধারণের সময় কোথায়, সংস্থানই বা কোথায়? আমার সম্বন্ধেই আমি বলিতে পারি, অখণ্ডভাবে পড়া হইতেছে না, এ দিকে বাড়ী হইতেও অর্পেরই প্রচণ্ড ভাড়া। নিতান্ত বেহায়া বলিয়া হুই বেঙ্গা হুটা টুইসন্ করিয়া কলেজে যাওঁতেছি মাত্র। বি, এ, পাস করিয়াছি, বাড়ীর লোকের কত আশা। আমার পক্ষে কি শিল্প বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেণ্টের সময় আছে, না তার মত অর্থ আছে?”

হুর্গদাস বাবু রাগ করিয়া বলিলেন—“তবে দাসত্বই কর! নূতন পথার নাম শুনিলেই যখন শরীর শিহরিয়া উঠে—দাসত্ব চিন্তার বাহিরে যখন আর চিন্তা যায় না, সেই চিন্তার ক্রমশঃ হারাওয়া গড়লিকা প্রবাহের মত এক পথে এক চিন্তা রোমন্থন করিতেই যখন অভ্যস্ত, তখন আর এ জাতির গতি নাই। ওকালতি, কেরালী-গির্জা, বা কিম্বি আর মাঠারী”—

হুর্গদাস বাবু উঠিয়া গেলেন। নগেন বসিয়া বহিল।

তারপর চেয়ার খানা টানিয়া একটু সম্মুখে বাইরা নীচের আসিনার তাতা ও আশাদের খেলা দেখিতে লাগিল।

হুর্গদাস বাবু একখানা ছাপার কাগজ আনিয়া নগেনের হাতে দিয়া বলিলেন—“দেখ—গাড়—তোমারই এ পত্রা অনুসরণ করিতে হইবে! আমি কোন কঠিন তোমাকে পাঠাইব। তোমার উকীল হইবার আর দু বৎসর বাকী; সে খান হইতে আসিয়াও বি, এল, এক জগৎ প্রস্তুত হইতে পারিবে।”

নগেন—“এ প্যারেক্টিক এনোসিসএসনের প্রস্তুতকরণ টান্—আমি দেখিয়াছি। আমার পক্ষে এ আবুহোসেনের স্বপ্ন—গরীবের ঘোড়া রোগ।”

হুর্গদাস বাবু হাসিয়া বলিলেন—“তবে বাইবার জন্ত প্রস্তুত হও। দয়াল—দয়াল। আমেরিকা বাইতে হইবে; খরচ পত্রের চিন্তা তোমায় করিতে হইবে না। কোন সাব্জেক্ট তুমি নিবে, সেইটাই চিন্তা কর।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“হহারও কি পরিণাম—সেই কেরালী গরিব নহে? আমরা কি কেপিটেল দিয়া ব্যবসায় করিতে পারিব?”

হুর্গদাস—“জান হইলে, ধন হইলে, ক্রমে করিব।”

নগেন—“ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে এই দশজন, আর পাঁচ জন, শিল্প বিজ্ঞান শিখিয়া দেশের কি মহৎ উপকার করিবে?”

হুর্গদাস—“আদিপুত্র কাণ্যকূজ হইতে মাত্র পাঁচটা ব্রাহ্মণই আনিয়াছিলেন—অজ্ঞ তাহা হইতে লক্ষ লক্ষ জনের উৎপত্তি হইয়াছে। বীজ অক্ষুরিত হইলে, ফলের অভাব থাকে না। যাই হউক, সে জন্ত আমি দায়ী। আমাদের সম্মুখে বাঙ্গালার অর্বনোতির সমস্যা উপস্থিত, তাহাই আমাদের পক্ষে এখন সর্বশক্তি প্রয়ুক্ত করিয়া সমাধান করিতে হইবে।”

পাকুল চা লইয়া আসিল।

বাহিরের ছাদে তখন বিধু বাবু ও গৃহ শিক্ষক যতীন বাবু বসিয়া গল্প করিতেছিল। বাহিরের বারান্দায় বিধুকে দেখিয়া নগেনের পূর্ব কথা স্মরণ হইল। নগেন তাহাকে চক্ষু টিপিয়া আশ্বাস দিল।

নগেন চলিয়া যাইতেছে, দেখিয়া বিধুও তাহার

করিয়া কহিতে উত্তর হইল। নগেন বলিল—
করিয়া কহিবেন না—চাখাম; আমি প্রয়োজনীয় কার্যে
হইতেছি, তারপর পড়াইতে যাইব। এখন আপনার
কথিত আলোচনা আমার মজুদী পোষাইবে না। কাল
আমাকেই সাক্ষাৎ হইবে, তখন সব বলিব।”
নগেন চলিয়া গেল।

প্রয়োজন পরিচ্ছেদ।

নগেন ছেলে পড়াইয়া আসিয়া রাত্রি ৮ টায় শৈলেনকে
বসিতে বসিল এবং তাহার নিকট একে একে সমস্ত কথা
বলিয়া বলিল। বিধুর প্রস্তাবের ভিতর যে গুচ তব ছিল,
সেই গুচ গোপন করিল না। সমস্ত কথা বলিয়া নগেন
কহিল—“এখন কতব্য?”

শৈলেন বলিল—“এ অতি উত্তম প্রস্তাব। সুখ
হোক, এ সুযোগ অবহেলা করিতে নাই।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“সুযোগ যে সুখ অথবা তাহা
হইলেও রক্ত সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নাই,—
কিন্তু বিধুর কথিত উদ্দেশ্য যদি সত্য হয়, তবে সেটাই
আলোচনা ও বিবেচনার বিষয়। বাবার মত
কিছুতেই হইবে না।”

শৈলেন—“তোমার বাবার মত কোনটাতেই হইবে
কিছুতেই হইবে না। তোমার বাবার মত কোনটাতেই হইবে
কিছুতেই হইবে না। তোমার বাবার মত কোনটাতেই হইবে
কিছুতেই হইবে না।”

নগেন—“তারপর দেখ বিপদ কত, সাত্তালদের
কত ভয় তাহা নীলস করিয়া প্রায় সাড়ে চারি হাজার
কিছু কহিয়াছেন। রেহানী সম্পত্তি—বাড়ীঘর ও
কিছুকিছু সব নিলাম করিয়া নিবে এখন। কোন উপায়
কিছুকিছু সব নিলাম করিয়া নিবে এখন। কোন উপায়
কিছুকিছু সব নিলাম করিয়া নিবে এখন। কোন উপায়

কিছুকিছু সব নিলাম করিয়া নিবে এখন। কোন উপায়
কিছুকিছু সব নিলাম করিয়া নিবে এখন। কোন উপায়
কিছুকিছু সব নিলাম করিয়া নিবে এখন। কোন উপায়
কিছুকিছু সব নিলাম করিয়া নিবে এখন। কোন উপায়

কিছুকিছু সব নিলাম করিয়া নিবে এখন। কোন উপায়
কিছুকিছু সব নিলাম করিয়া নিবে এখন। কোন উপায়
কিছুকিছু সব নিলাম করিয়া নিবে এখন। কোন উপায়
কিছুকিছু সব নিলাম করিয়া নিবে এখন। কোন উপায়

পাই নাই। উপাঙ্গনের সুবন্দোবস্ত না করিয়া বিবাহ
করিব না—ইহাই নিষিদ্ধ। সুখেও বলিয়াছি। এখন বাড়ী
ঘর ও জমিটুকু রাধিবাবর উপায় কি? পরিবারকে এই
রূপ বিপদে ফেলিয়া, সেই পরিবারের এক মাত্র ভরসার
স্থল—যদি পৃষ্ঠ ভঙ্গিয়া—এমন একটা কাজ করিয়া বসি,
বাহাতে বাবারও সমাজে মুখ না থাকে, তবে সেটাই বা
কেমন হয়? এ বিষয়ের সমুদায় পরামর্শ কি?” বলিয়া নগেন
একটা বালিস টানিয়া লইয়া চিৎ হইয়া বিছানার শুইয়া
পড়িল।

শৈলেন বলিল—“স্বপ্ন স্বপ্নে তোমার আমার
সকলেরই সমান সমস্ত। বিবাহ স্বপ্নে এবং ভারত
উদ্ধারি কথাবার্তা স্বপ্নেও কলেজের ছেলেদের বোধ
হয় পনের আনারই একমত। সংসারের প্রকৃত গহা এক,
আর আশাদিগের পরশৈলপদি ব্যাঘ্র—কল্পনা কল্পনা ঠিক
তার বিপরীত। সুতরাং কল্পনা বায়ু প্রভৃতি আশাদিগের
মত কলেজিয়ানদিগের পরামর্শে—এ সকল ব্যাপারে
বিশেষ কোন উপকার দর্শিবে না। শিল্প বিজ্ঞান
সমিতি লোক পাঠাইবেন—আগামী আগষ্ট মাসে।
তুমি হুগাদাস বাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিও না,
এখন তোমার বাড়ীতেও এসবকে লিখিও না, কাহাকে
কিছু জানিতেও দিও না। কলেজ বন্ধের আর মাত্র
দেড় মাস আছে, বাড়ীতে যাইয়া সকল সমস্তারই
সমাধান করা যাইবে। তোমার বাবাকে—সাড়ে চারি
হাজার টাকা লইয়া যদি তোমাকে কোথাও পাঠাই
করিতে পারেন, তাহার—সম্মতি দান কর। বিবাহ
করিব, সম্মতি দান করিলেই বিবাহ করা হয় না।
অনর্থক পিতার বিরাগ ভাঙ্গন হওয়া কদাপি সম্ভব নহে।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“হুগাদাস বাবুর ঘরে বিবাহ
করা কি তুমি পরামর্শ দাও?”

শৈলেন—“হুগাদাস বাবু ব্রাহ্ম, তুমি হিন্দু; তুমি
কেন তাঁর ঘরে বিবাহ করিবে?”

নগেন—“তবে তার প্রস্তাবে সম্মতি দেই কেন?”

শৈলেন—“তিনি কি কোন কতিপয় দিয়াছেন?
তবন ভো দেন নাই, দিতে পারেনও না।”

নগেন—“দেন নাই; কিন্তু আমার বিধান, বিধুর
কথা ঠিক,—সে সব ধর রাখিবে।”

শৈলেন "ভেমন হইলে—বংশ হাজার নগদ, একখানা বাগান বাড়ী সহ একটা well accomplished * * — কে না তাহা, গ্রহণ করিতে উপদেশ দিবে? আমাদের সমাজের ভাত ধনী-বাগের ভিতর সর্বদাই।" বলিয়া শৈলেন উচ্চ হাস্ত করিল।

আজ শৈলেনের মনে বেশ একটু ক্ষুষ্টি ছিল। সে পকেট হইতে তার বৌদির চিঠিখানা খুলিয়া নগেনকে পড়িতে দিল।

নগেন চিঠি পড়িয়া বলিল—“আজই পাইয়াছ? উত্তর দিয়াছ কি? কি উত্তর দিলে?”

শৈলেন হাসিয়া উত্তর করিল—হাঁ—না—কিছুই না।”

“সে কেমন?”

শৈলেন হাসিয়া বলিল—“তিন প্রশ্নের উত্তর।”

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—“তবে কি বৈশাখেই?”

শৈলেন—“কোন অবস্থিতি ছিল না, কলেজ এখন প্রায় নাই, কিন্তু জুলাইতেই পরীক্ষা; মনে হয়, পরীক্ষার পরে হইলেই বিশেষ সুবিধা হয়। তখন তোমাদেরও পরীক্ষা হইয়া যাইবে। সে কথাই লিখিয়া দিব। ঐ সময় বাড়ীতে সকল পরামর্শই হইবে। সমাজ সমস্তারও যীমাংসা করা যাইবে।

ময়মনসিংহের কবি কাহিনী।

কবি হারাইল বিশ্বাস।

ময়মনসিংহের নেত্রকোণা বিভাগে, চাইরগাতিয়ার বিশ্বাস বংশে কবি হারাইল বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বাস মহাশয় কোন টোলে বা স্থলে গিয়া বিভ্রান্ত্য না করিলেও একজন সুশিক্ষিত লোক ছিলেন। কবিত্ব শক্তি ছিল তাঁহার স্বাভাবিক সম্পত্তি। তিনি কবি গান, বাটু গান, বাউল গান ভিন্ন কোন গত পুস্তক রচনা করিয়া বান নাই। বিশ্বাস মহাশয়ের রচিত গীতধর্মীই তাঁহার কবিত্ব প্রতিভার পরিচায়ক। তাবো-জ্বাল পূর্ব সেই রসাল গীতি কবিতাগুলি একত্র করিলে একখানা সুবোধের পুস্তক হইতে পারে।

আমরা নিম্নে কবি হারাইল বিশ্বাসের রচিত কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

গীত—বালগী।

চিতান,—কর্ম ক্রমে এসে এই জন্ম ভূমিতে।

পারান,—পেয়ে দারাপুত্র পরিবার, মনে করে অহঙ্কার,

তাঁদের কর্তা হয়ে ভুলে আছি বা,—তব মায়াতে

লহর,—জানি সংসারেতে কর্তা হওয়া,

স্বপ্নে যেমন রাজ্য পাওয়া,

মাগো,—মায়া নিজে ভাঙল না,—তারা মা, মা,

মাগো,—আমার পুত্র আমার দারা,—

তাই ভেবে প্রাণ বৈল সার —

“তারা,, বলে একদিন তারা, ভাক্তে পান্নাম মা

মিল,—তারা দিন কতকাল সুখে ভুলে আছি নিশানি

—বধন আসবে বধন, কর্কে দমন,—

এ সুখের দিন কোথায় হবে

মহড়া, তারা মাগো,—আখার বল শুনি মা,

সে দিন আমার কি সুখে যাবে?

গুয়া,—সময় অন্ত হবে বধন, দারাপুত্র এসে তখন,

কর্কে নিরীক্ষণ,—

বলবে,—ছিলে কর্তা, চলো কোথা?

—রেখে যাও কি ধন?

করিয়ে ধনের উদ্দেশ, দারা কান্না কাঁদিয়া শেষে,

আমার সাজায়ে সন্ন্যাসীর বেশে,

অশ্রুধারা কৃষ্ণি কেলি দিবে।

বাদ,—ভোজের বাজী এ সংসার জানি গো শিরে।

লহর,—জানি বজুবর্গ আছে বারা,

দিনে দিনে সবই তারা,—কর্কে তারা, ধনের প্রার্থনা—

তারা মা, মাগো, সব বলবে সে সময়ে,

দিরে কি ধন বাওহে দিবে,

আমি বাবা ক ধন লয়ে, কেউ তাহা বলবে না।

মিল,—পূর্ব ৬৭।

এই গীতটির পরচিতান, ব্রহ্মাদি অবশিষ্টাংশ পাওয়া

গেল না।

(২)

চিতান,—বমসি, বমসি তারা, শায়ে শুতে পাই।

পারান,—তারা গো,—দরায়ী ব্রহ্মদরী, কোমল

আর অন্ত গতি নাই।

হ, —কালী কালী বলে কালী,—ভেবে অজ হৈল
কালি,
—তবু তো এলে না কালী দ্বন্দ্ব পদ্মেতে,—
এমা শ্রম কালী,—ওগো পাবাণ কালী,—
কুনি আমার কপালেতে কেবলি কালি,—
কালী তোরে না খাইলে, যাবে কি কালি অন্তর হইতে ॥
মিল,—আমার পিতা যেমন পাগলা ভোলা,—
পাপলী মা তোর তেমনি খেলা,—আমিও পাগলা,—
এবার তিন পাগলে করে মেলা, ভব জালা সব ঘুচাব ।
মহড়া,—দেখ্বে কেমন পাবাণের বেটা পাবাণ হয়ে
রও,—
এবার—পাবাণ কাড়া মস্তে তারা,—তোমারে গলাব ।
—আরোহিয়া পূণ্য রথে,—
জান অজ জুড়ে তাতে,—
দাঁড়াব মা তজ্জি পথে,—করেছি মনন,—
এমা শ্রম কালী, ও মা পাবাণ কালী,—
কর্ত্তে শমন দমন,—

মা রূপপদ্মে পাদ পদ্ম ধরি,—
সমুদ্রে রক্ত জবা করি,

মানব অঞ্জলি পুরি পূজিব চরণ ।

এই গীতটি একবারে অসম্পূর্ণাবস্থায় লাগু হইয়াছি ।
কবির কোন নিয়মিত রূপ নাই । কবির ভাব ও রচনা
কোন সীমার ছিল, সন্দেহ নাই ।

(৩)

কান,—সুখের নবমী গত,—বিজয়ার প্রবেশ ।

কান,—নিরে গোঁরী,—সর্ব শূন্য করি,—

কৈলাসেতে চলিলেন মহেশ ॥

কান,—তাই দেখে সব পুরবাসী,

বলে মরম জলে ভাসি,—

কৈ গো পাবাণ গৃহিণি,—

কি কথায় রয়েছ বলে,—উমা তোমার কৈলাসে,

বারান্ন কালে একবার এসে,—হের জশানী ।

কান,—কোন রম দ্বন্দ্ব হরিণীর প্রায় গিরিবাণী,—বলে,—

এমা উমা শানিক দাঁড়া করি কোলে ।

মহড়া,—আমার প্রাণ কুমারী,—

মম পুরী আঁধার করি,—কেন মা বাইতেছ চলে ।

ধূয়া,—আমি সংবৎসরে, আক্লাদ করে,—আনন্দ তোরে,

মনের এই সাধ, প্রাণ জুড়াব বন্ধে ধরে,—

হায় ! হায় !! হায় !!! হায় অকস্মাৎ,

শিবে দিয়ে বজ্রাঘাত,—

মা, কি আনন্দে নিরানন্দ করে গেলে ॥

খাদ,—কাল কিছু ঘাইলেনা মা,—যুমে ছিলে ।

লহর,—আমার এই সাধ রৈল অন্ধরে,—

কীর ননী রৈল পড়ে,—

ধেলে না মা তার,—কাল নিদ্রায়, হায় হায় রে ।

কার লাগি করিয়া যতন,

কল্পে তোরে প্রতিপালন,

কারে সঙ্গে দিলাম এখন, কেবা লয়ে যায় ॥

মিল,—আমার মনোসাধ না মিটল যায়ায় ভুলে,—

বলি ও উমা,—আর একবার আঁস তোর মার কোলে ।

(৪)

চিতান,—ভারতের অন্তর্গত, কুমারী গ্রাম সুবিখ্যাত,

নীলকমল শর্মা আছেন তার

পারায়,—তাঁহার কন্যা এসোকেনী, ষোড়শী রূপসী,

দেখে তার বদন শশী, উরুসী পলায় ।

লহর,—তাঁকে বিভা কল্পে নবীন দ্বিজবর,

* * * মরি হায় রে,

থাকে কলকাতা সহরে, কম্পোজের কার্য্য করে,—

নারী তার পিতৃ গৃহে থাকে নিরন্তর ।

মিল,—তাকে ছলে বলে ভ্রষ্টা করে হুইপাপী হুয়াশয় ।

মহড়া,—বহু মহন্ত রাজা, ধ্বজা উড়াইলে মন্দ নয় ।

ধূয়া,—তুমি জাঙ্গা পরে, মরছ ঘুরে কেন মহাশয়,—

তোমার যেমনি মজা, তেঁর মজা লোকে কর,—

থাক্তে রঙ্ মহলে, এখন ধেলে—তৈলের গাছ

ঘুরাতে হয় ।

খাদ,—এত দিনে মহন্ত তোর পাইলাম পরিচয় ।

লহর,—তোমার হুঁড়ি পেটের কি হবে উপায়,

মরি হার রে,— * * থাকতে যে বালাধানায়,—

জল খাইতে মাখন ছানায়,—

এখন এই জেল খানায়, ডাইল খেয়ে প্রাণ যায় ।

মিল,—তোমার উচিত শাস্তি দিয়াছে সাহেব,—

বানাইয়াছে রাম ছাগলের পাঠা,—

কয়েনারী চুরী বুকের পাটা বাড়ছে তোমার অতিশয় ।

অন্তরা,—নবীন যে তেজীর ছেলে, নারীকে সাঙ্গ কৈলে —

তাতেই টের পাইলে শান্তিরাম,—

লাভের মধ্যে এই করিলে, ধনপ্রাণ হারাইলে,

দেশ বিদেশে রাষ্ট্র কৈলে,—লুকন্দরা, নাম ।

কৈ তোমার সিকাই সাজন,

কৈ তোমার,—অঙ্গের ভূষণ,—

মুখ খানি কাঁচ কলার মতন, দেখে বড় দুঃখ হয় ।

মনে শুধুবলে, * * * ইচ্ছা হয় ।

হারাইল বিশ্বাস মহাশয়ের রচিত যে কয়টি গীত লেখা
হইল,—তন্মধ্যে এলোকেশীর রূপ বর্ণনার স্থলে অতি সুন্দর
কবিত্বের স্বাক্ষর পরিষ্কৃত হইয়াছে। “ ——— কল্প
এলোকেশী, ঘোড়শী রূপসী, দেখে তার বদন শশী,
উরুসী পলায় । ” কি সুন্দর !

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য ।

শক্তি পূজা ।

বিশ্ব সংসারে সর্বদাই যেন এক সংগ্রাম চলিতেছে ।
এই সংগ্রামের ফলে প্রবল দুর্বলকে নিষ্পেষিত করিয়া
নিজের অস্তিত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখিতেছে । এই
জুই দুর্বল প্রবলকে ভয় করে, প্রজা রাজাকে ভয়
করে । মূর্থ জ্ঞানীকে ভয় করে, পরীণ ধনীকে ভয়
করে । কারণ ধনী, জ্ঞানী, রাজা সকলেই শক্তিমান ।
যখন দুই রাজার সংগ্রাম আরম্ভ হয় তখন ধন বল, জ্ঞান
বল, জ্ঞান বল প্রভৃতি নানাবিধ বলের পরীক্ষা হইয়া
থাকে । অবশেষে ইহাদের সম্বারে বাহার বল
অধিক হয়, সেই জয় লাভ করিয়া থাকে । বল কিম্বা
শক্তি বৃদ্ধি হইলেই আমরা সকলে এক মন বুকের

কথা শ্রবণ করাইয়া দেয় । বস্তুতঃ পক্ষে পারীক্ষিক বল
যাহা দেখিতে পাই, স্থল ভাবে বলিতে গেলে উহার
শক্তির সরল অভিব্যক্তি ।

আমরা বিশাল অট্টালিকা, সুদৃঢ় দুর্গ, প্রকাণ্ড বন
দেখিয়া অনেক সময়ে সমুদ্রমে উহাদের দিকে তাকাইয়া
থাকি, উহাদিগকে প্রবল বৃশ্চিবায়ু কিম্বা বজ্রপাতে বিচুর্ণিত
হইতে দেখিলে আমাদের বিশ্বাসের অবধি থাকে না ।
কারণ আমরা যাহাদিগকে মহাশক্তিশালী বিবেচনা
করিয়াছিলাম, তাহা হইতেও প্রবলতর শক্তির জিহা
এখানে দেখিতে পাইগাম ।

উন্নত গিরিশৃঙ্গ কিম্বা বিশাল বারিধি—যাহা দেখিলে
ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহা যখন আগ্নেয়গিরির ভীষণ
উজ্জ্বল কিম্বা প্রবল ভূমিকম্প অথবা অন্য কোনরূপ
নৈসর্গিক কারণে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন আমরা
শক্তিকে মনে পূজা না করিয়া পারি না ।

যখন জাহাজে চাড়িয়া নদী পথে গমন করি, তখন
নদীতটে ভাসমান তরলী সকল দেখিয়া জাহাজের তুলনায়
উহাদিগকে কত ক্ষুদ্রই না মনে হয় । আবার যখন
ঝঞ্ঝাবাতে সেই বৃহৎ জাহাজকে আন্দোলিত করিয়া চল
মগ্ন করিয়া থাকে তখন ঝড়ের শক্তির নিকট জাহাজ
কত তুচ্ছ তাহা বুঝিতে পারি ।

ঝড় বৃষ্টির সময়ে সুদৃঢ় অট্টালিকায় বসিয়া নিকট
কুটীর কিম্বা বৃক্ষরাজ্য বসতিস্থ হইতে দেখিলে মনে
হয় আমরা প্রবল শক্তিশালী অট্টালিকার আশ্রয়ে নিরাপদ
নিরাপদে রহিয়াছি । কিন্তু যখন ঐ অট্টালিকাটী এক
কামানের গোলায় ভূমিসাৎ হইতে দেখি, তখনই উপলব্ধি
হইয়া থাকে আমাদের কামানের শক্তির নিকট
অট্টালিকার শক্তি কত নগণ্য ।

শিশুকালে আমাদের গ্রাম্য স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়কে
বড়ই পরাক্রমশালী মনে হইত, কিন্তু স্থল পরিদর্শনের
জন্ত সব-ইন্সপেক্টর বাবু আসিতেছেন শুনিলে পণ্ডিত
মহাশয়ের তেজও হীন প্রভ হইয়া পড়িত । প্রবল
শক্তির সম্মুখে দুর্বল শক্তি সর্বদাই এইরূপ বস্তুক
অবনত কারয়া থাকে ।

এখন আমরা রাজশক্তি কি ? সে সম্বন্ধে এক

আলোচনা করিব। বর্তমানে সমবেত ব্যক্তিগত শক্তির প্রয়োগকেই রাজশক্তি বলা যায়। আদিম অবস্থায় মানব শক্তির মধ্যে যে অপরকে পরাজিত করিয়া বশীভূত করিতে পারিত, সেই রাজ্য হইত। ইতর প্রাণীর মধ্যে এইরূপ এই প্রথা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মানুষ কিম্বা হস্তাযুগের মধ্যে বলবন্তমই সেই দেশের রাজ্য হইয়া থাকে। কিন্তু বর্তমানে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা নিজেদের মধ্যে হইতে এক-অন্যকে রাজ্য নির্বাচন করিয়া হয়। এই রাজ্য কোন ২ দেশে যথোক্তরূপে চলিতে থাকে এবং আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে কতিপয় বৎসরের জন্য একজন নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তাহাকে রাজ্য না বলিয়া প্রেসিডেন্ট বলা হয়। এইরূপ নির্বাচনের অর্থ কি? লোকের ব্যক্তিগত শক্তিকে রক্ষা করিয়া পরিপূর্ণ ও পরিবর্তিত করার জন্যই এই রাজ্য নির্বাচন। রাজ্য দেশের ধন বল, জনসংখ্যা, ও জ্ঞান বল বৃদ্ধি করিয়া থাকেন অথবা অন্য কথায় বলিতে গেলে দেশের বল দ্বারা সমাজের বল এবং সমাজের বল দ্বারা লোকের ব্যক্তিগত বল বৃদ্ধি করেন। এই সকল বল বৃদ্ধি করিতে কৃষি বাণিজ্য শিল্প ও বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতি করার প্রয়োজন। কৃষিজাত জীবের দ্বারা ব্যক্তিগত শক্তি রক্ষিত হইয়া থাকে, অর্থ বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কৃষির দ্বারা উৎপন্ন বস্তু আহাৰ করিয়া লোকে জীবনধারণ ও শারীরিক পুষ্টি সাধন করে, কৃষিজাত তুলা প্রভৃতি দ্বারা বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় এবং তাহা দ্বারা মানুষ সজ্জিত হইতে আশ্রয় রক্ষা করিয়া থাকে। এই লোক বল রক্ষাই সমাজ অথবা দেশের বল রক্ষা। সেইরূপ বাণিজ্যের দ্বারা দেশে অর্থ ও বাতাদি নানাবিধ জীব্যের আদানানি হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় প্রকৃতি দুর্লভ খাত্ত বিশেষের প্রতি সত্য অগ-
ত্যাগ প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই মূল্য বান খাত্ত সম্পদই অর্থ বল।
যদিও এই সকল খাত্ত বাহার যত অধিক, সে অপরকে
জয়িত্ত পরিবর্তে মান্যরূপ কার্যে খাটাইয়া লইতে
সক্ষম অথবা উহার পরিবর্তে বল সঞ্চয়কারী অপর জিনিস
অধিক করিতে পারে। কোন ২ অসত্য জাতির মধ্যে এই
ইউরোপীয় প্রতি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় না এবং

তাহারা অনেক সময়ে স্বর্ণ রৌপ্যের বিশেষ মূল্য বৃদ্ধিতে
পারে না। আমেরিকা প্রকৃতি দ্বানে যখন ইউরোপের
লোক প্রথম পদার্পণ করেন, তখন ঐ সকল দেশের প্রাচীন
অধিবাসী বৃন্দ প্রচুর স্বর্ণাদির পরিবর্তে কেবল মাছ
তাহাদের জীবন ধারণোপযোগী বস্তু গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট
থাকিত।

যুদ্ধের সময়ে এই অর্থ বলটি বিশেষরূপে উপলব্ধি করা
যায়। যে রাজ্যের অর্থবল অধিক, তিনি যুদ্ধের সময়ে
অর্থ দ্বারা অধিক সৈন্য নিযুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু
সে সময়ে দেশে জন বলেরও প্রয়োজন হয়। রাজ্যের সৈন্য
কিছু জনবল সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করার জন্য প্রচুর খাদ্য ও
বস্ত্রের প্রয়োজন এবং তাহাতে অর্থ কিম্বা কৃষি বাণিজ্যের
প্রয়োজন। অস্ত্রাদি সংগ্রহের জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং
শক্তিশালী যন্ত্রাদি আবিষ্কারের জন্য অর্থ ও জ্ঞানের
প্রয়োজন।

এইরূপে যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে এক দেশ অপর দেশের
শক্তির হিসাব করিয়া থাকে। শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা
কত, কামান কত, বন্দুক কত, যুদ্ধ জাহাজ কোন জাতীয়
কয় খানা, বিমান পোত কয় খানা, বাত সস্তার বাক্স
গোলা ইত্যাদি নানা রূপ শক্তির হিসাব করিয়া বোট
শক্তি নির্ণয় করা হয়। এই শক্তি যদি ফুট টন (Foot-
ton) কিম্বা অশ্ব বল (Horse Power) দ্বারা স্থির করা
সম্ভব হইত তবে তাহাই করা হইত। ইহাকেই বলে
রাজশক্তি। এই শক্তিদ্বারা প্রজা শাসিত ও পালিত হইয়া
থাকে। রাজ্যের অধীনে যে সকল বড় ২ প্রজা বা জমি-
দার থাকেন, তাহাদের বলও ঐ প্রকারে নির্ণিত হয়।
বাহার যত ধন সম্পত্তি তিনি তত বলিয়ান। অর্থাৎ
প্রয়োজন হইলে তিনি ধন ও সম্পত্তির দ্বারা শক্তি ক্রয়
করিতে পারেন। কিন্তু যত দিন তাহাদের ধন সম্পত্তি
রাজশক্তি দ্বারা সংরক্ষিত তত দিনই তাহাদের বল
থাকে।

ঔগামী রেল গাড়ীর যে শক্তি, অতিকায় কাবা-
নের যে শক্তি, কিম্বা বিশাল বিদ্যুৎগারে ডিম্বাঘোর যে
শক্তি এই রাজ শক্তিও ঠিক সেইরূপ।

ধন সম্পত্তির শক্তি তত দিনই বর্তমান থাকে যতদিন

আমরা উহাদের বিনিময়ে অপরের শক্তি ক্রয় করিতে পারি। যদি এই পৃথিবীতে আমি একটি মাত্র প্রাণী বর্তমান থাকি এবং আমার পক্ষত প্রমাণ ঘন বহু থাকে কিংবা আমি সমস্ত পৃথিবীর রাজা হই, তখন আমার শারীরিক শক্তি ভিন্ন আর কিছুই পরিমিত হইবে না।

জীব জগতে প্রতি বৃহত্তেই আমরা এক মাত্র শক্তির কার্য দেখিয়া থাকি, কেহ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে, কেহ বা অপরের শক্তি ধ্বংস করিতেছে।

শক্তি প্রতিহত না হওয়া পর্যন্ত আমরা উহা উপলব্ধি করিতে পারি না। যখন একটি প্রস্তর খণ্ডকে ভয় করিতে প্রচুর শক্তি প্রয়োগ করি তখনই আমরা ঐ প্রস্তরকে শক্ত বলিয়া থাকি।

শক্তির পরিণতি উদ্ভাপ। যখন একটি প্রস্তর খণ্ডের উপরে লৌহ দণ্ড দ্বারা আঘাত করি তখনই উদ্ভাপের উদ্ভব হয় এবং উভয়ের সংঘর্ষ গুরুতর হইলে তাহা হইতে অগ্নিকুলঙ্গ নির্গত হয়।

প্রস্তর খণ্ড শক্ত বলিলে আমরা ইহাই বুঝি যে প্রস্তর খণ্ডের অস্থসকল একরূপ প্রবল আকর্ষণে একত্র যে উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রবলতর শক্তির প্রয়োজন।

শক্তি ও উদ্ভাপ এক বস্তু না হইলে আমরা শক্তিকে উদ্ভাপে পরিণত করিতে পারিতাম না। এক বস্তু অবস্থা বিশেষে নানারূপ আকার ধারণ করে, ইহা আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই। জল, বাষ্প ও বরফ এক জলেরই অভিব্যক্তি।

জগতের বহির্দেশেও শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। দেখা যাক পণ্ডিতগণ পৃথিবী সৃষ্টি সম্বন্ধে কি বলেন। এই সৌরজগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে দুইটি অভিমত আছে। অনন্ত আকাশে আমরা সৌরজগতের গ্রহ ভিন্ন অগণিত নক্ষত্র দেখিতে পাই, এই এক একটি নক্ষত্রকে এক একটি সৌরজগৎ কল্পনা করা হইয়া থাকে; ইহাদের প্রত্যেকটি আমাদের সূর্য্য মণ্ডলের মত তেজপিণ্ড বিশেষ এবং ইহাদেরও গ্রহ উপগ্রহ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা সকলেই ভেত বিকীরণ করিতেছে। এই তেজেরও প্রকটা সীরা আছে। কোটি ২ বৎসর পরে হয়ত

কোন কোনটা নীতল হইয়া নিভেজ হইয়া পড়িবে এবং কতকগুলি হয়ত নিভেজ হইয়া এক নীতল জড়পিণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে। পণ্ডিতগণ আশঙ্কা করেন আমাদের সৌরজগৎও একদিন ঐরূপ নীতল পিণ্ডে পরিণত হইবে। সৌরজগতের মত নক্ষত্রেরও একটি গতি আছে। এই গতিশীল দুইটি জড়পিণ্ড অর্থাৎ নির্দিষ্ট পিতৃ সূর্য্য যদি পরস্পর সংঘর্ষে আসে তাহা হইলে সেই প্রবল আঘাতের ফলে উভয়টি প্রচ্ছন্নিত হইয়া উঠিবে এবং তাহার ফলে নব সৌরজগৎ উদ্ভাসিত হইবে। সংঘর্ষের ফলে ক্ষুদ্র ২ অংশ সকল যাহা বিচ্ছিন্ন হইবে তাহাই গ্রহ উপগ্রহে পরিণত হইবে। হয়ত এইরূপ সংঘর্ষের দ্বারাই আমাদের সৌরজগতের উদ্ভব হইয়াছে। ক্রমে ক্ষুদ্র খণ্ড নীতল হওয়াতে আমাদের পৃথিবী বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে এবং তাহাতে উদ্ভিদ ও জীব সজ্জ হইয়াছে। অগ্নিময় পৃথিবী যখন নীতল হইয়া কয়, হুল ও বায়ুতে পরিণত হইল, তখন হয়ত কোন নৈসর্গিক কারণে জল রাশির উপরে ভাসমান আত ক্ষুদ্র উদ্ভাদির সৃজন হইয়াছিল—ইহাই পণ্ডিতদের মত। এই উদ্ভাদি হইতে উদ্ভিদ জগৎ এবং তৎপরে জীব জগতের সৃষ্টি হয়। জীবগণের খাদ্যাদির দ্বারা জীবন ধারণের সম্ভব উপাদানই প্রত্যক বা পরোক ভাবে উদ্ভিদ প্রদান করিয়া থাকে। কাজেই জীবনধারণের উপাদানের পরেই জীবের সৃষ্টি সম্ভব। উদ্ভিদ জীবন সম্পূর্ণ রূপে সূর্য্যের উপরে নির্ভর করে। কাজেই বলিতে হইবে উদ্ভিদ ও জীব-জগৎ সমস্তোভাবে সূর্য্যের দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের যে তেজের দ্বারা ইহাদের উৎপত্তি, আবার সেই তেজেই উহারা পরিণত হইতে পারে। অপূর্ণ কথায় বলিতে গেলে তেজ বা শক্তিতে বাহার উৎপত্তি আবার সেই শক্তিতেই উহা পরিণত হইতে পারে।

আর একটি অভিমত এই যে অনন্ত নীহারিকাপুঞ্জ হইতে এই সৌরজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। তেলোময় বর্য়্যমান নীহারিকাপুঞ্জ কোন কারণে নীতল হইয়া নক্ষত্র-রূপে প্রকৃতি গ্রহাদি সমন্বিত সৌরজগতের উদ্ভব করিয়াছে। এবং সূর্য্যের শক্তি হইতে পৃথিবীর উদ্ভিদ ও জীব উৎপন্ন হইয়াছে।

আমরা কেবল মাত্র জড় জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি এবং আমাদের আলোচনা তাহাতেই সন্নিবর্তিত থাকিবে। হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন পঞ্চভূতের দ্বারা এই জড় জগৎ গঠিত, এবং পঞ্চভূতেই তাহা বিলীন হইবে। কিন্তু বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বহুবিধ মূল পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছে এবং বিজ্ঞান বিদগণ বলেন এই বহুবিধ মূল পদার্থ হইতে পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট। এখন কোনটা যে সত্য তাহা কে বলিবে? পক্ষেত্রয়ের অল্পভূতি সাপেক্ষে পঞ্চভূত, ইহা বুঝতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। আভিধানিক শব্দের দ্বারা ক্ষতি অথবা ভুল না বুঝিয়া শব্দ স্পষ্ট দ্বারা বুঝিলে ভাল হয়। বাহ্যিক পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য উভয় মতেই কোন না কোন রূপে মূল পদার্থের উল্লেখ আছে। ইহা বিজ্ঞান সম্মত যে এক একটি মূল পদার্থে এক তৃতীয় অল্প সন্নিবর্তিত। রাসায়ন শাস্ত্রে এই অল্পের বর্ণনা রহিয়াছে।

ইহাও রাসায়ন শাস্ত্রের একটি সুগম সত্য—যখন দুই কি ততোধিক বস্তু রাসায়নিক ভাবে সংমিশ্রিত হয় তখনই তাপের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং আবার উহা বিচ্ছিন্ন হইতেও তাপ উৎপন্ন হয়। কাজেই রাসায়নিক পদার্থ মাত্রেরই তাপ বা শক্তি নিহিত আছে—ইহা একরূপ অবিচ্যুত।

পরিদৃশ্যমান জগতের বস্তু সকলকে অল্পরাশির সমষ্টি বলা বাইতে পারে। অথবা অল্পরাশি একরূপ শক্তি বলে পরস্পর জ্বলিত বা সংকলিত হইয়া একটি বস্তুর সৃষ্টি করে। কাজেই একটি বস্তু গঠিত হইতে ও শক্তির প্রয়োজন, আবার উহার অল্পসকল বিচ্ছিন্ন করিতেও শক্তির প্রয়োজন। অতএব বলিতে পারা যায়, আমরা পৃথিবীতে কেবল শক্তির ক্রিয়াই দেখিতেছি।

এবং পরমাণুর সমষ্টিতেই অল্প বলা হইত, কিন্তু বর্তমানে পরমাণু হইতেও অল্পতর ইলেকট্রনের আবিষ্কার হইয়াছে। তাবায় বুঝাইতে হইলে ইলেকট্রনকে ইলেকট্রনিস্টার অল্প বলা বাইতে পারে। আমরা সৌরজগতে যে রূপ গ্রহগণকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূর হইতে পর্য্যবেক্ষণে বেগে অবিরত প্রদক্ষিণ করিতে দেখি সেইরূপ একটি পরমাণুকে একটি সৌরজগতের সহিত

তুলনা করা বাইতে পারে। কারণ একটি পরমাণুর মধ্যকে কেন্দ্র করিয়া উহার চতুষ্পাশ্বে লক্ষ ২ ইলেকট্রন নক্ষত্র বেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই ভ্রাম্যমান ইলেকট্রন সমষ্টিতে আমরা একটি পরমাণু বলিয়া থাকি; ইহাতে যাহা কিছু আরোপ করা যায় সমস্তই বস্তু সংস্কার বহির্ভূত। তাহাদিগকে ধরিবার ছুইবার যো নাই। ইলেকট্রনকে আমরা পূর্বেই ইলেকট্রনিস্টার অল্প বলিয়াছি এবং এই বিভ্রান্ত কোন রূপ জড় পদার্থ নহে। আজ পর্য্যন্ত যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় বস্তু সকলের অল্প বহুত্ব-সম্মত, এবং বিভ্রান্ত একরূপ শক্তি মাত্র। আমরা বস্তু জগতের দিকে প্রবেশ করিলেও অনন্তের দিকে দাবিত হই। পরিদৃশ্যমান বস্তু জগৎ ক্রমে অদৃশ্য হইয়া শক্তিতে পরিণত হয়। অল্প কিছু সময়ের জন্য অস্তিত্ব বিকাশ করে কিন্তু পুনরায় উহা শক্তিতে পরিণত হইয়া উহার অস্তিত্ব লোপ পায়। বস্তু বাহ্য দেখা যায়, তাহা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু বাহ্য অদৃশ্য তাহা অনন্ত। জগতের বহির্দেশে কি অভ্যন্তর, দেশে যে খানেই প্রবেশ করি, আমরা এক অসীম অনন্ত শক্তির সন্ধান উপলব্ধি করি। সেই শক্তি হইতে সমস্ত দৃশ্যমান জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং এই শক্তিকেই আমরা অনন্ত প্রসবিনী মহাশক্তি বা আত্মাশক্তি বলিতে পারি। হিন্দুগণ শক্তিলাভের জন্য এই আত্মা-শক্তিরই পূজা করিয়া থাকেন। আমাদের দৃশ্য জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সর্বত্রই শক্তির কাজ দেখিতে পাই। কেবল মাত্র ইহা রূপভেদে বিভিন্ন নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। মানুষ কেহ স্বপ্ন জড় শক্তির জ্ঞান লাগায়িত, কেহবা চৈতন্য রূপী স্বপ্ন মহাশক্তির আরাধনা করিতেছেন। এ বাবৎ যতদূর বুঝা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, একমাত্র শক্তি-তেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা শক্তিতেই বিলীন হইবে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত ।

অশ্রু-মালা।

বাদানী

কিম্বকিনে বাস, কর্ণে কারু,
হাড় ক'ধানি, ষাণ্ড সাবু,
ডিল্লী-পাগল, চাকরি-জীবী,
চাইরে আবার দবীচ্ শিবি।

মাড়োয়ারী

হস্তে লোটা, মস্ত জোয়ান,
মান অপমান সবই সমান,
লক্ষপতি, অল্প পড়া,
যাবজীবন বাবসা-করা।

সহরে কেরাণী

ছোট বাসা, অনেক লোক,
খুব ষাটুনি, দুঃখ শোক!
চিংড়ি মাছ, নানান শাক,
ঠিক তিরিশে ঘন্টার ডাক!

চাষা

পাটের টাকা, ষাটুর নাচ,
পাতলা ধূতি, মাংস মাছ,
পোয় বহু, হাণ্ড যুগ,
শক্ত দেহ, চওড়া বুক।

অতীত

প্রচুর ধোরাক, শান্তি গভীর,
উদার প্রীতি, পূণা সমীর,
সবাই ভ্যাগী, ধর্ম-জীবন,
নিখুঁৎ মাহুদ, লগৎ পাবন!

বর্তমান

ভাতের অভাব, জুলুম জ্বর,
দীর্ঘা কাটা দিন ছপহর!
'ধর্মাবতার, চরণ চুমি?'
হারিয়ে আবার জন্মকুঁহি ॥

ভাস্কর

'মা'র কলেরা'—'ভিটি কই?'
'গেগেই দেবো'—'বাদশা নই।'
'তাত কোটেনা'—'যাক না ম'জর'।
'ভাস্কর: বাবু-!'—'দাঁড়াও স'রে।'

নব্যা কিশোরী

পৃষ্ঠে বেগী, সেমিজ শাড়ী,
পুন্পিত বুক, দেমাক ভারী,
পায় পাছুকা, চাটনি মিঠে,
জুঁইয়ের কুঁড়ি, কপের ছিটে।

নব্যা বিধবা

লম্বা টেড়ি, চটুগ কথা,
উপকাসে বিহ্বলতা!
দিন যামিনী স্বপ্ন দেখা,
স্বর-সাধনা একা একা।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

গবেষণা।

যার যাহা প্রাপ্য নয় তাকে সেই জিনিষ দান করা
বাক্যে ধরচ হ'তে পারে কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চ
সম্মানের পদে বসানোটা যে সেই ব্যক্তিকেই
প্রকারান্তরে অপদস্থ করা, সে কথা বলা নিতান্তই
নিম্নপ্রয়োজন। কিন্তু সংসারে এমন লোকেরও অভাব
হয় না, যিনি নিজের অযোগ্যতা অস্বীকার করে সেই
সম্মানের আসনকেই প্রাপ্য অধিকার বলে গৌরব
করতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না।

আমাদের প্রফেসর চ্যাটার্জির স্বভাবটা ছিল ঠিক
এই প্রকার। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে তিনি কিছু
কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কার করে লোকের প্রয়োচনার
সেবার নোবেল পুরস্কারের জন্য চেষ্টা করে 'পাই পাই'
করে পেলেন না বটে কিন্তু দেশের লোক তাঁর
মন্তকে যে সম্মান-লাজাজলী বর্ষণ করল তাতে তিনি
খুসীই হলেন এবং এমন একটা ভাব প্রকাশ করলেন,
যাতে করে বোঝা গেল যে তাঁর কৃত্তিক বৃদ্ধিতে পারে
তেমন যোগ্য লোক ইউরোপে খুব কমই আছে।

তিনি বিপন্নীক। বোম্বাইয়ের এক ছোট গুলিতে তাঁর দ্বিতল বাড়ী, সেই বাড়ীরই এক অংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ছোট একটি ল্যাবরেটরী স্থাপন করে তারই ভিতর তিনি রাতদিন বসে বসে মাথা ঘামিয়ে থাকেন।

সেবার মাঘ মাসে ভয়ানক শীত পড়েছিল। ১১ই সকাল বেলা প্রফেসার চ্যাটার্জি একখানা কবল মুড়ি দিয়ে বৈঠকখানা ঘরে বসে একটা দৈনিকের উপর দিয়ে চোখ বুজিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ডাকপিয়ন এসে তাঁর হাতে একটা পার্শেল দিয়ে গেল। পার্শেলটা দেখতে খুবই ছোট এবং হাল্কা ছিল। কিন্তু যখন পোষ্টাফিসের ছাপের উপর নজর পড়ল তখন তিনি কিছুতেই আর অবাক না হয়ে থাকতে পারলেন না। দেখলেন পার্শেলের উপর তাঁর বাড়ীর পাশেই যে পোষ্টাফিস রয়েছে তারই ছাপ মারা, কিন্তু কোথা হ'তে কে পাঠিয়েছে তার কোনো নাম গন্ধই নেই। দেখে তিনি কৌতুহাসিত হয়ে ভাবতে বসে গেলেন—“এই ত বোম্বাইয়ের সিগ দেখতে পাচ্ছি, পোষ্টাফিস আমার বাড়ী থেকেই বেনী হয়ে নয়—মোটো পঁচমিনিটের পথ, তবে এই এত কাছে থেকে পার্শেলটা ডাকে ফেলবার কি দরকার ছিল? যিনি এটা পাঠিয়েছেন, তিনি এই পথটুকু হেটে এসে নিজেই আমার বাড়ীতে এটা দিয়ে যেতে পারতেন?”

সুতরাং ভেবে ভেবে তাঁর মনে ভারি খটকা লেগে গেল, জরুজিত করে পার্শেলটা চোখের নিকটে এনে খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন এবং ধীরে ধীরে মোড়ক খানা খুলতে আরম্ভ করলেন। যখন কাগজখানা খোলা হয়ে গেল তখন প্রফেসার অবাক হয়ে দেখলেন—ছোট একটি বাস—রূপোর তৈরি বলেই মনে হয়, কিন্তু তেমন ভারি নয়—অতি হাল্কা। দেখে তিনি কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলেন না; সঙ্গে কোন কাগজ পত্রও ছিল না, সুতরাং কে পাঠিয়েছে এবং কি উদ্দেশ্যেই যে পাঠিয়েছে, তা তাঁর উর্বর বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক কিছুতেই নির্ণয় করতে পারল না। তিনি তখন অতি লক্ষণে বাসখানা তাঁর ল্যাবরেটরীতে নিয়ে গিয়ে একখানা ভালো ম্যাগনিকারার দ্বারা পরীক্ষা করতে

বসে গেলেন। প্রথমেই তাঁর চোখ পড়ল—বাক্সের ডালার যেন অস্পষ্ট কি লেখা রয়েছে, সবটুকু পড়া যায় না। অনেক চেষ্টার পর এই কটা অক্ষর শুধু ধরতে পারলেন—“২৭২ ম ধ আ স ক”—তখন তাঁর মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল, কল্পনার চোখে একটা নতুন আবিষ্কারের পথ দেখতে পেয়ে আশার আলোকে তাঁহার মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠল; তিনি ঐ লেখা থেকে এই পাঠোদ্ধার করলেন যে—এই জিনিষটা সেই অতীত যোগের অশোকের আমলের নিশ্চয়—কালের প্রভাবে অনেক লেখা মুছে গিয়ে থাকবে কিন্তু তারিখটা যে একেবারে মিলে গিয়েছে—২৭২ সাল। তারপর ও যে টুকু পড়া যাচ্ছে তাতে “মগধ” এবং “আশোক” কথা দুটি স্পষ্ট ধরা পড়েছে। প্রফেসার চ্যাটার্জির মুখে তখন একটা আনন্দের হিল্লোল খেলে গেল, এমন একটা বাস এমন অদ্ভুত ভাবে তার কাছে এসে পৌঁচেছে এবং ক্ষুদ্র হ'লে ও যে সেটা পৌরাণিক হিসাবে সামান্য নয়, সে কথা ভেবে আপাদকন্তক তাঁর পুলকানন্দে নৃত্য করে উঠল।

তখন তিনি ঐ বাক্সের নীচের দিক থেকে খানিকটা খায়গা কেটে নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসে গেলেন। বিশ্লেষণের ফলে দেখতে পেলেন, উহার ভিতর যে সব জিনিষ রয়েছে তা অতি আশ্চর্য জনক—মাটির মত জিনিষ অথচ আমাদের এই চোখের সামনে যে মাটি রয়েছে এ ঠিক তার মত নয়, এ মাটিতে চূণের ভাগই বেশী এবং আবাদন করে দেখলেন, তাতে মিষ্টবাদও কিছু কিছু আছে।

প্রফেসার চ্যাটার্জি একবার পাটনা গিয়েছিলেন, সেখান থেকে পাটালিপুত্রের নূতন আবিস্কৃত নগরের ভাঙ্গা দেয়ালের খানিকটা মাটি তিনি একটা কোটার করে নিয়ে এসেছিলেন। দেখলেন—সেই মাটির সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। তখন তাঁর দৃঢ় ধারণা জন্মে গেল যে, এ বাসটা নিশ্চয় সেই অশোকের আমলের না হয়েই পারে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই—বাসটা প্রফেসার চ্যাটার্জির ঘরে আসা মাত্র তার সঙ্গে সঙ্গে নানা অশান্তি উপস্থাপ

যেন এসে তাঁর ঘরে ঢুকল। পার্শ্বদ-বাঁধা ছেড়া কাগজ ও হুতাগুলি বধন তিনি টেবিল থেকে ফেলে দিতে বাবেন তখন হাতে লেগে একটা ওষুধের শিশি পড়ে ভেঙে গেল। সেই শিশিতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে যা তৈরি করেছিলেন তা'তে তাঁর পূরা ভ্রমাস অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল—কিন্তু এক মুহুর্তে আজ সেই সব পরিশ্রম পণ্ড হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেই বস্তুটা অতি সতর্কপণে তুলে নিয়ে তিনি শয়ন ঘরের দিকে রওনা হ'লেন কিন্তু দরজার কাছে গিয়েই হঠাৎ খেয়ে এমন ভাবে পড়ে গেলেন যে হাতের কজিটায় ভয়ানক আঘাত পেলেন। পতন শব্দে বাড়ী ঘর ফেঁপে উঠলো দেখে ভয় খেয়ে ভৃত্য রামসিং তাড়াতাড়ি ছুটে এল। তার হাতে কতকগুলি চাএর বাসন ছিল, সেগুলি হাতে করেই সে ছুটে এসেছিল, দরজা পর্যন্ত যেতেই প্রফেসার চ্যাটার্জি কপাট খুলে টলতে টলতে একেবারে তার ঝড়ে গিয়ে পড়লেন। রামসিং সে চোট সাম্মাতে সাম্মাতে তার হাতের বাসনগুলি পড়ে গিয়ে একেবারে চুরমার হয়ে গেল।

বা হোক—এই পতন ও ভাঙনের পালা শেষ হলে পর ডাক্তার এসে প্রফেসার চ্যাটার্জির হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেল। চ্যাটার্জি তখন তাঁর কয়েক জন বৈজ্ঞানিক বন্ধুর নিকট এই অদ্ভুত ব্যঙ্গের কথা উল্লেখ করে চিঠি লিখতে বসে গেলেন এবং পরদিন বিকাল বেলা তাঁর বাড়ী এসে সেই ব্যঙ্গ দেখতে এবং পরীক্ষা করে মতামত জানিয়া যেতে আহ্বান করে পাঠালেন।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা প্রফেসার চ্যাটার্জির বাড়ীতে বৈজ্ঞানিকদের এক প্রকাণ্ড বৈঠক বসে গেল এবং নানা পরীক্ষা ও কল্পনা কল্পনায় রাত দশটা বেজে গেল। বৈজ্ঞানিকগণ আসল জিনিষটি যে অতি খেলো তা টের পেলে ও বাবার সময় সকলেই একবাক্যে রহস্য করে এই মত প্রকাশ করে গেলেন যে—এ ব্যঙ্গখানা বাস্তবিকই সেই অভীত যুগের—সেই রাজা অশোকের আমলের জিনিষ এবং পৌরাণিক হিসাবে সত্যি সত্যি এ অতি অমূল্য সামগ্রী।

সে রাত্রেই কলিকাতার উপর দিয়ে ভীষণ ঝড় বয়ে গেল, শীতকালে এমন ঝড়ঝড় কেউ কখনো দেখেনি। বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়েছে—গোলাঘর আর একটাও দেখা যাচ্ছে না—অনেক পুরোণো দালান পর্যন্ত ধসে পড়েছে। সকাল বেলা দেখা গেল, প্রফেসার চ্যাটার্জি ইট সড়কীর ভিতর থেকে বেড়িয়ে আসছেন—তাঁর শোবার ঘরের একটা দেওয়াল ভেঙে পড়েছিল। অনেক বেলা হয়ে গেল—ক্ষুধায় তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন; কিন্তু খাবার নিয়ে কেউ এলনা দেখে নিজেই রান্না ঘরে গিয়ে দেখলেন রামসিং পালিয়েছে। ফিরে এসে ভাঙ্গা আলুয়ারীর ভিতর থেকে সেই ব্যঙ্গখানা সাবধানে বাইরে এনে হাতে নিয়ে ধপন দেখলেন, উহা ঠিকই আছে, কোন অংশই একটুও নষ্ট হয়নি, তখন তাঁর মুখে এই অতি কষ্টের সময়ও একটা স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা যে কখন কোথার অন্তর্ধান করল তা টেরও পাওয়া গেল না।

সেদিনই তিনি সহরের সবগুলি দৈনিক ঐ ব্যঙ্গ সম্বন্ধে বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দিলেন। ক দিন পরই এক সাহেব, প্রফেসার চ্যাটার্জির লাবরেটরীতে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন—“কালকাতা হেরল্ডে আপনার ব্যঙ্গের কথা পড়ে আমি সেটা কিনে নিয়ে যেতে এসেছি। রেজুন গভর্ণমেন্ট মিউজিয়ামের সুপারিনটেন্ডেন্ট আমাকে ঐ ব্যঙ্গখানা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে টেলি পাঠিয়েছেন।” প্রফেসার চ্যাটার্জি তখন গম্ভীর ভাব ধারণ করে বললেন—“কিন্তু আমার ত ঐ ব্যঙ্গ বিক্রী করার তেমন কোন তাড়া নেই।” অগত্যা চোখ দুটা বড় বড় করে বললেন—“আমরা প্রচুর অর্থ এর জন্য দিতে প্রস্তুত আছি। বিজ্ঞাপনে যে রকম দেখলাম—আমাদের কাছেও ঠিক তেমনি আরেকখানা ব্যঙ্গ আছে—মাণ্ডারের এক বহু পুরোণো মন্দির থেকে আমরা সেটা সংগ্রহ করেছিলাম। আশ্চর্য্য এই, আজ পর্যন্তও কেউ সেখানার ঐ তহাসিক কাগ নির্ণয় করে উঠতে পারল না—কেউ না। আমি খুব আশা করে এসেছি, আপনি নিশ্চয় আমাদের নিরাশ করবেন না। আমরা দুটো ব্যঙ্গ মিলিয়ে দেখতে চাই।

তা ছাড়া পত্নীমেন্ট থেকে আপনার এই বাস্তবানার জন্য এক হাজার টাকা মঞ্জুর হয়ে গেছে। মনে রাখবেন— এক হাজার টাকা।”

এফেসার চ্যাটার্জি সে কথা শুনে প্রথম তাঁর কান দুটোকে বিশ্বাসই করতে পারলেন না; ধানিকরণ চূপ করে থেকে শেষে আমতা আমতা করে বললেন—“হাঁ— তা—এই দেখুন—বাস্তবটা বিক্রী করবার আমার তেমন ইচ্ছা নেই—আর তা ছাড়া দেখুন— জিনিষটা ঠিক আমার নিজেরও নয়—পার্শ্বলি এসেছে— কে পাঠিয়েছে, তাও জানিনে—হয়তো কেউ এসে এটা হাবী করতে পারে। তা—হাঁ—অপেনি নিজেও কেন একবার ভেবে দেখুন না।”

আগন্তুক একটু ভেবে নিয়ে বললেন—“তা বেশ ত, আপনি এক কাজ করুন; সব কাগজে আজই একটা নোটিশ দিয়ে দিন—হুদিনের ভিতর যদি কেউ এসে হাবী না করে, তাহলে আপনি আমাদের কাছে সেটা বিক্রী করে ফেলবেন।”

এফেসার চ্যাটার্জি খুসী হয়ে বললেন—“আচ্ছা তাই করা যাবে। আর দেখুন—আপনাদের যখন ওরকম আরো একখানা বাস্তব রয়েছে—বৈজ্ঞানিক এবং পৌরাণিক কৌতূহলের দিক থেকে দেখতে গেলে এ বাস্তবানাও আপনাদের হাতেই পৌছা দরকার। তা হ’লে দেখুন— হুদিন পর আপনি এসে খবর নেবেন।”

আগন্তুক খুসী হয়ে বললেন—“আচ্ছা তাই হবে।”

বিজ্ঞাপন ছাপা হ’ল—হুদিন কেটেও গেল, কিন্তু কোথা হ’তে কেউ কোন দাবী দাওয়া করে পাঠাল না। বাস্তবটা তখন বাংলায় মুদ্রক ছেড়ে মগের মূল্যে চলে গেল।

হু দিন পর এফেসার চ্যাটার্জি তাঁর ছোট ভাই সতীশের বাড়ী থেকে এক নিমন্ত্রণ পেলেন—সে দিন রাতে তাঁকে সেখানে আহ্বান করতে হবে। সতীশ বাবু হাইকোর্টের উকিল। সম্ভাব্যে কোর্ট থেকে ফিরে এসে খানা ছাড়ছেন, এমন সময় এফেসার চ্যাটার্জি সেখানে উপস্থিত হয়ে বলে উঠলেন—“কেমন হে সতীশ, তুমি আজো শুভে “পাও নি? আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য। সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগত আজ যা নিয়ে তোল পাড় করছে, তাঁর

কোন খবরই রাখ না?” তারপর সেই বাস্তবটার কথা উল্লেখ করে—কেমন ভাবে সেটা তাঁর কাছে এল—সে যে কি রহস্যময় ব্যাপার। পরীক্ষা করেই বা কি অদ্ভুত জিনিষ আবিষ্কার করলেন এবং শেষটার এক হাজার টাকার সেটা কোথায় কা’র কাছে বিক্রিয়ে গেল, সে সব কথা একদমে গড়গড় করে বলে যেতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর সাত বছরের ভাইপো রুহু হঠাৎ ঘরে ঢুকেই বলে উঠল—“জ্যাঠামশাই, আজ যে আমার জন্ম দিন!” এফেসার চ্যাটার্জি একেবারে যেন স্বপ্ন থেকে উঠেছেন এমন ভাব প্রকাশ করে বললেন—“আজ তোমার জন্মদিন! ওঃ—আমি ত সে কথা একদম ভুলে গিয়েছিলুম। আচ্ছা, যাহোক আমি কাল নিশ্চয়—” কথা আর শেষ হ’ল না, রুহু তা’র জ্যাঠামশাইর শূন্য হাত ও পকেটের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে চিৎকার করে কঁদে উঠল।

কাল্মা শুনে তার দিদি লতিকা এসে কাল্মা ধামাবার চেঁচা করে বলল—“ছিঃ—আজ জন্মদিনে বুদ্ধি এমন করতে আছে? জ্যাঠামশাই কাল তোমাকে নিশ্চয় জন্মদিনের উপহার এনে দেবেন।” রুহু তবু ধামে না। জ্বর করে সে বলল—“কেন জ্যাঠামশাই ভুলে গেলেন?” লতিকা বলল—“তাকে যে আরো ঢের ঢের কাজের কথা ভাবতে হয়—তোমার জন্মদিনটি শুধু মনে করে রাখলে তো আর তাঁর চলে না।”

তবু রুহু জোর করেই বলতে লাগল—“না না, তাঁর নিশ্চয় মনে হওয়া উচিত ছিল।” লতিকা হেসে বলল—“আরে পাগল! ভুই যাতা করে লিখে দিলেই তাঁর মনে হবে নাকি?” রুহু তখন কাল্মা ধামিয়ে বলল—“কেন হবে না। আমি তো তারিখই লিখে দিয়েছিলুম—তবু কেন তিনি ভুলে গেলেন?”

এফেসার চ্যাটার্জি সে কথা শুনে চিন্তিত ও বিচলিত হ’য়ে উঠলেন—কখন যে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা কিছুই তাঁর মনে পড়ল না। শেষে ভয়ে ভয়ে তিনি রুহুকে প্রশ্ন করলেন—“কি বলছ? মনে করিয়ে দিয়েছিলে? কিছুই যে আমার মনে পড়ছে না?” রুহু তখন এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল—“কেন?

আমরা যে একটা পার্শেল পাঠিয়েছিলুম—যদিও একটা পুরোণো বাজ ছিল—তার উপর বাবা যে চুকট খান তারই রূপালি কাপড়, চুণ ময়দা চিনি দিয়ে আঠা তৈরি করে দিদি লাগিয়ে দিয়েছিল, আমি তার উপর লিখে দিয়েছিলুম—“১৭ই মাঘ” তবু কেন ভুলে গেলেন?”

প্রফেসর চ্যাটার্জি তখন যেন একেবারে আকাশ থেকে ধপাস করে এই পৃথিবীতে এসে পড়লেন—তার সব কথাই তখন মনে পড়ল এবং মনে পড়ল—ঝুঝুর এই খেলার বাজটা নিয়ে কি কাণ্ডই তিনি করে বসেছেন! এতক্ষণ পরে যেন তার স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল—মাথাটা নেড়ে খুব জোরে এগুটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—“ওঃ—আমি যে ঐ বাজট বহুদূরে পাঠিয়ে দিয়েছি—

তখন তার ভয় হতে লাগল, যদি এই বহুদূর প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে আর কেলেঙ্কারীর সীমা থাকবে না—তার সব স্মৃতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সব যশ যে একদিনে বাষ্পের স্রাব বাতাসে মিলিয়ে যাবে, তার এতদিনকার গৌরবের স্বর্গাসন এক মুহূর্তে যে ধূলায় লুপ্ত হইবে পড়বে। তিনি ভাড়াভাড়ি ঝুঝুরকে কাছে টেনে এনে তার পিঠে ও মাথায় হাত বুলিয়ে চুপিচুপি বললেন—“হাঁ হাঁ—সব কথা আমার মনে পড়েছে—কিন্তু ভূমি সে বাজের কথা আর কিছু বোলো না—কিছু না, কারো কাছেই না। আমি একুণি ঘাচ্ছি তোমার জন্ত খেলনা কিনে আনতে—কি আনব বল? কি চাই তোমার?”

আনন্দে ঝুঝুর চোখ কলসে উঠল—নেচে উঠে সে বলল—“জ্যাঠামশাই, খুব বড় দেখে একটা কাঠের ঘোড়া—ছোটো বেলে আর সুন্দর দেখে একখানা ছবির বই আমার এনে দিন।”

প্রফেসর চ্যাটার্জি তৎক্ষণাৎ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন—মাথাটা তার রিমঝিম করতে লাগল। পথের দুধারে গ্যাসের আলো জ্বলছিল—সেই আলো-হাওয়ার ভিতর দিয়ে অজ্ঞানত ভাবে যেতে যেতে তার মনে হ’তে লাগল—পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়েই তরুণ যুগ্ম গবেষণা থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রয়োজন। সেই গবেষণার অভাবেই আজ এ পৃথিবীটা তাহার নিকট অগ্নয়ন ধাঁধার মত বোধ হচ্ছে এবং সেই ধাঁধার ভিতর তিনি যেন আজ বন্ধ্যাবিষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ।

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্য

ভাস্করাচার্য্য।

ভাস্করাচার্য্য একজন বিখ্যাত ভারতীয় গণিতবেত্তা ও জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। ইহার পিতার নাম ছিল মহেশ দৈবজ্ঞ। দাক্ষিণাত্যের সহ পূর্বভাগে পাদদেশে বিজয়রবিড় নামক গ্রামে ১০৩৬ শকে অর্থাৎ ১১১৪ খৃষ্টাব্দে ভাস্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। অত্যন্ত জ্যোতির্বিদ হইতে তাঁহার একটু বিশেষত্ব ছিল। ব্রহ্মপুত্রের স্রাব তিনিও উজ্জয়িনীর মান মন্দিরের সর্বপ্রধান জ্যোতির্বিদ ছিলেন। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের চারিটি অধ্যায় ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের লীলাবতী নামক প্রথম অধ্যায়ে পাটীগণিত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বীজগণিত, গ্রহগণিতাধ্যায় নামক তৃতীয় অধ্যায়ে জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় নামক চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ত্তমানমতি আলোচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি অধ্যায়ে গণিত আলোচিত হইয়াছে। ইহার পুত্রের নাম লক্ষ্মীধর ও কন্তার নাম লীলাবতী। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে তদীয় প্রিয়তমা কন্তা লীলাবতীর নামানুসারেই তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রথম ভাগের বা পাটীগণিতের নামাকরণ করিয়াছেন। ভারতে স্বর্বা সিদ্ধান্তের পরেই সিদ্ধান্ত শিরোমণির স্থান।

জ্যোতিষতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থখানা লিখিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইহার খ্যাতি আরব দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভাস্করাচার্য্যের আবিষ্কার সমূহ সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলেও আরবগণ প্রায় সর্ব বিষয়েই ঐ গ্রন্থসিদ্ধ ও অনামখ্যাত জ্যোতির্বিদকে অনুসরণ করিতেন। ভাস্করের আবিষ্কার ও প্রণালী সমূহ এইরূপে খৃষ্টাব্দ দ্বাদশ শতাব্দী অতীত হওয়ায় পূর্বেই ইউরোপে প্রবেশ লাভ করিয়া সুপরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মূল গ্রন্থ আধুনিক যুগেই তথায় নীত হইয়াছে।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনগর হইতে প্রকাশিত “পেনি

সাইকোপেডিয়াতে" বীজগণিতের (Vija Ganita) আলোচনা করা হইয়াছে। কোলকক ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লীলাবতী ও বীজগণিতের (Lilavati and Vija-Ganita) অনুবাদ করিয়াছেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে উইলকিন্সন (L. Wilkinson) সাহেব কলিকাতা হইতে জ্যোতিষ ও বর্জুলমিত্তির অনুবাদ ইংরেজিতে মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

পুস্তকখানা সংস্কৃত ছন্দে লিখিত। কিন্তু গণ্ডে ইহাদের ভাষা লিখিত আছে। জ্যোতিষ ও গণিত সম্বন্ধে ভাস্করের যে জ্ঞান জন্মিয়াছিল তাহা মৌলিক কি অপরের নিকট হইতে গৃহীত, তৎসম্বন্ধে অনেক ইরোরাপীয় পণ্ডিতের সন্দেহ আছে। তাঁহারা অনুমান করেন যে ভাস্করাচার্য্য আবরীয় ও মিশরীয় জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণিত শাস্ত্রে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বীজগণিত যে আরব গণের এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের বীজগণিত হইতেও অনেকাংশে প্রেষ্ঠতর তাহা কেহই স্বীকার করিতে পারেন নাই। ইহার ত্রিকোণমিত্তি ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিকোণমিত্তি হইতে উৎকৃষ্টতর।

জ্ঞান দেবতাসম্মতীকে প্রণাম করিয়া ভাস্কর লীলাবতী আরম্ভ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত স্তোত্র হইতে ভাস্কর কৃত গ্রন্থের বিষয়-নিচয়ের আভাস পাওয়া যায়। প্রথমে বিভিন্ন ওজন ও পরিমাপের ধারা, সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দশমিক প্রণালী। তৎপর যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগহার, বর্গ ও ঘনপরিমাণ, এবং বর্গমূল ও ঘনমূল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার পর দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশকে সাধারণ হরবিধিষ্ট করণ, ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ, মিশ্র সংখ্যা, এবং পূর্ববর্তী আট নিয়ম বৈকল্পে ভগ্নাংশে প্রয়োগ করিতে হয় তাহার উদাহরণ, $ক + ০ = ক$, $০ - ০ = ০$, $১ - ০ = ১$, $\frac{ক}{ক} = ১$ দুই বা ততো-

ধিক সমীকরণের সূত্রসং সমাধান (simultaneous equation of first order) ও তাহাদের প্রয়োগ বিধি ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে। তৎপর দ্বিতীয় মানের সমীকরণ (quadratic equation) সমাধান, ত্রৈয়াশিক ও চতুর্য়াশিক, সূত্রকথা ডিক্রিট, ও যৌগ কারবারের

প্রণালী, চৌবাচ্চা ও নলের অক্ষ, বিনিময়, সমান্তরশ্রেণী ও সমান্তরশ্রেণীর যোগফল (Arithmetical ও Geometrical progression), ত্রিকোণ ও চতুর্কোণের অক্ষন, কতকগুলি ত্রিকোণমিত্তির সূত্র (formula), ঘনপরিমাণ ও দল নির্মাণ (combination) ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

আমরা ভাস্করের গ্রন্থেই দশমিক প্রণালীর সূক্ষ্মজ্ঞমতে বিকাশ ও সৌষ্ঠব সর্ব প্রথমে দেখিতে পাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে সম্ভবতঃ আর্থা ভট্ট ও ভাস্করাচার্য্য উভয়েই দশমিক প্রণালী জানিতেন। তবে ভাস্করের জ্ঞান সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার গ্রন্থেই সর্ব প্রথম আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে শূন্যকে ১ হইতে ৯ পর্যন্ত অঙ্ক শ্রেণী মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে।

সংক্ষেপতঃ—বলিতে গেলে আমরা বর্তমানে পাটীগণিতের যে যে নিয়ম ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার সমুদয়ই লীলাবতীতে সূক্ষ্মজ্ঞরূপে লিপিবদ্ধ আছে। তাহার প্রণালী প্রায়ই দশমিকে প্রকাশিত।

আর্থাভট্ট, ব্রহ্মস্পতি ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি ভারতীয় জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিৎ পণ্ডিতগণের গ্রন্থাবলী হইতে তৎসং সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আমরা একটি কোতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের উল্লেখ করিতেছি। দাস দাসীর মূল্য সম্বন্ধে ভাস্কর কয়েকটি প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। কথা প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে বোড়শ বর্ষ বয়স্ক দাসীই সর্বাপেক্ষা বেশী মূল্যবান। বোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পর ইহাদের মূল্য বয়সের অনুপাত অনুসারে কমিয়া যায়। যেমন ১৬ বৎসর বয়সের সময় একটি দাসীর মূল্য ৩২ নিষ্ক হইলে ২০ বৎসর বয়সের সময় ইহার মূল্য কত হইবে? $\frac{১৬}{২০} = \frac{ক}{৩২}$ $\therefore ক = \frac{১৬ \times ৩২}{২০} = \frac{৪ \times ৩২}{৫} = \frac{১২৮}{৫} = ২৫ \frac{৩}{৫}$

তাহার সময়ে দুই বৎসর কার্য্য করিয়াছে এইরূপ আটটি বাঁড় দ্বারা বোড়শ বর্ষ বয়স্ক একটি দাসী খরিদ করিতে পারা যাইত। তখন টাকার সূচ্য প্রতি মাসে শতকরা ৩০ হইতে ৬০ টাকা ধারে চলিত।

ভাস্করের বীজগণিত একরূপ একটি শাস্ত্র (শ্লোক) দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে যে তাহা দ্বারা ধর্ম্মনীতি, দর্শন ও গণিত এই তিন শাস্ত্রেরই এক এগটি সত্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ইহাতে বাহ্যদ্রব্য আছে বটে! এই গ্রন্থে বিশ্লেষণের সাধারণ নিয়মগুলি লিখিত হইয়াছে। কোন শব্দের প্রথম অক্ষর সংক্ষেপতঃ ঐ শব্দের জন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাস্কর যোগ ও বিয়োগের সূচক সংক্ষিপ্ত চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু তাহার পুস্তকে গুণন, সমান ও অসমান প্রকৃতির চিহ্ন নাই। এগুলি চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ না করিয়া অক্ষর দ্বারা লিখিত হইয়াছে। কোন ভগ্নাংশের লব ও হরের মধ্যস্থিত অংশ জাপক রেখা নাই। অজানিত সংখ্যা সমূহের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। বিভিন্ন রঙের প্রথম বর্ণ দ্বারাই অজ্ঞাত সংখ্যা (যেমন ইংরেজী x) জ্ঞাপন করিয়াছেন। সমীকরণের বাম ও দক্ষিণ দিক পরস্পর উল্লিখিত লিখিত হইয়াছে। ইহাতে যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল, শূন্য সিদ্ধান্ত (Rules of cipher), সমীকরণ, ও মূল সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত (Operations of surds = মৌলিক) প্রকৃতি প্রায় সমুদয় প্রান্ত্রেই সুন্দরী যুবতী ও বীর পুরুষের অবতারণা করিয়া বিষয়টি সহজে আয়ত্তে আনিবার উপায় করিয়াছেন।

এখানে আর একটি কোতূহলপ্রদ বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের নিউটন ও ফ্রান্সের লিব্‌নিটজ্ আপনাদিগকে যে সূক্ষ্মমানগণিত ও সমাহার গণিতের (Differential and integral calculus) আবিস্কর্তা মনে করিয়া ৯ বৎসর পরস্পর কণড়াকরিয়াছিলেন, সেই সূক্ষ্ম মানগণিতের আভাস খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাস্কর তাহার গ্রন্থে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাহার ত্রিকোণমিতির একটি সূত্র আমাদের নিম্ন লিখিত Formulaর সমান; যথা, $d(\sin Q) = \cos Q dQ$ ।

আরবগণ আর্ধ্যভট্ট ব্রহ্মগুপ্ত এবং তাহার পরবর্তী জীধর (আচার্য্য) ও পরশুরাম প্রকৃতি গণিত ও জ্যোতিষ

বিশারদ পণ্ডিতগণের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাস্করের এই উন্নততম গ্রন্থের সদ্যবহার তাহার কঠিতে জানিতেন বলিয়া বোধ হয় না।

বৈদেশীক পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, যে সময়ে ভারতের সঙ্গে আরবের প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যের আদান প্রদান চলিতেছিল তখন (প্রায় ৩০০ খৃষ্টাব্দে) আরবগণ দেখিতে পাইয়াছিলেন যে ভারতীয় বণিকগণ তাহাদের কাগজ পত্রে সংখ্যা ব্যবহার করিতেছেন। সুতরাং ঐ সময়েই আরবীঘেরাও ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৭৭৩ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে কতকগুলি সারণী (Astronomical Tables) বোম্বাদে নীত হইয়াছিল। তখন হইতেই আরবগণ দশমিক প্রণালী ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

খ্রীঃশ্রবশচন্দ্র চক্রবর্তী।

সঙ্কলন ও সংগ্রহ.

বিমান মার্গে ট্রাম।

ক্যালিফোর্নিয়ার লবণপূর্ণ উপত্যকায় বিমান মার্গে তার দ্বারা যে ট্রামওয়ে স্থাপিত হইয়াছে তাহাই পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট ট্রামওয়ে। জনমানব শূন্য স্থানে ঐ লবণ উপত্যকা বর্তমান। ট্রাম হইবার পূর্বে রেলের মালগাড়ীর দ্বারা ত্রিশ দিবসে বহু কষ্টে লবণ আনা হইত। কিন্তু এখন ৭০০ পৌণ্ড লবণ ঘরে এমন বালতিতে লবণ আনা হয়। ঐ বালতিগুলি পরস্পর শিকল দ্বারা রেলের গাড়ীর দ্বারা সংযুক্ত হইয়া শূন্য দিয়া আইসে। ৬০০০, ৭০০০ ফিট উচ্চ হিত তারের উপর দিয়া বৈজ্ঞানিক কলে এই বালতিগুলি চালান হয়। এই শূন্য মার্গটি ১২২ মাইল দীর্ঘ দুই ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে বৈজ্ঞানিক বলে লবণ উপত্যকা হইতে ক্যালিফোর্নিয়ার পোর্টল্যান্ড দ্বারা তারটি যেখানে খুব উর্দ্ধে উত্থিত, সেই স্থানটি উপত্যকা হইতে ৪৪০০ ফিট দূর।

কুস্তীরের কার্য্য।

আমাদের দেশে রাতার নর্দমা পরিষ্কার করিবার কার্য্য যেখন বালক দ্বারা সম্পন্ন করান হয়। নর্দমা হইতে

কার্কিনাদি অন্ন বাষ্প ও অজ্ঞাত দোষিত বাষ্প উৎপন্ন হয়, সেই বিবাক্ত বাষ্পে অনেক বালকের প্রাণ নাশ হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকায় বালকের পরিবর্তে কুস্তীর দ্বারা ঐ কার্য্য সংসাধিত হয়। কুস্তীর শীকার লব্ধ বেতন করা শীকারী আমেরিকার পুষ্ঠ বিভাগে নিযুক্ত আছে। তাহারা কুস্তীর ধরিয়া জলপূর্ণ বহন বহন পায়ে রাখিয়া দেয়। প্রয়োজন মত কুস্তীরকে নর্দমা মধ্যে ছাড়িয়া দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে নলদ্বারা নর্দমায় প্রচুর পরিমাণে জল দিতে থাকে। কুস্তীর নর্দমার কর্দম বহন করিয়া লইয়া যা়।

মোটর বাঁশী ।

জাপানের কিউটো পুষ্ঠ বিভাগের কার্যালয়ে ১২টার সময়ে ভোপ দাগিবার পরিবর্তে মোটরের বাঁশী ব্যবহার করা হয়। উহা ৭০ ফুট দীর্ঘ ও পিতল নির্মিত। উহাই লগতে দীর্ঘতম বাঁশী। উহা কোয়ালকি বন্দরের কারখানায় প্রস্তুত। বাঁশীটি কিউটো নাগরের সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপিত। দ্বাদশ ঘণ্টার শক্তি বিশিষ্ট একটি বৈজ্ঞানিক মোটর দ্বারা পরিচালিত হয়। কার্যালয় হইতে বৈজ্ঞানিক শক্তি সাহায্যে ১২ টার সময়ে সঙ্কেত করা হইলেই পাইপ দ্বারা ঐ বাঁশীর মধ্যে বায়ু চালিত করা হয়; তখন শত বজ্র পতনের ত্রাস শব্দ শুনা যায়।

মধুমক্ষীর দৌত্য ।

যুদ্ধে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য পূর্বে অনেক স্থানে পারাবতের ব্যবহার ছিল। এখন পারাবতের পরিবর্তে মধুমক্ষিকার দ্বারা ঐ কাৰ্য্য সুসম্পন্ন হয়। মধুমক্ষিকাকে মধুচক্রের মধ্যে রাখিয়া লালিত পালিত করে। এবং যেখানে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে তথায় ঐ মধু চক্রের কিয়দংশ ও উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট পুষ্প রাখা হয়। মধুমক্ষিকার পক্ষে অল্প বীক্ষণিক যন্ত্র সাহায্যে সঙ্কেতিক সংবাদ লিখিয়া মক্ষিকা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মক্ষিকা সেই স্থানে গেলে অল্পবীক্ষণ সাহায্যে সংবাদ পাঠ করা হইয়া থাকে।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় ।

মিলনের বাধা ।

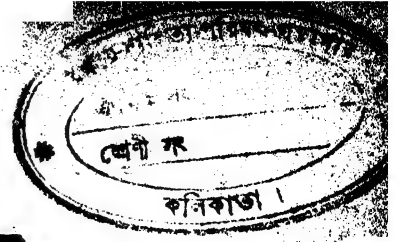
দূরেতে রহিলে হিয়া মাগে দরশন ;
মিলনে চাহিয়া থাকি, মাহি মিটে সাধ ।
সহসা বিরহ নিয়ে দুঃখ-শিহরণ
প্রণয়ের তটে তটে গাঁধে শিলা বাধ ।
প্রাণ ত হয়নি খোলা ভূষা অগ্নি-গিরি ।
পুড়িছে অন্তর নিত্য অনল উগারি ।

শ্রীদীননাথ মজুমদার, এম, এ ।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

পৌণ্ড বর্দ্ধন ও করতোয়া—শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ড প্রণীত, মূল্য একটাকা। গ্রন্থ থানা পৌণ্ড বর্দ্ধন এবং করতোয়া—এই দুইটি অংশে বিভক্ত এবং এক এক অংশে চারিটি করিয়া অধ্যায়। পৌণ্ড বর্দ্ধনের আদি কথা ও অবস্থান, পৌণ্ড দেশের বিবরণ, ঐতিহাস ও ঐশ্বর্য্যাদি এবং পৌণ্ড বর্দ্ধন বা মহাস্থানের আধুনিক অবস্থার ইতিহাস—প্রথম অংশে, এবং করতোয়ার প্রাচীনত্ব ও গঙ্গার সহিত করতোয়ার সম্বন্ধ, পুরাণে করতোয়া, করতোয়া মাহাত্ম্য, করতোয়ার গাত, বাণিজ্য, করতোয়ার ক্ষুদ্রত্বের কারণ, অধুনা করতোয়া ও দেশের অবস্থা—দ্বিতীয় অংশে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার শাস্ত্র গ্রন্থাদি ও ঐতিহাসিক প্রমাণ পর্যালোচনা করিয়া এই গ্রন্থখানা লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুসন্ধানের প্রসংসা করিতেছি। এইরূপ গ্রন্থ যত অধিক প্রকাশিত হইবে, ততই সাহিত্যের সম্পদ ও দেশের গৌরব বৃদ্ধির কারণ হইবে।

সাবিত্রী—শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসী প্রণীত, মূল্য একটাকা। কবি-গ্রন্থকারীর রুপসী পড়িয়া একদিন যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাঁহার সাবিত্রী পড়িয়াও আজ সেইরূপ মুগ্ধ হইয়াছি। পাঁচটি সর্গে এই কাব্যগ্রন্থ রচিত, পাঁচটি সর্গই কাব্য মাধুর্য্যে ও লিপি কৌশলে অলঙ্কৃত। ছাপা, কাগজ, বাঁধাইও সুন্দর।



সৌরভ

অষ্টম বর্ষ ।

ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩২৭ ।

সপ্তম সংখ্যা ।

নববর্ষ ।

নববর্ষের প্রভাত-রবির প্রথম-অভ্যাস ছায়াঘন-অরণ্যের
শিখে আসন্ন হইয়া আসিল। সমস্ত-জগৎকার ভেদ করা এই
নব অভ্যাস কি উদার ! কি গরিমাময় !

দেখিতে দেখিতে সমস্ত গগন পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া
জ্যোতিপুঞ্জ বিশ্ব-পৃথিবীর উপরে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল—
একটি মহোজ্জ্বল আলোক বিশ্বের হৃদয়কে স্পর্শ করিল,
একটি হৃদয়গত আত্মান তুমার-নীতগ পর্বতের শিখরে
শিখরে, গহন-বনানীর শিখে শিখে, বিকাশোন্মুখ কুসুম
বীধিকার লীর্ধে লীর্ধে, তুণে তুণে, শপে শপে, দিকে
দিগন্তে স্তম্ভিত হইতে লাগিল—এই আত্মান বাণী—সেই
চিরনবীন বাণী—নববর্ষের জাগ্রত-দেবতার সানন্দ
অভিবাদন !

এই বাণীত বার্ষ হইবার নয় ; তাইত আজ ইহারই
প্রেরণায় সমস্ত জগত জাগ্রত হইয়া উঠিল—বিশ্বের নিগূঢ়
মর্ম্মকোষের সমস্ত সুপ্ত সঙ্গীত সক্রিয় মুচ্ছনায় বহ্নত
হইয়া উঠিল—সেই হৃদয়গত ক্ষণিকের প্রতিধ্বনি !

তাইত আজ এই কোয়েল দয়েলের কণ্ঠে কণ্ঠে
সুললিত কল-সঙ্গীত, পুষ্পবনরীর স্তবকে স্তবকে অজস্র
লাবণ্য-বিকাস, কুহ-কুহরিত আশ্রবনে মঞ্জরিত মুকুলের
আমোদনী-সুরভি ।

ঠিক তেমনি একটি জ্যোতির্ময় আত্মান, একটি
অবাক্ত বেদনা, অনন্ত আকাশ হইতে, বিশ্বমানবের
অবরুদ্ধ হৃদয়-বারে আসিয়া কণ্ঠাঘাত করিয়া বলিতেছে,—

“খোল্-রে, দুয়ার খোল্-।”

এ যেন প্রতিদিবসের জরাজীর্ণ পুরাতন মর্ত্যলোকের
পুরোভাগে স্বর্গের চিরনবীন অপূর্ণ দিব্যবাণী—

“খোল্-রে, দুয়ার খোল্-।”

বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ, চলিয়া বাইতেছে ;
তবুও ত মানব-হৃদয়ের—রুদ্ধতার উন্মাদিত হইল না ।
যুগযুগান্তর ধরিয়া তাই সমস্ত আকাশ একটি অনবচ্ছিন্ন
ক্রন্দন নিনাদে মুখরিত হইতেছে—

“হায় বিশ্ব-মানব আজো জাগিল না ।”

বিশ্বপ্রকৃতি জাগিয়াছে ; মাঠে মাঠে কত শস্য, কত
ভূগ বরিংশোভায় বিশ্বলোক উদ্ভাসিত করিতেছে, অরণ্যে
অরণ্যে কত সবুজপত্র পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে ; কান্দনে
কান্দনে কত সুগন্ধ কুসুম প্রফুল্লিত হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু
হায়, বিশ্ব-মানবের হৃদয়-কুসুম আজো ফুটিল না । হায়
ফুটিল না ।

কিন্তু মানব হৃদয়ের বিকাশ কি পুষ্পবিকাশের মত
এতই সহজ, এতই সরল ! তাহার সার্থকতার বাধা কি
একটি ? তাহার কীট কি একটি ? তাইত কতশত
সুসুমার-হৃদয় কত বার্ষিক, কত প্রগতি-কীটের দারুণতম
দংশনে তাহার সমস্ত অবিকশিত লাবণ্য লইয়া বার্ষিকতার
ককরাণীর্ণ দুলিতলে বিগুপ্তিত হইতেছে । শত শত
মানবাত্মার অন্তরতম মহত্ত্ব, প্রগতিবেগের হুর্কিসহ ভাঙনার
শোচনীয়তম নিষ্ফলতার পর্যাবসিত হইতেছে ।

কিন্তু তথাপি আমরা কি কখনো দেখিনাই শতশত
বাধা ও প্রতিকূলতার পাষণপ্রাকার বিদীর্ণ করিয়া মানব-
হৃদয়ের অন্তরতম উৎস কি দুর্ধবার আবেগে-সমুৎসাহিত
হইয়া উঠিয়াছে—দেখি নাই কি মাঝম তাহার সমস্ত বহ্নত

বিদূর্ণ করিয়া কি পরিপূর্ণ বিভূষিতার সহিত মুক্তির
মানন্দে আপনাকে উৎসৃষ্ট করিয়া দিয়াছে, দেখিনাই কি
—মাহুব অপরাধিত বীর্ঘ্য ও অপ্রতিহত প্রতাপে তাহার
জীবন প্রবৃত্তির উচ্চত আন্দোলনকে চিরতরে নিরস্ত
করিয়া দিয়াছে—দেখিনাই কি মাহুব সমস্ত স্বার্থ সুখ
মিলক্ষন দিয়া, অর্থ—সম্পদ তুচ্ছ করিয়া অকুণ্ঠিত কণ্ঠে
এই অমৃত বস্তু উচ্চারণ করিয়াছে,—

“বেনাহং নামৃতান্তান্ কিমহং তেন কুৰ্য্যাম্ ।”

আমি জানি, মানবত্বের বিকাশের পথে পদে পদে
কত গুণ্ড, কত বিপত্তি ; কিন্তু তার চেয়েও আরো বেশী
জানি,—যে মাহুব সমস্ত বাধার উপর দিয়া, তাহার
বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। আমি জানি মাহুবের
অহংকার তাহাকে তুচ্ছতম সুখ দুঃখের পথে অহরহঃ
পরিচালিত করিয়া তাহার উচ্চতম আশা ও সংকল্পকে
ব্যর্থ করিয়া দিতেছে ; কিন্তু তার চেয়েও আরো বেশী
জানি, যে মাহুবের রিপু যতই প্রবল হউক, সে তাহার
অহিমাকে কিছুতেই ব্যর্থ করিতে পারিল না,—মাহুব
কঠোরতম দুঃখে ও তীব্রতম প্রায়শ্চিত্তে আপনার দুর্দ-
বীর রিপুকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া মহত্বের মহনীয় শিখরা-
শিখরে আপনার যাত্রাপথ প্রশস্ত করিতেছে। আমি
জানি যে মাহুবের মাধার উপর দিয়া শত দুঃখের, ঝটিকা
বহিয়া বাইতেছে—শত বিপদ শত মৃত্যুর সুবিপুল গর্জনে
জীবন করণ, বধির হইয়া বাইতেছে ; কিন্তু তার
চেয়েও আরো বেশী জানি, যে মাহুব আপনার মাহুবত্বের
মানন্দেই মৃত্যুকে, দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছে, শত
বিপদ বজ্রের প্রলয়রোলের ভিতর দিয়া, শত উত্তত
জন্মের গভীর নির্ধোনের ভিতর দিয়া তাহার চরমতম
মহত্বের পরমতম আনন্দাভিসার যাত্রা যুগ হইতে যুগান্তর
পর্যন্ত বিদূর্ণ করিয়া চলিয়াছে।

আজ সেই বহুবাহুর স্মরণান্বিত দুঃখদুর্গম পন্থায়
বাহির হইবার জন্য এই নবরোজবিভাসিত আকাশে
স্নানতপ্ত পখনে আলোক আসিল—সে আলোক সমুদয় মর্ম-
প্রতি বিদূর্ণ করিয়া অস্তরের অন্তরে আসিয়া পৌঁছিল।

ওরে যাত্রী ! আর কত কাল সুখের লালসায় আলস
বিহার করিতে রহিবি ! বাহির হইতে আলোক আসিয়াছে
“উজ্জ্বল ! প্রস্তুত !” আর ত বোহতপ্রায় বয় থাকিবার

দিন নাই। বাহিরের চিরপ্রতিশ্রুত বেদনা সমস্ত বন্ধের
পঙ্করে আশ্রয় আশ্রয় করিতেছে।

ওরে যাত্রী ! ঐ শোন সমস্ত বিশ্বত্রদাণ্ডে সমস্ত
গ্রহে, নক্ষত্রে, তারকার অনন্ত যাত্রার বিজয়-সঙ্গীত
বাজিয়া উঠিয়াছে, আকাশের প্রতি বন্ধ পরিপূর্ণ করিয়া
তার অধীর মুচ্ছনা স্বকারিয়া উঠিতেছে ;—

নিখিল চরাচরের সেই যাত্রা কোন্ অনাদি অতীতের
ভোরণ দ্বার উল্লসিত করিয়া কত নব নব বিকাশের
সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া অনন্ত ভবিষ্যতের সুদূর দিগন্তের
অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়াছে :—তাহারি তালে তালে
তাল মিশাইয়া যাত্রা করিবার দিন আজ আসিয়াছে।
সমস্ত আকাশ তোর অভিমুখে তাকাইয়া আজ রুদ্ধ
নিশ্বাসে তাহারি প্রতীক্ষা করিতেছে।

ওরে যাত্রী ! অহংকার এই নববর্ষের নবপ্রভাত সেই
যাত্রার উদ্বোধন সঙ্গার করুক ! অনতিকাল পরে দিগ্বন্ধ
বিদূর্ণ করিয়া যে বিজয়দ্রুি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে, সেই
দারুণ দাবদাহের বন্ধ ভেদ করিয়া তোর যাত্রা-পথ
চলিয়া গিয়াছে। আজ যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে সেই যাত্রার
যোগদান করিতে পারি।

আজ যেন অতীত জীবনের সমস্ত অহংকার ও প্রবৃত্তির
অতিতুচ্ছ কোলাহল সম্পূর্ণ উপেক্ষার সহিত বিন্যস্ত
হইয়া উন্নত মস্তকে, ও উন্মুক্ত হৃদয়ে নববর্ষের
এই নব জাগ্রত আলোকটীকে বরণ করিয়া আমার
হৃদয় মন্দিরে আবাহন করিয়া লইতে পারি এবং বিশ্ব-
নিখিলের সহিত কণ্ঠে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, হৃদয়ে, সম্মিলিত
হইয়া এই আগমনী গান গাহিতে গাহিতে আমাদের
আনন্দ যাত্রা আরম্ভ করিতে পারি :—

“তেঃ উহ হ্মার, এসেছ জ্যোতির্ময়,

তোমারি হউক জয়।

ত্রিমির-বিদার উদার অভ্যাস,

তোমারি হউক জয়।

হে বিজয়ী বীর নবজীবনের প্রাতে,

নবীন আশার ঝড় তোমার হাতে,

জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর হাতে,

বন্ধন ধোক্ কর।

তোমারি হউক জয়।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

১লা বৈশাখ, ১৩২৭।

কাব্যের শিক্ষা।

কেহ কেহ হয়ত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিতে পারেন, কাব্যের আবার শিক্ষা কি? কারণ, কয়েক বৎসর হয় আশাদের সাহিত্যিক মহলে দুইটি বিভিন্ন মতাবলম্বী সমালোচক শ্রেণী দেখা যাইতেছে। একদলকে একান্ত সৌন্দর্য্যবাদী এবং অপরদলকে অতি-নীতিবাদী সমালোচক বলা যাইতে পারে। এক পক্ষের মতে—সুকুমার সাহিত্যের একমাত্র কার্য্য সৌন্দর্য্যস্থিতি ও তদ্বারা পাঠকের আনন্দবিধান, অপর পক্ষের মতে, কাব্যাকারের একমাত্র কর্তব্য শিক্ষাদান। একপক্ষ বলেন—কাব্য শুধু শিল্পচাতুরি, অপর পক্ষের মতে তাহা নিরেট গুরু-গিরি। এই সাহিত্যিক বন্দনা আমাদের দেশে নূতন আমদানি হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা তত নূতন নহে। রবার্ট ব্রাউনিংএর The Ring and the Book নামক কাব্য প্রকাশিত হইবার পর ইংরাজ সাহিত্যিক সমাজে এই প্রশ্নটাই উঠিয়াছিল। অতি-নীতিবাদীরা দল ঘোষণা করিয়াছিলেন যে যেহেতু উক্ত কাব্য পাঠক সমাজের জন্য দৃষ্টান্ত কোন শিক্ষা বহন করিয়া আনে নাই, অতএব তাহা কাব্য নামবাচ্য নহে। যোট কথা একপক্ষ তুলিয়া ধান যে কাব্য-রচনা একটা Art বা শিল্পকলা,—অন্য পক্ষ মনে রাখেন না যে প্রকৃত আর্ট, বিলাসবাসনার, ইন্ড্রিয়সেবার যন্ত্ররূপ নহে, পক্ষান্তরে তাহা মানব সভ্যতা ও সাধনার এক শ্রেষ্ঠ উপাদান,—মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের নিদান। কাব্যের বা শ্রেষ্ঠ উপ-ভাসের অব্যবহিত উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যস্থিতির আনন্দ বিধান বটে, কিন্তু সকল সৌন্দর্য্যস্থিতির মূলেই আরেকটা গূঢ়তর অভিসন্ধি নিহিত থাকে, যদিও ঐ সৌন্দর্য্যের দ্বারা উক্ত অভিসন্ধির অস্তিত্ব বিষয়ে দর্শক বা শ্রোতাকে সর্বদা সতর্ক রাখিয়া তাহার রসসম্ভোগের ব্যাঘাত ঘন্মান না। সুবিখ্যাত রসজ্ঞেরা কাব্য সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন বদ্বারা পূর্বোক্ত বিরোধের এই দীর্ঘমেসারই উপনীত হই।

গ্রীক দার্শনিক Aristotle ইতিহাস অপেক্ষা কাব্যের প্রাথমিক উপলক্ষ কাব্যাকর্গত যে 'Higher

Truth', 'Higher Seriousness'এর কথা বলিয়াছেন তাহাই শ্রেষ্ঠকাব্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় উদ্দেশ্য। আপাতচক্ষণ মানবজীবনের অন্তরতম কুব সত্যটির সন্ধান—মানুষের জন্ম মৃত্যু-কর্ম্মপ্রবাহের বধ্যকার গূঢ় বহুস্তরের অসঙ্গত সমাধান প্রকৃত কাব্যই আমাদের চিত্তফলকে অনায়াসে মুদ্রিত করিয়া দেয়।

কবি শেলীর মতে—Poetry is what redeems from decay the visitations of the divinity in man, and is the record of the best and happiest moments of the best and happiest minds—যাহা মানব-জন্মের দৈব প্রেরণাগুলিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া সঞ্জীবিত রাখে তাহাই কবিতা। সানন্দচিন্তা, নিঃসন্দেহ, মনীষাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠতম চিন্তা ও ভাবরাশির লিপিবদ্ধ ইতিহাসই কাব্য। ফরাসী ভাবুক Amiel বলেন—The true poetry is that which raises you towards Heaven, and fills you with divine emotions, which sings of love and death, of hope and sacrifice, and awakens the sense of the infinite.—প্রকৃত কাব্য মানুষকে স্বর্গের অভিমুখে উন্নীত করে, মনুষ্য জন্মকে পবিত্র ভাবদ্বারা অনুপ্রাণিত করে; প্রকৃত কবিতা প্রেম, মৃত্যু-আশা ও আত্মত্যাগের সুমহান সঙ্গীত, তাহা আমাদের অন্তরে অনন্তের অনুভূতি জাগাইয়া দেয়। মার্কিন দেশীয় কবিদার্শনিক এমার্সন "Poetry and Imagination" (কবিতা ও কবি-কল্পনা) নামক প্রবন্ধে বলেন :—

Poetry is faith...must be affirmative. It is the piety of the intellect. "Thus saith the Lord," should begin the song. The poet who shall use nature as his hieroglyphic must have an adequate message to convey thereby. He is the true Orpheus who writes his ode, not in syllables, but in man. * * The poet must let humanity sit with the muse in his head... should rejoice if he has taught us to despise his song; if he has so moved us as to lift us—

to open the eye of the intellect to see further and better.—কবিতা আধ্যাত্মিকতা হইতে অভিন্ন—কবি নাত্তিকতা নহে, কিন্তু আন্তিক্য বৃদ্ধির জনয়িত্রী হইবে। কাব্য মানব-মনীষার পূণ্যজ্যোতিঃ—মানব-মানসের অমৃতময় আধ্যাত্মিক ফল। “ভাগবতী কথা এই কবিতা শ্রবণ” এই বলিয়া কবি তাঁর সঙ্গীতের মুখবন্ধ করিয়াছেন। বর্ণবিদগ্ধ যেমন একপ্রকার সাক্ষাতিক বর্ণমালায় সাহিত্যে বর্ণভবের ব্যাখ্যা করিতেন, যে কবি সেইরূপে সাহিত্যপ্রকৃতিকে রহস্যময় বর্ণমালা-স্বরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে মানবজাতির জন্য উপযুক্ত কল্যাণ-কারী বহন করিয়া আনা অত্যাবশ্যক। প্রাচীন অফি-সালের জায় যে কবি সঙ্গীত প্রভাবে জড় অ-জড়, স্থাবর অস্থাবরকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে চাহেন তাঁহার কবিতা কল্প-পদার্থের সমষ্টি বা বাক্যাঙ্কুর মাত্র হইলে চলিবে না, তাহা মনুষ্য-হৃদয়ের জীবন্ত অঙ্গের ও ছন্দে গ্রথিত হইবে। কবির মানসপথে কাব্য-লক্ষ্মীর পার্শ্বদেশে বিশ্বমানবকে স্থান দিতে হইবে। কোন কবি যদি (তাঁহার সঙ্গীত প্রভাবে) আমাদের চিত্তকে একপাশায়ে লক্ষ্য করিয়া থাকেন বাহ্যতে আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-কান্দা এক উর্দ্ধতর লোকে উন্নীত হয়,—আমাদের মানস-স্রোতের দৃষ্টি সর্বলোকে ব্রহ্মমুখ হইয়া, সান্ত জড়ত্বের সীমা ছাড়াইয়া অনন্তের দিকে প্রসারিত হয়, তবে তাহাতে তাঁহার আত্ম-প্রসাদ অসুভব করা কর্তব্য, যতপি তাঁহার কাব্যের মহৎ শিক্ষার ফলে তাঁহার সমুদয় কাব্যকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার না করি।

আবার, আমাদের রসীকজনাথের মুখেও কাব্যের আসল তাৎপর্যের কথা উক্ত রূপে শুনি। যথা—

“কুন্তুম আপন পক্ষে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তব সম্পূর্ণ না হয়,—
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে।
কবি আপনার গানে বস কথা কহে,
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি;
তোমা পানে ধার তার শেষ অর্থ খানি।”

কবে, আমরা প্রার্থনা: তুলিয়া যাই কাব্যের ভিতর-

কার এই যে আনন্দময় শিক্ষা তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি, তাহার প্রণালী বর্ণন-শাস্ত্রের, বর্ণ-শাস্ত্রের কিবা ব্যবহারী শিক্ষক মহাশয়দের শিক্ষাপদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ বহুতর। শেখোক্ত প্রণালী হস্ততাবিহীন ভাবকের মত বিধি নিবেদ ও শাসনের তাড়নার দূর্ভাগ্য শিক্ষার্থীর হৃদয়-পদার্থটিকে পীড়িত করিয়া স্মৃতিক শলাকামুখে স্মৃতির বীজাঙ্ক আমাদের মানস ব্রাহ্মণ্ডে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে চাহে। পক্ষান্তরে, কাব্য-লক্ষ্মী সেবাপরায়ণা, সহস্রা ভাব্যার জায়, অথবা স্নেহময়ী জননীর জায় স্নেহকোমল স্পর্শে, আমাদের বাসনাদঙ্ক হৃদয়ে অমির প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া ভব-বেদনার উপশম করিতে চান।

কিন্তু একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক, কাব্যের যে পরম শিক্ষার কথা বলা হইল তাহা কাব্যাদ্যয়নের শেষ পরিণাম—তাহা কাব্য-পাঠকাত রস-সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে ও তাহারি ফলস্বরূপে, পাঠকের অজ্ঞাতসারে শারদীয় শিশির বিস্তার জায় নীরবে করিয়া করিয়া তাহার হৃদয়ের তলদেশে লক্ষিত হইতে থাকে। সাহিত্য-রসী মর্মে প্রকৃত কাব্য-পাঠের এই পরিণামকে “Unity of impression” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—“Unity of impression * * * * is the highest aim of all dramatic art, perhaps of all arts to produce.

* * The Sculptor, the painter, the musician have each their special means of producing this final and superlative impression.”—

রসের একত্ব, অখণ্ডত্ব, অর্থাৎ সমুদয় রসবৈচিত্রের সম্মিলনসঙ্গাত এক অখণ্ড পরম রসের উদ্ভাবনাই সকল নাট্যকলায়, সম্বৎসর: সকল ললিত কলায়ই প্রধান লক্ষ্য। ভাবার্থ-শিল্পীই বল, চিত্র শিল্পীই বল, কিবা সঙ্গীতপটু শ্রুঙ্গায়কের কথাই বল ইহায়া সকলেই এই একই সর্বোত্তম চরম রস-স্থিতির জন্য তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি বর্ণসঙ্গীত আর কবিতায় কোন প্রভেদ নাই? এ প্রশ্নের উত্তর উপরে কাব্যের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে তাহা হইতেই পাওয়া যাইবে। বর্ণ সঙ্গীত মাত্রই কাব্য নহে। যে সঙ্গীতের এক

বাক্য অথবা অব্যবহিত লক্ষ্য বৈরাগ্যের শিক্ষা দান,—
সংসার অনিত্য, দেহ অনিত্য, ঐহিক জীবনের সকল কর্ম-
চেষ্টা, আশা, আকাঙ্ক্ষা যুগত্বকাবৎ অলোক মায়া—তাহা
মানব ছদ্মবেশে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করে, আনন্দের
উদ্রেক করে না, এই সুখ-দুঃখ কর্মময় জীবনের অন্তরীণ
ব্যাপ্তি, ও আনন্দময় পরিণতির আশা জাগাইয়া দেয় না।
কিন্তু বাহ্য কবিতা তাহা মুখ্যতঃ আনন্দ দান করে। আন-
ন্দের আবার শ্রেণী তেজ আছে। ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্ত
হইতে মানসিক বৃত্তির তৃপ্তিসম্ভাতি আনন্দ শ্রেষ্ঠ, আবার
মানস সুখ অপেক্ষা অতীন্দ্রিয় আত্মার প্রসন্নতা শ্রেষ্ঠ। যে
কাব্য অপূর্ণ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া মানবাত্মাকে অনাবিল
আনন্দের সমর্যাবতীতে উন্নীত করে তাহাই একাধারে
শ্রেষ্ঠ কাব্য এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম সঙ্গীত। কারণ, এই যে আন-
ন্দের ভিতর দিয়া শিক্ষা তাহা মানুষ সমস্ত দেহ-মন আত্মা
দ্বারা সমস্ত জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে, কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের
যে বিধিনিষেধাত্মক শিক্ষা তাহা মানুষের উপর জোর
জুলুম করে, এবং সেই জন্য অনেক স্থলেই কার্যাকরী
হয় না। এক্ষণে “গীতার” একাদশ অধ্যায়ের বিধিরূপ
বর্ণনা, Bible-এর Psalms of David, St. Francis
এর পরমার্থ সঙ্গীত, Thomas A. Kempis এর
“Imitation of Christ,” বিজ্ঞাপিত চতুর্দশ প্রভৃতির
বৈক্যব পদাবলী, রবীন্দ্রনাথের “নৈবেদ্য” “গীতা-
ঞ্জলি,” “গীতমালা” প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কাব্য অথচ শ্রেষ্ঠ
ধর্ম সাহিত্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

প্রভাত।

(১)

হে উজ্জল! হে দীপ্ত প্রভাত!

বিদ্যারিমা রজনীর নিষ্ঠুর নীরব অন্ধকার,
বিকীরণ কিরণ তব তজ্জালস শিরের সবার—

হ'ল আকস্মিক;

হে উজ্জল! হে দীপ্ত প্রভাত!

(২)

নবোদিত তোমার আলোকে—

ভাতি' গেল গৃহে গৃহে গাঢ় অন্ধ যৌতজ্ঞাবেশ,
জাগিল বিশ্ব তরু উর্দ্ধগানে চাহি নির্নিমেষ

প্রতি লোকে লোকে,

নবোদিত তোমার আলোকে।

(৩)

জাগিয়াছে বিশ্বচরাচর,—

ধরণীর প্রান্তে প্রান্তে তাই কি অপ্রান্ত কল রোল
গগনের কোণে কোণে সঞ্চারিল জাগরণ বোল

বিহঙ্গ নিকর—

জাগিয়াছে বিশ্ব চরাচর।

(৪)

আনন্দ মধুর তব গান—

অনিয়াছে দিকে দিকে, জলে স্থলে, নীল নভস্তলে,
প্রান্তরে, কাঙারে; গাহে তরাঙ্গিনী মৃদু কলকলে—

কি উদাত্ত তান,

আনন্দ মধুর তব গান।

(৫)

হে সুন্দর, আসিয়াছ আজি।

প্রসন্ন সুত্তর হাথে প্রস্তুতি করি পৃথিবীরে,—
বসিয়াছ শান্তাননে প্রজ্জ্বল মলিন তরুণীরে—

তব সাজে সাজি'

হে সুন্দর! আসিয়াছ আজি।

(৬)

হে নবীন! হে চির সুন্দর।

তোমার লাবণ্য আজি লীলায়িত দিগ্ দিগন্তরে
তোমার আনন্দ আজি তরঙ্গিত সর্ব চরাচরে—

শান্ত! মনোহর!

হে নবীন! হে চির সুন্দর।

(৭)

এহি, এহি, হে দীপ্ত প্রভাত।

কদরে দেহিমে বীৰ্য্য, কান্তি দেহ, অঙ্গে দেহ বল,
উঠুক ভেদিয়া হৃদি শুভ্রোজল কোতিঃ শতদল,—

যাক কেটে রাত,—

হে উজ্জল! হে দীপ্ত প্রভাত।

ঐ:—

জ্যোতিষে অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার ।

আধুনিক প্রায় সকল শিক্ষিত লোকের মতেই “অদৃষ্টবাদ” আমাদের জাতীয় অবনতির অগ্রস্তম প্রধান কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ আমাদের জাতিটাকে একেবারে পঙ্গু ও নিশ্চেষ্ট করিয়া আধুনিক উন্নতিশীল জাতি সমূহের অনেক পশ্চাদবর্তী করিয়া দিয়াছে এবিষয়ে অনেকেই একমত। মায়াবাদ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়; অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে বিদ্যুৎ-কলিত জ্যোতিষের উপরই সকলে দোষারোপ করেন। অনেকেরই ধারণা কলিত জ্যোতিষ অদৃষ্টবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং স্বভাবতঃই তাহার দেশহিতৈষী প্রণোদিত হইয়া অদৃষ্টবাদ ও তাহার সহায়কারী কলিত জ্যোতিষে বিতৃষ্ণ। বস্তুতঃ হিন্দুর ধর্মপ্রবণতা ও তাহার আধুনিক ফল অদৃষ্টবাদিতা যে আমাদের জাতিটাকে অনেক পরিমাণে পঙ্গু করিয়া আধুনিক জড় বিশ্বে সত্যতার প্রতিদ্বন্দী হইতে বিরত করিয়াছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে দেখিতে হইবে জ্যোতিষ-এ বিষয়ে কতখানি সহায়তা করিয়াছে বা আদৌ সহায়তা করিয়াছে কি না? আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে কলিত জ্যোতিষ এই অদৃষ্টবাদকে প্রশ্রয়তো দেয়ই নাই বরং পুরুষকারের দিগেই, বেশী প্রোৎসাহিত করিয়াছে।

পূর্বজন্মার্জিত কর্মকেই এইজন্মে দৈব, ভাগ্য বা দৃষ্ট নামে অভিহিত করা হয়। (১) জ্যোতিঃশাস্ত্র দ্বারা যে ফল নির্দেশ হয়, তাহা যাত্র জন্মান্তরীণ কর্মকেই নির্দেশ করে। (২) এখন দেখিতে হইবে মানুষ কেবল অজ্ঞানার্জিত কর্ম ফলই ভোগ করে অথবা তাহার নিজস্ব কর্ম কিছু আছে, বাহা জ্যোতিঃশাস্ত্র নির্দেশ করিতে সক্ষম নহে। অর্থাৎ মানুষ কেবল দৈবেরই দাস অথবা তাহার নিজ পুরুষকারের কিছু কনিষ্ঠ আছে? এবং এসবকে জ্যোতিঃশাস্ত্র কি বলে?

“হায়ণ রত্ন” নামক গ্রন্থে এবিষয়ের চিত্তাকর্ষক আলোচনা আছে। বৃহজ্জাতকে ত্র্যটোৎপল বিরচিত টীকাও ইহার আলোচনা দৃষ্ট হয়। তাহার ঠিক যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাই আমরা প্রথমতঃ প্রদর্শন করিব। তাহার বলেন—

“এই কালত জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? যদি মানুষ কেবল অজ্ঞান জন্মার্জিত কর্মফল ভোগার্থেই এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে এবং সারাজীবন কেবল সেই পূর্ব-জন্মের কর্মফলই ভোগ করে, তবে এই শাস্ত্র দ্বারা তাহা জানিয়া কি লাভ? যদি জন্মান্তরীণ ফল অবশ্যভাবী ব্যাপারই হয়, তবে এ শাস্ত্র দ্বারা তাহা জানা বা না জানা সমান। অপর বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্র সবই ব্যর্থ। নীতি-শাস্ত্রের উপদেশ, ধর্মশাস্ত্রের যজ্ঞাদির বিধান, তীর্থযাত্রাদির উপদেশ, রোগাদি প্রশমনের জন্য বিহিত ঔষধের ব্যবস্থা সবই নিরর্থক হয়। কারণ মানুষ দৈবের দাস, সে পূর্বজন্মার্জিত কর্মবশে সং বা অসং কর্ম প্রশ্রয় করিবে, তাহার জন্য বিধি বা উপদেশ বা নিষেধ কিছুই খাটেনা।”

বস্তুতঃ মানুষ যদি পূর্বজন্মের বিদ্যুৎমান কর্ম চক্রের মধ্যে কেবল পাক খাইতে থাকে তবে উত্তম, অধ্যবসায় পুরুষকার প্রভৃতি কথাগুলিকে অভিধান হইতে বাদ দিতে হয় এবং মানুষগুলি নিশ্চেষ্টতার জমিয়া স্থবিরতা লাভ তিন্ন তাহাদের আর গতান্তর থাকে না। বাহা হউক এসবকে পূর্বোক্ত রূপ আলোচনার পর “হায়ণরত্নে” এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে মানুষের জন্মান্তরীণ কর্মফল দ্বিবিধ, দৃঢ় কর্মোপার্জিত ও অদৃঢ় কর্মোপার্জিত। প্রথমোক্ত কর্মফল অনিবার্য—যেমন জন্মাত্মক। এই কর্মফল এত ভীষণ যে তাহার ফল হইতে মানুষ কিছুতেই পরিভ্রাণ পায় না। আর অদৃঢ় কর্মোপার্জিত ফল প্রতিবিধান যোগ্য। অর্থাৎ জ্যোতিঃ শাস্ত্রের সাহায্যে সেই প্রকার ফল পূর্বে জানিতে পারিলে এবং পুরুষকার অবলম্বনে তাহার হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাওয়া যায়। এই হােনেই নীতি ও ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ সার্থকতা পরিদৃষ্ট হইবে। ত্র্যটোৎপল বলিয়াছেন—কর্মের নানারূপ বৈচিত্র্য আছে, কতকগুলি কর্ম দৃঢ় ফল, আবার কতকগুলি দ্বিবিধ।

(১) পূর্বজন্মাত্মক কর্মকেই দৈববলি কথ্যে।

(২) বহুপাতিত্বত্ব কর্মসি ওভাপত্ত্বত্ব ভক্ত কর্মস: পত্তিৎ।

ব্যক্তগতি শাস্ত্র-সূত্র ভবনি রূপাদি বীপ ইব।

হুল। (ক) মহাত্মারতে আছে দৈব, পুরুষকার ও কাল এই তিনটি মিলিত হইয়া ফল প্রদান করে। (খ) রাজবর, বলিয়াছেন যেমন এক চক্রের দ্বারা রথের গতি হয় না, সেইরূপ পুরুষকার ভিন্ন দৈব সুস্থির হয় না। (গ) ভগবান্ ব্যাস বলিয়াছেন—বিদ্বান্ বাক্তি পুরুষকার অবলম্বনে দুর্লভ দৈবকে বার্ষ্য করেন ॥ (ঘ)

পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখা যাইতেছে পুরুষকারের কৰ্মফল যদি প্রবল হয়, তবে এক্ষণে তাহার ফল অন্তথা হইবে না; কৰ্মফল দুর্লভ হইলে প্রবল পুরুষকার অবলম্বনে অন্তথা হইবে। জ্যোতিঃশাস্ত্র সুচিত কৰ্ম ভিন্ন মানুষের একটি নিজস্ব কৰ্ম আছে, বাহ্য জ্যোতিঃশাস্ত্র নির্দেশ করিতে পারে না, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির উপরই তাহা প্রতিষ্ঠিত। তাহারই নামান্তর পুরুষকার। বস্তুতঃ দৈব ও ভাগ্য নামে আমরা বাহ্য বলি, তাহাও পুরুষকারের নামান্তর মাত্র, প্রত্যেক এই যে সেই পুরুষকারটা এক্ষণের নয়, পূর্ব জন্মের। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমরাই নিজ নিজ ভাগ্যের জন্মদাতা ও প্রতিবিদ্যাতা ॥ জ্যোতিঃশাস্ত্র শুধু সাবধান করিতে পারে, শুভ বা অশুভ ফলের সময় নির্দেশ করিয়া মানুষকে প্রবল পুরুষকার অবলম্বনে প্রোৎসাহিত করিতে পারে ॥ জ্যোতিঃশাস্ত্র হইতে একটি উদাহরণে তাহার ফলনির্দেশ চাতুর্য্য প্রকাশিত করিব। আত্মগণনা বিষয়ে নানারূপ প্রক্রিয়া দ্বারা দুর্লভ গণিতের সাহায্যে মানবের আয়ু নির্ণয় করিবার নিয়ম বিবৃত আছে। কিন্তু সেই গণনা অসুযোগী আয়ু অধিকারী মানব হইবে কিনা এ বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম আছে। যথা মানুষ পঞ্চাশীল অর্থাৎ স্তোজনে সংবত, সচ্চরিত্র এবং জিতেজ্বর না হইলে উক্ত গণিতাগত আয়ুর অধিকারী হইবে না। (ক) অর্থাৎ জ্যোতিঃশাস্ত্রের দ্বারা স্থিরীকৃত আয়ুও বধেচ্ছাচারীর পক্ষে

বাটিবে না। এখন পাঠক বর্গ বিচার করুন জ্যোতিষে অদৃষ্টের কি পুরুষকারের প্রাধান্য কীৰ্ত্তিত হইয়াছে?

বাহাদুর জ্যোতিষে বিশ্বাস নাই, তাহার শনি রাহু প্রভৃতি গ্রহ গণের ফলাফল উল্লেখ করিয়া ভীত উপস্থাপন করেন ॥ মানুষ স্বাধীন কৰ্মের অধীন না হইয়া কোনও গ্রহ বিশেষের অধীন এ কথা তাহাদের অসহ্য। আবার বাহাদুর জ্যোতিষে আত্মবান তাহারও এমন অদৃষ্টগ্রহগ্রণের কারকতায় বিশ্বাসী যে নিজের শক্তিতে সম্পূর্ণ আত্মশ্রুত। তাহার গ্রহের শুভ বা অশুভ ফলকে কলম মানিয়া লইয়া সেই সেই গ্রহের শরণাপন্ন হইয়া তাহারই উপাসনায় রত হয়েন। এই উত্তর প্রকারের লোকই ভ্রান্ত। প্রথমতঃ জানিয়া রাখা ভাল, গ্রহগণ কোনও শুভ বা অশুভ ফলের কারক নহে, হুচক মাত্র। অর্থাৎ রাশি চক্রের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত গ্রহগণ মানবের শুভাশুভ ফল প্রকাশের চিহ্ন মাত্র, সেই গ্রহগণ নিকটে কোনও ফল প্রদান করে না। শরীরের স্থান বিশেষে টিকটিক পতিত হইলে সেই স্থানের নির্দিষ্ট একটি ফল লিখিত আছে। কিন্তু উক্ত ফল টিকটিক প্রদান করে না, অর্থাৎ উক্ত ফলের জন্য টিকটিক দায়ী নয়, ফল বেঘটিনে, তাহা সে প্রকাশ করিতেছে মাত্র। সেইরূপ গ্রহগণ ও ফল প্রকাশক চিহ্ন মাত্র। গ্রহগণ যদি কেবল মাত্র হুচকই হয়, তবে গ্রহবিজ্ঞ হইলে গ্রহশাস্ত্র বা পুণ্যবিধান কি জন্য? এ বিষয়েও জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা আছে। গ্রহগণকে হুচকরূপে নির্দিষ্ট করিয়া “গ্রহরূপী জনাধিনঃ” অর্থাৎ মারাগণই গ্রহরূপে ফলপ্রদ করেন সুতরাং গ্রহপুণ্য তাহারই পূজা হয় ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন। (খ) গীতারও আছে—

যোযো যাং যাং তন্নং ভক্তঃ শ্রদ্ধাচ্ছিত্ত্বি দ্বিজিত।

তস্ততস্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধ্যাম্যহম্ ॥

সত্ত্বা শ্রদ্ধা যুক্ত স্তস্তাধীন যীহতে।

লভতেচ ততঃ কামান্ যদৈব বিহিতাম্ হি তান ॥

শ্রীবক্রিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ, কাব্যরত্ন

জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত।

পঞ্চাশিনঃ স্বধর্ম্মানঃ সংকুল্যাত্মা জিতেজিয়াঃ।

দ্বিজদেবার্জনা যজ্ঞা দেবামাতৃকদীপিতং ॥

(ঘ) প্রাক্ কৰ্ম শূচকাঃ ধর্মাঃ কৰ্ম্মেনৈব ততিঃ। কিসৌ প্রবতিগতএব স বিতুঃ ॥ দেবতা গ্রহরূপেণ মানুষ্যাদ্যং তত্তাত্ত্বম্। ফলং প্রাপদিতং বস্তু তদ্ব্যক্তি স্বকীয়কম্ ॥

(ক) কৰ্ম্মনাং বৈচিত্র্যং কানিচিৎ দৃঢ় মূলানি কানিচিৎ শিথিল মূলানি ॥

(খ) দৈবং পুরুষকারঞ্চ কালঞ্চ ভরওর্ব্বভ। জয় মেত মনু-
য্যানাং গিতিভিং স্তাৎকলাবহম্ ॥

(গ) যথা যোকেন চক্রেম নরবন্ত গতিভবেৎ ॥ তথংযুক্তব-
ত্মায়েণ বিনা দৈবং নসিধ্যতি ॥

(ঘ) বৃত্তে দুর্লভং দৈবং পৌরুষেণ বিপশিতা ॥

(ক) মে শাপপুত্রহনশব্দেব ব্রাহ্মণ নিকট ॥

ইতি কৰ্ম্মনাং বাহ্যেণ দেবতা পুণ্যকালকঃ ॥

বাল বিধবা ।

কোন্সনার শবার ঘুম বার রাতে ;
পুল্পের গন্ধের সকার গায়ে ।
নিখাস-ফিস্কাস্, আস্ বাব শুক ;
কাক-রঙ, কুঁড়ল অন্তর জল !
পাঙ্ক হীন বস্ত্রের আবরণ মধ্য,
অঙ্গের রূপ ঠিক চম্পক সত্ত্ব ।
কাঁকের দর্শন, উজ্জ্বল বন্ধে ;
তাই ঠোট কম্পন, জলতার চক্ষে !
বৌবন তার এক কন্ কন্ বর্ষা ;
সুখ-সাধ, সবশেষ, একদম ফর্সা !
হুংখের দিন রাত, হুংখের চিত্ত ;
হাঘোর লেশ নাই, ক্রন্দন নিত্য !
কভার-ভগ্নের সুখ, ধান দর্শন
করজন চার এই ছুখ্ প্রাণ-পর্শী !
শক্তির বর্ষণ শাস্ত্রের কর্ম ;
হুংখের বুল নাশ চিত্তের ধর্ম !
হার হার নিষ্ঠুর শাস্ত্রের ভক্ত,
একটুকু নাই তোর যাম্বের রক্ত ।
ধাক্ তোর বিতার-শক্তির গর্জ ;
কিছুই নাই তোর সব জ্ঞান ধর্ম !
পড়ার চামড়ার হুংখের বেজ
নিফল নিষ্ফল, শুকনাই নেত্র ।
দিন দিন লোপপায় গৌরব্ কার্য ;
কই কই, কই সেই প্রাক্তন আর্ঘ্য !
বকটি-বক্কার কটপট কন্স ;
ছটকট কন্সিস্ ; ঢের বোন্, হুংখ ।
শ্রম তোর আগ্রহ, হাড়মাস স্তম্ভ ;
ভিল ভিল মর্ছিস্, হচ্ছিস্ পুণ্ড !
সভাই তোর হুখ নয় এক রক্তি ;
ঘুম-বাস, কই তুই কাঁদ'ছিস্ সত্য !
কই, কই, কেউ নাই প্রাণবান্ বন্ধে ;
ক্রন্দন সার বোন্, তাই তোর সঙ্গে ॥

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ।

সাধু দর্শন ।

কয়েকদিন যাবৎ ময়মনসিংহ সহরে এক সাধুপুরুষের
শ্রুতাপমন হইয়াছে । তাঁহার বয়স সম্বন্ধে নানা জনরব ।
কেহ বলেন ৪০০ শত বৎসর, কেহ বলেন ৩৫০ বৎসরের
কম নহে ।

ব্যাপার কি জানিবার জন্ত আমরা সাধুসম্বন্ধনে গমন
করিলাম । শ্রীযুক্ত অধিনাশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের
বৈঠকখানা লোকারণ্য হার দেশের জনতা ভেদ করিয়া
আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম । মুণ্ডিত শীর্ষ শ্মশ্রুগুচ্ছ
বিরহিত প্রসন্নবদন দিগম্বর মূর্তি তত্ত্বপোষ শব্যার
সমাসীন । তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর ও গলদেশে রক্তা-
ক্ষমালা । মেজের সত্তরকে পিপাসিত নেত্র দর্শকবৃন্দ
উপবিষ্ট । সাধুর বয়স দৃষ্টান্তঃ ৮০ কিংবা ৯০ বয়স বৃদ্ধের
জ্ঞান আমাদের বোধ হইল । বৃদ্ধ বটে কিন্তু হৃবির
নহেন । বৌবনে বন্ধে ও বাহুঘরে বিশেষ শক্তি ছিল
সন্দেহ নাই । ইহার মহারাষ্ট্রের দেশের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম ।
ইনি হিন্দী ভাষায় কথা কহেন, বাঙ্গালা জানেন না ।
অশ্রান্ত সাধুর জ্ঞান ইনি সন্নতাসী নহেন । আমরা
এই ভরসায় তাঁহার চরণ বন্দনা পূর্বক প্রথমতঃ তাঁহার
নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম ।

প্রসন্নমূর্তি ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিলেন,
হঁ, আমার লৌকিক নাম আছে বটে । আমার নাম
কৃষ্ণাকী রাও । পূর্ব নিবাস জিলা সেতারা, বেনোলী
গ্রাম, এই গ্রাম নানা ফাণীবিসের অধিকার ভুক্ত ।

এখানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ ?
কারণ কিছুই নয়, কেবল উদ্দেশ্য হীন দেশ ভ্রমণ ।
পূর্বাঞ্চলের অনেকেই আমাকে প্রহ্লা করেন । এই সে
দিনের কথা ; রাণী ভবাণীর জীবিত কালে তাঁহার
নাটোরের ভবনে ও গিয়াছিলাম । রাণী রাণবরমতের
সহিত আমার সম্মুখিত ছিল । আমি তাঁহাকে শালগ্রাম
চক্র দিয়াছিলাম । ঐ চক্র এখন তাপাকুলের হুণ্ড
বাবুদের নিকট আছেন । ঢাকার শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ
সেন জল আমার বর্তমান শিল্পের মধ্যে সন্তুষ্ট ।
ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ রেলবার আদিয়াছি । এখানে

রান বাবর (পুরোক্ত অবিনাশ বাবুর ভগ্নিপতি) আমার শিত। এহান হইতে কোথায় বাইব ছিন্নতা নাই।

প্রশ্ন ১—আপনি কতকাল বাবর গৃহত্যাগ করিয়াছেন ; আপনার মাতা পিতা জীবিত আছেন ?

সন্ন্যাসী শিরশ্চালনা পূর্বক উত্তর করিলেন,—না আমি তাহা অবগত নহি। সে কি আশ্চর্য্যের কথা ? অরণ হইতেছে, আমার কোষ্ঠ সর্বোদয়ের বাসো মুত্য় পর আমার মাতা পিতা আমাকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ তীরে ত্রীত্রেজলিন্দ-বাণী জীউর হস্তে অর্পণ করিয়া চলিয়া যান। তখন আমার বয়স ১১ বৎসর মাত্র। সেই সময়ে বালাজী বাজীরাও পেশোরা হইরাছিলেন। বলিতে গেলে, বাজীরাও সম্পর্কে আমাদের আত্মীয় স্থানীয় ছিলেন।

এই সময়ে আমাদের মধ্যে জনৈক ইতিহাসজ্ঞ নিবেদন করিলেন যে পেশোরা বালাজী বাজীরাও কিছু উর্দ্ধ ১৫০ বৎসর হইল দেহ রক্ষা করিয়াছেন। অতএব তাঁহার জামিতে বাসনা, বামাজীর বয়স ১৫০শত বৎসরের উপর হইবে কি না। মহাপুরুষ সম্বিত বদনে উত্তর করিলেন, আমার বয়সের স্পষ্ট সংখ্যা গণনা নাই। আমি ঔরংজেব বাদশাহের সমসাময়িক বটি।

বৈঠকখানার বরটি প্রশস্ত ছিল না। তখন বৈশাখের অপরাহ্ন, সমবেত ভক্ত মণ্ডলীর গ্রীষ্ম অসহ বোধ হইতেছিল। কিন্তু বিশ্বরের বিষয় এই যে শীত গ্রীষ্মে সমজ্ঞান এই মহাবুদ্ধের দারুণ গ্রীষ্মাতিশয্যেও অনুমাত্র তাবাস্তব লক্ষিত হয় নাই। ভক্তপ্রবর ত্রীমুখ—বোধ হয় তক্ত গোবের তলস্থিত পুজীকৃত স্তম্ভহং ডাব তরমুজের প্রতি সতৃকনয়নে মুহূর্ধ্ব দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। গৃহমধ্যে মুক্ত বায়ুর সঞ্চালন জন্ত বখন শিবোরা স্বারদেশের জনতা দূর করিতে প্রয়াসী ছিলেন তখন মহাত্মা তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, ইহাদের প্রতি অথবা বাক্য বা হস্তক্ষেপ করিও না ; আমরা সকলেই একই আত্মা, পৃথক ভাবিও না। এই সময়ে জনৈক কৌশল দ্বারা প্রৌঢ় সন্ন্যাসী গৃহে প্রবেশ করিলেন। সত্যাহ সকলে আপত্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—ইনি নেপালী ব্রাহ্মণ ; ৪২ বৎসর পূর্বে ইহার লিখিত আমার পরিবারে বেধা হয়। তদবধি ইনি আমার সঙ্গি আছেন। ইনিও আমার ভায়র সুবক।

বিস্মিত ভাবে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম “মহাত্মা আপনার বয়ঃক্রম বোধ হয়”—মহাত্মা বাধা দিয়া বলিলেন—আবার বয়সের কথা বলিতেছ ? আমার বয়স এখন ৪২ বৎসর ৩ মাস ৫ দিন হইবে।

সত্যাহ সকলে বিষয়ে নীরব। নিতরুতা ভক্ত করিয়া সন্ন্যাসী প্রবর পুনরায় বলিতে লাগিলেন, তোমরা বিশ্বাস বা সন্দেহ প্রকাশ করিও না। মাহুয়ের অসংখ্য বৎসর জীবন ধারণ অসম্ভব মনে। তবে মাঝে মাঝে এই দুই দেহের জীর্ণ সংস্কার করিয়া লইতে হয়। আমি ১০ বৎসর পর পর এক একবার জীর্ণ সংস্কার করিয়াছি। এইরূপে আমার দুই তিন বার দেহ পরিবর্তন হইরাছে। সেই হিসাবে আমার পুনরায় ২২ বৎসর বয়স। সহচর অপেক্ষা বয়সে আমি বয়ঃ ছোট।

প্রশ্ন ১—দেহের জীর্ণ সংস্কারের অর্থ বোধ হয় কেহ রক্ষা করিয়া নব কলেবরে জন্ম গ্রহণ করা। আপনি কি বারংবার শিশুদেহ গ্রহণ করিয়া যাত্ অহে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইরাছেন ?

উত্তর।—না, তাহা নহে। বর্দ্ধিত্য হেতু বৎসর শরীরের রক্ত মাংস বিকৃত হইয়া উঠে, তখন মহাত্মাপুত্র লোকালয়ের বহির্ভূত গিরিকন্ধ্যের নিম্নত স্থানে গম্বু করিয়া বনৌষধি সেবন পূর্বক সপ্ত দিবস ব্যাপী এক প্রকার যোগ সাধন করেন। তৎপর শরীর ক্রমে স্বস্থ বোধ হয়, এবং শরীরের অল্পভূতি কিরিয়া আইনে। পুরাতন চর্খের স্বপ্নন হইয়া নূতন চর্খের উদ্ভব হয় এবং সুবকের ভ্রায় অঙ্গকান্তির বিকাশ হয়। এই সময়ে এবিধ দেহ রক্ষার জন্ত সহচরের প্রয়োজন। বায়রীয় লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নাম আপনারা অনেকেই বলেন। তাঁহার সঙ্গ আমি একবার নবকলেবরে মানস সর্বোচ্চ তীরে গমন করিয়াছিলাম। এই তো সে দিনের কথা।

ই, আমি সংকুত জানি। বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছি। গুজরাটী মারাঠী, কানাড়ী, ত্রাবিড়ী প্রভৃতি ৭৮ টি প্রাদেশিক ভাষার ব্যুৎপত্তি আছে। ইতিহাসের রাজা রাজড়ারের প্রসঙ্গ জানি না। নিজাধের সঙ্গে পেশোয়ার যে বৃদ্ধ হইরাছিল, বালাজীকে দেখিয়াছি। এখন পশ্চিম দেশীয় ইংরেজ রাজা। কিন্তু সত্যাহ

সিটি বেনাটের নাহাধলীতে আমার প্রয়োজন নাই, এবং লেখা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না।

এই সময়ে এক ধনবান ভক্তের গৃহ হইতে বানীজীকে লইয়া বাইবার লত একখানা পাড়ী উপস্থিত হইল। ভক্তরাঃ আশ্বরাও প্রসারিত হইল। সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ, আপনার ধর্ম্মত কি?

ধর্ম্মত? সে অনেক কথা। হিন্দু মুসলমান ও ইহুদী ধর্ম্ম সবাতাই আমার সহানুভূতি আছে।

“আপনি মুসলমানের হস্তে জল গ্রহণ করেন?”

না, এ পর্য্যন্ত আমি হিন্দুদের মধ্যেই পরিভ্রমণ করিতেছি এবং হিন্দুদেরই হস্তে জল গ্রহণ করিয়া থাকি। আমার বিশ্বাসে হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মভেদ মানিতেন না।

“মহারাজ পাত্রোখান করিবেন না; আমাদের আরও একটু জিজ্ঞাস আছে। আপনি পরলোক যানেন?”

উত্তর—মৃত্যু মৃত্যুর পর কর্ম্মফলসারে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উচ্চ বা নীচ প্রাণীর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। মৃত্যুর পর আত্মীর স্বভাবের সঙ্গে আর কসিন্ কালে দেখা হয় না।

“তবে যে আমরা প্রেত প্রাণাদি—?”

স্বাভাবিক পাত্রোখান পূর্বক জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন—প্রাণাদি সর্ব্বৈব নিকল।

ভক্তরা সাধুকে গাড়ীতে উঠাইলেন; আমরাও তাঁহার চরণ ধূলি লইয়া বিদায় হইলাম।

ধর্ম্মত তৎ নিহিতং শুভাং ।

শ্রীমদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ।

২০শে বৈশাখ, ১৩২৭ ।

“না”য়ের নানা নক্সা ।

বিনা বাক্যব্যয়ে অপরের কথার সার দিতে হইলে একটুখানি উচ্চারণেই বাধা নাড়িলেই হইল। উচ্চারণের এইরূপ ভ্রম আনত স্পন্দন (nod) দ্বারা কার্যিক মিলনের সঙ্গে মানসিক আত্মগত্য, আত্মকল্যাণ বা সন্ততি প্রভৃতি হইয়া থাকে। বাধাটি একপাশে একটুখানি থাকাইলেও মৌন সন্ততির কার্যিক বিকাশ হয়। ইহার অর্থ, আত্মা স্বীকার।

নীচব সন্ততির সর্ব্ব বিকাশও আছে। যুগ বন্ধ রাখিয়া নিম্নস আশ্রয়ের সঙ্গে বাক দিয়া “হ”। —একটু খানি হালকা গোছের, মিহি আঙুরের হ; হুতার নহে। অথবা যুগ ভ্রম হা করিয়া অস্বাভাবিক “হা”। হা (yes) বোধ করি বিকল্পে অথবা সন্ততির সর্ব্বাক সঙ্কেত। যথাহি বক্তব্যে। রূপসী আশ্রয়-শী দিগ্গ; গজ-বাহনকে প্রিয়সংবাদে অতিভূত করিয়া বলিলেন, কেন এসেছি জান? তোমার সঙ্গে আমরা (আমি ও বিমলা) এখনই পলাইয়া বাইব। কেন, পারিবে? শুনিয়া বায়ন “অবাক হইয়া হা করিয়া রহিলেন।” ইহার বিকল্পিত অর্থ, ব্রাহ্মণ এই পরম সংপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ যুগদ্বারা মৌনসন্ততি জ্ঞাপন করিলেন।

কথা কহা ও না কহা এই দুইয়ের মাঝামাঝি হু বা হুম। তথাহি অভিসারিকা আশ্রয়-আহারে উপবিষ্ট দিগ্গজের প্রতি; “বলি ও রসিক রাজ!” উত্তর নাই। “ও রসরাজ!” উত্তর “হুম”; yes, here I am. স্ততিরজন ভ্রমর জ্ঞান (hum) অস্বকরণ করিয়াই বোধ হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালোয়াতগণ প্রথমে যুগ বন্ধ রাখিয়া হু হুম শুণ শুণ রবে মনে মনে তান ঠিক করিয়া লইয়া অবশেষে যুক্তকণ্ঠে গান ধরিয়া থাকেন। যথা; “এ হুম—উ হুম (একটু কাসিয়া) মরিরে ভারত জননী।”

অথ “হা”য়ের বিপরীত “না”। প্রস্তাব মনোমত না হইলে মানসিক অপ্রসন্নতা যুগে প্রতিকলিত হয়। স্তবরাঃ নিবেদ জ্ঞাপনে ডাহিনে বামে শিরশ্চালনার কার্যিক ভঙ্গিটিও কটকট। এই মৌল ইতিতেও প্রস্তাব কারী প্রস্থানের গান না দেখাইয়া ঠায়ে বসিয়া তর্ক জুড়িয়া দিলে তোমাকেও কাছেই তুচ্ছভাবে বিসর্জন পূর্বক গুরুগর্জনে ইঁকিতে হয় :—

“নাঃ! বড় জালাতন করলে হে তুমি, চলা বাও হিয়াসে।”

এই ধানেই “না”য়ের উৎপত্তি। সন্ততি ও অসন্ততি স্বেচ্ছ উভয়বিধ শিরশ্চালন প্রণালী বোধ হয় সর্ব্বদেয়েই একপ্রকার এবং মাতৃবের সহজাত। ও, এ, গ কোমল হা, হাঁতে দেশ বিশেষে বর্তমান। কিন্তু অসন্ততির দ্বারা কেবল নাসিকার মিহি আঙুরের কণ্ঠ হয়। সন্ততি

ওঠের দরকার। তাই পাইডেছি অনুমানিক চরম বর্ণ
হয় ন এবং ন। না নিবাদ ইত্যাদি। অনুমান হয় ন
ও ন সংযোগে নিবেদেৎ বাংলা নাম “মানা”। ন বর্ণটি
নাস্তিক ও নিমিত্ত। এর আভিধানিক মুখ্য অর্থ অভাব,
বিরোধ, ভেদ, বন্ধন, অন্ধকার। স্বরাদি শব্দের আদিত
যোগ হইলে ইহার রূপ অনুহ, এবং বাঞ্জন বর্ণের
পূর্বে থাকিলে অ হয়। In, un ইংরেজী প্রতিরূপ।

বাংলাতে নিমিত্ত “না”য়ের নানা কণ্ঠ রূপ বিস্তারিত।
বধা; জীবাশ্মা কি, না ঘটাকাশ। ব্রজগোপীদের মধুর
রস কি, না শূকার রস। ইত্যন্ততঃ মানে কি, না এদিক
ওদিক। এখানে অর্থ বাধ্য বা namely. কি প্রশ্নের
কি অন্তত উত্তর এই অর্থে—“রামা, ভাত খাবি?” না,
“ভাত খাব কোথায়?”

হুয়ের অস্তিত্ব, অথবা অর্থে। তুমি কা’কে চাও?
রামকে কি শ্রামকে? প্রাদেশিক—রামকে না শ্রামকে?
চিনি হতে চাও, না চিনি খেতে চাও?

নিবেদেৎ অনুজ্ঞাত্ত বলি, দিও না। কিন্তু Pray,
do give বিনতি ভাবে; দাওনা, দাদা দাও দশটি টাকা
ধার দাও। গাও না তাই, গাও, একটা গান গাও।
অনেকে বলিতে পারেন, এখানে না শব্দটি “কেন গাহি-
তেছ না?” প্রশ্নের তথ্যাবশেষ। কিন্তু এস্থলে কারণ
জিজ্ঞাসা রূপ উদ্ভেদ্য লেশ মাত্র নাই; আছে কেবল
কাকূতি মিনতি।

“কেন-না”। প্রথমে ইহার সদর্পের উদাহরণ দিতেছি।
তিনি যাবেন না; কেন না, তিনি পৌড়িত। অর্থাৎ,
কেন তিনি বাইবেল না? সংক্ষেপে, কেন না? Why
not? তত্ক্ষণ, তিনি পৌড়িত। অতঃপর দেখুন “কেন-
না”র জন্ম-বিস্তৃতি। বধা; সুশীল ও সুবোধ এবার
নিশ্চয়ই জলপানি পাইবে, কেন না তাহার। পরীক্ষায়
প্রথম ও দ্বিতীয় হইয়াছে। টেশনে আমি তাঁহার চরণ
ধূলি লইয়াছিলাম, কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? উত্তর—
কেন না, তিনি আমার গুরুদেব। এখানে “কেন না”
র অপপ্রয়োগ কিন্তু সংস্কার অভাবে বাংলার বহুল।
সংস্কৃত করিলে হইবে “কারণ।”

“কি না”। সদর্প Whether or not. তুমি ভাল
কাজ কি না, লিখিত। অর্থাৎ কারণ বর্ণনা। তিনি
যেহাং ভালমানুষ কি না, তাই এতটা সহ্য করলেন।

সবিস্ময় খেদে; আমি বুকের রক্ত দিয়া মাত্ম করিয়াছি,
এখন বলে কি না—আমি ওর কেউ নই।

উত্তর লক্ষ্য প্রসঙ্গের অনুকূল উত্তর আদায়ের চেষ্টায়।
হুস্ত শিশুর প্রতি বিজ্ঞ অভিভাবকের উক্তি “আমি
আমরা ছুঁলে হুপুর বেলা ঘরে বসে পড়বো; তুমি
পড়বে, আমি পড়বো (সমস্তির ভিত্তিতে বাড় নাড়িয়া)—
না—না—না?” ইতি প্রাদেশিক। কেমন, নয় কি?
Is n’t it? ইত্যর্থে। বলা হয় “না”? কিন্তু চাই
“হাঁ”। শিক্ষার প্রভাব বহির্ভূত বয়ঃপ্রাপ্তগণ এমন বলে
বলিয়া থাকে “না—রে?” বধা; বয়স্ক বয়স্কের প্রতি
“বুড়ি পদা আর কতদিন? শীঘ্রই শুকাবে; না—রে!”
বিক্রমপুরী “না” এর অস্তিত্ব উদাহরণ; বধা। সে
করলে সে—না? সে করলে তো! অহু শুবিস্ত—
কোন চিন্তা নাই, সে সব হবে’নে—সে সব হবে এখন,
তুমি ভেবো না। বিষয়গম্য অপরিত উক্তির পান-
পুরণে!—দেখ, তোমার নূতন চাকরটা কি হোকা।
সে “না” করছে কি,—এক দৌড়ে “না” বাইরা, সড়কের
ধারে যে জলের কল আছে সেই কলের গোল বাঁচাটায়
“না” ডাক-চিঠির বাঁধ তাবিয়া—তারি ভিতর চিঠি
খানি রাখিয়া চলিয়া গেছে!!” এখানে “না” শুনি না
পড়িলেই পাঠোদ্ধার হইবে।

মুখে না না বলিয়া হাঁ আদায়ের চেষ্টার কথা বলি-
য়াছি। আবার হাঁ হাঁ দ্বারাও নিবেদ করা যায়। হুচি-
রাম ওড়ের দৃষ্টান্ত দিতেছি। শুভ-গৃহিণী তত্ত্বকালী বিব
খাইব বলিয়া তেঁতুল গুলিতে বসিলেন। উহা বিবু জানে
ত্রেণ “হুচিরাম হাঁ—হাঁ করিয়া নিবেদ করিতে লাগি-
লেন।” বলা বাহুল্য, ইহা অনুমানিক বাহ্যিকার।
কর কি, কর কি, থামো থামো ইত্যর্থ।

না—করা। পূর্ববলের অপূর্ব ব্যবহার। সে “না”
করে। যানা করে, রাজী হয় না, বীকার করে না,
ইত্যর্থ! কেবল ভগবান ছাড়া আর কাহারও “না”
করিবার সাধ্য নাই। বধা; জৈব না কল্পন যদি
একটা ভালমন্দ ধরব হঠাৎ এসে পড়ে, তাই এখনই
(সময় থাকিতে) একটা কর্দ ধরা উচিত, কারণ দশা
অশোচ, সময় সজীর্ণ।

সময় সজীর্ণ। প্রাচ অনেক গড়াইল। সঙ্গে গাহিয়ে
বাজিয়ে নাই; আর কত তা না নানা করা যায়?

শ্রীপরমেশ্বরপ্রসন্ন রায়।

খেলা বনাম ব্যায়াম ।

স্বীকার করিতেই হইবে ছেলেদের খেলাটাকে আমরা কতকাল রকট। উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি, উহা সেরূপ উপেক্ষার বিষয় নয়। খেলাটাকে সব সময়েই আমরা সেখাপড়ার সঙ্গে বাধ দিয়া দেখিতাম। এবং মানুষ মনে ইহায় যে কোন কার্যকারিতা আছে, ইহা আমরা কখনও মানিয়া লইতাম না। কয়েক বৎসরের মধ্যে খেলাটা বেশ পড়াকেও ডিলাইয়া আসিয়াছে। ভাল ছাত্রকে কেহ জাহুক আর নাই জাহুক ভাল খেলোয়ার কে আর লবাই জানে। কেহ কেহ বলেন যে খেলা ও শ্রম, শত্রু ও শত্রু, এদের দুইকে বিভিন্ন করিতে উত্তরই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞা যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহারই মজ্জা বল হীন, কুস্তিত ও দুইয়া পড়িয়াছে। দুর্বল ব্যক্তি সতত নিজকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে। আর আশ্রয়কার জন্ত নানা চুই বুড়ির আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদের পক্ষে ত্যাগ পরারণ হওয়া দুষ্কর হয়। যাহারা নিজের বিষয়ে ষত বেশী ব্যস্ত থাকে, তাহারা তত বেশী আশ্রয়, কুস্তি ও দুই প্রাপ্ত হয়। জানিনা কি কারণে আমরা কথিত শিক্ষিত বা বিদ্বান শ্রেণীতে স্বাধীনকৃত্যবের প্রবৃত্তি ; তাহাদের স্বাধীনতা অত ছোট পত্তিবদ্ধ। যেন হয়, যে শিক্ষার পরের জন্ত নিজকে দাঁড়াইতে হয়, সে শিক্ষাই ইহাদের হয় নাই। অথচ ইহারা ই দেশের কৃষিকার্য্য, বালক ও যুবক শ্রেণীর আদর্শ এবং উদ্যোগের উপদেষ্টা।

বিজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান, বিবেচনা দিতে পারে, ভালমন্দ বিচার ক্ষমতার পরিশুরণ করিতে পারে, কিন্তু বিপদ-সমুদ্রে হইলেও ভালকে আকরিয়া বরিবার সাহস দান করে না। বিপদকে ভয় করিতেই শিক্ষা দেয়। বিপদকে উপেক্ষা করিয়া শক্তি বিজ্ঞ হইতে পাওয়া যায় না। অপরদিকে শাস্ত্রাত্মক সকল বিপদের এক প্রকার পরিণাম সূত্রকেও উপেক্ষা করিতে অভ্যস্ত করে। ইহা কখনও বল সকার করে, পরের বিপদও খাড়ে লিগিয়া লইতে সক্ষম হইতে হয় না। মরণ-ভীষণ বিপদ হইতে বধন অপর সঙ্কল আশ্রয়কার ব্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন দুই দিগন্তে না করিয়া পরের সাহায্য করে

অগ্রসর হয়। সেখানে নিজের প্রেরণ এবং পরের প্রেরণ এ কথা ভাবিবারও তাহার অবসর হয় না। পুঁথির কীট গৃহকোণে বহু বীরত্ব কাহিনী পাঠ করে, অনেক কল্পনা ফাঁদে ; কখনও বা সত্যের মাঝে বিনাইয়া বিনাইয়া বক্তৃতার অগ্নিবর্ষণ করিয়াই ফেলে। কিন্তু তখনই অদূরে জনপদ মধ্যে যদি অগ্নির লীলা প্রকটিত হয়, এ সকল কল্পনা-বীরগণ নিজকে বাঁচাইতেই বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আর ঐ অগ্নি সমুদ্রে কাঁপাইয়া পড়ে কাঁরা? পরের গৃহ, পরের জীপুত্র, পরের গৃহ-দ্রব্য বাঁচাইবার জন্ত নিজ শরীর ও জীবনকে তুচ্ছ করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্তূপে প্রবেশ করে কাঁরা? বাদ্যের আমরা মনে তাবি, শুধু খেলিয়া খেলিয়া, কুস্তি করিয়া, হাতাহাতি ও তাত্ত্বিত করিয়া জীবনটা নষ্ট করিয়াছে ;—অকালকৃত্য ও, অপদার্থ বলিয়া বাদ্যের সর্বদা স্বগা করিয়া বাই—তাগ। বিদ্বান বা শিক্ষিত গণ ইহাদের প্রতি সর্বদাই উপেক্ষা প্রদর্শন করেন বলিয়া ইহারা তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিতেই চেষ্টা করে। ইহাদের সাহস, বুদ্ধির প্রাণ, ও উদ্বেজনার একটানা স্রোত এমন একটা দিক গ্রহণ করে যেখানে আমাদের মার্জিত রুচির দৃষ্টি পতিত হয় না। ইহাদের আবেগময় প্রাণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্রুতিভিত্তি ধারণার অতাবে যে কোন হের কর্মকেই আশ্রয় করিয়া লয়, ক্রমে সলসলবে বিপথে পরিচালিত হয়।

আমার জিজ্ঞাসা—এইরূপ যুবকদের বিপদ গমন জন্ত দায়ী কাঁরা? যারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করেন, তাদের স্বপ্নের দৃষ্টি ইহাদিগকে সমাজের যে ভয়ে নিক্ষেপ করে সেখান হইতে স্রপথে চলা বুঝি দেবতারও হুঃসাধ্য। প্রাণ প্রাণকেই চায়। শুধু বিজ্ঞা প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারে না। শিক্ষিতগণের প্রাণহীন আশ্রয় হইতে ইহারা যে দূরে থাকিতে চায়, ইহা প্রাণেরই ধর্ম। অতোত্তম প্রজ্ঞা হইতে যে প্রাণের সঞ্চয় ষটে তাহাকেই বিভিন্নবস্তুর বস্ত্র, সৌভদ, সপ্রাণতা প্রকৃতি অভিধান দেওয়া হয়। যাহাকে অগ্নি প্রজ্ঞা করি না, তাহাকে ভালবাসিতেও পারি না। অথচ এই প্রজ্ঞা কখন সর্বত্রই দেখিতে পাই। সবদিকে

জীহীন, নিরুদ্ব, আদর্শ মানব নহে। অথচ তাহারো প্রতিই আমরা প্রভাবীত নহি। তাহাদের শুভ দিকটার দৃষ্টি থাকে বলিয়াই তাহাদিগকে প্রভা করি ও তৎপ্রতি জীভিসম্পন্ন হই। এই বিপদরত যুবকদের প্রকাশ দিকটার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি ইহাদের সঙ্গে মিশিতে যাই, তবে তাহারা আমাদের ঘণার খোঁচাটা কিছুতেই অনুভব করিবে না। শিক্ষিতগণের সহিত অকুণ্ঠিত মিশ্রণে ইহাদের মধ্যে উন্নত হইবার প্রয়াস জন্মিবে। ইহাদের একটীর জীবনের গতি অনুদীর্ঘ করিয়া দিতে পারিলে সমাজের যে উপকার সম্ভব হইবে, পক্ষ দশটি বিদ্বান্ বারা তাহা হইবার নহে। অথচ এই শ্রেণীর যুবকদিগকে আমরা সমাজ বহির্ভূত করিয়া দিবার চেষ্টার আছি। এরূপ দুই চারিজনের কথা আমরা জানি, যারা স্থলে শিক্ষকদিগের উপহাসের পাত্র, পরিবারের উপেক্ষার পাত্র ও দুর্জহ বোকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারাই অধোরাত্র, অক্লান্ত পরিশ্রমে নানা ব্যবসারে বন্দী ও অপরের লজ্জা অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে অত্যন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ইহাদের সঙ্গে আমাদের মিলন সম্ভব হয় একমাত্র খেলায় মাঠে। পাঠ-ক্রান্ত যে সকল যুবক শারীরিক জড়তা তাদিবার লজ্জা কারিক পরিশ্রমটা নিত্যই হের বলিয়া মনে করে না, তাদের দেখাও মধ্যে মধ্যে সেখানেই পাইয়া থাকি। ইহাদের একদল খেলায় অতিভুক্ত, অস্তদল একটু নিলিপ্ত। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে একটা মূল্যবোধ রাখা চান না গেলেও দুই শ্রেণীর ছেলের পার্থক্য স্পষ্ট অনুভূত হয়।

এই দুই শ্রেণীর যুবকদের মধ্যে কিছু ব্যায়ামচর্চার আভাস পাই। অথচ শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার বৃত্তির সামঞ্জস্যের সহিত চরম পরিণতিই মনুষ্যের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অথচ কোথাও এই শারীর চর্চার কোম উত্তাপ আমাদের নাট। শারীরিক বৃত্তিগুলির কুরণ লজ্জা প্রতি লক্ষ্যে নিয়মিত চালনা বা ব্যায়াম প্রয়োজন। এই ব্যায়ামের স্থান আমরা খেলা দ্বারা পূরণ করিতে চাহিতেছি। কিন্তু ব্যায়াম কে প্রয়োজন সিদ্ধি করে খেলার তাহা সম্যক

সম্পন্ন হয় না। হিন্দু যোগবাদে প্রাণারামাধি জিহা দীর্ঘ জীবন লাভের এবং মানসিক বৃত্তিচয়ের ত্রিকার সাধনের উপায় বলিয়া কথিত হয়। প্রাণারাম জগৎ খাস প্রখাস নিয়মিত হয়। আসনাদি দ্বারা সার্বভৌমিক বৈধা সম্পাদন হয়। কিন্তু খেলার এসব হয় না। পরন্তু কুটবল প্রভৃতি খেলায় খাস প্রখাস অতিক্রম ও অনিয়মিত এবং পেনী সকলের আকর্ষক উত্তেজনা হইয়া থাকে। এ সকল খেলাতে আবার সকল ক্ষেত্রে ও সমুদয় পেনীর চালনা হয় না। এ কারণে যে সকল খেলোয়ার অলপ পুষ্টি ও প্রাত্যহিক ব্যায়াম চর্চা করিয়াছে তাহাদের শরীর কীণ, চক্ষু কোটরগত, চোরাই বহিস্কৃত হইয়া পড়ে।

অপরদিকে ব্যায়ামাদি—কৃষ্ণিধানার বৈঠক ও যুগল ডান, প্যারালাল বার, যুগল, স্তাণ্ডার ডাবল, ডেই এক্সাণ্ডার বাহারা নিয়মিত রূপে করিয়াছে তাহাদের শরীরের প্রত্যেকটি পেশী সুপুষ্ট ও সৌষ্ঠব সম্পন্ন হয়। ইহার প্রত্যেক ব্যায়ামেই খাস নিয়মিত এবং একটা আকর্ষক ইচ্ছার বহিঃপ্রয়োগ প্রয়োজন হয়। খেলায় মত ইহার প্রক্রিয়া উত্তেজনা বহল নহে। কাজেই যতদিন ব্যায়াম করা অভ্যাসে আশ্রিত না দাঁড়ায় ততদিন একটু ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন। একত্রে একাকী ব্যায়াম করিবার বৈধা আমাদের থাকে না অনেকের একত্রে মিলন ও উত্তেজনা পাওয়া যায় বলিয়া বসন্তাষের পরিবর্তে খেলাটা এরূপ আকর্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খেলাটার লক্ষ্য অনেক সময়েই সকলের সঙ্গে মিশিয়া একটু আমোদে সময়টা কাটাইয়া যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা একটু হালকা করিয়া লওয়া। কিন্তু ব্যায়ামের লক্ষ্য তা নয়। শরীরকে বৃদ্ধ করা ও সেই বৃদ্ধ শরীরকে জীবনে উন্নতির পথে সহায়ক করাই ব্যায়ামের উদ্দেশ্য। ব্যায়ামকে একত্রে খেলার উপরে সর্ববিধরেই স্থান দেওয়া উচিত। অথচ ছেলের মধ্যে এই ব্যায়ামাত্ম্যলব্ধি বাবাতে বৃদ্ধ হয় তাহার কোন চেষ্টাই আমরা করি না। এই কারণে খেলার দরুণ আমরা ছেলের বন্দী এবং তৎসঙ্গে কাজীর অনিষ্ট সাধন করিতেছি। বাঁচিবার লজ্জা

বিষম কালের মধ্য দিয়া আমাদের বাইতে হইবে তাহাতে
কমর বেহের কোথাও স্থান নাই। সুস্থ, সবল, পটু ও
অক্লান্তবীরী যুবক দলের আবির্ভাব বাহাতে প্রচুর ধর
অভিযানে প্রত্যেকের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।
কোথাও সাধারণের ব্যবহার অল্প ব্যারামাগার নাই।
কোম্পানি কোন স্থান দলের ব্যারামাগার দৃষ্ট হয়, কিন্তু
সেখানে নিয়মিত ব্যারাম কারবার কোনরূপ প্রয়োচনা
না উৎসাহ নাই। আমি শুধু আমার জন্মই মই,
সামিকে আমার দেশ ও জাতির প্রয়োজন আছে;
আমার পরিবার এবং ভবিষ্যৎ বংশীয় গণেরও দাবী আমার
উপর আছে, এরূপ ভাবনিচর যাহাতে ছেলেদের মধ্যে
কুতি পায় তাহার কোন প্রকার কথা পর্য্যন্ত আলোচনা
করিতে আমরা ভয় পাই, একান্ত ছেলেদের মধ্যে
ব্রতীয়া বিধীনতা, উদ্ভ্রমতা, ও আত্মশাসনের প্রয়োজন
এক প্রবল দেখা যায়। হুই একটি কুতিধানা মাঝে ২
প্রকাণ্ড বার, কিন্তু সেখানে বাওরা বে গুরুতর অপরাধ
ইহাই অতিভাবকগণ তাহাদের মতব্য দ্বারা প্রকাশ
করেন। যদি শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী খেলার মাঠের ও কুতি-
ধানা বা ব্যারামাগারের প্রতি মহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া
প্রচলিত ব্যারাম প্রণালীর উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা
করেন ও ভাষাকার যুবকদিগের সহিত ক্রিয়াকাল লেপন
করেন তবে দেশের একদল দুঃস্থ ছেলেকে ভালর দিকে
প্রভৃতি করিয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন।
সকলকাল বলিষ্ঠ দেহী, প্রশস্ত বক্ষ ও ত্রিটিত যুবকশ্রেণী
একতরু অল্প এইরূপ ব্যারামাগার প্রতিষ্ঠিত করিবার
প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কেরানীগিরিই এখন জাতীয়
আদর্শ ময়। সকলকেই ন্যূনাধিক নামা বিরোধের মধ্য
দ্বারা স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। কাজেই প্রম-
বিস্তার, কোমল বেহের ঠাই আর কোথাও নাই।

খেলার সমিতি (Club) মধ্যে সংজ্ঞা রচনার একটু
প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। সকলের সমবেত অভি-
ভাষার সুপ্রণালীবদ্ধ পরিচালনাই জাতীয়তার ভিত্তি।
কখনো শিক্ষিতাঙ্গের বৃত্তি আমাদের জাতীয় চরিত্রের
একটি পোড়ানীর আকার। ইহার অমূল্যমানের অমূল্যত্ব
এই খেলার মধ্যে। অবশ্যই ইহা থলা চলে না যে

এই অমূল্যমানের দলে আমাদের খেলোয়াড়ের চরিত্রের
ইহা সুপরিণত হইয়া উঠিতেছে। বাবা বালালী মনের
Organic defect তাহা সংশোধন করিয়া সেই বৃত্তিকে
কাগাইয়া তোলা খেলার মাঠের এই খেলোয়াড়ী ছেলেদের
কর্ম ময়। সেই বৃত্তির একটু কম্পান আমরা দেখানে
অমূল্যব করি। সাধারণতঃ দেখা যায় খেলার মাঠের
ছেলেরাই বিধি ও আদেশ পালনে অধিক তৎপর।
উহারের এই উৎসব বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত
চালক উহার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে পারেন।

এই উৎকর্ষ সাধন দূরে থাকুক প্রায় সর্বত্রই খেলার
দলে বিচ্ছেদই শুধু দৃষ্ট হয়। ইহার একমাত্র কারণ
খেলা ভিন্ন ইহাদের সমুখে অন্য কোন গৌণ লক্ষ্য নাই।
উচ্চ আদর্শের অভাবে ইহারা খেলাটাকেই চরম বলিয়া
ধরিয়া নেয়। বৃহত্তর জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ
যাদের নিকট অপরিচিত, খেলার মধ্যে নীতিজ্ঞান যে
পরিপূর্ণ হইতে পারে, এ ধারণা তাদের না হইতে পারে,
কিন্তু বারা শিক্ষিত বলিয়া সমাজের শ্রদ্ধা দাবী করিতে-
ছেন তাহাদের পক্ষে খেলার ক্ষুদ্র বাদবিসম্বাদ করা ও নীতি
অমাত্র করা, কখনও শোভা পায় না। এই খেলার মধ্যে
যদি হু একজন প্রকৃত ব্যক্তি সত্যত উপস্থিত থাকেন এবং
অতিভাবকগণ সর্বদা মাঠে আসিয়া উহারের এই নির্দোষ
ক্রীড়া ও আমোদে সহানুভূতি দেখান তবে খেলার মত্ততা
অনেকাংশে কমিয়া যায় এবং ইহার কুফল নিবারিত
হয়। খেলার যে একটু প্রাণসঞ্চারী প্রভাব আছে,
তাহাও তখন অমূল্য হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুহ।

স্মৃতি ।

দীন দরালের বৈঠক খানা
করেছি আফিস ঘর ;
তাহাতে বসিয়া পাঁচ সাত জন
নাহি করি কারো ভয় ।
রাজনীতি হবে গজাইয়ে ওঠে,
ঐ ঘরে লবে বাই হুট পাটে;
বার্ক, মাজ্টোন মরলে মট্টেও
কাঁধে করিয়াছে তর,

যদি কত কথা, গলা ভেদে ভেদে,

হয় মাথা ঘন ঘন।

২

রাজনীতি এই, শিখে যাও তবে,

হাতে চাও দেশ স্রাতি ;

যাদের মগজ্ হরয়েছে পরম

বলে যাও হুঁটো কথা।

করিতে হবেনা কোন কাজ আর,
Speech দিয়ে হবে পগাড়টি পার।

দশ জন মিলে বলুক না কেন—

হুই দশ কড়া কথা ;

Lecture দিতে হবে না কলুর,

Lungsএ হবেনা ব্যথা।

৩

রবি শশধর ফেলিব উপারি

কথার দাপটে মোরা

দেশ হিত নীতি বলিব বধন,—

সকল কথার সেবা ;

চাঁদার খাতাটি তোমাদের কাছে,

লইয়া বাইব, বড় বেছে বেছে,

পালাতে নারিবে, হইবে যে দিতে,

সবার পকেট কাড়া ;

এতেই তোমরা Nation হইবে।

হুই পারে হবে খাড়া।

৪

তোমরা সকলে যানব অধম

তাইতো চিননা স্রাতি ;

তনিরে শোননা আমরা যে বলি—

তোমাদের হিত কথা।

কত কাজ তরে বলি তোমাদের,

করিতে চাহনা, একি গ্রহকের!

পাল্‌জী জবাবে আমাদের কাছে

চাও হিসাবের খাতা ?

স্রাতির জবাবদিহি করিবারে

কেননো বাহাও মাথা ?

৫

মোদের জনম ভারত ভূমিতে

তধু কথা বলিবারে ;

আমনা ভোমরা, Speech দিতে আন

তাই কথা কাটিবারে।

বাহা করিবারে বলি তোমাদের,

করিতে পারনা, কথা বল কেন ?

কোন্ দেশে আর তনিরাহ কেহ—

চাপে স্রাতাদের কাছে ?

আমরা বলিব, তোমরা তনিবে ;

লইব Nation গড়ে।

৬

ব্যবসা না বুঝে কথা শুনে তধু

করেছ কোম্পানী খাড়া ;

তিরেকটার তার হয়েছি আমরা,—

সকলি হয়েছ সারা ;

হু একটা আকো ষিকিৎসে, অলে,

মরিয়া বেঁচেছে পূর্বজন্য কলে!

শিখে নেও, চাও স্রাতা হইবারে,

মোদের কাজেরধারা ;

দেখনা Nation Embryo

শরীর দিতেছে কাড়া।

৭

আমাদের ছেলে এম এ বি এ করে

চাকরী জুটায় দিবে,

তোমাদের তরে খুলিব দোকান

Share-এর খাতা নিরে।

মোদের যে ছেলে পাবেনা চাকরী,

উকীল হবেনা, পাবেনা ডাক্তারী,

প্রধান হইবে সেই দোকানের—

প্যাণ্ট গরে বুট পাবে,

হুইন কপিয়া বাস মাছিরান।

তার তরে দিবে ধুরে।

সমস্যা ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

রাজনীতি কেন, কোন নীতি তবে
খুলিনি বরের পাতা ;
তুইফোড় নীতি শিবিরে রেখেছি,
তাহতেই বাসিছে মাথা ।
প্রতিবাদ হ'লে তাই উঠি অঙ্গে ।
জবাব জোটেনা ডুবুরি নামালে,
নাড়ী তুড়ি শুধু বাহিরিতে চার,—
খুলি কলেকের খাতা ।
এই পূঁজি নিয়ে গড়িয়ে Nation
আমরা হইব স্রাতা ।

তাই দেখা যায় পূরব গগনে
উবার কিরণ রেখা ;
Agitationএর ফলিরাছে ফল
স্পষ্ট যেতেছে দেখা ।
যদি কিছু দিন পারি চালাবারে
বক্তৃতা নীতি প্রতি ঘরে ঘরে,
দূর করিবারে পারিব আমরা
জনন ভূমির বাধা ।
কন্সকোয়েন্স কংগ্রেসে যোর
যুঁরিনাকো বধা বধা !

জানিনা তোমরা হয়েছি আমরা
নিরেট বেহারী হক ।
স্রাতা হলে আর থাকিতে হয়না
নিয়মেতে অবরুদ্ধ ।
লোকমত বলে করিয়া প্রচার
পালনেতে তার নাহি অধিকার ।
আজ একমত, কাল আর এক—
মিত্যই নৃতন শ্রাব ।
বুড়ির চোটে কথার দাপটে ।
Nation হইবে সত্য ।

ঐক্যমুখিকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ।

গ্রীষ্মের ছুটিতে শৈলেন বাড়ী বার নাই । তাহার
মানসিক অবস্থার ঘোর পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে । “দ্বিত-
সাধিনী” পত্রিকার সংবাদ ভূতে সম্মান বাড়ীর লোম-
হর্ষণ ঘটনার সংবাদ পড়িয়া দুই দিন পর্যন্ত সে কাহারও
সহিত বাক্যালাপ করে নাই ; তাহার মানসিক
অবস্থা কাহাকে খুলিয়া বলিও প্রয়োজন মনে করে
নাই । নগেন তাহার কারণ বুঝিরাছিল—কেন না, সে
এ সংবাদ জানিত । সেও কিন্তু কাহাকে এ সংবাদ
জানিতে দেয় নাই !

হুর্গাদাস বাবু শৈলেনের অন্তরের সংবাদ পাইয়া এক
দিন একা আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিলেন ; আর একদিন
মেয়েদিগকে লইয়া আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন । পারুল
ও বকুল অহরোধ করিয়া গিয়াছিল—একটু জ্ব্ব বোধ
করিলেই যেন শৈলেন তাহাদের বাড়ীতে বার । শৈলেন
বার নাই ।

নগেন এখন হুর্গাদাস বাবুর বাড়ীতে বৈকালিক
চা পান বৈঠকের একজন রীতিমত সভ্য ; কখন কখন
দুবেলাও তথার পদধূলি ফেলিয়া থাকে ।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ হুর্গাদাস বাবুর জন্ম-উৎসব । পারুলের
প্রস্তাবে ও নগেনের অনুরোধে এবং শেষ গৃহিনীর
সমর্থনে উৎসবের বিশেষ আয়োজন হইয়াছে ।

প্রাথমিক ছাপা হইয়াছে—

প্রাতে ৬—৭টা উপাসনা ।

৭—১০টা কীর্তন ।

১০—১২টা দরিদ্র বিদায় ।

১—৩টা তত্ত্ব উপদেশ ।

অপরাহ্ন ৪টা—৬টা টালিপঞ্জ বাগান বাটীতে
উৎসব ।

৬টা—৭টা তথার উপাসনা ।

শৈলেনকে পারুল নিজে হোটেলে আসিয়া হাতে
ধরিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছিল । আজ নগেন আসিয়া
কাহাকে লইয়া গেল ।

উপাসনার এই সববেত হইরাছেন—শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়াছেন, ডাঃ বসু ও তাঁহার পরিবার আসিয়াছেন, ডাঃ পাদুলী আসিয়াছেন, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকটা ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী আসিয়াছেন, দুর্গাদাস বাবুর অন্তরঙ্গ আরও কয়েক জন বন্ধু আসিয়াছেন। আর আসিয়াছেন—বিধু বাবু, যতীন বসু, শৈলেন ও নগেন।

উপাসনার পর সন্ধ্যা। পাকুল ও বকুল সমস্তরে গান গাহিল। সন্ধ্যা শুনিয়া শৈলেন মুগ্ধ হইয়া গেল। এমন সুধামাখা সন্ধ্যা সে আর কখন শুনে নাই। জীবন ভরিয়া সে গণিতেরই উপাসনা করিয়াছে, কল্পনায় যে সন্ধ্যা সে জগত্রে অসুভব করিয়াছিল, জগত্রে বীণা হ্রিম করিয়া সে সন্ধ্যা গগনে পবনে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। আজ নুতন করিয়া বেন সে নুতন সন্ধ্যার তান জগত্রে গাঁথিয়া লইল। সে সন্ধ্যা কীত মধুর। সন্ধ্যা শুনিয়া শৈলেন আজ মনে বড়ই আনন্ড অসুভব করিল।

তারপর কীর্তন। কীর্তনও তাহার মনে সেই উদাস ভাবই জাগাইয়া রাখিল।

কীর্তনের মাঝখানে পাকুল আসিয়া তাহাকে জল খাইবার জন্য উঠিয়া যাইতে অস্বরোধ করিল। শৈলেন কীর্তন ছাড়িয়া গেল না।

কীর্তন শেষ হইলে শৈলেন বিদায় গ্রহণ করিল। পাকুল দুই হাত কোড় করিয়া বিনীত ভাবে কহিল, আপনাকে আর এ বেলা কষ্ট দিব না। ওবেলাতে কিন্তু ৩টার আপনার নিকট গাড়ী লইয়া বাইব। আমাদের টাঙ্গানের বাগান বাড়ীতে বাইতে হইবে। নগেন বাবুরা সকলে ট্রামে বাইবেন, আপনাকে আমাদের সঙ্গে বাইতে হইবে।

শৈলেন উত্তর দিতে পারিল না, ধীরে ধীরে চলিয়া আসিল।

শৈলেনের এই মানসিক ভাব পরিবর্তনের কারণ দুর্গাদাসবাবুর নিকট কেহ না বলিলেও কিছু দিন মধ্যেই তিনি তাহা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন।

পূজার পারিবারিক মানসিক অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া

জগদ্বদু বাবুই দুর্গাদাস বাবুকে সকল কথা লিখিয়া ছিলেন এবং তাহার তত্তাবধান করিতে তাঁহাকে অস্বরোধ করিয়াছিলেন। এই সূত্রে পাকুল প্রকৃতিও শৈলেনের মানসিক অসুস্থতার কারণ জানিতে পারিয়াছিল।

ঐ কারণে শৈলেনের এইরূপ মানসিক অসুস্থতার শুরুতাকে পাকুল বড়ই উচ্চ আদর্শে গ্রহণ করিয়াছিল।

একদিন নগেন ও যতীনের সঙ্গে কথায় কথায় পারিল বলিয়াছিল—“শৈলেনদার ভাব-উদ্ভাটনা খুব পতীর আয়তন হইতে উদ্ভূত।”

হাসিয়া নগেন বলিয়াছিল—“পতনের রূপ তুমার জায় পাগলামী ও মারাত্মক।”

যতীন বোস বলিয়াছিল—“আমি বুঝতেই পারি না—এরূপ ভাব এতদিনও কিরূপে টিকে থাকতে পারে।”

পাকুল বলিয়াছিল—“পতনের তুমার পতীরতা ঠিক পতন না হইলে কেহ বুঝতে পারে না। যে বাবা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধ করে, সেই উপলব্ধ জিনিসের মূল্য কল্পনা, তাহা অস্ত্রে কি বুঝবে?”

শোভন পাকুলের কথার উত্তরই একটু চুপিয়া হইয়াছিল। পাকুল আর তর্ক করে নাই।

শৈলেনের প্রাতঃসেহ কারণে পাকুলের সমস্ত প্রকৃতি প্রভাব নত।

ঠিক ৩টায় আসিয়া পাকুলের গাড়ী মেডিকেল কোলেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। আশা ভিতরে বাইরা শৈলেনকে লইয়া আগল। শৈলেন গাড়ীর উপরে বাহতে চাহিলে পাকুল দুঃখিত হইয়া বলিল—“তাহা হইলে আগল এহ গাড়ীতেহ বহন, আমরা তাই বোন্ গল গাড়ীতে বাহ।”

শৈলেনের আর উত্তর চলিল না; সেওতো তাহার ‘শৈলেন দা’—তাহা বোনেরই একজন।

শৈলেন আশাকে লইয়া একদিকে বসিল, পাকুল অন্য দিকে বাসল।

পাকুল জিজ্ঞাসা করিল—“আজকার কীর্তন আপনাদের নিকট কেমন বোধ হইল শৈলেন দা?”

শৈলেনের কথা বলিবার বেশী ইচ্ছা ছিল না, অথচ প্রশ্নের উত্তর না দিলেও নয়; সে বলিল—“বেশ হইয়াছিল।”

পাড়ীর মধ্যে কথা শোনা শুধু বাইরে ছল না, সুতরাং
কিছু কিছু গিয়া টাখ চলিয়া বাইবার অপেক্ষা পাড়ী
বাইরে হটল তখন পাকল পুনরায় প্রস্থ করিল—

“আমাদের দাত্তী আপনাদের মতকি কেমন বোধ হইয়া
ছিল ?”

শৈলেন সংক্ষেপে উত্তর দিল—“বেশ শান্তি পাই-
য়াছি ।”

“সত্যের সময় তো কোন কাজই করেন না শৈলেন
জা, তখন একবার আমাদের বাড়ী আসিল কি হয় না ?
আমরা যে লক্ষ্য উৎসাহের সময় প্রতিদিনই এইরূপ গান
গাইয়া থাকি ।”

শৈলেন উত্তর করিল—“হুয়াস মধোই পরীক্ষা দিতে
হইবে, এবে আমাদের Final Examination, সময়
কিবা ?”

পাকল ঘাট ঘীরে বলিল—“মমের এইরূপ শুভ্র
কিন্তু আমরা আপনাদের পরীক্ষার appear হইবেন কি
করিয়া আসি যে মুকুতে পারিতেছি না ।”

শৈলেন বলিল “দেখিবা ।”

পাড়ী পুনরায় চলিল এবং বাগান বাড়ীর গেটে
আসিয়া থামিল ।

এখানে কলের গানের ও মেধেদের গান বাজা-
বার বন্দোবস্ত ছিল । বিধুবাবু, নগেন ও যতীন্দ্র বাবু
সহিত আসিয়া সকল বন্দোবস্তই করিয়া ছিলেন । বিধু-
বাবু ব্রাহ্ম মন্দিরের একজন সাধক ও বটেন তাঁহার নাম
স্মৃতি হইতেই শোনা বাইতেছিল । আশা নাথিয়াই
দৌড়াইয়া চলিল ।

পাকল শৈলেনকে হাতে বহিয়া লইয়া বাইতেছিল ।
শৈলেন কুটি ও হঠাৎ হাত ছাড়িয়া নিল । নগেন দূর
হইতে শৈলেনকে দেখিতে পাইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা
করিয়া গেল ।

বাগান বাটী থানা অতি পরিপাটি—পূর্ণ সুখে অবস্থিত ।
সেই হইতে দক্ষিণ দিকে একটা বড় রাস্তা গিয়া তাহা
ঠিক চক্রাকারে ঘুরিয়া বাম দিকে আসিয়া পুনরায় গেটে

ঘিলিয়াছে । সেই বড় রাস্তাতে ক্রম ক্রম রাস্তা আলিয়া
খিলিত হইয়াছে । গোল রাস্তার মধ্যস্থলে নামা বাড়ীর
ফুলের গাছ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজান রাখিয়াছে । তাহার
মাকে মাঝে বাসবার আসন স্থাপিত । রাস্তার দুই পার্শ্বে
২ ফুট চওড়া করিয়া লাল মাল সেনপাৰ্জ গোপন করিয়া
তাৎ এমনি ভাবে সজান করিয়া ছাটিয়া দেওয়া হইয়াছে
যে দেখতে ঠিক বেন ২ ফুট চৌড়া এক থানা গালিচা
আচ্ছাদিত রাখা হইয়াছে বালিয়া মনে হয় । দাক্ষণের
দিকে পাতা বাহারের একটা চক্রবাহ । বহু ঘুরিয়া করিয়া
—একবার বাহির হইয়া, আর একবার মধো গিয়া—
ব্যুৎসার ভিতর প্রবেশ করিতে হয় । একবার প্রবেশ
করিলে, ব্যুৎসার ভিতরে না পহুছিয়া পাতা বাহারের
দেওয়াল ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার আর উপায় নাই ।
উত্তরাদিকে অন্ধকারের কুঞ্জবন । সেই অন্ধকার কুঞ্জ-
পঙ্কজাতকর কারণে পর বেন মন্দন কানন । তাহা
দুখা আতঙ্কে বাসিয়া এখানে বর্ণ সুখ উপভোগ কর-
য়া । পাশ্চমে একটা হেন্স ডাকাটারের পুষ্কারগী
পুষ্কারগীটা রক্ত কুণ্ডল পল্লবে সমাচ্ছন্ন । তাহার তীরে
নারকেল ও খজুর বৃক্ষের সারি । পুষ্কারগীটার
পুষ্কারকে সোড় বাধান ; সোড়র উপরে একটা দোতাল
গৃহ ; তহাই বাগান বাটা ।

নগেন শৈলেনকে বাগানের সমুদ্রের ভাঙ্গট
দেখাইয়া আসিয়া বিশ্রাম করতে বাসল ।

পাকল শৈলেনকে ডাকিয়া উপরে লইয়া গেল ।
সেখানে ব্রাহ্ম বৈষ্ণবের মেয়েরা অসংখ্য বাজাইয়া গান
করিতেছিলেন । গান থামিলে একল মকে দাঁড়াইয়া
রাব ঠাকুরের “পুরাণ কৃত্য” কাব্যতাটী ঠিক তাৎ অঙ্কুর
ভঙ্গিতে পাঠ করিল । মুকুলের বদন্তী ও মুখের ভঙ্গ
দেখিয়া শৈলেন মা হাসিয়া থাকিতে পারিল না । ইহা
পর আর তাহার ভাল লাগল না, সে বাহির হইয়া
আসিল ।

মোটের তলায় চাপর হইতেছিল । বাহিরে কনো
প্রাকের গান চলিতেছিল । শৈলেনের মনটা কোথা-
তাল বলিতেছে না, বুঝিয়া পাকল তাতাকে তাহার মত
দিয়া বলিল “বাতো ভাতা, শৈলেনকে কুঞ্জবনে নি-
য়ে

বা—বাম শৈলেননা, সেখানে তারি আদাম পাঠিয়েন।”

শৈলেন একটু শান্তিরই অনুসন্ধান করিতেছিল।
ভাতার সঙ্গে গিয়া অঙ্ককার কল্পনে প্রবেশ করিল।
সেখানে কল্পবিকট আদাম। শৈলেন-কল্প-ম ঘুরিয়া
বুড় হইয়া গেল—যাকি যেন ভাতাকে চটকাই বলিয়া
আজিলম পাশে আবদ্ধ করিয়া জটিল। সে ত’ভাতাক
বরিয়া জটয়া সেট নির্মল ললাসাম বসিয়া পড়িল।
চরিত্রিক উক্ত বুদ্ধ ও অঙ্ককার কল্পবনে ঘরা সূর্য-
রশ্মি প্রবেশের পথ বীজ ছায়া শীতল এ স্থানটি প্রকৃতই
শান্তি নিকন্তম।

শৈলেন বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। ভাতা বাপানের
বহির্গত শিশুটিকে দোড়াটতে লাগিল।

যদিলাদিগের কাকলিতে যখন কল্পবন মুখরিত
হইয়া উঠিল, তখন শৈলেন চকিতে পাল্লাখান করিয়া
এক দিকে সরিয়া গেল এবং ভাতাকে লইয়া বীরে
বীরে কুঞ্জের বাহিরে চলিয়া আসিল।

পাকল ভাতাকে পথে আটকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল
“কল্পবন আপনার নিকট কেমন বোধ হইল?”

শৈলেন বলিল—“ভাল লাগিলেই কি আর সর্বদা
এখানে আসিবার উপায় আছে?”

“পরীকার পরেতো সর্বদাই আসিতে পারিবেন।”

“দেখা যাবে।”

“ওদিকের চক্র বাবুটা দেখিয়া আসিয়া বসুন ওখানে,
আমরা আসিতেছি।”

শৈলেন ভাতার হাত ধরিয়া বীরে বীরে চলিতে লাগিল।

উত্তর হইতে দক্ষিণে বাটতে গুঁটির সমুদ্র দিয়াই
বাইতে হয়। গৃহের সমুদ্রে আসিয়া যাত্রা বিধু বাবু
বলিলেন—“বসুন শৈলেন বাবু, চা টা হোক”
তিনি আশাকে চা আনতে ডাকিলেন। এই সময়
হুগানান বাবুও ভাতার আর করেকজন বন্ধকে লইয়া
পুকুরের পাড় ঘুরিয়া চক্রবাহে বাইতেছিলেন। সুতরাং
শৈলেন অপেক্ষা করিল।

শান্তী মহাশয় ঘরে ছিলেন, তিনি আসিয়া বাহিরে
বলিলেন।

শান্তী মহাশয় বিধু বাবুকে দিতে চাহিয়া বলিলেন—
“ভাতামোহন বাবু এলেন না কেন?”

বিধু বাবু বলিলেন—“আজ্ঞে তিনি তাঁর একটা
আত্মীয়ের মৃত্যুতে গিয়া চলে গেছেন।”

বিধু বাবু কান্ড হ’লেন না—বলতে লাগিলেন—“কিন্তু
কষ্ট যাহাকে প্রভাবিত করে কে-নে। ওর কোমল
Consolation-ই নেই।”

শান্তী মহাশয় বলিলেন—“হুগানান একমাত্র
কারণ, অমর দেব ভগবানে আশ্রয়। Consolation
খুব আছে।”

বিধু বাবু বলিলেন—“আজ্ঞে আমরা কি তাঁকে
মামিমে? বিবেশ করিয়ে?”

শান্তী—“শিষ্টব করি না।”

বিধু—“ভগবান নেই?”

শান্তী—“যাহারা ভগবান বলিয়া একজন সর্বমিথ্যা
আছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন—তাঁহারা বিধিকে বিশ্বাস
করেন, হুগানান তিনটি ধারও ধারেন না।”

বিধু—আমরা কি মাত্তিক? আমরা ব্রাহ্মসমাজের
সকলেই পরমকারুণিক মঙ্গলময় পরম স্নাতকে পাণ্ডি
পরবলে বিবেশ করি। করি নে একথা কেউ বলতে
পারেন না; অথচ হুগানান কষ্টতো এক দিনের অধিক
একটু কয় ভোগ করিলে।

শান্তী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—“আপনারা ভগ-
বানের শক্তিকে নিজের শক্তি অপেক্ষ বেশী বলিয়া জ্ঞান
করিলে, আত্ম শক্তিকে কখনও এত প্রসন্নতর হোমেন
পাঠতেন না। ভগবানের শক্তিতে বিশ্বাস করেন না বলি-
য়াই প্রতী কার্যো প্রতী অনুষ্ঠানে নিজের শক্তির পরামর্শ
দিয়া থাকেন। তা’রপর শক্তি পরিচয়ের ফল হইয়া যখন
হুগানান কষ্টভোগ করিলে—বাঁকেন তখন তাহার হোমের
ভাগী ভগবানকে করিয়া থাকেন আমাদের বন্ধ হুগ-
ভাবে এধারণা বন্ধ মূল হয় যে ভগবানের উজ্জিত ব্যক্তিত্ব
অনন্তের একটি অঙ্গও এতক হইতে ওদিকে যায় না;
এবং হট্টই হট্টক আর অমট্টই হট্টক, সেট এক পুরুষ
জন্মেরই উদ্ভব হইতেছে এবং তাহাও অগতির কোমল
মঙ্গলের লভ্যই হইতেছে, তবে সে কর্ম দ্বারা দৌড়িক

কিছু বউকি আর অনিষ্টই হউক, লৌকিক সুখই হউক আর দুঃখই হউক, তাহা নিম্নের ভীতাই মঙ্গলময় অভি-
প্রায়ের হউক, এই সত্য বিশ্বাস করিতাম। এই
ধারণাই ভগবানের প্রতি দৃঢ় ধারণা। এই ধারণা
ধাকিলে অশান্তি ও দুঃখ যোগ হইতে পারে না।”

বিধু বাবু একটু অগ্রসর হইয়া হাত কচলাইয়া বলি-
লেন—“মহাশয়, আর একটু বৃদ্ধি করুন।”

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—“সোটা কথা বলিতে গেলে
এই বলিতে ভয় যে—আমরা ভীত হইতে অনেকটা দুশ্চিন্তা
পড়িয়া পড়িয়াছি এবং সেই ভয় সর্বদাই নিজকে বড়
বলিয়া মনে করিয়া থাকি। বিপদে পড়িতেই আত্ম
শক্তির দুর্বলতা উপলব্ধি হয়। তখন ভগবানের উপর দোষ
দিয়া—দুঃখ কষ্ট ভোগ করি। আমার ভিতরে ভগ-
বানের ভাব জাগ্রত থাকিলে আত্ম আমার প্রিয়তম
স্বজন্ম বিরোধেও মনে হইবে মঙ্গলময়ের কোন শুভ
অভিপ্রায় নিছির ভয়। তাহারই উচ্ছার একাধা হইয়াছে।
পূজ্য বর্তমান থাকিলে তাহা—যায়া অবশ্যই আমার কোন
না কোন অনিষ্ট হইত। এই ধারণা যদি আমার
থাকে—তবে কি আমার দুঃখ বা কষ্টের কারণ থাকিবে?”

শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা শুনিয়া শৈলেন মনে বেশ
স্বস্তি পাইতেছিল। সে মনে মনে ডাকিল—“ভগবান
কোন সাধু উদ্দেশ্যে তুমি এক্সপ করিলে তুমিই জান;
কিন্তু তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!”

বিধু ছাড়িবার পাত্র নহে, সে বলিল—“আমি যে
ভগবানকে বিশ্বাস করি নে, একথা ভাল করে বুঝেই
হইতে পারুন না—আমার সম্বন্ধে—।”

শাস্ত্রী মহাশয় এই সরলচিত্ত জীবটিকে লইয়া একটু
দুঃখ হইলেন। তিনি একটু রাগ দেখাইয়া বলিলেন—
“আপনিকি সর্বদা সত্যকথা বলিয়া থাকেন? কোন
অজ্ঞান কর্তব্য করেন না? সত্য করিয়া বলুন দেখি।”

বিধু—“এমন কি সত্যি করে বলতে পারি?”

শাস্ত্রী—“কেন পারেন না?”

বিধু—“কত সময় কত অজ্ঞান করে কেলি।”

শাস্ত্রী—“মিথ্যা বলেন না?”

বিধু হাসিত হইয়া বলিল “বলি বই কি?”

শাস্ত্রী—“সেই যে অজ্ঞান করেন ও অসত্য কথা বলেন,
অবশ্য লোকের নিকট নিজকে সত্য বাদী বলিয়া ভাবমান
বলিয়া পরিচয় দিতে। ঠিক নয় কি? এখনও কে একটু
গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেও সেই কারণে।”

বিধু বিমৌল ভাবে বলিল—“আজ ঠিক বলেছেন।”

শাস্ত্রী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—“ভগবানের প্রতি
অবিশ্বাস হইতেই বিশ্বাস উৎপত্তি—আপনি ভগবান
অপেক্ষা মানুষকে বেশী ভয় করেন এবং নিজকে অধিক
বড় করিতে চান। ভগবানকে বেশী ভয় করিলে—
সর্বদা ভগবানের অজ্ঞাতে যে আপনি এই পাপ
করিতেছেন না, সেটাই ভাবিয়াই লজ্জিত হইতেন।”

শৈলেন হাসিয়া বলিল—“ঠিক কথা, আমরা ভগবান
অপেক্ষা মানুষকে ভয় করি বেশী। মানুষের নিকট নিজকে
সত্যবাদী বলিয়া পরিচয় দিবার সময় ভগবানের কথা
একবারেই ভুলিয়া যাই।”

এই সময় মহিলারা কুঞ্জবন হইতে বাহির হইয়া
আসিলেন। হুর্গাদাস বাবুও বঙ্গুপন সহ সেই স্থানে
আসিয়া পৌঁছিলেন।

শৈলেন চক্ৰবর্তী দেখিয়া সন্ধ্যা সমাগমে হুর্গাদাস
বাবুর নিকট বিদায় হইলেন। পাকুল তাহাকে পাড়ীতে
বাইতেই অনুরোধ করিয়াছিল—সে তাহা রক্ষা করিতে
পারিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে পাকুল কল্পিত হস্তে
তাহার গলায় একটা ফুলের মালা ও বুকের পকেটের
উপর একটা গোলাপ ফুলের “বোকে” বসাইয়া দিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সমাজ সমস্তার মাথা দিয়া তারাচরণ মুখুর্জী বড়ই
বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। পুলিশের চাকুরীর পরিণামে
যে বিপদ তাহার স্বন্ধে পড়িয়াছিল তাহা হইতে নিষ্কৃতি
পাইতে হাতের টাকাতো সকল গিয়াছিল, তাহার পরও
গ্রাহ্যেব তারাপদ সাতাল হইতে জাম বাড়ী রেহাণ-
বন্ধক রাখিয়া ঐশ্বর্য হাণ্ডার টাকা আনিয়াছিলেন।
সে টাকার একটা পরসী মদও এ পর্যন্ত পরিণাম
করিতে পারেন নাই, ছয় বৎসরে তাহা সবে আসতে
আর পৌনে পাঁচ হাণ্ডারে দাড়াইয়াছিল।

সামাজিক দলদলি বন্ধন চরমে উঠিয়াছিল, তখন শ্রীরপুরের অন্ধা অনাবদ্ধক যোদ্ধারা আদালতে গড়াই। তারাপদ সাক্ষালও সেই সময় তাহার রেজেন্সী ধর্তের লালি করিলেন। ইচ্ছা করিলে সাক্ষাল আরও পাঁচ ছয় বৎসর অপেক্ষা করিতে পারিতেন; তিনি তাহা করেন নাই। তারপদ বন্ধন সাক্ষাল বাড়ীর দুর্ঘটনার মূল বলিয়া সকলেই তারাপদকে সন্দেহ করিল, তখন তারাপদ তাহাকে গৃহীত পথের ভিখারী করিয়া বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

যোদ্ধারা ডিক্রি হইয়াছে। দাবী আদালত খেচ সহ আর পাঁচ হাজারে উঠিয়াছে। স্তব্রাং দরবার তাহার পক্ষে অসাধ্য—তরসা এক মাত্র পুত্র; সেও যদি অসাধ্য হয় তবে সাক্ষালদের প্রতিজ্ঞা কলিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।

তারাপদ ঐশ্বর্য বন্ধে পুত্রকে বাড়ী আসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া লিখায় ‘অস্ম্যৎসব’ শেষ করিয়া নগেন বাড়ী আসিয়াছে।

প্রথম দিন তারাপদ ঋণ সঙ্কে পুত্রের নিকট কোন কথাই ভুলেন নাই। পরদিন প্রাতে তিনি নগেনকে জানাইলেন—

“সাক্ষালের ডিক্রির একটা হেতুনেস্ত না করিলে আর চলে না; লোকটা কেবল হুজুগে মাতিয়া নাশিষ্ট টা করিয়াছে—সময় ছিল তার আরও ছয় বৎসর।”

নগেন কোন কথা বলিল না। চৌকীর কোণে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

তারাপদ—“এ সঙ্কে পরামর্শ কি? ডিক্রির টাকাটা এখন আদালতে দাখিল করিয়া দিতে পারিলেই মুখ থাকে।”

নগেন—“আমি এ সঙ্কে কি বলিব? আমার যোগ্যতা তো দেখিয়াছেন। দুটি বৎসর বসিয়া থাকিয়াও একটা ২৫ টাকার চাকুরী পাইলাম না। আমি এখন এই সমস্তার কি করিতে পারি?”

তারাপদ—“এখন তো তুমিই করিবে—উপযুক্ত পুত্র হুজি। চুরী কর, চাষারী কর, বেয়ন করিয়াই হউক, ঋণও দিতে হইবে, পরিবারও প্রতিপালন করিতে

হইবে। আমার এ বৃদ্ধ বয়সে কি আর ভিত্তার আর আছে?”

নগেন—“আমাকে কি করিতে বলেন? এ সঙ্কে আমার একেবারেই কোন অভিজ্ঞতা নাই। কোন পদা নির্দেশ করিলে সে সঙ্কে ভাল মন্দ আলোচনা করা যায়।”

তারাপদ বলিলেন—“ঋণ তো শোধ করিতে হইবে?”

নগেন বলিল—“না শোধ করিলে কি হইবে?”

তারাপদ তা স্মরণ বলিলেন—“পাগল, এ ঋণ শোধ না করলে, মাথা বাধিবার স্থান থাকিবে না। এ যে বাস্তবতা লইয়া গেল।”

নগেন বলিল—“সে তো ঠিক কিন্তু এ বাস্তবতা কি পাঁচ হাজারেরই উপযুক্ত! তুমি করিলে কোনমতে শুরুতব—পাঁচ হাজার টাকা, না এই জমি-বাড়ী? অবশ্য যদি জমি বাড়ীই অধিক মূল্যবান হয়, তবে এই জমি বন্ধক দিয়া অনায়াসেই সস্ত্র কোন স্থান হইতে পাঁচ হাজার টাকা আনিয়া এ ঋণ শোধ করা হইতে পারে।”

তারাপদ—“সেটাই তুমি ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ। এই পৈত্রিক ভিটা বাড়ী গেলে, ঐ পুত্র পরিজন লইয়া কোথায় গিয়া দাঁড়াইব, কাহাকে বলিব, একটু স্থান দাও—কেই বা সস্ত্রপ স্থান দিবে।”

নগেন বলিল—“জয়নগরের বাড়ীতো খালি পড়িয়াই আছে; যদি পাঁচ হাজার টাকা এ বাড়ী-জমির মূল্য যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবে তাহা আপাততঃ বরং ছাড়িয়া দেন। পাঁচ হাজারের উপর বাড়ী জমি বিক্রয় হইয়া যাউক। আমরা গিয়া জয়নগরেই বাস করিতে থাকি।”

তারাপদ বলিলেন—“পৈত্রিক বাড়ী নিলামে তুলিয়া শেষ বরসে ঋণ বাড়ীতে থাকিবে?”

নগেন—“ঋণ করিলে তো ঋণ দিতে হইবে? এখন পাঁচ হাজার টাকা কল্প করিয়া যদি জমি বাড়ী রাখেন শোধ দিবার উপায় কি? আর ছয় বৎসরে যে তাহা ৮ হাজার হইবে, আর বৎসরে ১০ হাজার হইবে।

কিছু কহিয়া কি কেবল অভাবের সঙ্গেই বৃদ্ধ করিব ?
এ বুদ্ধি কি সর্বাঙ্গীণ ?

ভার্য্যচরণ—“সংসার করিতে হইলে, পিতা মাতা
দ্রী পুত্র প্রতিপালন করিতে হইলে, অভাবের সঙ্গে
বুঝিতে হয় বৈ কি ? কমতী থাকিলে হয়ও না।
তুমি বি, এ, পাশ করিয়াছ এম, এ, পাশ করিয়া
উকীল হইবে—তোমার উপর সংসারের সমস্ত ভার—
এখন তুমিই যদি নিরাক্ষর করিয়া দাও—”

নগেন—“তেমন অদৃষ্ট হইলে তখন এরূপ ভবি
ষ্যতী পীরপুরে বসেই পাওয়া যাইবে। আমি এই ভবি
ষ্যতী দশ হাজারের দ্বারিখে রাধিবার পরামর্শ সঙ্গত
মনে করি না।”

ভার্য্যচরণ—“পাপল, দশ হাজার হইবে কেন ? বার
বৎসরের মধ্যে কি আমাদের অবস্থা ভগবান একটুও
উন্নত করিবেন না—পেলা, খেলা এরা চাইওতো তত
মিলে বি, এ, পাশ করিয়া তোমার সাহায্য করিতে
পারিবে ? সাহস না থাকিলে কি এ দিনে চলে !”

নগেন এ পর্য্যন্ত কোন কথাই স্পষ্ট ভাবে উত্তর দেন
নাই ; অথচ প্রতি কথারই তেমন উত্তর তাহার মনে
বোলাইয়া উঠিতেছিল। এইবার সে ধীরে ধীরে বলিল—
“অতি সাহসের কল প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে।”

ভার্য্যচরণ রাগ করিয়া বলিলেন “আমার বাবা যদি
আমাকে বি,এ, পাশ করাইতেন, আমি এরূপ দশ
হাজার বিপ হাজার কে ভুল জান করিতাম।”

পিতার খরচে নগেন বি,এ, পাশ করেন নাই। এক্টেল
পরীক্ষার পূর্বেই তাহার পিতার চাকুরী গিয়াছিল।
ভার্য্যচরণ সে নিজের চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত পাঠ বজায় রাধি-
রাছে। তাই পিতার কথার বলিবার মত উত্তর তাহার
মনে জমিয়া উঠিয়াছিল। সে নিজেকে সংযত করিয়া
বলিল—“আমার সাহসে কুলার না, তা আমি কি করিব।
আপনি যদি ভাল বুঝেন তাহাই করুন।”

ভার্য্যচরণ “বাজারের বিকুপাল রোডে রাধিয়া পাঁচ
হাজার টাকা কর্তব্য হইতে সম্মত আছেন। আমি তাহা
সইয়াই সাক্ষাৎকরণে দেখি করিয়া দিতে চাই, তোমা-
কেও সেই দ্রব্যই আনিয়াছি।”

নগেন “যে এ টাকা পরিশোধের উপায় ?

ভার্য্যচরণ “তাঁহা বটেই। তাহারও বোপাক এক-
রকম ঠিক।”

নগেন “তা যদি ঠিক থাকে তবে আমার আপত্তি
কারণ কি ? আর আপত্তি থাকিলেই বা তার মূল্য
কত ?”

ভার্য্যচরণ কতকণ ধাবিয়া থাকিয়া বলিলেন—“ভা-
গ্যের কুজবাবু যেরূপ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।
অবস্থা তাঁহাদের মন্দ নহে। আমি অনেক পত্র বাদে,
মগদ পাঁচ হাজার চাকুরী ছিলাম, আড়াই হাজার দিতে
তাঁহারা সীকৃত। একটু দম ধরিলে তিনহাজার পাওয়া
যাইতে পারে। যেরূপী তত ধরের, দেখিতে মন্দ নহে।”

নগেন চঠাৎ কোন উত্তর করিল না। উত্তর করিবার
প্রয়োজনও দেখিতে পাইল না। চুপ করিয়া রহিল।

ভার্য্যচরণ বলিতে লাগিলেন—“আমি কতক
বদি তিনহাজার শোধ দিতে পারি, থাকে দুইহাজার।
তা না হয় বাহিরের ভবিষ্যৎ কতকটা বিচার করিয়া ফেলি।
অন্নমণ্ডের তালুকের আরে ও বাকী ভবিষ্যৎ বামেই সংসার
চলিবে—পরামর্শ টাকি মন্দ মনে কর ?”

নগেন কোন কথাই বলিল না।

অতরাং ভার্য্যচরণ আর কোন কথা হইলনা। সন্ধ্যার
পর পিতা পুত্র পুনরায় একত্র হইলেন।

ভার্য্যচরণ কথা তুলিলেন—“টাকা সইয়া বিবাহ
করিব না,—একথা বোধ হয় তোমার অবস্থার লোকে
আর এখন বলিতে পারে না। এরূপ বলা নিতান্তই
পাপলায়ী।”

নগেন উত্তর করিল না।

ভার্য্যচরণ—“তাঁহা হইলে বিকুপালকে ধর কেওয়া
প্রয়োজন। দেখা পড়া—কাল হইয়া যাক।”

নগেন বলিল—“সেটা আর কাল কেন, ৮/১০ দিনের
অন্ত পাঁচ হাজারের পুর্বেই বা দেই কেন, আর ৮/১০
দিনই বা বলি কেন ? মাত্র ভিক্ষা হইয়াছে। ভার্য্যচরণ
ভিক্তীকারী নোনা, চেং নং নং—অবস্থা ৩০ বাল।
এই তিন তাঁর বালের মত কেন দেই। কর্তব্য করিতে
হয়, এখন নিতান্ত প্রয়োজন হইবে, তখন করিবেন।

আর তাহাতে আমার উপস্থিত থাকিবাইবা এমন কি প্রয়োজন ?”

ভার্যচরণ বলিলেন—“টাকাটা বুকের উপর না ফেলিয়া দিতে পারিলে তেজ খাটুক না। দেখুক বেটা—ভার্যচরণের কক্ষ আছে কিনা ?”

নগেন হাসিয়া বলিল—“এ বড় বেশী কক্ষতার বিষয় কি হইল? আর এক্ষণ ক্ষতি অনেক বেশ সর্বদাই নিশ্চয়ী।”

ভার্যচরণ হাসিয়া বলিলেন—“লড়িতে হইলে মানুষের মতই লড়িতে হইবে, মরার মত নহে। আর তোমার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন, তোমাকে সঙ্গে না রাখিয়া টাকা দিবে না। দুই জনের নামেই দলিল দিতে হইবে। জয়নগরের সম্পত্তিও রেহানাবদ্ধ রাখিতে হইবে। ওতে আর কি বিশেষ কতি ?

নগেন কথা শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তেজনা ধীরে ধীরে প্রশমিত করিয়া বলিল—

“দুই জনে দালিল লিখিয়া দিতে আমার কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না, কিন্তু জয়নগরের বাতামহ সম্পত্তি আমি রেহানাবদ্ধ করিতে কখনই পারিব না।”

নগেন ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

সে রাতে সে সন্ধ্যাে আর ভার্যচরণ কোন কথা তুলিলেন না। পরদিন প্রাতে তিনি পুনরায় নগেনকে ডাকাইলেন।

ভার্যচরণ নগেনের মেজাজ জানিতেন নগেন উদ্ধত স্বভাবেরও ছিল না, খুব অস্থগতও ছিল না। সে বাহা ভাল না বুঝত, তাহাতে হঠাৎ মতামত প্রকাশ করত না; কিন্তু বাহা অবশ্যই কর বসে করিত, তাহা করিতে একবার অসম্মত হইলে, তাহাতে আর কখনাপ সম্মতি দিতেন না। জয়নগরের সম্পত্তি বধন সে দায়াবদ্ধ করিতে অসম্মত হইল, তখন ভার্যচরণের সকল আশা ভরসাট শেব হইয়া গেল।

নগেন যে এক ব্রাহ্ম ডাক্তারের ঘরে বিবাহ করিয়া তাহার পরে বিলাত বাইতে প্রতত হইয়াছে তাহা তিনি পরেশের ও নলিনীর মুখে শুনিয়াছিলেন। তাহার

বাড়িতে আসির প্রায়ে এই কথা রটনা করিয়া ফিরাইল; এইরূপে ভার্যচরণও এই লংঘন শুনিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি পরেশ ও নলিনীকে ধেরা করিয়া ভিতরের খবর লইয়াছিলেন।

ভার্যচরণ সূচকুর লোক তাই প্রথমেই নগেনকে সে সকল প্রশ্ন না করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনে ছাড় পর হইয়াছিলেন। এইবার নগেন আসিলে তিনি বলিলেন—

“তোমারারা তবে কোন উপকার প্রত্যাশা বুধা ?”

নগেন চুপ করিয়া রাইল।

ভার্যচরণ বলিলেন—“গিও প্রাণের পথেও বালি দেখা বাইতেছে।”

নগেন তথাপি নিরুত্তর।

ভার্যচরণ—“ভানতে ছ তুমি ভগবন্ত বাবুর এক শাখীর কতা বিবাহ করিয়া বিলাতে বাইতেছ—ব্রাহ্মণের ছেলের কি নেব এই দুর্গত ?”

নগেন বলিল—“বাইবার প্রত্যাশা হইয়াছে বটে, কিন্তু আপনাদের সম্মতর অপেক্ষার আমি সম্মত যেই নাই; বিবাহের কথা মিথ্যা, বিলাত বাওরাকে দুর্গতি বলিয়াও আমি মনে করি নাই।”

ভার্যচরণ—“ভগবন্ত বাবুরই এই কাহুলাজি; নিজে ডুবিয়াছেন, পরকেও ডুবাতেছেন।”

নগেন—“ভগবন্ত বাবু বোধ হয় ইহার বিন্দু বিন্দুও জানেন না।”

ভার্যচরণ—“তবে তুমি বিলাতেই বাইবে?”

নগেন—“আপান বদ আমাকে গৃহে রাখিয়া ধন মুক্ত হইতে পারেন, প্রয়োজন কি বিলাতে বাইবার।”

ভার্যচরণ—“তোমা দ্বারা আমার যে গাধায়া হইবে, তাহাতে নমুনাতেও বুঝাখ।”

নগেন—“তবে আর তিন বৎসর পরে ওকালতি পাসের আশার বাসনা থাকিয়া কি হইবে। আপনাদেরও উপকারে আসনা না, নিজের জীবনটাকেও অত্যাঘ প্রত্যাশা রাখিব—এ কোন প্রয়োজন?”

ভার্যচরণ রাগ করিয়া বলিল—“ব্রাহ্মণের সম্মত লাহারামে রাইওনা। কুলে কলঙ্ক আনিও না। গিও গিভানদের গিও লোপ করিও না।”

হঠাৎ—“কালভি আমি পাল করিতে পারিব না।
হুইবেলা হুই কেবলেক লড়াইতে বাই, তারপর ম কলেক
বাই—” জুলিয়া রান আহার করি, কিছুকাল এম. এ.
ক্রাসে বাই—আমার পড়িবার সময় কোথায়
না জড়িয়া কি এম. এ. রি, এল হওয়া যায়?
এখন বাড়িতে ৫ টাকার বেদী কোন মতেই বিতে
পারিতেছি না। ল ক্রাস, এম. এ. ক্রাস ছাড়িয়া দিলেও
২৫ টাকার বেদী দিতে পারিব না। বি এ, পাস
করা দ্বারা আশক আনা থাকিলেও আমার দ্বারা আর
অধিক কি হইতে পারিবে, বুঝতে পারিতেছি না।
বদি বলেন, মাষ্টারের চেষ্টা করিতে পার। মাষ্টার
ভাবিত্ব আমার পাঁচ হাজার টাকা ঋণ আপনি কারবেন
না। সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাউক।”

জারনা রান হইয়া বলিলেন—“আহান্নামে যাও।”

নগেন ধীরে ধীরে পিতার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল।

পরদিন নগেন কালকাতা চলিয়া যাবে, সুতরাং
বিষয়ে তারাপদ সাক্ষাৎকারের সাহিত সাক্ষাত কারয়া
ভিকি কিছু কাল সময় দেন কি না চেষ্টা কারয়া দেখতে—
চাহিয়াছিল। মাতা বরোপের পর হইতে নগেন মাতা-
সহ আগুয়েই বাস করত, সুতরাং আশের কাহারও
সাহিত তাহার পারচর ছিল না। মাঝে মাঝে
২০ দিনের লক্ষ্য আসত, সমবন্ধ দপের সাহিত
সুয়েই সে সময় কাটাইয়া দিত; তারপর কালকাতার
গিরা অবাধ আশ ৭ ৭৭৭র মধ্যে সে পারপুর আশে
আসে নাই।

সে কিছুকাল আহারের পর অপবস্থ বাবুর সহিত
সাক্ষাৎ কারল। এবং তাকে লংরা তারাপদ সাক্ষাৎকার
সাহিত সাক্ষাৎ করিল।

নগেনের পরিচর পাইয়া তারাপদ হুখে কানিয়া
কর্মিলেন। তারচরণই যে তাহার কুলে কালকাতা লেপন
করিবার ব্যাপারে একজন শ্রেষ্ঠ পরামর্শ দাতা ছিল,
তাহা বলিয়া তারাপদ হুখে ও কোথায় অত্যন্ত হইয়া
পড়িলেন।

অপবস্থ বাবু নগেনের আশ্রয় জন্মিলে তারাপদ
দরেহে বলিলেন—“বাও বাবু, তোমাকে না জানাইয়া

তোমার অজ্ঞাতে আমি কিছু করিব না; তুমি যদি
বিলান্তেই বাও, আমি অপেক্ষা করিব। তুমি শীঘ্রপরে
অজিত পৌরব গ্রন্থ—পিতার কুবুড়ির আইনগণ ম
করিয়া—অপথে চলিয়া দেশের পৌরব রক্ষা কর।”

যাত্রার পূর্বক্ষেপে তারচরণ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করি
লেন—“আহান্নামের প্রভাব চালাইব কি?”

নগেন বলিল—“সম্পত্তি রক্ষা না পাইলে কেবা
বিবাহের ভাষা বিবাহ করিব না—উপার্জন-কর না হওয়া
পর্যন্ত করিব না।”

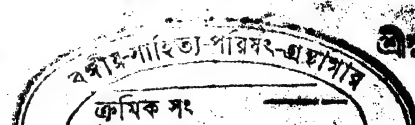
তার—“কেন?”

নগেন—“যে পিতা মাতার অন্নবস্ত্র বোণাইতে অক্ষম
তার পক্ষে—।”

আর কথা শুনা গেল না। নগেন রওনা হইয়া গেল

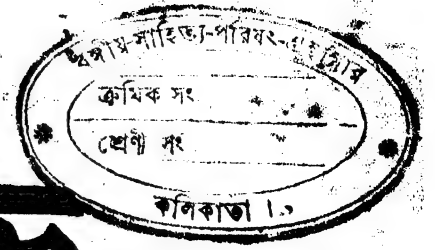
মোকলাভ।

শুরু করিলেন শিল্পে,—মৃত্যুকালে যার
হরিনাম ফুটে মুখে মাত্র একবার,
শ্রীমতি অ পনি তারে নিম্নে বান এসে,
সে নিত্য আনন্দময় শ্রীবৈকুণ্ঠ বাসে!
শিল্প হইবে—চমৎকার! তবে এই বেলা
লুটি ভগ্ন-মুণ্ডক, করি লীলা খেলা!
মৃত্যুকালে হরিনাম লব একবার
হাতে হাতে মোকলাভ নিশ্চিত আমার!
শুরু কন—শুন বৎস অ গহিত হয়ে,
সার' ভয় থাক যদি লীলার লয়ে,
আপিলে পিগালা তারি সে পরম কপে
মৃত্যুকালে হরিনাম হইবে মাক-মদে!
কদিপদে হরি বার বিরাটের মুখে
মৃত্যুকালে হরিনাম ফুটে তারি মুখে!



শ্রীমতেশ্বর সিংহ

সৌরভ



অষ্টম বর্ষ।

ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩২৭।

অষ্টম ও নবম সংখ্যা

আলেকসন্দরের পঞ্চনদ আক্রমণ।

(১)

হুনান বা গ্রীসদেশের নাম সকলেই জানেন। আলেক-সন্দার ঐ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা ফিলিপ ঐ প্রদেশের স্বত্বপাতি ম্যাসিডোনিয়ার রাজত্ব করিতেন। ইহার পূর্বে পারসীকেরা কয়েকবার গ্রীস আক্রমণ করিয়া উহার অনেক অল্প কারিয়া ছিলেন। আলেকসন্দার বাল্যকালে ঐ সকল কাহিনী শুনিতে ক্রমে ক্রমে পারসীকদিগের উপর একবারে ষড়গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ধীরে ধীরে হুনান জয় করিলেন ও প্রায় ৭০,০০০ সৈন্য সঙ্গে লইয়া পারস্য অভিমুখে রওনা হইলেন। ইহার পর তিনি কিলিকারে এসিয়া মাইনর, মিশর, পারস্য প্রভৃতি রাজ্য হস্তগত করিয়া আধুনিক আফগানিস্থানে প্রবেশ করিলেন, তাহার ইতিহাস বর্ণনা করিব না, কারণ তাহার সহিত উপস্থিত কথার কোনও বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

খ্রীঃপূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকসন্দার হিন্দুকুশ পর্বত পার হইয়া প্রায় ৬০,০০০ যুরোপীয় সৈন্তের সহিত কোহ-ই-দমন প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। বিনা যুদ্ধে ঐ স্থান অধিকার করিয়া তিনি নিকরা নামক নগরে প্রবেশ করিলেন। আধুনিক ফেলালাবাদের কয়েক মাইল পশ্চিমে নিকরা অবস্থিত ছিল। এই স্থান হইতে তিনি তাহার সর্বপ্রথম প্রায় অর্ধভাগ সেনাপতি হিকেসটিয়ন এবং পারডিকসের অধীনে থাইবার পাশের ভিতরদিয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে প্রেরণ করিলেন এবং অপরাধী সৎ লইয়া

উত্তর দিকের কতিপয় অসভ্য জাতিকে দমন করিবার জয় গমন করিলেন। তাহার মনে হইল, যদি ঐ সকল জাতিকে দমন না করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাহারা তাহাকে পরে বিশেষ কষ্ট দিতে পারে।

উপর্যুক্ত সেনাপতি হয় পশ্চিমধ্যে বিশেষ কোনও প্রকার বাধা পাইলেন না। সিদ্ধনদের পূর্ব তটে ঐ সময়ে যে সকল রাজ্য ছিল তাহাদের মধ্যে তক্ষশীলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐলম্ব ও চেনাব নদীর মধ্যে সেই সময়ে পুরুবা নামক একজন ক্ষত্রিয় নরপতি রাজত্ব করিতেন। তক্ষশীলার সহিত পুরুবাবর বহুদিন হইতে শত্রুতা চলিতেছিল। কিন্তু পুরুবা শৌর্য ও বীর্যের সহিত তক্ষশীলার নরপতি নাটিয়া উঠিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি এতদিন পর্যন্ত মনের আশ্রয় মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। একদা সুযোগ বুঝিয়া এই প্রবল বিদেশী দিগন্তের সহিত যোগদান করিলেন; কারণ তিনি খুব জানিতেন যে, পুরুবাবর জায় ক্ষত্রিয় নরপতি কখনও আলেকসন্দরের অধীনতা স্বীকার করিবেন না।

আলেকসন্দার নিজের কাবুল নদের উত্তরে ফুলার নদীর তীরবর্তী স্থান সকল জয় করিয়া আরও উত্তর দিকে গমন করিলেন। সেখানে বাজোর নামক এক পরাক্রান্ত রাজ্য অধিকার করিয়া অস্পেসিয়ানদিগকে আক্রমণ করিলেন। ভারতের উত্তরে তাহাদের যত পরাক্রমশালী জাতি আর ছিল না। প্রথম যুদ্ধে আলেকসন্দারকে হটিয়া আসিতে হয়, দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহার পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে গ্রীকেরা প্রায় ৪০,০০০ লোককে বন্দী করেন এবং তাহাদের প্রায় ২০,০০০ গাভী লুণ্ঠন করিয়া বন্দনে

প্রেরণ করেন। ইহার পর তিনি অক্সফোর্ড নদী পার হইয়া আরও কিয়দূর উত্তরে গমন করেন এবং আলেক সন্দ্রিয়া নামক এক সহর স্থাপিত করিয়া তথায় কয়েক সহস্র গ্রীক সৈন্য রক্ষা করেন। ইহার পর গ্রীক বীর ভারতের দিকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে “মাল্লাগা” রাজ্য অবস্থিত ছিল। কথিত আছে যে, ইহার অধিপতি বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন। মাল্লাগার একদিকে সুয়াটিন নদী ও অপর দিকে দুর্গম পিরমালা, এইদ্ব্যতীত সহরের চারিদিকে বিশেষ সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। আলেকসন্দর নদীর দিক হইতে সহর আক্রমণ করিলেন এবং কয়েক দিবস দিন রাত্রি ভাষণ যুদ্ধের পর রাজধানী দখল করিলেন। গ্রীক লিখিত ইতিহাসে লিখিত আছে যে, মাল্লাগা অধিপতিকে, সাহায্য করিবার জন্য ভারত হইতে ৭০০০ বীর সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঠিক সময়ে ইহারা হাঁচিতে পারেন নাই বলিয়া সহরের ভিতর প্রবেশ করারিতে পারেন নাই। সহর দখল হইবার পর আলেকসন্দর ইহাদিগকে তাহার সহিত যোগদান করিতে বলেন। তাহারাই ছিলেন প্রকৃত স্বেচ্ছা সন্তান। স্বদেশের বিরুদ্ধে বিদেশীকে সাহায্য করিতে তাহারাই সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। তখন গ্রীকেরা ইহাদিগকে আক্রমণ করেন। তাহারাই একে একে সকলেই জীবন বিসর্জন করিলেন তথাপি বিদেশীর বশতা স্বীকার করিলেন না।

ইহার পর তিনি “নোরা” আক্রমণ করেন। তাহার পর ‘বজ্রিয়া’ অধিকার করেন। এই স্থানের এবং অপরূপ আরও কয়েকটি সহরের অধিবাসীরা সিদ্ধ নদের নিকটবর্তী মহাবনু পর্বতের উপর আশ্রয় গ্রহণ করেন। পর্বতটি নদী তীর হইতে প্রায় ৫০০০ ফুট উচ্চ এবং উপরে উঠিবার একটা তির আর পথ ছিল না। আলেকসন্দর বিশেষ আয়োজনের পর মহাবনু আক্রমণ করিলেন এবং প্রায় তিন সপ্তাহ বিশেষ চেষ্টার পর উহা অধিকার করেন। ইহার পর তিনি ক্রমে সিদ্ধ নদীর তীরবর্তী “ভবিল” সহরে প্রবেশ করিলেন। অনেকে বলে করিতেন—এই ওহিন্দুই আধুনিক ‘আটক’ সহর কিংবা এলিফান্টার নামের বিশেষ ভাবে প্রমাণ

করিয়াছেন যে, প্রাচীন ওহিন্দু এক্ষণে অন্দ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা আটকের ১৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

আলেকসন্দর এই ওহিন্দু হইতে সিদ্ধ পার হইবার বন্দোবস্ত করিতে থাকেন। প্রথমে তিনি সৈন্যদিগকে একমাল কাল বিশ্রাম করিবার অবসর দেন। তাহার পর একদিন প্রাতঃকালে দেবদেবীর পূজা করিয়া আলেকসন্দর নদীর উপর পুল নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। যথা সময়ে ঐকার্য সম্পন্ন হইল। ইহার পূর্বে একদিন তক্ষশীলার অধিপতি হুয়ং আদিয়া আলেকসন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার অধীনতা স্বীকার করেন। তিনি যে কি জ্ঞাত “গারগড়া” হইয়া বশতা স্বীকার করিলেন, তাহা আমরা উপরে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি।

প্রাচীন কালে তক্ষশীলা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখনও পর্যন্ত রাওলপিন্ডির উত্তর-পশ্চিমে এবং হসন আবদাল সহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইহার প্রাচীন গ্রন্থাগার ভগ্নাবশেষ-নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনজাতক পুস্তক সকলের অনেক স্থানে ইহার উল্লেখ আছে। তখন ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের দূরবর্তী দেশ সকল হইতে ছাত্রেরা উপস্থিত হইতেন।

তক্ষশীলার অধিপতি আস্তি শুধু যে আলেকসন্দরের অধীনতাই স্বীকার করিলেন এমত নহে, তিনি নানা প্রকারের বহুমূল্য উপহার, সুন্দরী দাসী সকল এবং ৫০০০ সৈন্য, গ্রীক বীরকে অর্পণ করিলেন। আলেক সন্দর আস্তির সাহায্য না পাইলে যে সহজে সিদ্ধ নদী পার হইতে পারিতেন না, তাহা দ্বারা বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আস্তি বশতা স্বীকার করিতে সিদ্ধর উত্তর তটবর্তী প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান নৃপতি সকল আলেকসন্দরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। ইহারা সকলে যদি মিলিত হইয় গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন এবং মহারাষ্ট্র পুত্র যদি তাহাদের সহিত যোগদান করিতেন, তাহা হইলে হয়ত গ্রীকদিগকে সিদ্ধর অপর তীর হইতেই স্বদেশে ফিরাইয়া বাইতে হইত—অথবা হয়ত কেহই আর দেশে ফিরাইয়া বাইতে পারিতেন না। কিন্তু হস্তশীল

ভারতের লোক একতার মর্ম কোনও দিন জানিতেন না। সেই প্রাচীন মহাভারতের যুগ হইতে আধুনিক যীশুভা করের সময় পর্যন্ত—আমাদের দেশে তাই ভাই ঠাই ঠাই নীতির শত ২ উল্লাহরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করিয়া আছে। আজ পর্যন্ত আমরা এই সর্বদেশে নীতির কলভোগ করিতেছি। মুসলমানেরা এদেশে আজ প্রায় ১০০ বৎসর বাস করিতেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্ভাব স্থাপিত হইল না। হিন্দু কিংবদন্তি মথো ও তাই! পরস্পরের সর্বনাশ সাধনে সকলেই তৎপর।

আলেকসন্দর সিদ্ধ পার হইয়া তিন দিনের মধ্যে তক্ষশীলার উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে থাকিয়া তিনি চারিদিককার প্রধান প্রধান সামন্ত ও নৃপতিগণের নিকট হইতে সম্ভ্রাটোচিত সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু পুরুরবা ধরা দিলেন না। আলেকসন্দর তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে বশতা স্বীকার করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ক্ষত্রিয় নৃপতি বলিয়া পাঠাইলেন—“তাঁহার সহিত গ্রীক রাজের অবিলম্বে সাক্ষাৎ হইবে—যুদ্ধক্ষেত্রে।”

কয়েকদিবস তক্ষশীলার বিশ্রাম করিবার পর আলেকসন্দর পুরুরবার রাজ্যভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে সময়ে বিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত স্থান মহারাজ পুরুর শাসন দণ্ডের অধীন ছিল। তক্ষশীলা হটেতে বিলাম নদীর দূরত্ব ১০০ বা ১১০ মাইলের অধিক ছিল না (১)। সে সময়ে এই পথের অবস্থা যে খুব ভাল ছিল, তাহা বোধ হয় না। কারণ ঐ ১১০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে তাঁহার প্রায় দুই সপ্তাহ লাগিয়াছিল। তিনি মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বিলাম নদীর পশ্চিম পারে উপস্থিত হইলেন। নূতন বর্ষার জলে নদী তখন দুইকূল প্রাবৃত করিয়া ছুটিতেছিল। তিনি লিঙ্গ নদ পার হইবার জন্য যে সকল নৌকা ব্যবহার করিয়াছিলেন, উহাদিগকে গরুর গাড়ীর সাহায্যে এই স্থানে আনিয়ন করিয়াছিলেন।

(১) ঐ সময়ে পঞ্চদশ এদেশের প্রায় সমস্ত নদীই অত্যন্ত প্রবাহিত হইত।

নদীর পরপারে মহারাজ পুরুর প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য লইয়া (২) উপস্থিত ছিলেন। এই সৈন্যের মধ্যে বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত হস্তীও ছিল। আলেকসন্দর স্পষ্ট বুঝিলেন যে, এই বিশাল বাহিনীর সম্মুখে ঐ বিপুলকারী নদী পার হওয়া অসম্ভব। ৪৫ মাস অপেক্ষা না করিলে নদী স্বাভাবিক ভাবে প্রাপ্ত হইবে না। অথচ এতদিন অপেক্ষা করা তাঁহার নিকট সমাচীন মনে হইল না। তিনি তখন কৌশল নীতি আলোচন করিলেন। তিনি নিজের সৈন্যদিগের মধ্যে প্রচার করিলেন যে, নবেম্বরের পূর্বে তিনি নদী পার হইবেন না। তখন সেই নদীর তীরে শিবির স্থাপিত হইল। ৪৫ মাসের উপযুক্ত রসদ সংগ্রহের জন্য তিনি চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। পুরু এই সকল আয়োজন দর্শনে নিশ্চিত হইলেন; বুঝিলেন, আশ্রয় কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই।

কিন্তু তিনি বিষম লজ্জা করিলেন। তিনি বুঝিলেন না যে, আলেকসন্দর গোপনে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরগা প্রস্তুত করাইয়া অল্প দিক হইতে নদী পার হইবার আয়োজন করিতেছেন। (৩) এই সময় ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ

(২) আলেকসন্দরের সমস্ত ইতিহাস আমরা গ্রীক ইতিহাস হইতে প্রাপ্ত হই। আমাদের নিজের কোনও ইতিহাস এ সংক্ষেপে আদৌ লিখিত হয় নাই। তাঁহারা এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন আজ আমাদের কাছে তাহাও অবনত মস্তকে সমাধা হইতে হয়। এই ইতিহাসের একটি বিশেষত্ব এই যে, আলেকসন্দর এদেশে যে কোথাও পরাভূত হইয়াছিলেন, তাহা বোঝা যায় না।

(৩) বিদেশীয় লেখকেরা যখন তখন আমাদের কাছে ‘cunning’, ‘crafty’, ‘men of duplicity’ প্রভৃতি শব্দগুলির বিশেষণে বিশেষিত করেন। তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সরলতা, সত্য-প্রিয়তা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি সমস্তই সকল তাঁহাদেরই একচেটে। অথচ তাঁহাদের ভাষ্যতেই আছে, ‘Every thing is fair in love and war’। যুদ্ধের সময় কুটিল নীতির প্রয়োগে তাঁহারা যেমন নিপুণ এমন আর কেহই নহে। আমাদের প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতি যুদ্ধের সময় যে কি প্রকার সরলতা অবলম্বন করিতেন তাহার সূত্র সহস্র দুইশত মহাভারত, রামায়ণ, রাজসূত্র প্রভৃতি পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা মাইতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে অবশ্য দুই এক স্থানে যুদ্ধের সময় কুটিল নীতির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কথিয়ারা প্রায়ই ঐ নীতিকে ঘৃণা করিতেন।

উত্তরে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইল। তিনি গোপন সৈন্যদল দ্বারা স্থির করিলেন যে, তাঁহার শিবিরের প্রায় বোল মাইল উপরে (উত্তরে) পার হইবার উপযুক্ত স্থান। ঐ স্থানে নদী ঘোর ফেরাতে উহার পরিসর খুব কম ছিল এবং গভীরতাও অধিক ছিল না। যে স্থানে তিনি শিবির সংস্থাপিত করিয়াছিলেন এক্ষণে, উহা কিলম নামে প্রসিদ্ধ। আলেকসন্দর কটরিস নামক সেনাপতিকে ঐস্থানে কয়েক সহস্র সৈন্যের সহিত স্থাপিত করিয়া অর্দ্ধ পথে অপর দুই জন সেনাপতিকে রক্ষা করিলেন। তাঁহাদিগকে আদেশ দিলেন যে, তিনি নদী পার হইবা মাত্র তাঁহারাও যেন নদী পার হয়েন। এই সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ হইবার পর একদিন গভীর রাত্রে তিনি ১২,০০০ পদাতিক ও ২০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া শিবির ত্যাগ করিলেন। ভাগ্যক্রমে, সেদিন সন্ধ্যার পর হইতে ঝড় ঝুটি আরম্ভ হওয়ায় তাঁহার কার্য্য অপর পার হইতে কেহই লক্ষ্য করিল না। তিনি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পার হইবার নৌকা প্রকৃতি সমস্তই অক্ষত। তাঁহার সৈন্য সকল যখন নদীর প্রায় মধ্য স্থানে উপস্থিত হইল তখন মহারাণের করেকজন প্রহরীর দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তাহারা অবশ্য তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে এই সংবাদ প্রেরণ করিল। অবিলম্বে অক্ষয়ির সাহায্যে চারিদিকে সংবাদটি ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কিলম হইতে ঐ স্থান প্রায় ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এতদূর হইতে সৈন্যাদি সূক্ষ্মজ্ঞত করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইতে অনেক সময় অভিযাহিত হইয়া গেল। মহারাজ পুরুষ পুত্র যখন ২০০০ সৈন্য ও ১২০ টা রথ লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন আলেকসন্দর নদী পার হইয়া উপযুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়াছেন। হিন্দু সৈন্য যদি তাঁহার নদী পার হইবার সময় উপস্থিত হইতে পারিত, তাহা হইলে বহুতর গ্রীক সৈন্যকে নদীর মধ্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইত।

তাহা হউক, অবিলম্বেই আরম্ভ হইল। ১১,০০০ সৈন্যসহ এবং প্রবীর সৈন্যের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় বালক

২০০০ সৈন্য লইয়া অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না। তাহার সৈন্যেরা অনতিদ্রুতই পরাস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু মহাবীর পুরুষ পুত্র পিতার নামে কলঙ্ক লেপন করিল না। সমুখ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়া অক্ষয় বীরলোকে চলিয়া গেল। পুরুষ নিকট সংবাদ পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতেও এক বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন না। কিয়দংশ সৈন্য শিবির রক্ষার জন্য রাখিয়া তিনি পুত্রহত্যাকে শাস্তি দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইলেন।

যে স্থানে পুরুষ দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য একক আলেকসন্দরের বিশ্ব বিজয়ী সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তাহা এক্ষণে ‘কবুরী’ নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পশ্চিম-উত্তরে শিরওয়ালি এবং দক্ষিণে পকরুল।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

সমস্যা।

ঘোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রাণ মাস। সুর-তরঙ্গিনী জাহ্নবী পূর্ণ যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে বাট-বাট শীলা-সোপান প্রকালন করিয়া তাঁর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

গলা এখানে উত্তর বাহিনী। কাশী, দশাশমেদ বাটের উপরে একটি ছোট বাড়ীর দ্বিতলের উন্মুক্ত বারান্দায় বসিয়া অপরাহ্নে একটি যুবক ও একটি যুবতী আলাপ করিতেছিল। উর্ধ্বে মেঘ সংযুক্ত ধুমায়মান আকাশ, নীচে তরঙ্গ বিকৃত কলনাদিনী গঙ্গা। দূরে, অপর তীরে কাশী নরেশের বিশাল প্রাসাদের উচ্চ চূড়া দেখা যাইতেছিল। যুবক যুবতীকে তাহা দেখাইয়া বলিল—“ওই ব্যাশ কাশী, ওখানে মরিলে কি হয় জান?”

যুবতী বলিল “মরিলে আবার কি হয়?”

যুবক—“ওখানে মরিলে গাথা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।”

যুবতী হাসিয়া বলিল—“স্বামনগরের লোকগুলি পুণ্য করিয়া মরিলে গাথাই হইবে—ব্যবস্থাসিঁতো মন্দ হবে। আপনি কি তাহা বিশ্বাস করেন?”

যুবক হাসিয়া বলিল—“তাহারা যদি পাখাই হয়, তবে আমার বিবাহে বাধা কি?”

যুবতী বলিল—“কানীতে মরিলে স্বর্গে যাইবে, আর তার দুই মাইল দূরে মরিলেই একেবারে পাখা—এ সংস্কার শিক্ষিত লোকের ভিতর কেমন করিয়া থাকিতে পারে, আমি চিন্তা করিয়াই উঠিতে পারি না। আচ্ছা কারলী রাজকুমারকে যিনি রক্ত দান করিয়াছেন, তাহার মৃত্যুতে কোথায় স্থান হওয়া উচিত?”

যুবক—“কেবল রক্ত দান করিলেই হইবে না; স্বর্গের আদালতে মনের বিচার হয়। কে কি অভিপায়ে কোন বার্ষিক রক্ত দান করে, চিত্রগুপ্ত তাহার স্বপ্ন দৃষ্টিতে সে কার্যের উদ্দেশ্য বিচার করেন—তদনুসারে স্বর্গরাজ ‘রায়’ প্রদান করেন।”

যুবতী—“আমি কারলী রাজের ধাত্রীকন্ডার উচ্চ আত্মত্যাগ সহিয়ার কথাই কেবল চিন্তা করিতেছি। এই রক্ত কয়জন পারে?”

যুবক—“ওই মেয়েটার রক্তদানে আত্মত্যাগের বিষয় কিছুই নাই; সে রাজার ধাত্রীর কন্যা, একে পরাধীন, তার উপর রাজার আদেশ—তাহার সাধ্য কি যে তাহা অমান্য করে? তবে এরূপ ব্যাপারে আত্মত্যাগ পুরুষজাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, মেয়েদিগের মধ্যে অসম্ভব।”

যুবতী রাগ দেখাইয়া বলিল—“দার্পণের পুরুষ জাতিই বেশী, কোমল নারী প্রকৃতি স্বার্থের ধার ধারে না; পুরুষের স্বার্থের ইচ্ছাতে তাহার মুক শক্তি সর্বদাই পরিচালিত হইতেছে।”

“ঠিক কথা।” বলিয়া যুবক উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। এই সময় একটি কিশোরী আসিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে যুবকের চোখ টিপিয়া ধরিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। যুবক দুই হাতে তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে সম্মুখে টানিয়া আনিতেই সেই চুপি চুপি বলিল “তুমিই দিদি, রাজবাড়ীর মেয়েটা নাকি মারা গেল। মেয়েটা রাজপুত্রের জন্য তার জীবনটা দিল; দিদি, আমাদের স্বপ্ন ভাগবাসার এই—পরিণাম।”

যুবতী বলিল—“তিনি কিন্তু ওর ভিতর বার্ষিক্যাগ কিছুই বুঝেন না। ভাগবাসার কিছুই পান না।”

যুবক বলিল—“ভাগবাসার ওতে কি আছে? মেয়েটাকে যে বাধ্য হইয়াই রক্ত দিতে হইয়াছে। সে কি নিজ ইচ্ছায় রক্ত দান করিয়াছে?”

যুবতী ও কিশোরী একত্রে বলিল—“মিস্ত্রী।”

যুবতী বলিল—“চিত্তের যে অবস্থায় অজ্ঞের সুখের জন্য বা জীবনের জন্য মানুষ আত্ম সুখ বা আত্ম জীবন বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হয়, তাহাই প্রকৃত ভাগবাসা।”

“দিদি যে ‘বিশ্বকর্ষ’ হর দেব ঘোষালের চিঠি খানি মৃগস্ত করিয়াছ দেখিতেছি।” বলিয়া কিশোরী হাসিয়া উঠিল। কিশোরীর সঙ্গে যুবকেও হাসিয়া উঠিল। যুবতীর মুখ লজ্জায় লাল হইয়া গেল।

এই সময় দুর্গাদাস বাবু আসিয়া বলিলেন—“কারলীর রাজকুমার সুস্থ আছেন, ব্রহ্মচারী বাবার চিকিৎসায় বেশ হাত আছে। আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রেও Transfusion of blood এর ব্যবস্থা আছে কিন্তু তাহার ব্যবহার নাই।”

যুবক জিজ্ঞাসা করিল—“মেয়েটা নাকি মারা গেল বাবা?”

দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—“ওতে মারা যাওয়ার কোন আশঙ্কা নাই। যাহার শরীর দুর্বল বা যাহার শরীরে রক্ত কম, তাহার শরীর হইতেতো আর রক্ত গ্রহণ করা হয় না। তবে বাহিরের লোকে সেই রূপই মনে করে বটে। আমি এই মাত্র রাজ বাড়ী হইতেই আসিলাম।” ইহার পর অল্প প্রসঙ্গ উঠিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাদাস বাবু বড়ই মাতৃভক্ত। তাহার বৃদ্ধা মাতা কানী-বাস করেন। দুর্গাদাস বাবু মায়ের সুখ-সুবিধার জন্য যতদূর প্রয়োজন, সুব্যবস্থা করিয়া, দিয়াছেন। বালগী টোলায় একটি ক্ষুদ্র কোঠা ভাড়া করিয়া ঠাকুর চাকরের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। অসম্পূর্ণ বিধে-ব্যয়ের শ্রীপাদপদ্মে শেষ গতি হয়, বৃদ্ধা তাহারই ভরসায় অপেক্ষা করিতেছেন।

ইতোমধ্যে তাহার শারিরীক অবস্থা খুব খারাপ হইয়াছিল—গদগদ ঘাটে যাওয়াও বন্ধ হইয়াগিয়াছিল, তাই পুত্রকে দেখিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলেন।

হুর্গাদাস বাবু চিঠি পাইয়াই মাতৃচরণ দর্শনে যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। এই সময় কলিকাতার অপর্যাপ্ত একটু সড়কাপথ হইয়া পড়িয়াছিল, সহরের নামা স্থানে প্লেগ। একদিন তাঁহার নিজ বাড়ীতেই প্লেগ দেখা দিল,—তাঁহার ষোড়ার চাকর প্লেগে আক্রান্ত হইল। সেই দিনই সপরিবারে হুর্গাদাস বাবু টেলিগ্ৰাফের বাগার বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইলেন। লোকটাকেও হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া তাহার মাসের চালা খামা পুড়াইয়া ফেলিলেন। বাড়ীর অনেক জিনিস পত্রও নষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

এই সময়ে নগেনের Preliminary পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। সে ও পরীক্ষার পর তাঁহাদের সহবাত্রী হইবে এবং কানী হইতে আসিয়াই আমেরিকা যাত্রা করিবে স্থির করিয়াছিল। সুতরাং হুর্গাদাস বাবু নগেনের জন্ম ২৫ দিন বিলম্ব করিয়া তাহাকে সহ সপরিবারে বেনারস চলিয়া গেলেন।

হুর্গাদাস বাবুর টেলিগ্রাফ পাওয়া ডাঃ বাক্টি এক খামা বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। হুর্গাদাস বাবু সপরিবারে সেই বাড়ীতে উঠিলেন ; নগেন হুর্গাদাস বাবুর বায় সঙ্গে বালানী টোলায় রহিল।

হুর্গাদাস বাবুর মাতার বয়স ৭৪। এই বয়সেও তিনি প্রতিদিন গর্ভার বাইয়া স্নান করেন, অন্নপূর্ণা-বিশেষের দর্শন করেন এবং নিজের অন্ন নিজে রাখিয়া বাইতে চেষ্টা করেন। ঠাকুর আছে ; কিন্তু তাহাকে সকল দিন রান্না প্রস্তুত করিতে হয় না। সে বুদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া গন্ধার যায়, মন্দিরে যায়। যে দিন রান্না না, করিতে হয়, সে দিন পরসা লইয়া যায় কিন্তু অন্ন ছাড়া আহার করে।

হুর্গাদাস বাবু প্রাতে ষেকালে দুই বেলাই মাতৃ চরণ দর্শন করিতে আইসেন। মায়ের চিঠি পাইয়া তিনি ডাঃ বাক্টিকে ও হুর্গাদাস কবিরাজকে তাঁহার তবাবধান করিতে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার রীতিমত আসিয়া দেখিয়া বাইতেছিলেন, ঔষধও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা ঔষধ গ্রহণ করেন নাই। ৮ কানীধামে আসিয়া ঔষধ গ্রহণ তিনি কখনও করেন নাই। আর করিবেনও না।

হুর্গাদাস বাবু মাকে কেবল তার ভক্তি করেনই দুই বেলাই ছুতা ছাড়িয়া বার জন্ত বারান্দার অপেক্ষা করেন, যা বাহিরে আসিলে মাটিতে বাখা রাখিয়া প্রণাম ও তাঁহার পদাঙ্গুলিতে মস্তক স্পর্শ করেন। মগেন তাঁহার এই মাতৃভক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রচণ্ড পরিপ্লুত হইয়াগিয়াছে। আশু ও তাতা পিতার অমুসরণেই পিতামহিকে প্রজ্ঞা-ভক্তি দেখাইয়া থাকে। পাকুল ও বকুল বৃক্ষ পিতার মাতৃভক্তির অনুষ্ঠান শুনিতে ‘লাহুনা’ বলিয়া প্রথম দিন হস্ত করিয়াছিল,—নগেনের স্থণা প্রকাশে তাহাদের আচরণ শোধরাইয়া গিয়াছে। তাহারাও তাহাদের পরিপাটি পোষাক পরিচ্ছদের সতর্কতা লইয়া কথা সম্ভব বিনীত প্রজ্ঞা ভক্তিই প্রদর্শন করিয়া থাকে। গৃহিণীও শান্তিডীকে যথেষ্ট প্রকার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

নগেন বুদ্ধার ব্যবহারে মুগ্ধ। সে এখন বুদ্ধার গঙ্গা-নানের সাধী। প্রাতে উঠিয়া গঙ্গানান করিয়া অন্নপূর্ণা ও বিশেষের চরণ দর্শন করে, গৃহে আসিয়া কিঞ্চিৎ আহার করে, তারপর হুর্গাদাস বাবুর বাড়ী যায়। দ্বিপ্রহরে আহার করিয়া বিশ্রাম করে, বিকালে পুনরায় তথায় যায়। সন্ধ্যায় আসিয়া বুদ্ধাকে লইয়া বিশেষের মহা আরাতি দর্শন করে। ইহাই হইয়াছে এখন তাহার দৈনন্দিন কর্তব্য।

আজ পনের দিন হইল তাঁহারা কানীধামে আসিয়াছে। আসিবার কয়েক দিন পরেই কারলীর রাজ পুত্রকে সন্ত-প্রয়োগ করা হয়।

রাজপুত্রের বয়স্ক্রম ২০২২ বৎসর। নানাপ্রকার কুৎসিত রোগে শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া সুবক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। রোগীর জীবনের কোন আশা নাই দেখিয়া রাজ পুত্রকে লইয়া মহাপুরুষ-দিগের আশ্রয় ভিক্ষার্থ ৮ কানীধামে আসিয়াছেন এবং দশাধর্ষে ঘটিয়াছে অহল্যাবাইর প্রাণাদে অবহান করিতেছেন।

এই সময়ে ৮ কানীধামে মহাত্মা যোগজীবন ব্রহ্মচারীর আশ্রমস্থান। মহাত্মা যোগজীবন ঐশ্বর্যশ্রীসিদ্ধি-স্বামী অপেক্ষাও বরেন্দ্র বৃদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, ‘জিনি

কিন্তু কেবল পাদসাহের সঙ্গ সাধিত' কেহ বলেন 'বাদসাহ আকবর শাহের সময়ের লোক'। কিন্তু তিনি নিজে বলিলেন, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ প্রকৃতি হায়ে নাম গ্রন্থে ত্রুটি ছিলেন, তখন তিনি রামেশ্বর সেতুবন্ধে অবস্থান করিতেন; সেইহেতু তাঁহার সহিত যুদ্ধভূমি সাক্ষাৎ হয় নাই। মহাত্মা যোগজীবনের বয়স্ক্রম এই হিসাবে চারিশত বৎসর এবং ইহার মধ্যেই তিনি ৩৪ বার দেহের সংস্কার করিয়াছিলেন।

৭ কাশীধামে মহাত্মা যোগজীবনের তখন খুব নাম-ডাক। তিনি যেমনি বয়োবৃদ্ধ বলিয়া পরিচিত, তেমনি জ্ঞান-বুদ্ধ বলিয়াও খ্যাত হইয়াছিলেন। বহু ভাষা ও বহু শাস্ত্রে—বিশেষতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রে—ইহার জ্ঞান সর্বস্বাদী সম্ভব ছিল।

কারলীর রাজা যাইয়া আসিয়াটে মহাত্মা যোগজীবনের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং পুত্রের অসুখ অবস্থার কথা নিবেদন করিয়া একবার আসিয়া তাহাকে পঞ্চধূলি দান করিয়া আশীর্বাদ করিতে অস্বরোপ করেন।

রাজার আগ্রহে ব্রহ্মচারী রাজপুত্রকে আসিয়া দেখিয়া বলেন—“আমি আপনার পুত্রকে রক্ষা করিয়া দিব। ইহার শরীরে আমি নুতন রক্ত প্রবেশ করাইব এবং ইহার দুর্বিত রক্ত মোক্ষণ করিয়া ফেলিয়া দিব। এক জনকে ইহার জন্ত রক্ত দান করিতে হইবে।”

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি রূপ লোক চাই? বয়স, এবং ত্রুটি কি পুরুষ প্রয়োজন, জানাইলে অস্বপ্নান করিতে পারি।”

ব্রহ্মচারী বলিলেন—“বয়স ইহার সমান বা কিছু কম, বোলর কম না হয়, দেহ বলিষ্ঠ ও সুস্থ, শরীরের রক্ত নির্দোষ, যুবক, কিম্বা যুবতী হইলেও হইবে। তাহার শরীরের রক্ত আমি defibrinate করিয়া লইব।”

রাজা—“তাহার শরীর হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া লইয়া কুমারের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে সে ব্যক্তির অবস্থা কি হইবে?”

ব্রহ্মচারী—“কোন অনিষ্ট হইবে না, অনিষ্ট হইতে বিবনা; তাহার শরীরে প্রচুর রক্ত থাকিলেই বেওয়া হইবে।”

রাজা—“কোন সুস্থকর পদ্য রক্তে সে কার্য সম্পাদিত হইতে পারে না কি?”

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন—“যে একটা রাজার ভাবি উত্তরাধিকারী, তাহার পত্ন স্বভাব কখনই বদল জনক নয়। তাহার রক্ত গ্রহণ করা হইবে, তাহার রক্ত দানের সময় বনের ভাব শান্ত ও উৎসুক থাকি চাই; ভীত ও ভঙ্কিত রক্তে শরীরে বিপরীত ক্রিয়া করিবে। পিতাকে পুত্রের এবং পুত্রকে পিতার রক্ত দানই সর্বাঙ্গের নিয়ম।”

রাজা বলিলেন—“তাহাই হইবে।”

ইহার পর রাজার এক দ্বারীর কন্যা ব্রহ্মচারী তাহার রক্ত দান করিতে সম্মত হইলে ব্রহ্মচারী কুমারের উপর অঙ্গ-উপচার করেন। এ ঘটনারই আভাস পাঠক পূর্বে পরিচ্ছেদে পাইয়াছেন।

নগেনের ইচ্ছাছিল একদিন হৃগদাস বাবুকে লইয়া ব্রহ্মচারীর নিকটে যাব। আজ সেখানে বাইবে ভাবিয়া আসিয়া বাড়ীর গেটে দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় একটা যুবক তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল—“বাবু আপনি যে?”

নগেন সেই অপরিচিত যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুতেই তাহার পারচয় স্বরণ হইতেছিল না।

যুবকটিও একটু লজ্জিত হইয়াছিল, সে দ্রুততার সহিত বলিল—“আপনার নাম নগেন্দ্র যুগোপাধ্যায়—না?”

নগেনও হাসিয়া বলিল—“হাঁ—আপনাকে—” যুবক নগেনের যুগ হইতে কথা টানিয়া লইয়া বলিল—“—চিনিতে পারেন নাই অবশ্যই।”

নগেন লজ্জিত হইয়া বলিল—“ঠিক মনে হইতেছে না।”

যুবক—“আমার নাম নগেন্দ্র ভট্টাচার্য। বহাদুরের কথা—ঢাকা পশোদ স্থলে এক সপ্তে পড়িতাম।”

নগেন লজ্জিত হইয়া বলিল—“আনাকে বাপ করিবেন—আপনি এখন কোথায় আছেন, কি করিতেছেন?”

যুবক—“আমি হৃগদা বাড়ীতে থাকি, এখানে বিত্তভা-নন্দ চতুষ্পাঠিতে ছোঁতাৎ পড়িতেছি। আপনি ওকালতি করিতেছেন অবশ্যই।”

নগেন—“না দাঁড়, উকিল হইব কি, এখনও পড়াই শেষ হয় নাই। দুটা বৎসর মাঝে কামাই গিয়াছে।”

ভট্টাচার্য্য বলিল—“চলুন অগ্রসর হই, গমনোদ্ভবই তো বৈবিত্তেছি।”

নগেন ইতস্তত করিয়া বলিল—“এক স্থানে যাইবার কথা ছিল—।” একটা ভ্রম লোক অপেক্ষা করিবেন।”

ভট্টাচার্য্য—“কোথায় যাইবেন,—কেই বা অপেক্ষা করিবেন?”

নগেন—“যোগ্য জীবন ব্রহ্মচারীর নিকট বাইতে ইচ্ছা ছিল।—”

ভট্টাচার্য্য—“চলুন না—সে তো হুর্গাবাড়ীর নিকট—আসিয়াট।”

নগেন—“তাঁহার সহিত আপনার আলাপ আছে কি?”

ভট্টাচার্য্য—“আমরা দুই তিন দিন গিয়াছি। তিনি খুব আলাপি লোক। লোকের সকল কথাই উত্তর দেন। নানা রকম প্রক্রিয়া দ্বারা তিনি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন। লোকটা চার শতাব্দীর প্রাচীন, বহু শুণে গুণবন্ত।

নগেন—“সে তো শুনিতেছি, এত দিন কি লোক বাচিতে পারে?”

ভট্টাচার্য্য—“সে সম্বন্ধেও তাঁহার সহিত আলাপ ছিল, অবশ্য আমার নয়—কশীর প্রায় সকল বড় লোকই আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কারিতেছেন—তাঁহাদের সহিত আলাপে ব্রহ্মচারী বাবাই বলিয়াছেন—নাশ্বের অসংখ্য বৎসর বাচিয়া থাকা অসম্ভব নহে। তবে মাঝে মাঝে দেহের জীর্ণ সংস্কার করিতে হয়। মহাশয়ও তাঁহার দেহের জীর্ণ-সংস্কার করিয়াছেন, ৪র্থ সংস্কারে তাঁহার বয়স ৪০ হইয়াছে। শরীরের চর্ম্ম শিথিল হইয়া গেলেও মাথার চূণ বা দাড়ি একটাও পাকে নাই—আশ্চর্য্য!”

নগেন, ভট্টাচার্য্যের সহিত অসি ঘাটে বাইয়া যোগ-জীবন ব্রহ্মচারীর পদগুলি লইয়া আসিল।

ব্রহ্মচারীর সহিত সেদিন তাহার বিশেষ কোন আলাপ হইল না। লোকের গতি বিধি ও প্রকৃত জিজ্ঞাসার প্রকৃতি ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়াই নগেন সে দিন চলিয়া আসিল।

ভট্টাচার্য্য, তাহাকে পুনরায় তাহার বাসার আসিয়া পহুঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

নগেন কাসার আসিয়া বুদ্ধাকে আশ্রম দর্শনের কথা বলিলে বুদ্ধাও সাধু দর্শনের জন্ত লালারিত হইয়া উঠিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

শৈলেন শেষ পরীক্ষা দিয়া পিতার আদেশে বাড়ীতে আসিয়াছে। দেশের খবর আর কাহারও নিকট না জিজ্ঞাসা করিয়া সে তাহার বৌদিদির নিকট শুনিতে বসিল। শৈলেন জিজ্ঞাসা করিল “সাত্তালদের বাড়ীর ঘটনাটা কিরূপে হইল, তারপর আর একেবারেই সাড়াশব্দ নাই! এর ভিতরের রহস্তটা কি বৌদি?”

বৌদি বলিলেন “সেই যে দিন ইস্কুল বয়ে সত্তা হইল—সভার পরে সাত্তাল বাবু আমাদের বাড়ীতে আসিয়া প্রস্তাব তুলিয়া গেলেন। রাগে হিতসাধিবীর বিজ্ঞাত্বরণ মহাশয় আমাদের বাড়ীতে আহ্বান করিয়াছিলেন; খাওয়া দাওয়ার রাত অনেকটা হইয়াছিল। আমরা সব চক্ষু বুজিয়াছি, তার একটু পরেই গোলমালে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমাদের ভয় হইতে লাগিল; ঠাকুরকে কোথাও যাইতে দিলাম না। তিনি অতুলকে দোড়াইয়া পাঠাইলেন। সে আসিয়া খবর দিল। তখন ঠাকুর আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি লোকজন ডাকিয়া—লইয়া গেলেন। পাকি ভরিয়া অহুসন্ধান হইল, কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। বিজ্ঞাত্বরণ মহাশয় প্রাতঃকালেই মহকুমায় যাইয়া পুলিশ সাহেবকে লইয়া আসিলেন। আহা মেয়েটার জাতি ও গেল—।” বলিয়া বৌদিদি কাদিতে লাগিলেন।

শৈলেন জিজ্ঞাসা করিল—“এরূপ হইল কেন? করিলই বা কারা? তার কিসকিছু জানা গেল না?”

বউদি চখের জল মুছিয়া বলিলেন—“এ দিনের সভার সাত্তাল বাবু নাকি ও পাড়ার মুখুজ্জা মহাশয়ের ও চক্রবর্তী দিগের কুল-কণের কলঙ্ক কথা বলিয়াদিয়া ছিলেন, তাই ওরাও তাহার কুলে কলঙ্ক দিল। শুনিতেছি আপনার মুখুজ্জা বুড়াই লোকজন দিয়া এই কলঙ্কের কার্য্য করিয়াছিলেন।”

শৈলেন অনেকক্ষণ ভক্তিত হইয়া থাকি। বলিল—
“পুলিস সাহেব আসিল, তবে মোকদ্দমা চলিল না
কেন?”

বৌদি—“পুলিস সাহেব প্রতিয়ার মাকে ও ঠাকুর-
মাকে আদালতে লইয়া বাইতে চাহিল। শত্রুপক্ষ রটনা
করিয়াছিল যে প্রতিয়ার সহিত পূর্ণ হইতেই বদ লোকের
দোষ-ভাব ছিল, তার বাঁ তা জানিত—এসব কুকথা
মোকদ্দমার সময় প্রতিয়ার মাকে জেরা করিয়া অপমান
করিবে, তাই সান্তাল বাবু কলঙ্কের উপর কলঙ্কের ভর
পাইলেন।”

শৈলেন চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে
বলিল—“প্রতিয়ার কি আর কোনই খোজ হইল না?”

বৌদি—“তাহাকে এক মূল্যমান জমিদার মূল্যমান
করিয়া ‘মিকা’ করিয়া ফেলিয়াছে।” বৌদির চক্ষে জল
ধারা বহিতেছিল। শৈলেনেরও হৃদে চক্ষু হইতে জল
পড়াইয়া পড়িল।

বৌদি বলিতে লাগিল—“তারপর এই ছয় মাস
গ্ৰামে কি কেহ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারে? আমাদের
বাড়ীতে সারারাত চৌকিদার বসিয়া থাকে। বাহির
হইতে ঘরের তালো বন্ধ করিয়া এমন ডাকাতি কখনও
শুনি নাই। এখন পাড়ার সকলের বাড়ী। পাহারা বন্দিই
এইরূপ পাহারা বন্দি অবস্থাতেও কি নিশ্চিন্তে ঘুমাইবার
যো আছে? আজ এর বাড়ীতে আগুন, কাল তার
মাথার বারি, পরশু তার গোহালে গরু নাই—একটা
না একটা আছেই—। বিস্ত্রাভূষণ মহাশয় গ্রামই
আসেন; মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কে লইয়া সে দিন আসিয়া
ছিলেন। দুই পক্ষের লোককেই জামিন দিতে হইয়াছে।
শীঘ্রই নাকি গ্রামে মিগ্রাহ পুলিশের থানা বসিবে; এ গাঁ
কি আর বাসের যোগ্য আছে?”

বৌদির মিকট হইতেই শৈলেন গ্রামের অবস্থা যথা
সম্ভব অবগত হইয়া বিকালে পাড়ার বাহির হইল।

শৈলেন গ্রামে বাহির হইয়া প্রথমেই নগেনদের
বাড়ীতে গেল। সে বাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।
আজ কয়েক দিন হইল বাড়ীখানা পোড়া গিয়াছে।
পোড়া টিনের একখানা চাপড়া প্রভৃত করিয়া তাহাতে

শৈলেন পোড়া টিনের বেড়া লাগাইয়া তারাতরণ অতি দুর্ভাগ্য
দিন অতিবাহিত করিতেছেন।

শৈলেনকে দেখিয়া বৃথুর্জা ঘর হইতে একখানা
আনিয়া বসিতে দিয়া বলিলেন—“এইতো বাবা তুমি
কিনে আছি—এ কি ভুললোকের গাও না চতুর্ভাগ্য
যেল?”

শৈলেন তারাতরণের পদগুলি লইয়া বলিলেন—
“এ ঘটনা কবে ঘটয়াছে?”

তারাতরণ তামাকটা টানিতে টানিতে বলিলেন—
“বুধে বুধে আট দিন আজ। বসো বাবা বসো।”

শৈলেন তারাতরণের বসিবার অপেক্ষার ঝড়াইয়া
ছিল। উভয়ে উপবেশন করিলেন।

তারাতরণ—“হকার দম টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
কবে আসিয়াচ বাবা? ভাল তো?”

শৈলেন নম্রভাবে উত্তর দিল—“আজ গ্রামে ৮টার
আসিয়াছি। শরীর ভালই আছে। বাড়ী পোড়ার
সংবাদ আশ্রয় পাই নাই, মগেনও পার নাই।”

তারাতরণ রাগের সহিত বলিল—“ও হতভাগা
কথা বলিও না। ওটাই বাবা আমার বড় দুঃখের মূল।
আবার মাথা রাখিবার ঠাই নাই, অথচ তাঁর দেশ অরণ
চলিতেছে! বাবু আমেরিকার বাইবেল—এখন কালী
ভ্রমণ হচ্ছে।”

শৈলেন—আপনি কি তার চিঠি পাইয়াছেন তবে?”

তারাতরণ তামাকে দম দিয়া কানিতে কানিতে
বলিলেন—“দেখবে, দেখবে কি লিখেছে সে কুলদার
হতভাগা?” বলিয়া তিনি “পেলা” “পেলা” বলিয়া
ভাকিতে লাগিলেন। পেলা আসিলে তারাতরণ
বলিলেন—“তোমার বড়কার চিঠিখানা আনু দেখি—আমার
কোটের পকেটে আছে।” তারপর শৈলেনকে লক্ষ্য
করিয়া বলিলেন—“দেখবে, আলকালকার শিকা দুই
দিগকে কত অসংঘত ও অহমিকা পূর্ণ করিয়া
ভুলিয়াছে?”

পেলা চিঠি আনিয়া দিল। তারাতরণ তামা

শৈলেনের হাতে দিয়া বলিলেন—“পড়।”

শৈলেন চিঠি খানা পড়িল।

সৌরভকমলের—

অন্য Preliminary পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। উত্তর
দেখানো হয় নাই। আমি আমেরিকাই যাইব স্থির
হইয়াছি। সংসারের কল্যাণ সাধন ও পিতা মাতার
কর্তব্য অভিযোগ মোচনই আমার এ যাত্রার উদ্দেশ্য।
আপনি অর্থ চান—অর্থ চাওয়াই অগতির এখন বাস্তবিক
সমস্যা। প্রয়োজনও তার এত অধিক যে ভগবানের
দুর্ভাগ্য আমরা বুলতঃ ইহাই চাই। আমাদের বাড়ী
রক্ষা করিয়া আমি এত সঙ্কটাবস্থায় রহিয়াছে যে
পরিবারে অসুখের আকাঙ্ক্ষা না হওয়া ব্যতীত তাহা
কি উপায় একবারেই নাই। বিবাহ করিয়া সেই
স্বপ্ন এখন কারবার ও পর প্রত্যাশী হইয়া বাঁচিয়া
কিভাবে ইচ্ছা অত্যন্ত অসম্ভব ইচ্ছা। ইহাতে মানুষের
কোন বুদ্ধি ও তাব মলিন হইয়া যায়। অথচ অর্থ
কি।

সুস্থ ভাবে—সরল ভাবে চিন্তা করিতে গেলে ইহা
কি বীকার করিতে হইবে যে সংসা বাহার ধরে আছে
কিন্তু অর্থ উপার্জনে তাহার ক্ষমতা না হওয়া পর্যন্ত
কিছু পক্ষে বিবাহ করিয়া জন বুদ্ধি করিবার ইচ্ছা, সেই
কিন্তু অলসী ভাঙ্গিয়া আনার সহায়তা করা ব্যতীত
কিছুই নহে।

অর্থ উপার্জন—কম ব্যক্তির সরল মন ও স্বচ্ছল অব-
স্থায় নিত্য মতভেদে শুল্ক 'কাটাকাটি মারামারির'
প্রতিরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অর্থহীন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি
কিন্তু সং এবং নিরীহ প্রকৃতির হইলেও নিত্য
কিন্তু তাড়নার তাহার প্রকৃতি বিকৃত হইয়া যায়।

আমার বর্তমান অবস্থায় অংশোধ করিয়া, ভ্রাতা-
বন্ধুকে লেখা পড়া শিখাইয়া, বাড়ীতে খরচ-পত্র দিয়া
আমাতাকে সুখী রাখিয়া মইয়ের গায় বাঁচিয়া থাকি-
য়া আশা করিয়া। বাহ্য করিতে বলিয়াছি, তাহা
কিন্তু হুয়াশা; তথাপি চেষ্টা করিতে হইবে। আশী-
ষ্ট্য করিবেন যেন এ চেষ্টার ভগবান সহায় হন।

অর্থ হইলে কতি নাশের কত চিন্তার বিষয় কিছুই
না। বাড়ী ভরিয়া লোক ও আশ্রয় অসুখের চিন্তা করি-
য়া না। আমি সত্যলি বহাণের বিকট হইতে সমস্ত

লইয়াছি। তিনি আমার আগমন কাল পর্যন্ত অপেক্ষা
করিতে বীকৃত হইয়াছেন। অত আমি কাশীধাম যাত্রা
করিলাম। সেপ্টেম্বরের ১ম সপ্তাহে আমেরিকা যাত্রা
করিব। ইতি—

সেবকাধম—শ্রীনগেন্দ্রনাথ শর্মাঃ।

শৈলেন চিঠি পাঠ করিয়া চক্ষু জ্বলিলে তারাতরুণ
বলিল—“দেখিয়াছ সংসার উপর কি রকম ইজিত, আর
কেমন বস্তুতা! পাবও ফাজিল—অধঃপাতে যাউক।
তিনি গিয়াছেন আবার তারাপদ সাত্তালকে খোসামদ
করিতে। কুপুত্র—পিতৃ পিতামহের পিণ্ড লোপকারী”—

তারিণী বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া হকাটা কল্পিত হস্তে
একদিকে ঠেস দিয়া রাখিয়া দিলেন।

শৈলেন বিনীত ভাবে বলিল—“আপনি তাহাকে
অভিসম্পাত করিলে তাহার অকল্যাণ হইবে। বিদেশে
কত বিপদ, কত দুর্ভিক্ষ। আপনি মুহূর্ত্ত-মনে তাহাকে
অশীর্বাদ করুন। যাতা পিতা গুরুজনের অসন্তোষ
বজ্রের মত সম্মানকে আহিত করে। আপনি তাহা কদাচ
করিবেন না।”

তারাতরুণ কোষে অধীর হইয়া বলিলেন—কুপুত্র
অপেক্ষা নির্কংশ ভাল, নির্কংশ ভাল! হতভাগা অধঃ-
পাতে যাউক।”

শৈলেন ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

উনবিংশ পুরিচ্ছেদ।

পিতা মাতার অভিসম্পাত বজ্রের মত পুত্রের উপর
কার্য করিয়া থাকে; ইহার প্রমাণ অনেক স্থলেই দেখা
গিয়াছে। যে দিন তারাতরুণ কোষে অধীর হইয়া
শৈলেনের সম্মুখে পুত্রের প্রতি দুর্ভাষা প্রয়োগ করিয়া
ছিলেন, সেই দিন দুর্ভাষা বাবু প্রকৃতির ৬ কাশীধাম
ভ্যাগ করিবার কথা।

প্রাতে উঠিয়া নগেন টেসনে পাড়ী রিজার্ভ করিতে
গিয়াছিল। একখানা পাইওনিয়ার হস্তে করিয়া আসিয়া
লেখানা দুর্ভাষা বাবুর সম্মুখে রাখিয়া বলিল—“খবর
দেখুন, গত ৪ঠা আগষ্ট আমাদের ব্রতী ব্রতীসত্তা
কোষেশ্বর সঙ্গে বহু সন্তোষ করিয়াছেন।”

দুর্গাদাস বাবু পত্রিকা খান্না লইয়া দেখিতে লাগিলেন। নগেন পারচারি করিতে করিতে বলিল—“থাক ; একটা কথা বলিতে—”

দুর্গাদাস বাবু পত্রিকার উপর হইতে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন—“কি কথা ?”

নগেন দীর্ঘ হাশ্ব করিয়া বলিল—“আমাদের বিভিন্ন ধর্মের বুল উদ্দেশ্য এক—ভগবানে পঁহুছা। এই শেষ যীর্ষাংসা সম্বন্ধ কোন ধর্ম-সমাজেরই যতভেদ নাই, পঁহুছার পন্থা লইয়াই যত গোল যোগ। এতদিন কালীতে থাকিলেন—আপত্তি কি চলুন না গল্পানান করিয়া একটাবার বিবেচনার দর্শন করিয়া আসি ! ভগবতের এত ভক্তি-প্রভা, আকুল প্রার্থনা যেখানে ভূপ হইয়া আছে, তাহা ধর্মের না হউক—আনন্দের হিসাবে—অগত্যা অভিজ্ঞতার হিসাবেইবা মন্দ কি ?”

দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—“আর ভক্তিরইবা না কেন ? অযুত ভক্তের ব্যাকুল প্রাণ যেখানে গড়াগড়ি যায়, সে স্থান ধর্মের স্থান, ভক্তির স্থান নয় কেন ? ভগবান সেখানে অবশ্যই আছেন। কুসংস্কার আমার নাই, চল না সকলেই !”

দুর্গাদাস বাবুর কথার পাকুল ও বকুল হাসিয়া কুটপাট হইতে লাগিল। দুর্গাদাস বাবুর স্ত্রী সর্বদাই স্বামীর মতের অনুগমন করিয়া থাকেন, সুতরাং সেখানে আর যত ভেদ হইল না। তখন সকলেই ভাড়াভাড়ি কলিকাতা যাত্রার মালপত্র বাঁধিয়া রাখিয়া গল্পানানের আয়োজন করিতে লাগিল।

নগেন বলিল—“যোগজীবন ব্রহ্মচারী বাইবার দিন সাক্ষাৎ করিয়া বাটতে আদেশ করিয়াছিলেন—সেখানে একবার বাওয়া প্রয়োজন না ?”

দুর্গাদাস—“তিনটার অসিঘাটে বাইব।”

পাকুল হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল—“বন্দিরে বাইতে আমাদের কি কি লইতে হইবে ?”

নগেন বলিল—“রানের কাপড় পামছা লও, তোষা-দের সেবেজতো লইবেই ; জুতা ছাতি লইও না ; এই, আর কি ?”

দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—“টাকা ভাড়াইয়া কিছু

পয়সা লইতে হইবে। বন্দিরেও কিছু দেওয়া প্রয়োজন। তাহা কাহারও উপকারের ক্ষত নয়, নিতেরই চিত্ত উৎকর্ষের ক্ষত। ভক্তি ভগবানের দিকে ; অন্যের ভগবানের সেবা।

দুর্গাদাস বাবু খালি পায়ে সপরিবারে নামাখা মণিকর্ণিকার বাটে চলিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

তিনটার দুর্গাদাস বাবু ও নগেন একখানা গাড়ী করিয়া বাবা যোগজীবনের আশ্রমে আসিয়াছেন। দুর্গাদাস বাবু ইতঃপূর্বে আরও দুই দিন আসিয়া ব্রহ্মচারী বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। একদিন সপরিবারেই আসিয়াছিলেন। কারলীর রাজবাড়ীতে উপচারের দিন দুর্গাদাস বাবুর সহিত ব্রহ্মচারীর প্রথম আলাপ। ঐ দিন ডাঃ বাক্টি ও দুর্গাদাস বাবু তাঁহার চিকিৎসার সাহায্য করিয়াছিলেন। নগেন বহুদিন ভট্টাচার্যের সহিত প্রথম আশ্রম দর্শনের পর প্রায় একদিনই ব্রহ্মচারী বাবার পদধূলী লইতে আসিত। তাহার সমুখে ব্রহ্মচারী বহুলোকের মনের কথা, ভূত ভবিষ্যৎ কথা বলিয়া দিয়াছেন। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া কেবল দেখিয়াছে। তাহার নিজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একদিনও সে ব্রহ্মচারী বাবাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নাই।

ব্রহ্মচারী দুই তিন দিন তাহার আসিতে দেখিত। একদিন তাহার পরিচয় লইয়াছিলেন। সেইদিন হইতে নগেন তাঁহার পরিচিত।

দুর্গাদাস বাবু ও নগেন বাইয়া দেখিলেন ব্রহ্মচারী আগন্তুকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন।

দুর্গাদাস বাবুকে দেখিয়া ব্রহ্মচারী বসিতে ইরিত করিলেন। তাহার আন্তরিক কথুনে উপদেশন করিলেন।

সমুখে একটা রোগী। তাহার ঘন ঘন হিকা হইতেছিল। রোগী জীর্ণ শীর্ণ। ২৭ দিনের অর। ১০৫ ডিগ্রি অর সহ সে গন্তকল্য ব্রহ্মচারীর দ্রুত আনীত হইয়াছে। ব্রহ্মচারী একটা ঔষধ বাতনাইয়া তাহাকে গদার ডুবায়া

এই সময় নগেন ভাষার শরীরে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ সহ করিয়া রহিল—তারপর আর সহ করিতে পারিতেছিল না। ভাষার অস্থির ভাব দেখিয়া ব্রহ্মচারী ভাষার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—“বুঝক, তোমার মহাশয় তোমার উপর অসন্তুষ্ট।”

হুগাঁদাস বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“ইহার হঠাৎ কেন বলিলেন—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?”

ব্রহ্মচারী—“আধনি ভাষার, খুব জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ইহার আর গিয়াছে হস্তিভাল ভয় প্রেরণে—”

হুগাঁদাস বাবু বুঝিলেন। আর কোম প্রশ্ন করিলেন না। একটু পরে বলিলেন—“আজ আমার গিয়া বাইতে ইচ্ছা করি।”

ব্রহ্মচারী বলিলেন—“বেশ, কলিকাতা গেলে আপনাকে আশ্রমে অতিথি হইব, যেন রাখিবেন।”

হুগাঁদাস বাবু হাত বোড় করিয়া সৌজন্য দেখাইয়া দিলেন—“সে তো আমার উপর বিশেষ অঙ্গগ্রহ, যেন রাখিবেন।”

মালা এসনের পরে হুগাঁদাস বাবু বলিলেন—“আজকের রাতপুত্র বেশ রক্ষা পাইয়াছেন—আশ্চর্য।”

ব্রহ্মচারী বলিলেন—“দীর্ঘজীবী হইবে না; বড় কষ্টের ছেলে—অত্যাচার করিবে, তারপর ভোগিয়া যাবে।—বেশ, এ বিড়া একদিন আর্ধ্য-ভারতে বিশেষায়িনী সজীবনী বিড়া বলিয়া পরিচিত ছিল।

অতীত পুত্র কচ এই বিড়া শিখিয়ার জন্ত তুচ্ছাচার্যের নিকট অধ্যয়ন কুটিল ছিলেন। বসতি রাজা এই বিড়ানী বিড়া প্রভাবে পুত্রের রক্তে যৌবন লাভ করিয়া পুত্রের পুরুকে কিছুকালের জন্য নির্জীব করিয়া দিয়াছিলেন। যৌবন ভোগান্তে পুনরায় নিজ রক্ত পুত্রের যৌবন দান করিয়াছিলেন। এ আর্ধ্য বিড়ার বিড়া, কিন্তু এই ভারতেই এখন তাহা অজ্ঞাত।

ইরোপ তো এ বিড়ার সহিত পরিচিত এই সে দিন ইরোপের বাল্যকালে—১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে। রোমের পাপ Innocent VIII এর উপর এই চিকিৎসার প্রথম পরীক্ষা হয়। এখন সমগ্র ইউরোপে ইহা বিদিত—British Pathologyতে পর্য্যন্ত বীজিত হইয়াছে।”

এই সময় নগেন ভাষার শরীরে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ সহ করিয়া রহিল—তারপর আর সহ করিতে পারিতেছিল না। ভাষার অস্থির ভাব দেখিয়া ব্রহ্মচারী ভাষার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—“বুঝক, তোমার মহাশয় তোমার উপর অসন্তুষ্ট।”

হুগাঁদাস বাবু ভবিত হইয়া পড়িলেন।

ব্রহ্মচারীর চক্ষু হইতে তীব্র ঘোড়ি বাহির হইতে লাগিল—তিনি যেন যুবকের তৃত্ত তবিত্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ক্ষণকাল পরে বলিলেন—“তত হইতে অস্তরের এবং অস্তত হইতে ততের উৎপত্তি—ইহাই বিবেচনের ইচ্ছা। তাহার ইচ্ছাই পূরণ হইবে।” বলিয়া ব্রহ্মচারী নগেনের হস্তধারণ করিয়া সবলে টানিয়া দিলেন, ভাষার শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল।

হুগাঁদাস বাবু নগেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“শরীর কেমন বোধ করিতেছে?”

নগেন বলিল—“বেদনাটা যেন হঠাৎ নাই। কিন্তু শরীরটা কেমন কেমন বোধ হইতেছে।”

“তবে চল এখন বিদায় হই।” বলিয়া হুগাঁদাস বাবু উঠিয়া ব্রহ্মচারীর নিকট বিদায় হইলেন।

নগেন ব্রহ্মচারীর পদধূলি লইতে বাইয়া বলিল—“আশীর্বাদ করিবেন—যেন ভগবান আমার স্তত উদ্দেশে সহায় হন।”

ব্রহ্মচারী বলিলেন—“অসন্তুষ্ট।”

নগেন উঠিতেছিল—ধমকিয়া বলিয়া পড়িল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন—“বাহা যটিবে, তাহার জন্য চিন্তা করিও না। ভগবান সহায় আছেন। দেখি হাত?”

নগেন হাত বাড়াইয়া ধরিল।

ব্রহ্মচারী হাত দেখিয়া বলিলেন—“তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না,—ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।”

নগেন “তবে আমার কি কর্তব্য।”

ব্রহ্মচারী—“ভগবানের উদ্দেশে পথই একতরু যথেষ্ট পথ; তাহার উপর নির্ভর পায়ন হইয়া চলিও—

নিক-বল বুদ্ধিরে প্রবল বলিয়া কখনও গণ্য করিও না।
ইহাই বুঝক ভাবনের একত পন্থা।”

নগেন—তবে আসি; আজই কলিকাতা চলিয়া
বাইব।”

ব্রজচাঁদী—“ওবু বাইব! বাইবার তুমি কে? তোমার
বাঙরা ভগবানের ইচ্ছা নহে।”

নগেনের নিকট ব্রজচাঁদীর কথাবার্তা প্রাহেলিকার
মত বোধ হইতেছিল। সে বিনীত ভাবে বলিল—
“তবে কি কর্তব্য?”

ব্রজচাঁদী—“আজ বাও।”

নগেন ধীরে ধীরে বলিল “তবে কি আমার আজ
কলিকাতা বাঙরা হইবে না?”

ব্রজচাঁদী—“ভগবান যদি নেন, তবেতো বাইবেই—
নতুবা কাল দেখা হইবে।”

নগেনের উঠিয়া বাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। কি
জানি কি হয়! অথচ কথা শুনি তাহার নিকট নিতান্তই
বেন বাজে কথা—ঠাট্টা তাহার মত বোধ হইতে ছিল।
সে মনে মনে ভাবিতেছিল—ব্রজচাঁদী এত ক্ষমতা সম্পন্ন
হইয়া আমার সঙ্গে বাচালতা করিয়া তাহার মূল্যবান
সময় নষ্ট করিবেন? নগেন পুনরায় পদধূলী লইয়া
বলিল—“তবে কাল পুনরায় আসিব।”

ব্রজচাঁদী রাগ দেখাইয়া বলিলেন—“বাও।”

দুর্গাদাস বাবু গাড়ীতে বসিয়া অপেক্ষা করিতে
ছিলেন; নগেন বাইয়া বলিল—“ব্রজচাঁদীকে বুঝিলাম
না; আমার বাঙরা আজ হইবে না।”

দুর্গাদাস বাবুর নিকট সে সংক্ষেপে ব্রজচাঁদীর উক্তি
বিস্তৃত করিল। দুর্গাদাস বলিলেন—“এল বাসার তো
বাই।”

দুর্গাবাড়ীতে গাড়ী থামাইয়া নগেন মহেশকে ডাকিয়া
আনিয়া বলিল—“আজ চলিয়া বাইবার কথা, আমি
চলিয়া-গেলায় কি না কাল প্রাতে একবার আমাদের
দশাখন্ডে ঘাটে ও বালানী টোলার বাড়ীতে আমার
ভব লইও।”

মহেশ বাহির হইতেছিল, তাহার সঙ্গ লইল এবং
কিছু দূরে আসিয়া দাঁড়িয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পর নগেনের শরীরের বেদনা কুড়ি কইল।
সে দুর্গাদাস বাবুকে বলিল, আগরায় আজই চলিয়া যাক—
আমি মনের বাঁধা না তাকিয়া আসিব না; কাল আর
একবার ব্রজচাঁদীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মেলা
টা খুসি করিয়া বাইব; তাহার কথার মনটা তাকিয়া
গিয়াছে।”

নগেন বেদনা অগ্রাহ্য করিয়াই সকলকে লইয়া টেনে
গেল। ও তাহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। আশা
ভাতা, বকুল, নগেন কে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিল।
ভাতাকে চুম্বাধিয়া, আশার গালে ধীরে ধীরে টোকা
মারিয়া, বকুলের করমর্দন করিয়া নগেন আদর প্রকাশ
করিল। পাকুল ডিপ করিয়া নগেনের পায়ে
প্রণাম করিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। নগেন সকলকে
উঠাইয়া দিয়া বিদায় লইল।

দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—“কাল চলিয়া বাইও।
গাড়ী চলিতে লাগিল। পাকুল—কমাল উঠাইয়া,
বুয়াইয়া নগেনকে বিদায় দিল, নগেনও কমাল বুয়াইয়া
তাহাদিগকে বিদায় দিল। বাসার আসিবার পথেই
নগেন, তাহার শরীরে এমন উৎকট বেদনা অনুভব
করিতে লাগিল যে ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিবারও
তাহার তর সহিল না। সে বিছানার ওইয়া পড়িল।

এক বিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই দিনেই পীরপুরের সম্যক অবস্থা শৈলেনের মন
দর্পণে যেন স্পষ্ট দেখতে পাইল। সমস্ত সমাজ
তাহার নিকট বিশেষ গুণিল বলিয়া বোধ হইল না। খুব
সহজ বলিয়াও মনে হইল না। পারিবারিক সমস্যা
ত্যাগ করিতে পারিলেই মীমাংসা হয়। সামাজিক
সমস্যার আত্মত্যাগ চাই। একটি নিজের বার্ষিক পয়-
ত্যাগ করা, আর একটি নিজেকেই তার দত্ত দেওয়া।

সমাজ সমস্যা মীমাংসার জন্য শক্তিশালী পুরুষের
দরকার। যার মনের গৌরবে, মানের গৌরবে, বিজ্ঞান
গৌরবে বুদ্ধির গৌরবে—এক কথায় যার ব্যক্তিত্বের
গৌরবে সমাজ উজল, এমন লোক চাই। এমন লোক
হওয়া কি সহজ? শুভরায় সামাজিক সমস্যা সমাধান
করা বাহার তাহার পক্ষে সহজ নয়।

বাই হঠক শৈলেন সুশীল বিভাভূষণকে খবর দিয়া আনাইল।

ইতোমধ্যে একদিন সে তারাপদ সাত্তালের সহিত সাক্ষাৎ করিল। শুভলোক তাহার নিকট মনের কষ্ট বলিতে বলিতে কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

শৈলেন বলিল—“মহাশয় মোকদ্দমাটা ছাড়িয়া দিয়া আসি করুন মাই। ঐ টা দ্বারাই সমাজের লোক চিনা বাইত।”

তারাপদ বলিলেন—“ও কথাই বাবা আমার নিকট কুমিল্লা না, মনে বড় কষ্ট পাই। ও মোকদ্দমা রাখিলে পক্ষের লোক আমার কুৎসা রটনা করিয়া আমাকে দেশ হইতে তাড়াইত। অথচ সাক্ষী হীন মোকদ্দমা ফাঁসিয়া, বাইত।”

ইহার পর শৈলেন আর সে সম্বন্ধে কোন কথা জুনে মাই।

শান্ত্রী বিভাভূষণ আসিলে তাঁহাকে লইয়া শৈলেন পুনরায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সমাজ সমস্তা সমাধানের চেষ্টা করিতে লাগিল। বিনা বুলো চিকিৎসা করিয়া, বিনা বধে ঠাক দান করিয়া, দুঃখে বসে সহানুভূতি জানাইয়া, গ্রামের জলা-জল পরিষ্কার করিয়া, বিনা পরসার কটো তুলিয়া শৈলেন অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামবাসীর মত ও ভক্তি, মেহ ও প্রীতির পাত্র হইয়া উঠিল।

ইতোমধ্যে তাহার একদিন হিতসাধিনীর অধিবেশনও করিয়াছিল। তাহাতে তারাপদ ও তাঁহার কতিপয় সঙ্গী লোক ব্যতীত আর সকলেই উপস্থিত হইয়া সমস্তা সমাধানের অঙ্গুলেই মত্ত প্রদান করিয়াছিলেন।

শৈলেন যখন সমাজ সীমার পথে খুব উঠিয়া গিয়া লাগিয়াছিল, সেই সময় তাহাদের প্রিন্সিপালের এক টেলিগ্রাম পাইয়া তাহাকে চলিয়া বাইতে হয়।

বাড়ী ছাড়িবার পূর্বেই তাহার বৌদি তাহাকে ধরিয়া বলিল। বৌদি বলিল—“আপনিতো বাই-তেছেন, আমাকে কি জবাব দিয়া বাইবেন?”

শৈলেন একটু হাসিয়া বলিল—“একোন্ অভিনয় আবার?”

বৌদি—“এখনতো সংসার করিবার সময় আসি-

শৈলেন “সবর আসিলে সংসার পাতাই বন্ধ করতের বিধি হয় তবেতো পাতিতেই হইবে।”

বৌদি—“তবে তাহার উত্তোপ করিব, জানিবেম।”

শৈলেন হাসিয়া বলিল—“সবর আসিবার সূচনার চাঁদ উঠিবে, জ্যোৎস্না ফুটিবে, মলয় ছুটিবে, মাধবী আহাকার করিবে, কোকিল কুহ ডাকিবে—তবেতো সময় আসিবে।”

বউ দি—“আজ বে গুরুপক্ষের দ্বাদশী, চাঁদও উঠে, জ্যোৎস্নাও ফোটে। মলয় ছুটীয়া অনেক দূর গিয়াছে,—কোকিলও ডাকিয়া ক্লাব হট্টয়া পড়িয়াছে—আর আমরা মাধবীর দল—আহাকার করিতেছি—তবে সম্মতি?”

শৈলেন হাসিয়া বলিল—“তোমাদের দ্বাদশীর চাঁদ, শারদীর জ্যোৎস্না, তোমাদের মলয়, তোমাদের কোকিল, আমার প্রাণেতো আর বান ডাকাইতে পারিবে না। ও তোমাদের জড়জগতের কথা নয়, মনোজগতের কথা।

বৌদি! ও বনমাঝে নয়—মনমাঝে, সাজ সরঞ্জাম লইয়া প্রকাশ হওয়া চাই, যাক ও সব সময়ে হবে। এবার তো যাই।”

বৌদি হঃসিত হইয়া বলিলেন—“না ঠাকুর পো, ও হইবেনা—আমার মাথা খাও, আমাকে সম্মতি দিয়া বাইতে হইবে। ঠাকুর পাত্র দেখিতেছেন—”

শৈলেন গভীর ভাবে বলিল—“তবে আরো কিছুদিন অপেক্ষা কর বৌদি। বিবাহ করিলে যদি সমাজের বিশেষ কোন কল্যাণ হয়, তবে অবশ্যই করিব—তখন আমিই তোমাকে বলিব—তোমাকে আমার সম্মতির জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না।”

বৌদি বলিল—“আমি আপনার কথা বুঝিলাম না। আমাকে বুঝাইয়া বলুন।”

শৈলেন—“সময়ে আপনি বুঝবেন। ও তবু কেউ কাহাকে বুঝাইয়া দেয় না।”

বৌদি হাসিয়া বলিলেন—“তবে কি? যেম সাহেব জানিবেম?”

“আমি হিন্দু, অতুই বিশ্বাসী হিন্দু; ভগবান প্রজাপতি বাহা ব্যবহা করিয়া রাখিয়াছেন—তাহাই করিব। ‘করিব’ বলিতে পারি না—তাহাই হইবে।”

বৌদি—“মাকে কি বলি? তিনিতো উত্তর চাহিবেন।”

শৈলেন—“তাঁহাদের মনে কষ্ট দিও না; তাঁহা-
দিগকে বখারোতি কথা বার্তা চালাইতে বলিও। পরীক্ষার
পাস হই, ফেল হই, আর পড়িব না—দেশের জন্ত খাটিব
ইচ্ছা করিয়াছি। দেশ ও সমাজের হিতের জন্ত উদ্দেশ্য
পরিবর্তন করিতে পারি; বিবাহ তাহারই মধ্যে একটি।
বাল্যলীলার অর্থ নৈতিক অবস্থা শোচনীয়, সমাজের অবস্থা
ততোধিক—বিবাহ তাহা সমাধানের একটি প্রধান বিষয়।
কেবল ভোগের জন্ত বিবাহ—এই জাতির ভবিষ্যৎ নষ্ট
করিয়া দিতেছে। সুতরাং একটু চিন্তা করিয়া বিবাহ
করিব। বিবাহ ব্যাপারে পিতামাতা অপেক্ষা যে বিবাহ
করিবে তাহার চিন্তা বেশী করাই বর্তমান যুগে উচিত।
প্রাচীন সত্য যুগ নাই—সে যুগের দীর্ঘ পরমায়ুও নাই।
এখন পিতা বাইট বৎসর বয়সে পুত্রের বিবাহ করাইয়াই
পতাবু হন—পুত্রকে—তারপর বিশাল পরিবার লইয়া
হাবুডুবু খাইতে হয়। অবশ্য আমাদের যদিও সে অবস্থা
নয়। আমি জাতির কল্যাণের হিসাবে বলিতেছি।
আজ এই পর্য্যন্ত।”

পরদিন শৈলেন কলিকাতা চলিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

প্রাতে ৮টার মহেশ ভট্টাচার্য্য আসিয়া দেখিল শরের
দরজা উন্মুক্ত,—মগেন্ ঘুমাইতেছে; সে প্রথমে দুই
তিনটা ডাক দিয়া কান্ড হইয়া ছিল, এইবার শরীরে
ঝুঁকিদিয়া তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিল। শরীরে ধরিয়া
সে দেখিল শরীর আগুনের মত গরম মহেশ ঝুঁকিল, প্রবল
অরের তাড়নার নগেনের চেতনা শক্তি লুপ্ত হইয়াছে।

মহেশ কর্তব্য স্থির করিল; তারপর দশাধর্মের বাটের
নিকটেই মহেশের পরিচিত এক ডাক্তারের ডিস্পেন্সেরী
ছিল; সেখান হইতে সে বাইরা ডাক্তার বাবুকে লইয়া
আসিল। ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিলেন—তখনও
নগেন সংজ্ঞাহীন। রোগীর ঘেঁহু পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার
যুব বিকৃত করিয়া বলিলেন—“শ্লেগ।”

মহেশ ভীত হইয়া বলিল—“উপায়?”

ডাক্তার—“সহরের পশ্চিমে শ্লেগের খুব আক্রমণ
আছে, গলার পাড়ে ছিল না—রোগীকে হাসপাতালে
পাঠাইবার ব্যবস্থা কর।” বলিয়া ডাক্তার বাহির হইয়া
গেলেন।

মহেশ নিরুপায় হইয়া বাল্যলীলোন্মাদ বাড়ীতে
হুর্গাদাস বাবুর মাতাকে একটা তবদিয়া ও লোকজনের
অভাব জানাইয়া একেবারে ব্রহ্মচারীর নিকট গিয়া
উপস্থিত হইল।

ব্রহ্মচারী অবস্থা শুনিয়া বলিলেন—“যুবক একা
আছে, তাহা হইলে যে লোকের প্রয়োজন; খাটিতে
পারে এমন লোকের প্রয়োজন।”

মহেশ বলিল—“শ্লেগের রোগীর পরিচর্যা করিতে
লোকের তর বিস্তর,—লোক পাওয়া বাইবে না—উপায়
নাই—।”

ব্রহ্মচারী—সাহস দিয়া বলিলেন—“তর নাই।”
জন সেবায়—নারায়ণের সেবায় বিপদ নাই—সে বিপদ
আমার লইয়া আইস—আমার মা হুখিনীকেই; চল
আমিই বাইতেছি।” বলিয়া ব্রহ্মচারী তাঁহার পেটিকাটা
বাম হস্তে ও বৃহৎ বটিটা দক্ষিণ হস্তে লইয়া বাহির হইয়া
পড়িলেন।

মহেশ গাড়ী লইয়া গিয়াছিল। গাড়ী চলিল। তাঁহার
অন্ন দুই হাটীয়া গিয়া একটা ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারে দাঁড়াই-
লেন। ব্রহ্মচারী ডাকিলেন—“মা। মা হুখিনী।”

ডাক শুনিয়া একটা মলিন বসনা কিশোরী আসিয়া
বাহির হইল। ব্রহ্মচারী বলিলেন—“আইস মা তোমার
গামছা কাপড় লইয়া আইস, আর এখানে আনিতো
পারিবে না; এই গাড়ীতে উঠ।”

কিশোরী যথা সম্ভব সম্বর তাহার ক্ষুদ্র সম্পত্তি
আঙুলিয়া লইয়া আসিয়া বাবার সম্মুখে দাঁড়াইল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন—“গাড়ীতে উঠ; তোমরা গাড়ীতে
বাও, আমি আসিতেছি।”

মহেশ হুখিনীকে লইয়া গাড়ীতে চলিয়া গেল।

কানীর অলি গলি ঘুরিয়া গাড়ী পঁহুঁহিবার পূর্বেই
ব্রহ্মচারী একজন ডাক্তার লইয়া আসিয়া নগেনের নিকট
পঁহুঁহিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন—একটা যুবক

সীলোক নব্বেনের মাথার বরিয়া তাহাকে ডাকিতেছেন—
তার উপায় বীনের মত চারিদিকে ফেল ফেল করিয়া
চাখিতেছেন ।

বৃদ্ধা ব্রহ্মচারী বাবাকে দেখিয়া কানিয়া উঠিলেন ।
বলিলেন—“বাবা আসিয়াছ, এখন তুমি দেখ, এ অনাথ
বালক—বাঁচেনা বুঝি—একেবারেই জ্ঞান নাই । উপায়
কি হইবে বাবা ?”

ব্রহ্মচারী বলিলেন “কোন চিন্তা নাই, এই আমি
দেখিতেছি ।”

এই সময় হুগ্ধিনীকে লইয়া মহেশ ভট্টাচার্য্যও
বাঁহিয়া উপস্থিত হইল ।

ব্রহ্মচারীর নির্দেশ মতে মহেশ প্রথম জল করিয়া
আসিলেন । ব্রহ্মচারী অল্প প্রয়োগ দ্বারা শরীরের রক্ত
পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । ডাক্তার তাহার সাহায্য
করিতে লাগিলেন । হুগ্ধিনী রোগীর মাথায় নেকড়া
জিহাইয়া জল সেক দিতে লাগিল,—বৃদ্ধা মাথায় হাত
দিয়া বসিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

ব্রহ্মচারী রক্ত পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারকে বলিলেন
“আপনি রোগীর নাড়ীর প্রতি লক্ষ্য রাখুন, আর
টেন্সারেচার দেখুন, আমি ইহার শরীরের দূষিত রক্ত
রা কেলিয়া দিতেছি । অনেকটা কেলিতে হইবে ।”

কিঞ্চ হস্তে ব্রহ্মচারী রোগীর দক্ষিণ বাহুতে যদ
দুসাইয়া বস্ত্রের মুখে রবারের লম্বা নল ঘুরাইয়া দিলেন—
কীরবেগে শরীরের দূষিত কাল রক্ত বাহির হইতে
লাগিল । তারপর যদ তুলিয়া লইয়া শরীরের সন্ধি স্থান
সকলে হস্ত বস্ত্র দ্বারা ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিতে
লাগিলেন । শরীরের স্থানে স্থানে প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া
দিলেন ও অস্ত্র স্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বাঁধিয়া দিলেন ।

কার্য শেষ করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন—“আর কোন
কর নাই । এখন আর আপনা হইতেই যাইবে ; না গেলে,
মিকানে তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে । পথ্য—বেদানার
রস দুধ, সাবু । বেদানা প্রচুর চাই । অনেক রক্ত
তুলিয়া গিয়াছে ।”

ডাক্তার বিদায় হইলেন ।

ব্রহ্মচারী বাঁহিয়ার সময় বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া
বলিলেন—“আপনার সঙ্গে আমার মা হুগ্ধিনী কে রাখে-

বেন ; বতছিল রোগীর চলিবার শক্তি না হইবে, ততদিন
না আমার আপনার নির্দেশ মত রোগীর পরিচর্যা
করিবে । তারপর আমি তাহাকে লইয়া যাইব । আমি
প্রয়োজন মত আসিয়া রোগীকে দেখিয়া যাইব । প্রলেপ
গুলিই শরীরের রক্ত নির্দোষ রাখিবে । রোগীর সহিত
কথা বলিবেন না ।”

ব্রহ্মচারী চলিয়া গেল । মহেশও তাহার পশ্চাৎ
অনুসরণ করিল । প্রেগের নাম শুনিয়া মহেশ ভয় পাইয়া-
ছিল, তাই সে দশাখমেধ খাটে শরীর প্রকাশ করিয়া
জুতা জামা খুইয়া বাসার গেল ।

হুর্গাদাস বাবু মাঠাকুর চাকর লইয়া সে বাড়ী
হইতে এ বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন । সে বাড়ীর তাল
বন্ধ রহিল ।

শেষ বেলায় নগেন চক্ষু মেলিয়া চাহিল । হুগ্ধিনী
ঝিঙ্ক দিয়া তাহার মুখে বেদানার রস তুলিয়া দিল ।
সে এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল । যন্ত্রের
ঘোরে সে যে দেখিতে পাইল—কৈশোর যৌবনের
হুতুলে পা রাখিয়া এক খান্না সুখমায়র ঘোঁহিনী নৃষ্টি বর্ণ
মর্তের ব্যবচ্ছেদ তাঙ্গিয়া দিয়া তাহার মুখে তুলির অমৃত
তুলিয়া দিতেছে । তখন সৌন্দর্য্য সমালোচনার শক্তি
থাকিলে নগেন নিশ্চয় মনে মনে বুদ্ধিত—শাক্লের
সৌন্দর্য্য ইহার তুলনায় কোথায় লাগে ?

বিপর্য্যয়ে—

আঁখিয়ার রজনীর যাত্রীরা সব ।
চৌপ'র রাতভর কেন কলরব ।
পূর্বব গগনে হের উষার আভাস,
এইবার হাড়ে ঠিক লাগছে বাতাস ।
চোখ ভ'লে আঁখি মেলে চাও একত্রার,
মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নাই আর ।
ভালো আল অতীতের বেদনা বিদ্যাদ,
চেড়ে কালো জীবনের সব অবসাদ ।
সকল কাজের সেবা লাগে এই কালে,
কেনে ডিকিছে পাব হুমিয়ার হানে ।

মাথার উপরে হোক যেন-পর্জন,
ঘন ঘোর বজ্রের হোক বর্ষন।
কব্ কব্ কব্-কব্ হুটির কল,
নষ্ট হউক শত সৃষ্টির কল।
ভেঙে চূরে আসে যদি প্রলয়ের ঝড়,
কনকনে শীতে দেহ কাঁপে ধ্বংস।
চলিতে হইবে তবু হুর্গণ পথ,
পাবে না পাবে না পথে পুষ্পক রথ।
হুংখে কেলিছ কেন গাঢ় নিশ্বাস।
নাশিয়া আত্মক প্রাণে মহা বিশ্বাস।

ক্যালো না হাজার কেন মরনের বারি,
কেউতো র'বে না কাছে দিন দুই চারি।
মাথা কুটে ছাতি গিটে মর নিশিদিন,
যুধতার ক'রে থাক বিবাদ মলিন,
ডেকে কেউ শুধাবে না করি' সমাদর,
হাত ছুটি বুলাবে না মাথার উপর।
পাবে না পাবে না কারো মেহ অক্লরোগ,
শুখের পারবা সবে, চার শ্বখ-ভাগ।
ভর কেন পাস্ তুই ওরে প্রাণবান্।
নির্ভয়ে লও যেচে হুংখের দান।

ভাখনা চলিছে সবে চলার মেশার,
হুং শোক বুকে চেপে তালে তালে বার।
কেহতো বসিয়া নাই, চলিছে কেবল,
তুই কেন ব'সে র'বি বহু পাগল।
কুল কোটে, কল বের, পাখী গান গায়,
নদীকূল কলকল চলিছে হেলার।
পতপাখী ভরলতা নিশিদিন চলে,
চলিতেছে সকলেই প্রাণপণ বলে।
চলিবার লক্ষ্য শুধু আপন বিকাশ,
হুটে গিয়া কবে পড়া চলে ব্যর্থবাস।

তোমাদেরো মাকে আছে চলিবার বেগ,
সেদিন-ই বুঝিবে যবে কেটে বাবে যেন।
এক আশা এক ভাবা এক গিণাসারি,
দিনরাত ছুটে চল ঘন ভবনায়।
বাহুব হইতে চাও, হাড়' নোক-লাজ।
বাম হাতে চোখ মোহ', ডান হাতে কল।
ব'লে ব'লে কেন শুধু কর ব্যান্ ব্যান্।
প্রাণ পাওয়া জীবনের হোক মহা ব্যান্।
সময় থাকিতে আক কর প্রাণপণ।
চলার মেশার মাতো, হুটু জীবন।

কাপিরাহে মাতোয়ারী পার্শী প্রাজীম
সাঁওতালি বুনা পারো কাক্রি মলিন।
তুমি কেন ব'লে ভাবো শিরে দিয়ে হাড়।
দুই বেলা নাহি মোটে দুই হুঠা ভাত।
বে জাতি আনিল আগে জানের আলোখ
বাহাকার করে তার কোটি কোটি লোক।
পেটে নাই হুধু ভাত, পরার কাপড়,
লাধ্ লাধ্ মরিভেছে কুবার কাতর।
মরিয়া উজাড় হলো, ভারত শ্মশান,
ঈশান বালাই তাই আপন বিধান।

কুবার বাহুন করে পাঙ্কা সেলাই,
চণ্ডী করিছে পাঠ মেঘের কদাই।
মাপিত বরিল হাল ছেড়ে কুর কাঁচি,
চাষা বলে "হুতোব্, বাবু হোলো বাঁচি।"
কাষার কুবার ছেড়ে নিজ নিজ বাড়ী,
সহরে হয়েছে সবে, একি কক্‌ঝারি।
ওলট পাগলট—তবু চাই কিছু চাই,
কাজের রাজ্যে আর জাতিভেদ নাই।
অগৎ জুড়িয়া চলে সাগর-মখন।
ভারত বানোরা করে পরম-গ্রহণ।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

রবীন্দ্রনাথঃ—হ্যাঁ। এবার দীর্ঘকালের অন্তই বাচ্চি—
সুখভি সুখোপ বাচ্চি ; সেখান থেকে আমেরিকা ও
কানাডায় যেতে হবে। পেটনমাসের পূর্বে ফিরতে পারব
না। হুটো বই লভুন বের হয়েচে—সে হুটো জনসাধা-
রনের জিতরে যাতে প্রচারিত হয়, সেজন্তে আমার
কিছুকি প্রয়োজনীয়—এ ছাড়া সে-সকল দেশ হতে
আমাদের তারা নিমন্ত্রণ করেছে—সে অন্তত বাচ্চি।
সাব্বিতা! বিদ্রোহ বারাদটা তোমার কাছে কিরূপ
হয়েছে ?

ପ୍ରଶ୍ନ—ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ବିକାଶ କରିବା ?
 ଉତ୍ତର—ହଁ, ତାହା କରିବା ।

লেখক :—যুরোপের সঙ্গে আত্মীয়তা না করে এখন আর উপায় কৈ? পশ্চিম একেবারে হুড়হুড় করে আশাদের ঝাড়ে ঝোড়ে এসে পড়েছে। তাকে ঠেকিয়ে রাখবে কে? আমাদের কাছে তাদের সহিত মিলিত হতেই হবে। নচেৎ আমাদের জীবন রক্ষা করাও দায় হয়ে উঠবে। আর এক কথা এই যে প্রত্যেক জাতিই শৈশব অবস্থার নিজ নিজ গভীর মধ্য থেকে উন্নত হয়ে পরিপুষ্ট হয়ে বিশিষ্ট একটি জাতীয়তাকে সৃষ্টি করে থাকে, তখন বাহিরের সঙ্গে সংঘাত লাগা বাহ্যনীরনয়—ছোট চারাগাছকে যেমন একটি পরিবেষ্টনের ভিতরে বাড়তে দিতে হয়, তেমনি প্রত্যেক জাতিকেও সেইরূপ বাড়তে দিতে হয়—তার একটি বিশিষ্টতা যতদিন না হয়। তারপর একদিন আগে যে দিন সেই বিশিষ্টতা সার্থকতা লাভ করে—সে দিন স্বাভাবিক দিন নয়—মিলনের দিন, অহঙ্কারের দিন নয়, প্রেমের দিন—বর্জনের দিন নয়, গ্রহণের দিন, ঐক্যের দিন—সেই দিন প্রত্যেক জাতি আপনার সমস্ত জ্ঞানকে প্রেমকে কর্মকে বিশ্বমানবের সাধগ্রী করে তোলে—সেই দিন প্রত্যেক জাতি পরস্পর পরস্পরের সহিত সন্নিগনে আপন মহিমাকে মহোজ্জ্বল করে তোলে—আমার বিশ্বাস আজ সেই দিনই এসেছে। এখন যদি যত্ন হয় থাকি তবে সেটা শুধু যে অনুবিধাকর তা নয়, সেটা অমূল্য।

ববীজনাথ—আমরা যদি কৃপমণ্ডকের মত নিজের
 ক্ষুদ্র গণ্ডাটুকুতে বসে থাকি, তবে আমাদের স্বপ্ন ও
 বুদ্ধির বিকাশ হবে কোথা থেকে! বাহিরে একবার
 বেরোও দেখবে সর্বত্রই কত প্রকার সাধনা-উপাত্ত
 চলছে কেউ স্থির হয়ে নেই—সর্বত্রই বৃত্তির অত অসীম
 প্রয়াস।

লেখক :—আর বাহিরের সঙ্গে বাটাই করে লেখলে আপনাকেও সত্য চুটিতে দেখা যায় না--তখন আপনাকে এত একান্ত করে দেখা হয় বা সম্পূর্ণ বিধা। এমনসময় এগুলি সাহেব রবীন্দ্রনাথের একমাসি ইংরেজী কাগজ হতে লইয়া সেই প্রকারে পাঠিয়া উপস্থিত।

হইলেন—তাঁর পরিধানে একটা সাধানিধে বসন, অঙ্গে
বিস্তারিত একটা লম্বা পাঞ্জাবী। সেই গ্রহ হইতে
হুয়েকটা কবিতার তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বুঝাইয়া
দিলেন—বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত প্রাণহিমোল
কি অপূরণ ভঙ্গীতে কবির মানসনয়নে প্রতিভাত হইয়া
তাঁহার চিত্তটিকে নিগূঢ়-রস-সঞ্চার-বিকশিত করিয়া
ফুলিয়াছে বুঝাইয়া দিলেন—তাঁহার কাব্য মিচরের সরল
অর্থ লোকেরা উপলব্ধি করিতে না গিয়া কিরূপে সেও-
লোকে কোন ভুল ভয়ের রূপক বলিয়া নির্ধারণ করিয়া
বিস্ময়ে পড়ে—তাঁহারাই বলে যে তাঁহার কবিতার অর্থ
বোঝা যায় না—অথচ সরল অর্থ অল্ অল্ করিতেছে।
এই বিশ মিনিট কাগ উত্তরের কথোপকথন চলিল—
তারপর এতদ্ভাষ্য সাহেব চলিয়া গেলে আবার আমাদের
সঙ্গে আলাপে-প্রবৃত্ত হইলেন।

আমরা এতদ্ভাষ্য সাহেবের সবকিছু জিজ্ঞাসা করিলাম—
ইনি একরূপ বাঙালী কাপড় পরিধান করেই সকল সময়
বাগন করেন ?

রবীন্দ্রনাথ,—ইঁহার কিছু নাই। এতবড়
বিদ্বান্ অথচ ইঁহার এত দৈবত। আনিগড় কলেজে
এঁকে প্রিন্সিপাল স্বরূপে বেতন বলেছিল,
সেখানে থাকলে প্রচুর অর্থ পেতেন—কিন্তু তিনি বাননি।
ইনি আমার শান্তিনিকেতন ইকলে তৃতীয় শ্রেণীর
ছাত্রদিগকে composition শিক্ষা দিয়া থাকেন।
ইনিই ত ভগবতী। এত বড় ভাগী করজন আছে ?
সর্বভূতের ভিতরে ইনি একটা চিন্ময় সত্তাকে উপলব্ধি
করেন বলেই তাঁদের কল্যাণের জন্য নিজের সর্বস্ব
ভ্যাগ করতে পারেন ইনি। তাই সূর্য্য তারতবার্ষিকের
রীতি বাসকদের সঙ্গে অব্যাহিত মিশ্রণে এঁর হৃদয়ে
অবৈতনিকী প্রীতির আবির্ভাব হয়ে থাকে। তাঁদের
মুহুর্তেই তিনি আপনাকে উৎসর্গ করছেন। আমি
নিজের সম্বন্ধে এত বড় আত্মত্যাগের কল্পনাও করতে
পারি না—এই খামেই ইনি আমার চেয়ে অধিক মুক্ত।

সে দিন যাত্রাজে ফুলিয়া ধর্মপট করেছিল, ইনি
অপেক্ষাকৃত ভাবিগকে সাহায্য করতে ছুটে গেলেন—কি
কিছু কিছু তাঁর সেখানে বাহার ? তবুও গেলেন—এই ত
তাঁর প্রাণের

লেখক :—আত্মোৎসর্গময়ী ত বাহুবীর সাধনা—
কেউ কবুতে কাব্যে, কেউ বা কপে, কেউ নিজে, কেউ
সঙ্গীতে—ভগবতী একই। এই এতদ্ভাষ্য সাহেব কবিতার
ভিতরে আপনাকে মুক্ত করে দিয়েছেন—তেন্নি আপনাকে
কাব্যে আপনার আনন্দময়ী পরম শক্তিটিকে উৎসর্গ করে
করতে চলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ :—সে পার্থক্য হচ্ছে প্রকৃতিগত, ক্রটিগত
বা বা temperament.

লেখক :—আমার বিষয় বোধ হয়, আপনি এত বড়
একটা শক্তি—একটা সম্পদ, আপনার সাহিত্যে কালো
ও প্রবন্ধে প্রকাশিত করছেন, অথচ তা কেহ বুঝল না।
অন্ততঃ বাংলা দেশ বুঝল না।

রবীন্দ্রনাথ :—তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই।

লেখক :—আমাদের কিছ প্রধান দুঃখই এই।
পশ্চিম আপনাকে বা-হোক কথকিৎ বুঝেচে, আদিত্য
আপনার ব্যয়ের লোক হয়ে আপনাকে বুঝল না।
এর চেয়ে কোন্‌দের কারণ কি আর হতে পারে। এই
সেদিন গিরিলালকর বাবুর ফান্টারী একখানা সমা-
লোচনা পড়লাম। দেখলাম তত্‌লোক ঐ নাটকটির
কোনো কিছুই বোঝেন-নাই, খামখা কতকগুলো মিন্‌কার
প্রচার করেছেন। আমার পড়ে হাসি এল—“তামো
মানুষ নই গো মোরা ভালোমানুষ নই” এই কথাটার
যে কি তাৎপর্য্য তাও বোঝেন নি। তারপর বুদ্ধি এক
কুরবার যে “অন্ধ বাউল” যে কেন এল, সেটার লম্বা
বর্ষ গ্রহণ কর্তে পারেন নি। তলিয়ে না পড়ে, না বুঝে,
অনর্থক কতকগুলো গাল দেবার জন্মেই সমালোচনার
লেগে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ :—বহুপূর্বের থেকেই আমার লেখা পড়ে
কতলোক একরূপ কত সমালোচনা করেছে। আমি তাতে
কৃত বা দুঃখিত নই।—এ হওয়া অব্যাহািক নয়।

লেখক :—বড় বড় লোকদের কাছে শুনেছি তাঁরা
বলেন, যে আপনি বড় Destructive, Constructive
genius আপনার নেই। আমার মনে হয় কিছু
ঠিক এর বিপরীত। পড়তেই ত আপনি—ভেঙেছেন
কি। তবে বা ধ্বংস করেছেন তা সৃষ্টিরই পূর্ব আয়োজন

আমি জানি কতই কাঁচ হই নি—পড়ে, ভবে হেঁচকে—
কিন্তু আমি করে লজাকে প্রতিষ্ঠিত করেচেন, পাগকে
কিন্তু লজা পূর্ণাঙ্গ কর পতাকা উড্ডীন করেচেন, বহু-
কিন্তু লজা অঙ্গের অটলারতন কে বিদীর্ণ করেচেন।
কিন্তু তাই করেই কি কাঁচ হয়েচেন—এত আপন্যারি
কিন্তু “কারাগার বা হিল, সেও আমি ভেঙে ফেলিচি,
কিন্তু সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে যদি
কিন্তু “নূতন সৌধের সাধা ভিত্তকে
কিন্তু আমার আলোক মধ্যে অস্তিত্বের করে দাঁড় কহাও”।
কিন্তু যা পড়েচেন তার মহিমা চিরদিন অক্ষয় হয়ে
কিন্তু আমি। আমার জাতীয়-জীবনে আপনি যে
কিন্তু আমার উদ্বোধন করলেন, এর গরিমা একদিন
কিন্তু হয়ে উঠে নেই! এই উদ্বোধন সত্যের উদ্বোধন,
কিন্তু আমার উদ্বোধন। এই উদ্বোধন বাণী আল দিগ্-
কিন্তু আমি করি—দুগুণাঙ্কের লজা এ অমর হয়ে
কিন্তু—এই উদ্বোধন-মন্ত্রের ধ্বনি হচ্ছে আপনি—আমরা
কিন্তু নিজের মত একে অনুসরণ করে চলব।

রবীন্দ্রনাথ :—দেখ। প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে
কিন্তু একটা message আছে। সেই message প্রচার
কিন্তু তার আছে তার পরে। সেই message চির-
কিন্তু কিন্তু তার আকারটা হচ্ছে অভিনব। যন্ত্রের
কিন্তু দেখানো করেছে, সেইখানেই সেই চিরনবীন,
কিন্তু প্রিয়পুত্রের message আর গোপন থাকে নাই।
কিন্তু একটা message ছিল, সেটা আমি প্রচার
কিন্তু—কিন্তু অহরহ বিশ্বাস অন্ধকারে বাসের দুটি
কিন্তু করে আছে তারা সত্যের আলোক দেখলে সহসা
কিন্তু ওঠে—তাদের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক নয়—তারা
কিন্তু একি গোপন্য। আমাকেও তারা তাই ভেবেচে,
কিন্তু আমি কি লজা-প্রচার করব না? অবশ্যই করব।
কিন্তু মোক এখন বুঝেচেনা, একদিন না একদিন
কিন্তু হবেই তাদের।

লেখক :—দেখের কোক আপনার সবচে কতদূর
কিন্তু—তারা বলে আপনি আচার-নিয়ম মানেন না,
কিন্তু আমার কাছে।

রবীন্দ্রনাথ :—দেখ। আধুনিক বিশ্বনামে ধর্মের

অনুপ্রাণনা কোথাও থাকেনি—কোথাও কোনো প্রকৃত
সাধক নেই—সেই কতই বেশের লোকেরা কতকগুলো
আচার-নিয়ম পালন করেই ভাবে যে সব হয়ে গেছে।
আর অল্প সহস্রবিধ পাগে লিপ্ত হতে কুঠাবোধ করেনা।
ভাবে তারা, রে, আচার নিয়ম কিনিবটাই একটা মত
লাভ; এই ভেবে তারা পুণ্যকে লজা করে নিরেচে—
বিশেষ বিশেষ কতকগুলো অমর্ত্য ঠিক রাখলেই হ'ল;
তারপর জাল জুরোচুরি বাই কর না কেন, তাতে কিছু
আসে যায় না।—তাই দেখা গেছে, কত উকিল কত
দারোগা দীন দরিদ্রকে নিপেষিত করে অর্থ লুণ্ঠন করে
দিশা বোধ করে না—অবচ তারাও আচার-নিয়ম-
গুলোকে হবহ বজার রাখতে।

এরমানে আর কিছু নয়—অন্তরে অন্তরে যে অপরিসীম
রিক্ততা এসে পড়েচে সেইটেকেই কতকগুলো বাহ্য
কিনিব দিয়ে তরাট করে দিতে চাচ্ছে। কিন্তু বাহ্যিকে
হাজারি চক্চকে করো না কেন, ভিতরে যদি পদার্থ
না থাকে তবে তা সম্পূর্ণ নিরর্থক ত বটেই বরক একটা
দাক্ষিণ বন্ধন। তাদের হুজির দিকে কিছু-নাও আগ্রহ-
নেই—তাদের পক্ষে এই-সব আচার-অমর্ত্য কেবলই
বন্ধন। প্রকৃত ধার্মিক যদি কেউ আবির্ভূত হন,
তা হলে অবশ্য এগুলির সার্থকতা হয়ত থাকতে পারে,
কিন্তু আমি কর্চি দালালীগিরি, আমার ওটা কতক নয়
আওড়ালে আর কতকগুলো জলের ধারার নাম করলে
কি হবে?

লেখক :—দালালীগিরি আর দারোগাগিরিই ত
মানুষের চরম লক্ষ্য নয়—তার লক্ষ্যই হচ্ছে মুক্তি। কিন্তু
মুক্তিকে লাভকর্ত্তে হলে তো কর্ণের মধ্যদিয়ে নিয়ম
অমর্ত্যের মধ্যদিয়ে বেতে হবে!

রবীন্দ্রনাথ :—শিষ্টরই! কর্ণকে ও নিয়মকে বাহ্য
দিয়ে যে মুক্তি সেত মুক্তিই নয়, সে আর কিছু। এই
কথাই ত আমি বারবার বলেচি। নিয়ম বন্ধনের ভিতর
দিয়েই ত আনন্দ বরণ আপনাকে মুক্তি দান কর্ত্তে করতে
চলেচেন।

নিয়মকে বাহ্য দিলে আমার প্রকাশ হবে কি করে?
নিয়ম ত চাইই, তবে আমি এই দাঁড় বলাকে চাই। সে

বাঁধা মুক্তিকে চায়, তোগকেই চায়, তার নিয়ম পালন করছে কেন ? না, তার মনে হয়েছে যে নিয়ম-পালন করলেই খুব একটা লাভ হল—তুলে গিয়েচে যে নিয়ম—কিন্তুটা মুক্তির বাহন বাজ ! অর্থাৎ সে নিয়মগুলো ততক্ষণই সার্থক বস্তুত্ব তা আমাদের মুক্তিকে প্রকাশ করতে, মতেই নির্বাক ! কিন্তু আমাদের দেশের লোক-দের এদিকে কোনো মন্তব্য নেই । তার কল হয়েছে কি, আচার নিয়ম বাজাই একটা পুণ্যকর ব্যাপার হয়ে উঠেচে, তাতে কতকগুলো ভালো নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মন্দ নিয়মও আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে—তাতে অতি তুচ্ছ লোকাচার গুলোকেও চমুতে না দিয়ে অচল করে রাখা হয়েছে এবং ভূরিপরিমিত অসংবত উচ্ছ্বল প্রাণ সমাজের মধ্যে ঢুক পড়েচে !

প্রকৃত ধর্মপ্রাণ এদেশে অল্পে নাই, তাই এদেশে এসব চলচে । প্রকৃত ধর্মের আবেগ যদি একবার উজ্জ্বলিত হয়ে উঠত, তবে কি এসব কুনিয়ম দেশে থাকত ! তবে কি আচার গুলোকে এরকম অচল বোঁটার মত ব্যবহার করা হত, এবং তাতেই লোকেরা লম্বট থাকত !

দেখ ! তোমার যদি টাকা পাবার জন্তে লালসা থাকে, তবে যে কেউ তোমাকে সেই অর্ধ-লালসার চরিতার্থতার জন্তে কোনো পথ দেখিয়ে দেয়, তুমি নির্ভীক-চায়ে তা কখনো মেনে নিতে পারবে না ; তুমি পরীক্ষা করবে সে পথ প্রকৃত পথ কি না ; তার পর তাকে অবলম্বন করবে—যদি তা না কর তো বোকা বাবে তোমার অর্ধের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ নেই । তেমনি ধর্মকে লাভ করার জন্তে প্রাণে বার পিপাসা দেগেচে তাকে ও কেউ হুটে নিয়মের কথা বলে তুমিই রাগতে পারবে না—সেত দেখবে, সে নিয়ম সত্য-নিয়ম কিনা—তাকে মুক্তি লাভ করা বেতে পারে কিনা ; সেত কখনোই কামোদিত্বের মত অত্যন্ত আচার গুলো মেনে চলবে না—সে মুক্তি খাটিয়ে বিচার করে দেখবে কোন্ আচার ধর্মের পক্ষে অঙ্গুষ্ঠ এবং কোন্টী প্রতিফল । সে যে লোক নিয়ম-পালন করবে তা তোমার আমার ধান্ধলের মত নিয়ম নয়—তা বিশ্বের অসংখ্য নিয়ম, একের সহস্র নিয়ম

—বিশ্বের সেই অসংখ্য নিয়মকে মানি না। বসেই ও মুক্তি প্রকার নির্বাক আচারের বন্ধনে আবদ্ধিত হচ্চি—তার ও মাঝে প্রকার কৃত্রিম বীভৎস প্রকার পীড়নে পীড়িত হচ্চি—মহত্ত্বকে বহুবিধ ভীকতা ও মূঢ়তা দ্বারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্চি ।

উপনিষদে আছে “বাধাতথ্যাতো ধর্মবান্ধবঃ শাখতীভ্যঃ” সমাভ্যঃ অর্থাৎ তাঁর বিধান বধাবধ, তুলোমেলো নয়, এবং সে বিধান শাখত কালের । এই নিত্য কালের জন্য বিহিত—তা মুহূর্তে মুহূর্তে নুতন নুতন ধেরাল নয় । সেই নিয়মকে না মেনে আপন ধেরাল আর যাকেই মানতে বাত তাতে বন্ধনটাকেই লাভ করবে, মুক্তি থেকে আত্মাকে চিরদিনের জন্য নির্বন্ধিত বকিত করা হবে । এবং সেই বন্ধনটাই দেশে দেশে আজ একাধিপত্য বিস্তার করেছে ।

লেখক :—আপনাকে সমাজ উচ্ছ্বল বলে প্রচার করচে—কিন্তু বস্তুতই তারাই উচ্ছ্বল ও অসংবত ; তারা বিশ্ববিধাতাকে অগ্রাহ্য করে ব্যক্তিগত ও সমাজগত বিশিষ্ট বিশিষ্ট কৃত্রিম প্রথাকে নিদাক্ষণ উচ্ছ্বলের সাক্ষ্য লাহির করচে ।

রবীন্দ্রনাথ—এবং সেই জন্য তারা এত অধঃপতন হয়ে উঠেচে যে তারা বিশ্বের সমাইকে ছোট করে দেখে নিজেরা সব চেয়ে বড় হয়ে উঠতে চায় ।

লেখক :—আচ্ছা, এদেশে যে সব মন্ত্রলান প্রচার আছে—বেমন বিশ্ববার নির্জলা একাদশী এগুলো শুনতে বোকা নয়, যে সম্পূর্ণ নির্বাক ও মুক্তির প্রতিফল, তুলো এগুলোকে নির্বন্ধভাবে এদেশে প্রচলিত করা হয়েছে ।

রবীন্দ্রনাথ :—বিশেষতঃ বাংলা দেশে । ব্যক্তিগত ভাবে যে নির্জলা একাদশী করলেই পবিত্রতা প্রকাশ হ'ল—এদিকে বালবিধবাদের শিকার কোরো । যতদূর দেখে নেই—চোখের সামনে কত অনাড়ম্বর দেখতে—তাদের মন কত কলুষে পরিপূত হয়ে উঠে—সেই কাল থেকে নেই—নির্জলা একাদশীটি ঠিক পবিত্র আছে ! আচ্ছা এই যে একাদশীর দিন একাদশীতে কলুষে মিতে থাকে না এইটো কি পুণ্য নয় ? একাদশীতে এত বন বিভূত হয় না, তামসিক হয়ে ওঠে ? এই

নিজেকে কি কোনো কল আছে—এতে কি সংঘব শিকা
হয়? আর আর যেনে কল জল হুব এ সব খেতে
হয়—কিছু এসেলে নয়বার মুখে ঠেব খাওয়া নোও
মিলে না। এই এই নিবেদনা যাম্বে সেটা হল পাপ।
সংস্কৃত পবিত্রতার ক্ষেত্রে অবশ্য পবিত্র আহার করা উচিত।
সাংস্কৃতিক আহারের বহলে সাংস্কৃতিক ভোজ্য গ্রহণ করা
উচিত। নিরাশ্রিত আহার এই ক্ষেত্রেই কল্যাণপ্রদ।
নিরাশ্রিতের নিরাশ্রিত আহার করানোটা ভালই; কিন্তু
নিরাশ্রিত একজনীটা নিরাশ্রিত পীড়ন—অথচ যে পীড়নে
নিরাশ্রিত পীড়িত উদ্ধত হয়ে না উঠে, তামসিক হয়ে যায়।
নিরাশ্রিত নিরাশ্রিত পবিত্রতা এই কথাগুলো আমরা
সংস্কৃতিক আচার্য্যি অথচ এগুলোর আদর্শ যে কি, তা
সংস্কৃতিকের মনে নাই। এই সেদিন যেমার গ্রেণ সাহেবের
মৃত্যুর পর তাঁকে নিমন্তলার দাহ করানো হ'ল। এরকম
সংস্কৃতিক পবিত্র ব্যক্তি মুহূর্ত্ত। এতবড় মহাপ্রাণ খুব
জীবে দেবা যায়; অথচ নিমন্তলার তাঁর শবদাহ হল বলে
সংস্কৃতিক পবিত্রতার বের হল “হিন্দুধর্ম্ম আজ রসাতলে
গেল”। আমি ত বলি নিমন্তলার চৌদ্ধপুরুষের সৌভাগ্য
সংস্কৃতিক বড় মহাপ্রাণ—লোকের শব আদ—সেখানে দড়
হয়।

পবিত্রতা কাকে বলে? নিজেকে চতুর্দিকের সংস্রব
সংস্কৃতিক আচার্য্যি রাখেই কি উচিত হওয়া যায়। বিবেক
সংস্কৃতিক আচার্য্যি হুয়ে হুয়ে রেখে নিজেকে বতর করে
হয় কি উচিত হওয়া যায়। মানুষ মানুষকে, শুধু মানুষ
সংস্কৃতিক আচার্য্যি মানুষকে বিদেশী বলে ত্যাগ করবে এই
কি উচিতের চিহ্ন। এ যে বোর অশুচিততা, বোর পবিত্র
আচার্য্যি—এ তে অসংস্কৃতিকই বাড়ে, আর—কিছু হয় না।
সংস্কৃতিক আচার্য্যি কি? সে হলে আচার্য্যি কে বর্জন
করে—নিরাশ্রিত ও ভোগ্যকে ত্যাগ করে আচার্য্যিকে
সংস্কৃতিক করে রাখে! সংস্কৃতিকের আচার্য্যি কি? সেত
সংস্কৃতিক নয়। সে হলে চিত্তকে সর্বকোষে বিবৃত রাখে।
সংস্কৃতিকের পাপপূর্ণ আবেশনগুলোকে দমিত করা—
সংস্কৃতিক বিকোষগুলোকে প্রশমিত করা—কিন্তু এখন
সংস্কৃতিক পবিত্রতার যে আদর্শ এসেছে প্রচলিত আছে
সংস্কৃতিক চিত্তকে বোল আদাই আছে। পবিত্র হতে

হলে শুধু নিরাশ্রিত-হবিত খেলেই চলবে না—সংস্কৃতিক
লোককে কল্যাণ চাই। শুধু সংস্কৃতিকের নিরাশ্রিত
খেলেও তা পাপ। এখনকার হবিত জগদ্বারী অনেক
লোকই লোভের দাস।

লেখক ১—আচ্ছা অসুখ জাতির হাতে খেলেই অস-
বিত্র হ'ল, এ রকম যে একটা ধারণা সত্য বলে আছে সেটা
কি ঠিক?

রবীন্দ্রনাথ ১—কখনই নয়। পবিত্রভাবে পবিত্র
সাংস্কৃতিক আহার সাংস্কৃতিক বিহার এ সমস্তই উচিতের চিহ্ন।
ব্রাহ্মণ যদি মরলা হাতে মরলা জল দেয়, তবে তা বর্জনীয়
এবং মূল্যমান সন্তানও যদি পবিত্রভাবে বিবৃত জল দেয়
তবে তা সানন্দে গ্রহণীয়। দেখতে হবে আহার বা
করুচ তা পবিত্র এবং বিবৃত কিনা—যে দিচ্ছে সে পরি-
ষ্কার এবং পবিত্র কিনা এবং বা আহার করুচ তাতে
তোমার কিঞ্চিৎ পরিমাণে লোভ আছে কিনা। এই
তিনটির প্রতি দৃষ্টি রাখলেই উচিততা রক্ষা করা যেতে
পারে।

লেখক, এখনকার দিনের আচার্য্যি নিরম সংস্রব ও উচি-
তার আদর্শ বেখে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিচার করুতে
বেও না। তখন অগ্নি, জল, মাটি, অন্ন প্রভৃতির সঙ্গে
আচার্য্যি যোগ স্থাপন করবার ক্ষেত্রে প্রত্যাহই নানা কর্ণে
নানা অহুতানে তাদের পবিত্রতা সংগ করবার বিধি ছিল—
তখন সমগ্র ভারতীয় জাতি জীবের প্রতি হিংসা পরিত্যাগ
করে, মৎস্য মাংস আহার পরিত্যাগ করে, নিরাশ্রিত
আহার করুত। নদী সঙ্গমে, সমুদ্রতীরে, পর্বত শিখরে,
যেখানেই ভূমার বিশেষ বিশেষ প্রকাশ দেখা গেছে,
সেখানেই ভারতের তপস্বীপণ তীর্থস্থান স্থাপন করুতেন—
মানুষ সেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত পূর্বতম মিলনে সাক্ষাৎ
হতে পারুত। কিন্তু এখনকার দিনে সে form গুলো
আছে কিন্তু সেই spirit নেই। তাই সে সব সংস্রব ও উচিততার
উদ্বোধনকারী নিরমগুলোকে বিবৃত করে পালন করা
হলে। এখনকার শাস্ত্রাংশাসন হলে যে অসুখ জীবের
অসুখ জলের দ্বারা অসংস্কৃতিক করুতেই চৌদ্ধপুরুষ
উদ্বোধন হবে—এখন এতে বলাই নদে আচার্য্যি সত্য নেই

জগতের নতুন দিগন্ত আন্নার বোপে শিক্ষা কিছুই দেওয়া হতে না। অর্থাৎ নিয়মটাকে কৃত্রিম উপায়ে চালানো হতে। গরার বেধেচি জীলোকেরা অল্প বয়সেই পাঠানের পায়ে চলে দিতে—বাদের না আছে রিতা, না আছে চরিত্র ; এতে যে একটা অভিনির্ভা প্রচার করা হয়, তাতে বিচার বুদ্ধি নষ্ট হয়। এবং spiritual মুক্তির এটা একটা ঘোর বাধা।

লেখক :- বুদ্ধিপূজা সবচেয়ে আপনাত্মক কি মত তা জানবার জন্য আমাদের সবিশেষ কৌতূহল আছে।

রবীন্দ্রনাথ :- দেখ! এদেশে এখন যে ভাবে বুদ্ধিপূজা করা হয়, তাতে বুদ্ধিকেই চরম ও পরম উপাস্ত্র ভাবে দেখা হয়—ও ভাবে বুদ্ধিপূজা করার কোনো মানে নেই, কেন না উহাতে আত্মোপলব্ধির কিছুমাত্র সাহায্য করে না—বরং ক্ষতিই করে। কিন্তু বুদ্ধিপূজাতে যদি বুদ্ধির ভিতর দিয়ে অমূল্য ব্রহ্মকে দেখবার সাধনা হয়, তবেই তাই সার্থক ও সুন্দর। এখনকার দিনের বুদ্ধিপূজা নিত্যকাল বীতংস ভাবে আচরিত হয়, কিন্তু বুদ্ধিপূজা জিনিষটা কখনো ধারাপ নয়—এর খুব বড় একটা অর্থ আছে—এতে সাধনাকে সুসঙ্গত ও সুস্পর্শ করেই তোলে—আমাদের দেশে বুদ্ধিকে নিয়ে এক প্রকার ভক্তি বিলাসিতা সৃষ্টি করে বসে—নিজ নিজ হৃৎপ্রবৃত্তি গুলোর চরিতার্থতা করবার জন্যই যেন বুদ্ধিপূজা—তাতে কত-রকম অসংবত উচ্ছৃঙ্খলতা ও বীতংসতা আছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ভাবকে রূপের ভিতর দিয়ে দেখবার জন্যে যদি কেউ বুদ্ধিপূজা করেন তাহলে তাতে এ সমস্ত বাধাখোঁজ চলতে পারে না ; তাতে বীরতা থাকবে, সৎস্বপ্ন থাকবে, নিয়ম থাকবে।

আমাদের ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনাই হচ্ছে রূপের ভিতর দিয়ে অরূপকে উপলব্ধি করা—অরূপকে রূপের ভিতর দিয়ে দেখা কিন্তু প্রাণের আনন্দ না আগলে রাখা বুদ্ধিপূজা করে লাভ নেই। অনেক বলেন বুদ্ধি পূজা করতে করতে পরে বুদ্ধির ভিতর দিয়ে প্রেমের স্বাদ পাওয়া যাবে ; কিন্তু সেটা ভুল—আগে প্রেম বা আনন্দে, আমরা রূপের দ্বারা ব্যাপ্ত থাকলে পরে ভাবের সত্যবোধ হতেই পারে না। প্রাণের আনন্দ কখন উদ্ভূত হয়ে উঠে, আপনাকে আপনি করতে পারে

না, তখনই রূপের ভিতর দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করতে। রূপ সেই আনন্দকে সেই প্রেমকে আরো সম্পূর্ণ করে তোলে। প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ বখনি হয়েছে তখনই রূপ গ্রহণ করেছে। সেইভাবেই ভারতবর্ষ বুদ্ধির সাধনাকে এত উচ্চ স্থান দিয়েছে। বস্তুতঃ নিরাকার সাধনাকে চেয়ে সাকার সাধনা যে অনেক উন্নত এবং পূর্ণ ভাবে কোনো সম্ভব নেই। আমিও তাই করছি। আমি রূপেরই উপাসক। রূপের ভিতরে অরূপের অমূল্যত্বই আমার সাধনা—রূপকে আমি কোনদিনই বাধা দিচ্ছি না। জগতের কত বিচিত্র রূপের ভিতর দিয়ে অরূপের আনন্দকে আমি দেখছি এবং তার কাছে আমার আত্মাকে উৎসর্গ করে দিচ্ছি। এমন কি, অরূপ যদি সেই পরমাত্মাকেও তা আমি রূপ দিয়ে দেখছি। এই হচ্ছে ভারতের চরম সাধনা। এই সাধনাতেই রাস-প্রসাদ, চৈতন্যদেব সিদ্ধ হয়েছিলেন।

লেখক :- আচ্ছা, আমাদের দেশের মেয়েদের উন্নতির জন্য কি ভাবে তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত তা তাদের কাল কি ?

রবীন্দ্রনাথ :- কথাটা যখন উঠল তখন এই প্রশ্নের এবার গুরুত্বটা মেয়েদের সঙ্গে আমার বা আমার হয়েছিল তা বলছি তখন—

এবার বোঝাইয়ে দিয়ে অনেক বোঝান সত্য। অস্তিত্ব নানাম সত্য বক্তৃতা দিলে। সেখানকার লোকেরা আমাকে খুব অভিনন্দিতও করেছিল কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি কিছুতেই পেলেম না। তারপর একদিন মেয়েরা আমাকে নিমন্ত্রণ করলে—আজকাল নিমন্ত্রণ বলে বা বোঝায়, তা তারা নয়। অর্থাৎ তারা ইচ্ছা করে আমাকে না। কিন্তু তারা আমাকে যে তাদের হৃদয়ের প্রকাশ দিয়ে বরণ করে নিলে তাতে আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। তাদের কাছে গিয়ে আমার হৃদয় গুলে গেল। কোনও প্রকার সঙ্কোচ রইল না—তারা আমার কাছে কিছু উপদেশ আদর্শনা করলে আমি বললাম :-

সত্যবাদী। তোমরাই হচ্ছে দেখক কল্যাণী রূপিনী। অর্থাৎ দেশে তোমরা যে বেঁচে আছ, তা

কোনো চিন্তা নেই। জেগেই আছে দেশের পুরুষদের
বুড়ি তেলে দেবার কাজে এবং পাখা ঘিরে বাতাস করবার
কাজে। কিন্তু জোমাদেরও একটা কর্মের কেন্দ্র আছে।
সে কেন্দ্র সবটাই পুরুষদের কেন্দ্রের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক
কিন্তু তবুও একটা কেন্দ্র আছেই। অনেক বলতে চান
যেহে পুরুষে কোনও ভেদ থাকবে না—কিন্তু ভেদ
কোনো সত্যকার সেখানে তা থাকবেই এবং থাকাই
শ্রেয়। সেজন্যে ওদিকে বুদ্ধি দিলে চলবে না। পুরুষ
পুরুষের কাজ করুক, আর মেয়ে মেয়ের কাজ করুক।
এইটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মেয়েদের কাজ কি?
কাজ মেয়েরা যে নিরবক আচার-নিষ্ঠার অর্জিত হয়ে
সকলে এতে তাদের নারীত্বের মহিমাকে ধরু করে
দিয়েছে। মেয়েরা কি করবে? তারা নিজেরা পর-
স্পরের সঙ্গে কল্যাণবন্ধনে মিলিত হবে এবং কল্যাণ
নিরবে কল্যাণ-কর্মে দ্রুতী হবে এবং পুরুষদের মধ্যে
ও অনৈক্য আছে সেটাও দূরীতে চেষ্টা করবে।
জোমেরা অবশিষ্ট কত কি লীগ তৈরী করচে—সে জন্ত
কিন্তু যেটে বরচে। তারা নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত।
কিন্তু যে বিলম্ব তা হচ্ছে স্বার্থের বিলম্ব—কিন্তু মেয়েরা
ও বিলম্ব তা হবে গেমের বিলম্ব। মেয়েরা পুরুষ-
বিশ্বকেও স্বার্থের থেকে প্রেমের পথে আনতে চেষ্টা
করবে এই হচ্ছে তাদের কাজ। মেয়েদের তুচ্ছ করলে
কিন্তু কেন? মেয়েইত একদিন বলেছিল—

“দেখাং নাস্তাতা তান্ কিমং তেন কুর্য়াম।”

লেখকঃ—কিন্তু আমরা মেয়েদের উচ্চ শাস্ত্র হতে
অজ্ঞত করেছি, তাদের কোন একটা মূল্যই দিই না।
তারপর গায়ত্রী পাঠ পর্যন্ত নিষেধ।

রবীন্দ্রনাথঃ—এটা সম্পূর্ণ গায়ের জোরে করা
কিন্তু—কেননা মেয়ে পুরুষে কতকগুলো বিষয়ে
স্বাধীন থাকলেও মূলে সন্ধ্যাই এক। কিন্তু সেই
সম্পর্কই যদি ছেদন কর, তবে আর রইল কি?

গায়ত্রীই বল উপনিষদই বল—এ বিশ্ব মানবের
সম্পত্তি। এ মেয়ে-পুরুষ সবার নিজের জিনিষ। গায়ত্রী
বিদ্যারূপে এখন খেলো করে সবাই নিয়েছে। তার
জীবন দিক সবার মধ্যে সে বসে কেহই অংশ করে না।

কিন্তু গায়ত্রীর সাধনাই ভারতের শ্রেষ্ঠতম সাধনা।
ও তুচ্ছ বঃ বঃ এর নাম হচ্ছে ব্যাক্তি। অর্থাৎ চারদিক
থেকে আক্রমণ করে আনা। স্বার্থ আর্থা তিনি তিনি
এই ভাবে তুচ্ছ বঃ বঃ লোকের মধ্যে চিত্তকে প্রেরণ
করে সমস্ত বিশ্ব-জগতকে মনের মধ্যে আক্রমণ করে
আনেন—

তৎ সনিতুর্করণ্যং তর্গোদেবন্ত বীমহি

এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি—

বিমো যোনঃ প্রোচোদরাৎ

যিনি আমাদেরকে বুদ্ধি বৃত্তি সকল প্রেরণ করেছেন—
তার প্রেরিত সেই বীমহেই তাঁকে ধ্যান করব।
বাইরের জগৎ ও আমার অন্তরে বী, এই দুইই একই
শক্তির বিকাশ, এ জানলে জগতের সঙ্গে আমার চিত্তের,
এবং আমার চিত্তের সঙ্গে সেই সত্ত্বিদানন্দের অনিচ্ছ
যোগ অসম্ভব করতে পারি। এতেই দেখা যাচ্ছে
পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ অসম্ভব করা
এইটেই ছিল ভারতবর্ষের সাধনা। ভারতের ঋষি
হচ্ছেন তাঁরাই—তে সর্বাং মর্কতঃ প্রাপ্যধীর।

মুক্তাখ্যানঃ সর্গমেবাভিগতি

ধীর পরমাত্মাকে সর্গজ হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন
সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন সকলের মধ্যে প্রবেশ
করেছেন। সর্গাহুত্বই হচ্ছে ভারতবর্ষের সাধনা।
নিকটে ও দূরে বা-কিছু দেখা আত্মার যোগে সকলের
মধ্যে আপনাকে বিস্তৃত করে দেওয়াই হচ্ছে আত্মার
মুক্তি। তাতেই আত্মার প্রকাশ। এক সময়ে ভারত-
বর্ষ জগৎকে যারা-ছারা বলে উড়িয়ে দিয়ে নির্বাকের
সাধনা করতে লেগে গিয়েছিল সত্য কিন্তু এইটেই
ভারতবর্ষের প্রকৃতি নয়—এটা বিকৃতি। যারাবাদীরা
বলেছিল বা-কিছু দেখতে সবই মৃত্যু, সবই মিথ্যা,
তুমি নিজেও মিথ্যা—অতএব সব ত্যাগ করো এবং
আপনাকেও ত্যাগ করো অর্থাৎ মর—এই আত্মহত্যার
সাধনার লিঙ্গ হতে বসিচ কেহই পারেন নি। কিন্তু
উপনিষদ শীঘ্র ও অশীম দুইই বেনেচে—রণ, অরণ
দুইই বেনেচে, অরণ ও গোহং দুইই বেনেচে।
তাঁরা জগৎকে কখনো বাহু কেন নি।

ঈশাবাস্তবিকঃ সৰ্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে
যা-কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন করে
দেখবে—এইত উপনিষদের উপদেশ।

যো দেবোহম্মো যোহপমু

যে বিশ্বং ভূগনমাবিবেশ

য ওলধিবু বনস্পতিবু

তন্মৈ দেবারং নমোনিমঃ।

একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে বিবেচনাকে দেখা ?
বিশ্বের মাঝখানে বিশ্বের যিনি পরমসত্য তাঁকে এক
বার উপলব্ধি করলে পর, আমাদের দৃষ্টির সব জড়
আবরণগুলো দূর হয়ে যায়—তখন জগৎ আর শুধু
জগৎই নয়—তা ব্রহ্মস্বর, তখন রূপ আর মোহ নয়—তা
অগ্নরূপেরই প্রকাশকেন্দ্র। তখন বিশ্ব একটা যন্ত্রের মত
আমাদের অভ্যাসের কক জড়িয়ে থাকে না—প্রতি মুহূর্তেই
এই অশুভ আকাশের অসীম আনন্দ থেকে তা জন্মগ্রহণ
করচে, এই কথা বুঝতে পারি; তখন আকাশ ও
পৃথিবীর, জীব ও শিবের, ভক্ত ও ভগবানের অচিন্ত্য
লীলারহস্য উপলব্ধি করতে পারি; তখন দেখি সর্বত্রই
আনন্দ—পরমানন্দ, সর্বত্রই মুক্তির উৎস উৎসারিত, সেই
উৎস দ্বারার চিন্তটাকে স্মরাত ও পবিত্র করে পরিপূর্ণ
করে তুলতে পারি; তখন সকলের সঙ্গে সহযোগে বলতে
পারি যে আমি ধন্য !!!

নেপালী দরবার।

(মহারাজী লক্ষ্মীদেবী)

নেপালী দরবারের পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে মহারাজী লক্ষ্মী-
দেবীর নির্কাসনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে; এই
প্রবন্ধে কি কারণে নেপালের পাটরাণী লক্ষ্মীদেবী
বেনারসে নির্কাসিত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ লিপিবদ্ধ
করিলাম।

চৌভূরীয়া ও পাণ্ডেগণ নির্কাসিত হইয়াছিলেন।
কিছুকাল পর হইলে মহারাজাধিরাজ উদাদিত্যকে দেখে
কিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। কতজনকে প্রধান
মন্ত্রী পদ দেওয়া স্থির হইল। তিনি না আসিয়া পঁছা

পর্ষাও জল বাহাদুরই প্রকৃত প্রভাবে অহারী ভাবে প্রধান
মন্ত্রী পদ গ্রাপ্ত হইলেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল
কতজন নামে মাত্র প্রধান মন্ত্রী, কিন্তু মহারাজীর জিহবার
গগন সিংহ সামরিক ও বৈষয়িক সর্ববিধ ব্যাপারে কড়াকড়
করিয়া প্রধান মন্ত্রী হইয়া বসিয়াছেন। কার্যভার কতজন
মাত্র বেওয়ানী বিচারক হইয়া রহিলেন। বর্তমান মন্ত্রী
সভায় জল বাহাদুরের সর্ববিধ প্রাধান্য এক প্রকার বিস্তৃত
হইয়া গেল। তিনি যুবরাজের পক্ষের লোক বলিয়া
মহারাজ ও মহারাজী কর্তৃক এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।
এই সকল হইলেও জলবাহাদুর বিপুল উদ্ভবশীল বলিয়া
কেহই তাঁহাকে জেনারেল পদ হইতে নামাইতে সাহস
করিল না। তাঁহার আধিপত্য একরূপ রহিয়াই গেল।

নেপালের এই বিবন গোলযোগের সময় প্রধান শিব
যুদ্ধ চলিতেছিল। হীন কুলোত্তম গগনসিংহের মহারাজীর
নিকট সর্বদা বাতারাতে এবং মহারাজীর নাম করিয়া
তাঁহার আদেশে কাঁধে হইতেছে বলিয়া বোষণা করিয়া
মহারাজা ক্রমেই অসন্তুষ্ট হইতেছিলেন। ইহার পরে
গগনসিংহের বিরুদ্ধে প্রকৃত প্রভাবে একান্তে যুদ্ধের আরম্ভ
হইল। ১৮৪৬ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বর গগনসিংহ যখন নিজ
পুত্রার নিযুক্ত ছিলেন, তখন লালকা নামক একব্যক্তি
জানালা দিয়া গুলি করিয়া তাহাকে মারিয়া কেবল
গগনসিংহের দেহ মাটিতে পড়িয়া রহিল, সব প্রাণ বহু
টেউ খেলাইতে লাগিল। হত্যাকারী কোন দিক দিয়া
পলাইয়া গেল, কেহ ধরিতে পারিল না। চতুর্দিকে ভয়
মূল পড়িয়া গেল। অনেক মাথাওয়ালা লোকই বুঝিতে
পারিলেন, এই অঘটন জন্য কোন একটা ভীষণ কাজ
অচিরে উপস্থিত হইবে। সকলে তাহারই প্রতীক্ষা
করিতে লাগিলেন।

বেশী সময় অতিবাহিত হইল না। এই ভীষণ হত্যা-
কাণ্ডের সংবাদ মহারাজীর নিকট পঁছিয়া যায়,ই
মহারাজী প্রতিহিংসায় অলিয়া উঠিলেন। তিনি অদ্য
বিলম্বে পদতলে গগন সিংহের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।
এবং গগন সিংহের মৃতদেহ দর্শন করিয়া ভীষণ প্রতি-
হিংসায় বশবর্তী হইলেন এবং ইহার প্রতিকার গ্রহণ
হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে উপায়েই পারেন

বিজোহীদিগের সুসন্মান করিবেন। তিনি অবিলম্বে কোর্ট প্রাসাদে আসিয়া সকল কর্মচারী ও সর্দারগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, অবিলম্বে সকলেই আসিয়া একত্র সমবেত হইলেন। প্রথমে বুদ্ধিমান জঙ্গবাহাদুর তদীয় প্রাক্তন সহ কিছু সৈন্য লইয়া আসিলেন। এই হত্যা দণ্ডকে জঙ্গবাহাদুর বলিলেন “১৮৪৩ খৃঃ অব্দে হইতে মহারাজ মহারাজীকে রাজ্য প্রতিনিধির অধিকার দান করিয়াছেন সুতরাং মহারাজীই এই বিষয়ের বিচার করিয়া হুকুম দিতে পারেন।” জেনারেল অভিমান রাণা এই সময় মহারাজকেও ডাকিয়া তথায় উপস্থিত করলেন। মহারাজ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পূর্বেই অবগত ছিলেন। বিচারার্থে প্রতিনিধি জোহালা মহারাজী কাকী বীর কিশোর পাণ্ডেকে প্রেরণ করিতে আদেশ করিলেন। অভিমান রাণা নিরাপত্ত্যে তাহা সম্পন্ন করিলেন। বীর কিশোর বাহাদুর নিজকে নির্দোষ বলিতে লাগিলেন। জোহালা মহারাজী অল্প প্রত্যাপে বীরকিশোরের দায়িত্ব কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। কে প্রকৃত দায়ী তাহা মহারাজ জানিতেন। অভিমান রাণা মহারাজকে জোহালা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু মহারাজ বিনা দায়িত্বে তজ্ঞ হকুমে সন্মতি দিলেন না। রাজাধিরাজের আজ্ঞাই তখন অভিমান রাণা মানিয়া লইলেন। ইহার পর মহারাজীকে বন্দীতে আদেশ করিলেন। মহারাজ কাকীকে বলিলেন “এই আপদ সময়ে প্রধান মন্ত্রী কাকীকে ডাকিয়া বিষয়চর্চার সাহায্য লওয়া দরকার।” এই বলিয়া তিনি জঙ্গবাহাদুরের এক ভ্রাতাকে লইয়া বিহারপ্রদেশে কতেজদের বাড়ী চলিয়া গেলেন। ফলকথা এই তদারকে মহারাজের উপস্থিত থাকিতে সাহস হয় নাই। এবং রেসিডেন্টকে গগন সিংহের হত্যাকাণ্ডের বিচার দিবারিচ্ছা করিয়া মহারাজ সরিয়া পড়িলেন। এই সময় রাণা বই প্রেরণ। এই সকল কারণে গগন সিংহের মৃত্যুর স্থানসময়ে অশ্রুতে নীত হইতে পারে।

এই সময় গগন কোর্ট প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন তখন রাণা তাহাকে বলিলেন “বীর কিশোর পাণ্ডের বিচারার্থে আদেশ অসম্ভব জেনারেল অভিমান

রাণার অবিলম্বে প্রাপন্ন করিয়া মহারাজীকে একটু ঠাণ্ডা করা হউক।” মহারাজীকে ইচ্ছা যে কতেজই প্রধান মন্ত্রী থাকিবেন ও জঙ্গবাহাদুর প্রধান সেনাপতি হইবেন। কতেজ এই বাবস্থায় রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন “বীর কিশোরের যথার্থীতি বিচার হউক। অভিমান রাণা মহারাজের হুকুম মানিয়া কর্তব্য পালন করিয়াছেন সুতরাং তিনি নির্দোষ।” অভিমান রাণাকে কতেজ জঙ্গবাহাদুরের কথা বলিলে তিনি তাঁহার তিন রেজিমেন্টের সেনাদলকে সাবধানে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিলেন এবং প্রাসাদের বাহির স্থিত সেনাগণকে বন্দুকগুলি ভরিতে হুকুম দিলেন। এই সময় জঙ্গবাহাদুর মহারাজের কাছে—উপর তালার গিয়াছিলেন। তিনি মহারাজীকে আত্মপূর্বিক সকল কথা বলিলে মহারাজী রাজ্য প্রতিনিধির তরবারী হস্তে নীচে আসিয়াই কতেজ, দল ভজন পাণ্ডে ও অভিমান রাণা প্রকৃতিকে সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন “কে আমার বিশ্বাসী সেনাপতি গগন সিংহকে হত্যা করিয়াছে, শীঘ্র বল!” কেহ উত্তর দিল না। কতেজ ইত্তর দিলেন “সকল কথা তদারকে বাহির হইবে।”

জোহালা মহারাজী তখনই বীরকিশোরের উপর তরবারী উত্তোলন করিলেন, এই বিষয় হত্যাকাণ্ড হইতে বিরত থাকিতে তিনজন মহী তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং যথা সাধ্য শাস্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন।

উপর তলার কিরিয়া বাইবার সময় মহারাজী সিঁড়িদিয়া উঠিতেছেন এমন সময় বন্দুকের শব্দ হইল। কতেজ ও দলভজন হত হইলেন। অভিমান রাণা আহত হইয়া পড়িলেন। কতেজের পুত্র খজা বিক্রম, জঙ্গবাহাদুরের ভ্রাতা রাম বাহাদুর ও রুক্ষ বাহাদুরের কপালে কুকুরের আঘাত করিলেন এবং একজন সিপাহীকে কাটিয়া ফেলিলেন। তিনি পুনরায় রামবাহাদুরকে আঘাত করিতে উত্তত হইলে জঙ্গবাহাদুর নামিয়া আসিয়া একজন সিপাহীর বন্দুক লইয়া খজা বিক্রমকে নিহত করিয়া ভ্রাতাকে রক্ষা করিলেন।

বিহার ঘটনার সহিত নেপালের রাজনৈতিক বন্ধনের

পূর্জন করিতে লাগিল। প্রকৃত পক্ষে ইহার পরই যখন রক্তপাত আরম্ভ হইল। দারুণ হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। যে বাহাকে পাইল মারিয়া ফেলিল। শত্রু যন্ত্রের ঠিকানা রহিলনা। এই সময় জঙ্গবাহাদুরের রেজিমেন্টের সৈন্যেরা আসিয়া পৌঁছিল এবং মহারানী উপর তালি হইতে হুকুম দিতে লাগিলেন “আমার শত্রুদিগকে নির্মূল্য কর।” তখন মৃতদেহের স্তূপ পড়িয়া গেল। জঙ্গ বাহাদুর বলেন যে, মহারানীর লোক প্রথমে গুলি চালাইলে পরে জনগণ উন্মত্ত হইয়া হত্যাকাণ্ড সংঘটন করে। এই ব্যাপারের পরিণাম কি হইবে পূর্বে কাহারো জানা ছিল না। ৩১ জন বড় সর্দার বা উচ্চ রাজ কর্মচারী, ২০ জন মধ্যবিত্ত সর্দার, বহুতর সিপাহী ও সাধারণ ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করিল। একই সময়ে হঠাৎ এইরূপ ভাবে হত্যাকাণ্ড ভারতের স্বাধীন রাজ্য কেন—পৃথিবীর কোন বর্ণোচ্চাচারী স্বাধীন দেশেও ইতঃপূর্বে আর হইয়াছে কিনা বলা যায় না। এই অমানুষিক ব্যাপার ইতিহাসের বিশেষ আলোচ্য বিষয় সন্দেহ নাই। ভীকু জৈগ মহারাজার অবিবেচনার যে এই কাণ্ড ঘটয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

যখন হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল তখনই মহারানী জঙ্গবাহাদুরকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দিয়াছিলেন। জঙ্গবাহাদুর মহারানীকে তাঁহার হস্তমান ঢোকা প্রাসাদে পছন্দাইয়া দিয়া মহারাজের নিকট গিয়া প্রধান মন্ত্রী হিসাবে অভিষেক করিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন “আমার রাজ্যের এতগুলি প্রধান ব্যক্তির হত্যা কে ও কেন করিয়াছে?” জঙ্গবাহাদুর বলিলেন “আপনিই মহারানীকে সর্বক্ষমতা দিয়াছেন, যাহা কিছু তাঁহার হুকুমেরে হইয়াছে।” মহারাজ তখনই মহারানীর নিকট অন্তর মহলে গেলেন। মহারানী ভূতলে লুপ্ততাবস্থায় পড়িয়া কাঁদিতেছিলেন। রাজা ও রানী উভয়ের মধ্যে বচসা হইল। রানী কহিলেন “আমার বড় পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত না করিলে আরো নয়হত্যা হইবে।” মহারাজ রাগ করিয়া পাটন নগরের দিকে অধারোহণে চলিয়া গেলেন। পথে টাকিথেলে ভবানী সিংহের সহিত কথাবার্তা কহিয়া-

রানীকে দিলে তিনি শুৎকণাং ভবানী সিংহের যত্নকর্তব্য করার জন্য ৫০ জন সৈন্য পাঠাইলেন। রাজার সাক্ষাৎকালে ভবানী সিংহের শিরোচ্ছেদ হইল। রাজা আশঙ্কিত করিতে সাহসী হইলেন না। এই সময় জঙ্গবাহাদুরের এক ভ্রাতা মহারাজকে গোপনে বাইয়া রাজপ্রাসাদের লইয়া আসিলেন। ইহার পরই হত সর্দার দিগের সম্মুখে মহারানীর হুকুমে সরকারে বাজেরাগ হইল। তাঁহাদের পরিবার বর্গ এক একটি পুটলী লইয়া দেশ ত্যাগী হইয়া নির্দাসিত হইলেন।

মহারানী লক্ষ্মীদেবীর দুই বৃদ্ধির এইখানেই শেষ হইল না। তিনি জঙ্গবাহাদুরের নিকট সুবরাজ অরেন্দ্র বিক্রমকে হত্যা করাইয়া বীর পুত্রের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। জঙ্গবাহাদুর এই প্রস্তাব প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই। রাজবাটীতে এইরূপ অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের পরই মহারানীর আদেশে সুবরাজ তাঁহার ভ্রাতাকে তাঁহাদের আবাস বাটীতেই অবরুদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু মহারানীর এই দুর্বৃত্তসম্মি বার্থ করিবার জন্য জঙ্গবাহাদুর তাঁহার নিজের দুই ভ্রাতাকে তাঁহাদের প্রহরী করিয়া রাখেন এবং প্রত্যাহ স্বয়ং গিয়া উহাদিগকে দেখিয়া আসিতেন। এই সময় মহারানী ও জঙ্গবাহাদুর রাজ্যের সর্বো সর্বা ছিলেন; কিন্তু সকল রাজকাৰ্য্যই মহারাজাধিরাজ, সুবরাজ এবং মহারানীর নামে পরিচালিত হইত। মহারানী যখন বুঝিতে পারিলেন যে, জঙ্গবাহাদুর তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধির পথে কণ্টক হইয়া পড়াইয়াছেন, অথচ এই বিষম হত্যাকাণ্ডের কার্য্যও নিষ্পন্ন হইল, তখন তিনি বীরধূজ বাশনিয়াং নামক একব্যক্তির সহিত ষড়বস্ত্রে লিপ্ত হইলেন। মহারাজাধিরাজ, সুবরাজ, জঙ্গবাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতাগণকে রাজবাটীর এক ঘরে বাহাতে একত্র আনাটয়া সকলকেই একবারে নিহত করা যাউতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। উঃ! নিতরানক ব্যাপার, চিন্তা করিতেও অস্থির শিহরিয়া উঠে।

হত গগন সিংহের ল্যেড পুত্র উজ্জিসিংহের পিতৃ-মৃত্যুর পর জেনারেল পদ পাইয়া এই বকবার লিপ্ত হইয়া ছিলেন। বিজলী রাজ নামক এক পণ্ডিতের সহায়ত ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। পরে এই পণ্ডিতের

হুঁচি আসিয়া পড়িয়াছিল। অসুস্থবিদ্যা মহারাজীর হৃদযন্ত্রের জন্ত দেশের এতগুলি প্রধান মাথাওয়ালা রক্ষার নিয়ুক্ত হইল—আর যে সকল বাকী আছেন তাহারাও এবার গেদী দেশের দশা কি হইবে, পণ্ডিতজী ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া এই বড়বরের কথা জঙ্গবাহাদুরকে জানাইয়া দিলেন। বড়বরকারী উজির সিংহ কতকগুলি সৈন্ত ও কনিষ্ঠরা বসুক ভোরে রাজবাটীতে (১৮৪৬ সালের ৩১শে অক্টোবর) লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে বড়বরকারী বীরখুল বাশনিরাংকে দিয়া মহারাজী জঙ্গবাহাদুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন জঙ্গবাহাদুর নিজেই রাজবাটীর দিকে বাইতেছিলেন। বীরখুল জঙ্গবাহাদুরকে বলিল “মহারাজী আপনাকে ডাকিয়াছেন।” জঙ্গবাহাদুর কহিলেন “তাঁহা অসম্ভব, তুমিই না আমার রাজ্য প্ররাস মন্ত্রী হইয়াছ ? রাজপ্রাসাদে আমার কি কাজ থাকিতে পারে ?” বীরখুল ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। জঙ্গবাহাদুরের আদেশে কাণ্ডেন রাণা মীর অধিকারী ভাষাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল। তখন রাজ্যের সমস্ত বড় লোক ও প্রজা সাধারণ হুঁসিত পাবিল যে, মহারাজীই এই সব অনর্থের মূল। তৎপরে মহারাজীর উপর প্রজাহীন হইয়া পড়িল। ইহার কলে সকলেই যুবরাজের পক্ষবর্তী হইল। জঙ্গবাহাদুরও ভবিষ্যৎ শান্তির আশা করিতে লাগিলেন।

জঙ্গবাহাদুর রাজ বাটীতে গিয়া মহারাজ ও যুবরাজের পদতলে পাগড়ী স্থাপন করিয়া কহিলেন—“আমার চাকরীর ইচ্ছা লওয়া হউক, অথবা যুবরাজের সন্তানসমূহকে নিয়মিত বধ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হউক।” মহারাজ নিজের ও যুবরাজের হত্যার পক্ষবর্তের কথা পূর্বেই শুনিয়াছিলেন; তিনি এইবার তাহাকে আলিঙ্গন করতঃ রাজ্য নিরাপদে রক্ষা করার জন্য তাহার উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিলেন। রাজবাটী হইতে বাহিরে আসিয়া জঙ্গবাহাদুর সৈন্যদলকে অস্ত্রধারণ করিয়া রাজবাটী ঘিরিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। তৎপরে রাজবাটীর ভিতর হইতে শান্তি শান্তি করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিয়া বড়বরকারীদিগকে একে একে হত্যা করিলেন। ১৫ জন

ব্যাসানিরাং বংশের লোক ও ৫ জন সামরিক কর্মচারী নিহত হইল।

পূর্বেই এই ব্যাপারের সন্ধান পাইয়া উজিরসিংহ পলাইয়া নেপালের বাহির হইয়া বাইতে পারিয়াছিলেন। মহারাজ জঙ্গবাহাদুরকে ভীমসেন আপার সমস্ত জারগীর সম্পত্তি প্রদান করিয়া রাণাজী পদবী দান করিলেন। ঐ দিনই বিকালে জঙ্গবাহাদুর মহারাজীকে জানাইয়া পাঠাইলেন “যুবরাজের প্রতি একান্ত বিরুদ্ধ ভাব জন্ম আপনাকে আর নেপালে স্থান দেওয়া হইবে না। অতঃপর হুই গুল্লুসহ আপনাকে বেনারস গিয়া অবস্থান করিতে হইবে।”

মহারাজী লক্ষ্মীদেবী একান্ত নিকৃপার হইয়া অবশেষে এই বাবস্থায় যীকৃত হইলেন এবং অব্যবহৃত চিত্ত বাহী মহারাজকেও জীর্ণ মর্শনের অস্থিলায় সঙ্গে বাইতে বাধ্য করিলেন। ১৮৪৬ সালের ২৩শে নবেম্বর তাহার বেনারস যাত্রা করিলে যুবরাজই রাজ প্রতিনিধি হইলেন। জঙ্গবাহাদুর নিজের জাতীগণকে এবং অসুগত আত্মীয়গণকে গবর্ণরী পদ ও সামরিক প্রধান কর্মগুলি দিয়া রাজ্য রক্ষার নিযুক্ত হইলেন।

মহারাজী লক্ষ্মীদেবীর জন্ত বেনারসে সরকার হইতে বাড়ী বাগান প্রস্তুতি করিয়া দেওয়া হইল। এই সময় বেনারসে বহুসংখ্যক নির্কাসিত নেপালী ছিল, তাহার আসিয়া মহারাজকে ঘিরিয়া বসিল। মহারাজ পুনরায় বিরুদ্ধ দলে বেগদান করিলেন।

নেপালে ফিরিবার অস্থিলায় ১৮৪৭ সালে ২৫শে মার্চ তারিখে তিনি সিগৌনী পর্যন্ত গিয়াছিলেন। এবং গুরুপ্রসাদ চৌতুরিয়া রাজীর সহিত মিলিয়া জঙ্গবাহাদুরকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জঙ্গবাহাদুর ও যুবরাজ মহারাজকে নেপালে বাইতে লিখিলেন কিন্তু মহারাজীকে রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না। এই পত্র পাইয়া মহারাজী নির্কাসিতদের সহিত বড়বর করতঃ মহারাজ দ্বারা এমন এক আদেশ পত্র বা পরওয়ানা লিখি করাইয়া নেপালের সৈন্ত ও প্রজাদের উপর প্রেরণ করিলেন যে “তোমরা সকলে প্রবাস মন্ত্রী ও তাহার দলের সকলকে অবিলম্বে হত্যা কর।”

অন্য সাহসী বীর জন বাহাদুর গুরুপ্রসাদ চৌধুরী
ও কাকী জগন্নাথ পাণ্ডেও ঐ পরোয়ানা সহ যুক্ত
করিলেন এবং সৈন্যগণকে একত্র করিয়া কহিলেন “আমিই
সেই প্রধান মন্ত্রী, তোমাদের যাহা কর্তব্য তাহাই করিতে
পার।” বলিয়া বুক পাতিয়া সাহসী বীরের আশ্রয়মান
হইলেন।

প্রজা ও সৈন্তেরা বলিল “এই হুকুম আমরা মানিমা—
যেহেতু মহারাজ যুবরাজকে সমস্ত রাজশক্তি দান করিয়া
নেপালের বাহিরে গিয়াছেন। এখন যুবরাজের হুকুমই
মানিব।”

ইহার পর ১৮৪৭ সনের ১২ই মে মহারাজের জ্যেষ্ঠ
পুত্র যুবরাজ সুরেন্দ্রবিক্রম সাহাকে বিধি মত সিংহাসনে
বসান হইল। এবং রাজ্যের সমস্ত সর্দার ও সেত্বাধ্যক্ষ
গণের দণ্ডতথ যুক্ত পরোয়ানা মহারাজের নিকট প্রেরিত
হইল।

মহারাজার চরিত্রের জ্ঞাত রাজা রসাতলে যাইতে
বসিয়াছি। অধুনা জঙ্গবাহাদুরের কার্যাত্ম্য তাহা
সুশ্রীয়া চলিতে লাগিল। সেই হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত
মহারাজী বেনারসেই রহিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিজ্ঞানভূষণ।

সংগ্রহ।

শব্দানুভূতি।

ভগবানদত্ত পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোন একটি দুর্বল হইয়া
পড়িলে অপর ইন্দ্রিয়গণ অগ্রাম বাসীর প্রতি সহানুভূতি দেখা-
ইবার জ্ঞান যেন নিজের স্বল্পে অধিকতর কষ্টভার বহন
করিয়া অগম্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি পূরণ করিতে চেষ্টা করে।
একজন মুক-বধির নেত্রের সাহায্যে ইসারা ইঙ্গিতে একরূপ
বুদ্ধিতে পারে যে তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। সেইরূপ
অন্ধ ও তাঁর শ্রবণ ও স্পর্শের দ্বারা অভূত কার্য সম্পন্ন করিয়া
থাকে। আমরা অল্প একটি অন্ধ উদ্ভিদ তত্ত্ববিদের কথা
উল্লেখ করিব। ইহার নাম জন গ্রিমস্ উইলকিনসন।
(Mr. John Grimshaw Wilkinson) ইনি ২২ বৎসর
বয়সে অন্ধ হইয়া উদ্ভিদ কণ্ঠের গবেষণা আরম্ভ করেন।

এখন ইহার বয়স ৬৪ বৎসর, ইনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বিশেষ
পণ্ডিত হইয়াছেন। কেবল মাত্র স্পর্শের দ্বারা তিনি ইন্দ্রিয়
এবং অল্প দেশ জাত প্রায় ৮০০ শত ফল-পুষ্প প্রদ বৃক্ষ ও
হতা-শুল্কের পরিচয় বলিয়া দিতে পারেন।

অনেক সময় দেখা যায়, কেহ কেহ প্রেমাস্পদের গতি
বিধি একরূপ ভাবে পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা করেন যে কেবল মাত্র
সামান্য পদশব্দ শুনিয়াই তাহার আগমন ও নির্গমন বলিতে
পারেন।

এই উইলকিনসনও শব্দতত্ত্ব একরূপ ভাবে পর্যবেক্ষণ
করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমি ও ক্ষুদ্র ভূমি
উপরে শব্দের পার্থক্য লক্ষ্য করেন। তৎপরে তিনি ভিন্ন ২
বৃক্ষের উপরে বৃষ্টিপাত হইলে তাহাদের বিভিন্নরূপ বৃষ্টিজল
গ্রহণের শব্দ অনুভব করিতে থাকেন।

তিনি বলিয়াছেন জুলাই মাসের গরমে একটি পপি গাছ
(Poppy) ও তন্নিকটবর্তী আর একটি গাছ স্পর্শ করিলে
তিনি পপি গাছটিকে অপেক্ষাকৃত নীতল বোধ করেন।
তাঁহার যখনই এই তাপ বৈষম্য অনুভব হয় তখনই মনে
হয় একরূপ কেন হয়?

বৃষ্টি পাতের সময়ে ভিন্ন ২ বৃক্ষে ভিন্ন ২ শব্দ হয়;
তাহাতেও তিনি বৃক্ষের পরিচয় বলিতে পারেন। তিনি মনে
করেন পাইনাস্ সিলভেস্ট্রিস্ (Pinus sylvestris) নামক
বৃক্ষ বৃষ্টি পাতেও অত্যন্ত নীরব থাকে। কেবল প্রবল বজ্র-
পাতের সময়ে উহাতে মাঝে ২ সাই সাই শব্দ হয়। বজ্রা-
বৃষ্টিতে ওক বৃক্ষ (Oak) ভীষণ শব্দ করিয়া থাকে। এই এক
বনে পাখীর ডাকও প্রবলরূপে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে।
কিন্তু পাইন বনে পাখীর ডাক অত্যন্ত মৃদু শুনা যায়। বহিরা-
পপলার বৃক্ষ প্রবল তড়িত ভারাপন্ন তথাপি প্রচণ্ড বজ্র-
পাতের সময়ে উহা নীরব থাকে। এবং বজ্রপাত বন্ধ হইয়া
গেলে উহার শাখা পরবে একরূপ শব্দ হয়। বৃক্ষ
শুল্কাত্ত জঙ্গল ও শূণ্য ময়দানে বৃষ্টি-পাতের শব্দের পার্থক্য
তাঁহার অনুভূতি এড়াইতে পারে নাই।

স্পর্শ সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন যে কোন কোন
লোকের সহিত করমর্দন করিয়া সুখানুভব হয়। তিনি
একজন ডাক্তারের কথা বলিয়াছেন, যাহার সহিত করমর্দন
করিয়া তিনি বৃষ্টিতে পারিতেন যে ঐ ডাক্তার অত্যন্ত দারুণ

ভাবাপন্ন কিন্তু তিনি একজন সুদক্ষ অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে অনেক লোকের মুখের চেহারা দেখিয়া লোকটী কিরূপ তাহা স্থির করেন কিন্তু তিনি বলেন দেশের ভিতরে গিয়া তিনি কয়েদির সহিত কর্মন্দন করিয়া বলিতে পারেন, কে দুষ্কার্য্য করিয়া চিরাত্যস্ত হইয়াছে। লোকের মনের ভাব তাহাদের কাষের দ্বারা— এমন কি সামান্য হস্তপদাদির চালনাও প্রকাশ হইয়া পড়ে যাইয়া তাঁহার বিশ্বাস। রয়েল ইনষ্টিটিউসনে অধ্যাপক বেগ (W. H. Bragg) শব্দ তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া এই ঘটনাবলির উল্লেখ করিয়াছেন।

মঙ্গল গ্রহে খবরাখবর।

লণ্ডন ডেইলি মেলে (London Daily Mail) সিমার্কণি লিখিয়াছেন যে কিছু দিন যাবৎ তারহীন টেলিগ্রাফে কার্য্য করার সুময়ে মাঝে মাঝে একরূপ সঙ্কেত পাওয়া যাইতেছে। উহা একরূপ অর্থহীন শব্দ সমষ্টি বলিয়া মনে হয়। এই সাঙ্কেতিক শব্দ দিবা রাত্রি উত্তর সময়েই পাওয়া গিয়া থাকে। এই সঙ্কেত কোন দেশ কিম্বা মহাদেশে আবদ্ধ নহে, ইহা একই সময়ে লণ্ডন ও নিউইয়র্কে পাওয়া যাইতেছে, মিঃ মার্কণি বলেন যে ইহা এক অদ্ভুত শব্দ এবং বোধ হয় ইহা পৃথিবীর বহির্দেশ হইতে আসিয়া থাকে। কোন কোন অক্ষর—বিশেষতঃ ৩ অক্ষর সঙ্কেত অনেক সময়েই পাওয়া যায়। কিন্তু এ যাবৎ ইহার কোনরূপ অর্থ বোধ গম্য হইতেছে না। শব্দের বেগ সমান এবং বহু দূর হইতে আসিতেছে মনে হয়। তিনি বলেন, ইহার কারণ আমরা কিছুই অনুমান করিতে পারি না। হয়ত ইহা কোনরূপ বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের দ্বারাও হইতে পারে এবং সূর্য্য মণ্ডলে ভীষণ উচ্ছ্বাসে এই বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন হইতে পারে। মিঃ মার্কণিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে অপর কোন গ্রহ হইতে পৃথিবীতে সঙ্কেত প্রেরণের চেষ্টা হইতেছে কি না? তাহার উত্তরে তিনি বলেন “আমি এ কথা একেবারে অবিশ্বাস করিতে পারি না, কিন্তু ইহার কোন নিশ্চয় প্রমাণ নাই।” এই শব্দের কোন বিশেষ সময় নাই ইহা দিবা রাত্রি উত্তর সময়েই সমান। এই ঘটনা গত সপ্তাহের পূর্বে হইতেই লক্ষ্য করা হইয়াছে কিন্তু

বুকের জন্ত ইহার বিশেষ কোন সম্মান করা হয় নাই। ইতঃ পূর্বেও একবার মঙ্গল গ্রহ হইতে আলোক সঙ্কেতের কথা প্রচারিত হইয়াছিল, এরাও কেহ কেহ মনে করেন, মঙ্গল গ্রহ হইতে এইরূপ সঙ্কেত করা হইতেছে। আলোক সঙ্কেত হইতে বৈজ্ঞানিক সঙ্কেতে হয়ত কোন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

চন্দ্রলোকের পথে।

এতকাল চন্দ্রলোকে গমন একটা গল্পের বিষয় ছিল। জুলেস ভার্ন তাঁহার “চন্দ্রলোকে গমন” নামক উপ-ন্যাসে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। অনেক সময়ে মানুষ বাহা কল্পনা করে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা যায়। আমরা বাল্য কালে যে পুস্তক রথের কথা কিম্বা সমুদ্র গর্ভে প্রবেশের গল্প শুনিয়াছি বর্তমান যুগে তাহা প্রকৃত কার্য্যে দেখিতেছি।

আমেরিকার র্কার্ক কলেজের অধ্যাপক পডার্ড (R. H. Goddard) সাহেব বায়ু মণ্ডলের উপরের স্তর পরীক্ষা করিবার জন্ত একরূপ হাউই নির্মাণ করিয়াছেন। এ যাবৎ আমরা মাত্র ১৯ মাইল উর্দ্ধের খবর পাইয়াছি, কিন্তু এই অধ্যাপকের যন্ত্রের সাহায্যে ২০০ মাইল বায়ু স্তর ভেদ করিয়া তত্বর্জে উঠাও সম্ভব হইবে। এই হাউইয়ে প্রবল বিদ্যুৎক নিহিত হইবে। প্রথমটীর বেগে হাউই বহু উর্দ্ধে উখিত হইলে দ্বিতীয়টী বিদীর্ণ হইবে এবং তাহার ফলে হাউই আরও উর্দ্ধে উঠিবে। এইরূপ পর্যায় ক্রমে একটীর পরে আর একটী বিদীর্ণ হইতে থাকিবে। দুইটী বিদারণের মধ্যবর্তী সময়ে উহা নীচে পড়িতে পারিবে না, কারণ উহাতে একরূপ পেরাসুট থাকিবে। সে সময়ে উক্ত হাউইয়ে যে সকল যন্ত্র থাকিবে তাহাতে উপরস্থ বায়ু স্তরের অবস্থা নির্দিষ্ট হইবে। বায়ু মণ্ডলের উপরের স্তরের অবস্থা জানাই এই যন্ত্রের উদ্দেশ্য। এই হাউইটী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলিবে। ২০০ মাইল যাইতে মাত্র ইহার ৩৫ মিনিট সময় লাগিবে। এখন কথা এই—বায়ু মণ্ডলে উৎপাদিত প্রবেশ করিয়া প্রবল বেগের জন্ত বায়ু গবেষণে উহা আসিয়া অনেক সময়ে ভগ্ন হইয়া যায়। সে হওয়া এই

হাউইটীও যে স্নেহগণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে। পণ্ডিতগণ মনে করেন হাউই বখন পৃথিবীর আকর্ষণের সীমার বহির্ভূত হইবে, তখন নিকটস্থ উপগ্রহ চন্দ্রের আকর্ষণে উহা চন্দ্রলোকে যাইয়া পড়িবে। এক্ষণ হওয়াও কতদূর সম্ভব জানি না। যখন হাউইটী পৃথিবীর আকর্ষণের সীমার বাহিরে যাইবে তখন সেখান হইতেই যে চন্দ্র তাহাকে টানিয়া লইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? যদি উহা পৃথিবী ও চন্দ্রের আকর্ষণের সাম্য স্থানে উপনীত হয়, তবে কি উহা উভা সমূহের মত নিজ কক্ষে চলিতে পারিবে না? পণ্ডিতগণই এই প্রশ্নের সীমানা করিবেন।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

তুমি ও আমি।

বড় নগর—বড় সহর

অট্টালিকার বাস ;

বড় রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার

চলছে বার মাস।

কলের জলে ঘানটা চলে,

কবুচ তাই পান ;

বালাম চাল, বুটের ডাল

উদরে দাঁও স্থান।

মৃত ছুঁকে তুমি মৃত

জল খাইতে স্নিগ্ধ—

রসগোল্লা, কাঁচা গুন্ডা,

বাহুসাভোগ, লুচি।

পরসাতোয়ার ভূতে যোগার

মস্ত তুমি লোক,

ভাবচ মনে—দিনে দিনে

আরো বৃদ্ধি হোক।

ভাতেও তোমার হুংহু চুচু

নাইকো মনে আশ ;

এত যে চাও এত যে পাও—

অভাব বার মাস।

* * * *

হাতী ছাড়া, পল্লি পাড়া,

আমার বাড়ীঘর।

গ্রাম্য পথে, কোন মতে,

চলুচি নিবস্তর।

খড়ের ঘরে বসত ক'রে

জুড়াই মনের ব্যথা।

ঘরের কোণে বাগান বোনে

লাগাই পাভা মতা।

আউস অন্ন, আমার অন্ন—

আজ্ঞাদে তা খাই।

দামের মলে বিলের জলে

তৃষ্ণা ভুলে যাই।

জলপানি মোর ইচ্ছাওড়,

মুড়ি মুরকি চিড়া।

ভাতেই তুট; দুঃখ কষ্ট

নাইকো মনের পীড়া।

ঘাট বাট, গ্রামল মাঠ,

সবুজ ঘাসের হাসি,

আমার প্রাণে শান্তি আনে,

ভুলায় হুংহু রাশি।

আমি ক্ষুদ্র, দীন দরিদ্র,

অভাব দিবা রাত্তি

জিহ্না দিনে বিশ বিনে

নাইকো অন্ন পত্তি।

এতেই আমি সুখের স্বামী,

পল্লি ঘরের বুকে।

ছেলে মেয়ে কোলে নিয়ে

থাকি মনের সুখে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র দত্ত কবী

জ্যোতিষে প্রভুতত্ত্ব ।

আধুনিক সময়ে ঐতিহাসিক আলোচনা ও প্রভুতত্ত্বের গবেষণায় দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং প্রাচীন শিল্প কলা ভাষার ব্যবহার বাণিজ্য প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে বিস্তারিত ও অবিকৃত হইয়া মানব সমাজকে কৌতূহলী ও বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন করিতেছে। মৈত্রেয় লিখিত সিরাকুসোলা, বারোজ অজস্রদান সমিতির গৌরবিসরণ, গুরুকারের মোগল স্বভাষ প্রভৃতি মানব সমাজকে যত জানি কৌতূহলী ও বিস্মিত করিতে পারে নাই, দশরথ মহর্ষি কৈকেয়ীকে আর্থেনিয়ান বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা, কালিদাসকে জীলোক ও ঝনাকে পুরুষ বলিয়া পরিচিত করিবার দক্ষতা, ঢাকার বিক্রমপুর গুরুগণাটিকে বর্তমানে বঙ্গী করার কল্পনা প্রভৃতি সেই পূর্ব-বিস্মিত মানব সমাজকেও হতবুদ্ধি করিয়াছে সন্দেহ নাই। সুতরাং এতাদৃশ ক্রমবিকাশের শ্রেষ্ঠ যুগে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সামান্য ২।১ টি তত্ত্বকে “প্রভুতত্ত্ব” বলিয়া প্রকাশ করা বোধ হয় খুব অসমসাহসিকতার কার্য হইবে না।

ইহা পূর্বে ১৩২৩ সালের তাজ সংখ্যার সৌরভের “ফলিত জ্যোতিষে বসন প্রভাব” শীর্ষক প্রবন্ধে ফলিত জ্যোতিষের একাংশ যে যুগলমানদিগের নিকট হইতে সুদীর্ঘ তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ফলিত জ্যোতিষে উল্লেখিত নানাপ্রকার গণনার বিষয় অবলম্বনে তৎকালীন সামাজিক রুচি ও অবস্থার একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

ফলিত জ্যোতিষের অন্ততম অংশের নাম গ্রহগণনা-ব্যায়। কেহ ভ্রমপ্রবণ করিলে সেই যুহুর্ডের লগ ও প্রসংহান দৃষ্টে যেরূপ জাতক জীবনের ফলাফল নির্দেশ করা যায়, সেদৃষ্টে কেহ কোনও বিষয়ে গণনা করাইবার চেষ্টা গ্রহ বিজ্ঞান করিলে সেই বিজ্ঞান যুহুর্ডের লগ ও প্রসংহান করিয়া গ্রহ গণনা করিতে হয়। এই গণনাকে জাগতিক গ্রহগণনা কহে। এতদ্বিধ গণনাকী যতে, পাশ্চাত্য

সাধারণ্যে—রমল যতে, যৌগিক জিরাবলম্বনে যরোহি যতে, গ্রনাকর সাধারণ্যে এবং দেবতা, কল, পুশ, নামাকর প্রভৃতি দ্বারা—নানাবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বনে ফলিত জ্যোতিষে গ্রহগণনার নিয়ম বিবৃত আছে। কিন্তু জাগতিক গ্রহ সন্ধ্যাই বহু গ্রহ দৃষ্ট হয় এবং ইহার আলোচনা এত বিস্তৃত যে অস্ত্রান্ত্র গ্রনালী তাহার তুলনার নিতান্ত লগণ্য বলিয়া মনে হয়। এই গ্রহগণনাধ্যায়ে অনেক রকমের গ্রহগণনারই উপদেশ আছে; কিন্তু তথাপি কতকগুলি বিষয় বিশেষ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। জাগতিক গ্রহগণনাবিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্ন সময়ে লিখিত গ্রন্থ ২০।২৫ খানা গ্রন্থ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই প্রত্যেক গ্রন্থেই কোন কোন রকমের গ্রহগণনার বিষয়ে সামান্য ভাবে উপদেশ দিয়া কতকগুলি বিষয় সন্ধ্যা বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। সেই বিস্তৃত আলোচনার বিষয়গুলি সমস্ত গ্রন্থেই একরূপ। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে অস্ত্রান্ত্র বিষয়-গুলির তুলনায় সেই বিষয়গুলিই তৎকালে খুব বেশী আলোচিত হইত। তাহা হইলে বাহা সমস্ত গ্রন্থেই বিশেষ বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে সেই বিষয়গুলি আলোচনা করিলে সেই সময়ের সমাজ ও জনগণের রুচির এবং কার্যাবলীর কতকটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতে পারে সন্দেহ নাই।

গ্রহ গণনাধ্যায়ে “জীতিজ্ঞা” বিষয়ক একটি প্রকরণ আছে; সেই প্রকরণে নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির গণনার সূত্র লিখিত আছে। যথা—

(১) বিবাহ হইবে কিনা? (২) বিবাহ ছাড়া অন্তভাবে জীলাত হইবে কিনা? (৩) কন্যা বরণ করিতে চলিলাম, কতলাত হইবে কিনা? (৪) এই জীলাত ব্যাপার কাহার দ্বারা সম্পন্ন হইবে? (৫) প্রস্তাবিত কটার চরিত্র তত্ত্ব কিনা? (৬) আকাজিত রমণীর সহিত কলহাদি হইবে কিনা? (৭) এই রুটী জী আবার আসিবে কিনা? (৮) আমি কিরূপ জী চিন্তা করিতেছি? (৯) আমি অত কোনও রমণী সন্তোষ করিতে পারিব কিনা? (১০) সন্তোষ-বিলাস হস্তাদি বৃত্ত হইবে কিনা? (১১) অত * * * * * হইবে? ইত্যাদি—

উল্লিখিত প্রণের নমুনা দেখিয়া ও প্রত্যেক প্রশংসনা গ্রন্থে উহার বিস্তৃত আলোচনা দেখিয়া, এবং ঐরূপ প্রণের প্রকাশে জ্যোতিষীর নিকট গণনা করাইয়া লইতে লোকে লজ্জিত হইত না বুঝিয়া তৎকালীন সমাজের নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বোধ হয় কেহই উচ্চমত পোষণ করিবেন না। ইহা ছাড়া অন্নভুঞ্জীর গ্রহসংস্থান ফলে, এবং দশার ফলে লিখিত বহু শ্লোকে বহুস্থানে স্রীশান্ত, উত্তম স্রী ভোগ, দিগ্যগনা লাভ ইত্যাদি বর্ণিত আছে। দশাকলে অনেকেই লক্ষ্য করবেন, স্রীলাভ ব্যাপারটি একজনের ভীষনে ৫৬ বার উল্লেখিত থাকে। যে স্থানেই উত্তম সময়ের বা উত্তম গ্রহের বা উত্তম যোগের বিস্তৃত ফল লিখিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেক স্থানেই রমণীলাভ কথাটি পরিত্যক্ত হয় নাই।

প্রশংসনাধায়ে এইরূপ ধারা হইতে আমরা সে কালের জনগণের ও সমাজের রুচির বিষয় বাহা চিন্তা করিতে পারি, সে কালে সাহিত্যের ভিতর হইতেও তাহার আভাস সূচিয়া বাহির হইতেছে। আমরা কাদম্বরীতে অবিবাহিত শূদ্রক রাজার গৃহে—কি রাজসভা, কি অন্তর মহল—সর্বত্র স্রীলোক কে প্রহরা কার্যে নিযুক্ত দেখি, রাজাকে শত শত যুবতী গণিকা দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া স্নান কার্য সমাধা করিতে দেখি। রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়কে পাঠ সমাপনের পরে পত্র লেখা নারী একটি যুবতীকে তাড়ন করত বাহিনী রূপে দেওয়া হইয়াছিল এবং সে সৰ্বদা রাজ পুত্রকে ছারার গ্রায় অনুসরণ করিত। এই পত্র লেখা কিন্তু কোনও রাজার রুহিতা, তাহার পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অস্ত্রান্ত লুণ্ঠিত প্রবোর সহিত তাহাকেও আনয়ন করা হইয়াছিল। তখন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পরে বিজিত রাজার রাজ্যের প্রব্যাধি লুণ্ঠন করার সময় বিজিত রাজার অন্তঃপুরের রমণীবৃন্দও পরিত্যক্ত হইত না। আধুনিক সময়ে যেরূপ বড় লোককে ভালি দেওয়ার সময় খাসী পাঠা দেওয়া হয়, সেইরূপ সেই সময়ে জয়ী রাজাকে সম্ভট করার ক্ষুদ্র উপঢৌকনের সাবঙ্গী মধ্যে রমণী-রত্ন একটি বিশেষ সামগ্রী বলিয়া গণ্য ছিল। এই ব্যাপদেশে কত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লক্ষিত হইত—মুসলমানদের “বিধকতা” তাহার অঙ্গ

দৃষ্টান্ত। পরস্রী আশ্রয় করার কলা কৌশল সে যুগে কতদূর উন্নত লাভ করিয়াছিল, দশকুমার চরিত পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। মুসলমানে বেখার সহিত আদর্শ নাটকের বিবাহ সম্বন্ধন করিয়া শূদ্রক কবি সেকালের সমাজের একটি অদ্ভুত রুচির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন সন্দেহ নাই।

একনিষ্ট প্রেম তৎকালে খুব বিরল ছিল। বেশী দিনের কথা নহে—প্রচেষ্টা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আত্ম জীবন চরিতে লিখিয়াছেন—তখন কোনও গল্পমাঝ লোককে পরিত্যক্ত করাইয়া দেওয়ার সময় “ইনি ইহার রক্ষিতাকে একখানি টুটকালয় করিয়া দিয়াছেন” বলিয়া গুণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। তৎকালীন সমাজের নৈতিক অধোগতি বিষয়ে সংশয়ের কারণ নাই, তবে জ্যোতিষের মধ্যেও যে ইহা ধরা পড়িয়াছে ইহাই আমাদের বক্তব্য।

প্রশংসনাধায়ে যুদ্ধগণনা প্রকরণটি বিস্তৃত। দুর্গ ভঙ্গ হইবে কিনা? কোন দিক হইতে আক্রমণ হইবে? ইত্যাদি প্রশ্নের সহিত অনাদি বিষয়ক প্রশংসনাধার নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত আছে। তদ্বারা সেই সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ যে একটা নিত্যকার ঘটনা ছিল, তাহারও কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া যুগয়া গণনা, দূরদেশস্থিত ব্যক্তি সম্বন্ধে গণনা, বৃষ্টি গণনা প্রভৃতি লক্ষ্য করার বিষয়। এই সমস্ত গ্রন্থ ভারতের পশ্চিম প্রান্তে রক্ষিত স্মরণ্য সেই দেশের পুত্কে বৃষ্টি গণনার বাহ্য উক্ত দেশের জলাভাবের আভাসই প্রদান করে।

আজকাল কেহ জ্যোতিষীর নিকট স্রী চিন্তা প্রকরণের বিষয় নিয়া গণনা করাইতে যায় না। ইহা নৈতিক উন্নতির লক্ষণ। যুদ্ধ বিগ্রহ, সন্ধি, বৃষ্টি, যুগয়া গণাইতেও আধুনিক লোক ব্যগ্র নহে; তৎপরিবর্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সে সকল স্থান অধিকার করিয়াছে। “মৌকন্দমার জয়পরাজয়”, “বদলী প্রশংসা”, “পদোন্নতি”, “লটারী”, “চাকুরী লাভ”, “পরীক্ষার পাশ না কেল” ইত্যাদি। ইহার মধ্যে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে উক্ত লটারী ইত্যাদি নূতন বিষয়গুলির সম্বন্ধে আমাদের জ্যোতিষ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা নাই, প্রতি সামান্ত ভাবে ইঙ্গিত আছে মাত্র। এই গণনার বিষয়গুলি আলোচনা করলে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সামাজিক অবস্থা-নুসারে গণনার বিষয় পরিবর্তন হয় স্মরণ্য গণনার বিষয় অবলম্বনেও যে সামাজিক অবস্থার একটি আভাস পাওয়া যায় ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীবক্ষিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যাকাব্যার্থী,

কাব্যরত্ন, জ্যোতিঃ সিদ্ধান্ত।

মা আনন্দময়ী ।

(চিত্র)

কর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমান্ত করিয়া তবে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি উচ্চ শিক্ষিত। গৃহিণীর বিজ্ঞা ততদূর না গেলেও স্কুলের দীনা আদিক্রম করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকেও সুশিক্ষিতা না বলিয়া উপায় নাই। ওকালতিতে কর্তা বিমল বাবুর পশার মন্দ নহে; গৃহিণী হিমাংশুবালার রমণী সমাজে ডাক হাঁক, কঁাক কনক বথেই আছে। থাকিবার কথাই তো, তিনি নিজে উচ্চ শিক্ষিতা, তার উপর আবার বনী।

হিমাংশুবালাকে গৃহিণী বলায় কেহ মনে করিবেন না যে বিমল বাবুর জননী বর্তমান নাই। বৃদ্ধা অন্নপূর্ণা পুত্রের বিবাহ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবশ্যই গৃহিণী ছিলেন, এখন পেন্সন পাইয়াছেন; পক্ষাশোর্ধ্বে পেন্সন পাওয়া আইনের ব্যবস্থা। বিমল বাবুর একটা কন্যা ও একটা পুত্র বর্তমান। কন্যা বিজলী বজ্রিত-বিধির গতি কাটাইয়া বিজলী হানিবার মাহেন্দ্রক্ষেপে পঁহুঁছিয়াছে, পুত্র জমলের হাতে খড়ি না পড়িলেও কাগজ পেন্সন পড়িয়াছে। সংসারে একটা দাসী আছে, নামটা তার স্বাক্ষর সেকলে, তাই তাহাকে দাসী বলাই এখানে প্রচলিত। আর আছে একটা পুত্রোৎসাহী চাকর। চাকরটার নামের স্বর নাই—অন্নপূর্ণার নিকট সে সনায়েন, গালের গৃহিণী ও বিজলীর নিকট সে কখনও বেয়ারা, এখনও বুড়ো, অবিবাহিত বিমলের নিকট ছেলে বেয়ার ছিল সে—সনাকাকা, এখন হইয়াছে খানসামা; বালক জমলের এখনও জোনোদর হয় নাই, তাহ তাহার নিকট ল বড়াদাই রহিয়াছে।

বিমলের ভদ্রাসন বাড়ী একটা আশীষিত আধিবাসী। মাকুল পন্নোগ্রামে অবস্থিত, তাই গ্রামা পূজার সময় ভিন্ন বিমলের আর দেশে বাড়ী হয় না।

দীপাবিতার সময় মাকে নিয়া বিমল কয়েকদিনের জন্য বাড়ীতে বাল্ল মাত্র। তাঁহাদের বাড়ীটাকে দেশের লোকে ‘বাবুর বাড়ী’ বলে। এই বাবু শ্রুত বাবুর বাড়ী। ১২শের লাঠি এগার মাসই পেচক, চন্দ্র চটিকা প্রভৃতি।

নিশাচরগণের ইজারা দখলে থাকে। বাড়ীতে যে বৃদ্ধ সরকার আছে, সে বাবুর খাজানাদি আদায় তহনীল করে, আর বাকী সময় এই ইজারাদারদিগের সহিত নিফদ লাঠালাঠি করিয়া দিন কাটায়।

পরেশ বিমলের খুল্লতা ভ্রাতা। সে অতি শৈশবে মাতাপিতা হারাইয়া অন্নপূর্ণার স্তনে ও তৎপর বিমলের পৈত্রিক সম্পত্তির উপদেষ্টে পুষ্ট হইয়া যৌবন সীমার পদার্পন করিয়াছে। স্বীয় অজ্ঞতা নিবন্ধন অন্নপূর্ণা ও উদাসীনতা বশতঃ বিমলচন্দ্র পরেশের এই অনধিকার ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু হিমাংশুবালার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট সে ক্রটি অগোচর থাকিতে পারে নাই; তাই, দুই বৎসর বইল পরেশ সাবলব্ধ দ্বারা মায়ুষ হইবার সহপদে সহ এই সংসার হইতে বিতারিত হইয়াছে।

(১)

এবার বড় দুর্ভিক্ষ, পাটের বাজার বন্দা থাকায় মামলা মোকদ্দমা নাই বলিলেও হয়। গৃহিণীর ক্যাস ব্যক্ত এবার রক্তত ধণ্ডের মধুর নিকনে শস্যমান হয় না। ইহাতে হিমাংশুবালার যে কি কষ্ট তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারিবে না। এই মানসিক অশান্তি ফলটা প্রত্যক্ষভাবে অন্নপূর্ণা ও সনাতনকে এবং পরোক্ষ ভাবে বিমল বাবুকে উপভোগ করিতে হইতেছিল।

কালীমূর্তির বীতংসতা ও ঐপৌত্তলিকতার বিষয় চিন্তা করিয়া হিমাংশুবালা অনেকদিন হইতে এই বাঞ্ছা ব্যয়টা উঠাইয়া দিবার জন্য স্বামীকে উপদেশ দিয়া আসিতেছিলেন। এবার অতাবের বাজারে বাহাতে উহা না হয়, তজ্জন্ত বিশেষ পীড়াপিড়ি আরম্ভ করিলেন। পত্নীর উপদেশ এইবার অবহেলা করা সাধ্যাতীত বুদ্ধিয়া বিমল বাবু সরকারের উপর নিবেদন আজ্ঞা জারি করিলেন। বুড়া গেচাশার গ্রামে বড় আঘাত লাগিল। মূনিবের হুকুম, সে আর কি করিবে? কুলগুরু ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরকে সমস্ত নিবেদন করিয়া সে অক্ষমোচন করিল। ব্রহ্মানন্দ শিষ্য অন্নপূর্ণার অন্তিমত জানা আবশ্যক বোধ করিয়া সহরে আসিয়া অন্নপূর্ণাকে বলিলেন—“তুমি জীবিত থাকিতে

মা আনন্দময়ীর সেবা বন্ধ হইল এ কেমন কথা ?
অন্নপূর্ণা অশ্রুমোচন করিতে করিতে বলিলেন—“পাপের
শাস্তি পাইতেই না আমি আজও বাঁচিয়া আছি।
একে একে সবাই গেল, আমি পানীরই মৃত্যু নাই।”

ব্রহ্মানন্দ—“মৃত্যু কর্মফল ধ্বংস করিতে পারে না।
কর্মফল ভোগিতোই হবে। বউমা গ্রামা পূজার বিরোধী
কেন ?”

অন্নপূর্ণা—“আমি কি বলবো ?”

বিমল নিকটে ছিল, তাই হিমাংশুগালা অজ্ঞাব-
গুঠনে কিঞ্চিদূরে উপবিষ্টা ছিলেন। অন্নপূর্ণার কথায়
তাহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল, উত্তেজিত স্বরে সে
বলিল—“কাল্পনিক উলঙ্গ মূর্ত্তির বীভৎস ছবি দেখিয়ে
ছেলেপুলের হৃদয় কলুষিত করে লাভ ক’ক ? বিশেষ
পৌত্তলিকতা সভ্যতার বিরোধী।”

গুরু—বিমল, তোমারও কি এই মত ?

বিমল—অজ্ঞান দেখি না। ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি কি ?

গুরু—আমি মূর্খ, যুক্তি প্রমাণ দর্শনার শক্তি আমার
নাই। কিন্তু সব কাজই কি যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়া
সম্পাদিত হয় ?

বিমল—হুয়া উচিং।

গুরু—সকল সময় উচিতের মর্যাদাও বা প্রকৃত
হয় কই ?

বিমল—আপনি কি তবে অজ্ঞায়ের অশ্রুমোচন করেন ?

এমন সময় পরেশ আসিয়া প্রথমতঃ গুরুকে তৎপর
অন্নপূর্ণা, বিমল ও বৌদিদিকে প্রণাম করিল। পরেশকে
আশীর্বাদ করিয়া ব্রহ্মানন্দ বিমলকে বলিলেন—“সে
কথা পরে বলিব। বল দেখি, অধুনা চিত্রকরদের
ভিতর শকুন্তলাকে ত কেহ দেখে নাই, তবে শকুন্তলার
চিত্র অঙ্কিত হইল কিরূপে ?”

বিমল—চিত্রকর কালিদাসের বর্ণিত চিত্র ভুল ও
রং এর সাহায্যে প্রতিকলিত করিয়াছে।

গুরু—শকুন্তলা নামে কেহ ছিল কি না তার কি
কোন প্রমাণ আছে ?

বিমল—ব্যাসের কল্পনাও হইতে পারে।

গুরু—কল্পনার লিখিত চিত্র ঘরে রাখিতে তবে
কোন দোষ নাই ?

বিমল—কি দোষ ?

গুরু—তবে মা আনন্দময়ী পল্লনা প্রসঙ্গ হইলেই
বা তাঁর চিত্র উপেক্ষিত হইবে কেন ? মা ত পুণ্যাদি
দ্বারা পাক্কলিত ?

বিমল—চিত্র দোষের নহে, কিন্তু গ্রামা উলঙ্গ চিত্র
এড়ই কংসিত !

গুরু কতক্ষণ জ্বলন্ত ভাবে থাকিয়া বলিলেন—
তোমাদেব নভেলের কমলিনী, বিনোদিনীর চিত্র হইতেও
কি কংসিত ?

পরেশ—বৌদি, তোমার লগুন রত্ন শান' দাও না ?
হিমাংশুগালা কলুষিত করিয়া পরেশের পানে
তাকাইয়া বলিল “বিজু তার বায়ে বন্ধ ক’রে রেখেছে।”

বিমল—কমলিনী, বিনোদিনী প্রভৃতির চিত্র কংসিত
নহে। আর্দ্র দিক দিয়া দেখিতে গেলে উহা বড়
সুন্দর।

গুরু—আনন্দময়ীরও দুইটা দিক আছে, শুধু আকৃতি
দেখিয়া সমালোচনা চলে না; প্রকৃতিই সমালোচনার
প্রধান বিষয়। সংহার মূর্ত্তিময়ী রণরঙ্গিনী মার কাঁধটাই
দেখা উচিত। বিজ্ঞাপাগরের রূপে লোক তাঁহার বশী-
ভূত হইয়াছে এমন কথা ও শুনা যায় নাই,— তাঁর গুণেই
লোক বিমুগ্ধ হইয়াছিল।

হিমাংশু—ছেলে পুলে অত প্রকো না, যা দেখে, তাই
শিখে।

গুরু—যা দেখে তা শিখে না,—সব শিখান যায় তাই
শিখে। ইংরেজের প্রকৃতি যেমন, বদেশান্ত্রাণ, বিল
বানিজ্যেশ জ প্রকৃতি ভগ গ্রাম শিক্তি বালী
মরেই ত দেখিতেছে, কিং কেহ তা শিখিয়াছে কি ?

বিমল—পৌত্তলিকতা অসভ্যতার নিদর্শন।

গুরু—গীর্জার যৌগুষ্ঠের চিত্র রাখা হয় কেন ?
তাহার চূড়ান্তে কখন উলঙ্গ কেন ?

বিমল—যৌগুষ্ঠী বীণ রত্ন শ্রবণ ও গুণার শ্রবণ।

গুরু—বাইবেল পড়িলেই ও সব জানা যায়, তবে
চিত্রের আবশ্যকতা কি ?

বিমল—চিত্রে স্বরূপ উপলব্ধি পাই হইতে পাইতর হয়

গুরু—হিন্দুর মূর্ত্তি পূজার উদ্দেশ্যে তাই। মন্তগুলি

পড়িয়া দেখিও, উহাতে পুতুলের উপাসনা নাই—সেই চিন্তারী শক্তিরই উপাসনা আছে। আত্মা শক্তির বড়ৈখ্যের স্পষ্ট উপলব্ধির জন্যই শক্তির কল্পনা। উহা পুতুল পূজা নহে,—পুতুলের পূজা করিলে ধ্যান ও পাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইত না।

এমন সময় বিজলী আসিয়া ডাকিল “বেয়ারা”! সনাতন জড়সড় হইয়া উপস্থিত। বিজলী ক্রান্তির কক্ষেরে বলিল “আমার খাবার আনিস্নি কেন রে?”

সনাতন—দ্বিধমণি, আমার বড় জর হইয়াছে, তাই বাইতে পারি নাই।

বিজলী—খাবার সময় ত একখাল উড়ে যায়; তখন ত জর আসে না!

বুড় নীরব—ব্রহ্মানন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন “ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারা যায়, কাজ করান যায় না। তুমি বুদ্ধিমান উচ্চ শিক্ষিত, যাহা ভাল বুঝ করিও। তোমার সংসার হইতে এককাল পরে মা আনন্দময়ীর অঙ্গ উঠিতেছে দেখিয়া এত কথা বলিলাম।”

অন্নপূর্ণা—ঠাকুর, আনন্দময়ীর অঙ্গ ওঠে, আমার অঙ্গ ওঠে না কেন?

গৃহিণী কুটিল মেত্রে শাণ্ডীর পানে তাকাইল।

পরেশ—মা আনন্দময়ীর খাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁর অঙ্গের অভাব হইবে না। গুরুদেব, আপনি দুঃখ করিবেন না। এও বোধ হয় তাঁর একটা লীলা।

গুরু—দীর্ঘ জীবী হও। মার লীলা মা ই জানেন। আর দুই মাস পরই ত দীপাবিতা? দেখি মা কি করেন।

(২)

পরেশ মহাকুমার জমিদারী কাছারীর নায়েব। মহাকুমার অত্যন্ত কলেরার প্রাণ্ডীর্ভাব হইয়াছে। পরেশ জন সাধারণের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করিয়া দিবা রাত্রি রোগীর পরিচর্যা করিতেছে। ঈশ্বরের কি ইচ্ছা! পরেশ ও সেই দারুণ ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হইল। ব্যাধিব-বীন পরেশকে আর কে দেখিবে? সন্ধ্যাে পরামর্শ করিয়া পীড়িত পরেশকে তাহার উকিল দাদার বাসায় পাঠাইয়া দিল। কিন্তু সেখানে তাহার স্থান হইল না। সংক্রামক ব্যাধি—তাই বৌদ্ধি তাহাকে বাড়ীতে রাখা বিপদ জনক মনে করিয়া হাসপিটালে পাঠাইয়া দিলেন। বিমল বাবু ডাক্তারদেরে বিশেষ রকম অহু-বোধ করিয়া দিলেন, বেন পরেশের চিকিৎসার কোন ক্রটি না হয়।

বুড়া সনাতনের প্রাণটা বড় বেয়াদব। সে রোগই খাইয়া পরেশকে দেখিয়া আসে, এমন কি অনেক সময় তাহার সেবা তত্পরতা করে। হিম্মতবান ব্যাধি সংক্রমণের ভয়ে সনাতনকে বলিলেন

“অত মারা দেখাতে হ’লে হাসপিটালে গিয়েই থাক। আমার ছেলে পুতুলের ঘর।”

অন্নপূর্ণা কয়েক দিন হয় দেশে গিয়াছেন, তাই এসব খবর রাখেন না।

পরেশ অনেকটা ভাল হইয়াছে, আজ সনাতনকে অনেক ক্ষণ বসিতে দেখিয়া পরেশ বলিল—“সনাতনাকা, অনেক এগে এখন বাবে না?” সনাতনের বক্ষ চক্ষুজলে প্রাবৃত হইল। পরেশ ত অবাক! ক্রন্দনের কারণ সে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না।

পরেশ প্রিজাসা করিল—কেন, কঁাদছ দাদা?

সনাতন—গিন্নি মা, আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন।

দুঃখে ও আত্মমানে পরেশের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

সনাতন—বাব, তুমি একটু ভাল হইলেই আমি বাব।

পরেশ—তবে আর কোথায় বাবে?

সনাতন—যেখানে দুই চক্ষু যায়! ভিক্ষা করে খাব।

পাশের ঘরে নবীন ডাক্তার দাঁড়াইয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিল। নিকটে আসিয়া বলিল—“এখনও কি লোকে ভিক্ষা দেয়?”

সনাতন—গৃহস্থ লোক দেয় না ত কি?

পরেশ—ডাক্তার বাবু, এখনও দিন রাত্রি দুটাই আছে।

নবীন—উজ্জল আলোকে দেশ উদ্ভাসিত হইয়া পড়িয়াছে; এই বুড়ের স্থায় পেচকের আর এখানে স্থান নাই।

পরেশ—মা আনন্দময়ীর লীলা বৃক্ষ পত্রের এক পাশে আলো অপর পাশে অন্ধকার চিরদিনই থাকবে। ডাক্তারের অহুমতি লইয়া পরেশ সনাতনকে হাসপিটালে রাখিল।

নবীন ডাক্তার বয়সে নবীন; পরেশের সমবয়সী ও স্বজাতীয়। হাসপাতালেই উভয়ের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। পরেশ হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া দুই সপ্তাহ নবীনের বাসায় থাকিতে বাধ্য হইলেন। নবীনের সহোদরা হেমলতার যত্নে ও তাহার মাতা ও ভ্রাতৃ বধুর স্নেহে পরেশ বড় সুখে এই কয়দিন অতিবাহিত করিল। যৌবনোন্মুখী হেমলতার অপক্লপ রূপ লাভণ্য পরেশের হৃদয়ে একটা বেশ ভাবান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

(৪)

গ্রামা পূজার আর এক সপ্তাহ মাত্র বাকি। অন্নপূর্ণা দিবারাত্রি অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। এককাল পর মা আনন্দময়ীর চরণ দর্শনে বঞ্চিত হইবেন ভাবিয়া তাঁর স্বামী-শোক উৎপলিয়া উঠিয়াছে। সারাদিন আনন্দময়ীকে ডাকিয়া ডাকিয়া উপবাসিনী অন্নপূর্ণা অবসন্ন দেহে তত্পরভূত, হইয়াছেন; এমন সময় গুরুদেব আসিয়া ডাকিলেন।

অন্নপূর্ণা উঠিয়া গুরু পদধূলি গ্রহণে তাঁহাকে বসিতে দিয়া নিজে অদূরে মৃত্তিকায় উপবেশন করিলেন।

গুরু—কি স্থির করিলে ?

অন্নপূর্ণা—কি আর করিব ? আমার হাতে টাকা থাকিলে মা কি আমার ঘরে চরণ ধলি না দিয়া পারিতেন ?

গুরু—যোগ্য পুত্র সবেও তোমার এই দুর্দশা !

অন্নপূর্ণা—ইংরেজী পড়া বউ আমার ছেলেকে বশ করিয়াছে। আমি মন্দ ভাগিনী না হইলে পুত্র আমার পর হইবে কেন ?

গুরু—নিমন্ত্রণ না হয় না হইল। সামান্য ব্যয় হইলেই ত পূজা হইতে পারে।

অন্নপূর্ণা—এক পরসী খরচ হইলেও সরকারের দণ্ড হইবে ও চাকুরী বাইবে, বিমল এরূপ লিখিয়াছে।

গুরু—তবে কি আর কোন উপায় নাই ?

“যাঁর উপায় তিনিই করিবেন” বলিয়া পরেশ আসিয়া উত্তরকে প্রণাম করিল। সনাতন উভয়ের চরণ ধলি লইয়া কাঁধের বোচকা এক পাশে নামাইয়া রাখিয়া ব্রহ্মানন্দের জন্ত তামাক সাজিবার চেষ্টা দেখিল। অন্নপূর্ণা পরেশের মস্তক স্পর্শে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন “এত শুধাইয়াছ কেন বাবা ?”

পরেশ—কলেরায় বড় টানাটানি করেছিল, জোঠাই মা, কিন্তু তোমার আশীর্বাদের সঙ্গে পেড়ে উঠলো না।

গুরু—দয়াময়ী মা তোমার মঙ্গল করুন।

পরেশ—গুরুদেব, আনন্দময়ীর পুত্রার আয়োজন করুন ; টাকা যত লাগে আন দিব।

“সত্য বাবা, সত্যি !” বলিতে বলিতে আনন্দের আবেগে ব্রহ্মানন্দ পরেশকে আলিঙ্গন করিলেন। পরেশ ঠাকুরের পদধূলি লইয়া বলিল “মা’র এক পুত্রই যে সব কাজ করিবে তার মানে কি ? অপর পুত্র কি কিছুই অধিকারী নয় ?”

গুরু—অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু প্রবৃত্তি কই ? যে চুঁকু ছিল বিজাতীয় শিক্ষার ফলে তাও বাইতে বসিয়াছে।

পরেশ—কিন্তু পূর্বাশাশে উবার রক্তিম ছটা দেখা বাইতেছে।

গুরু—এ চপলার ক্ষণিক হাসি, আশার লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে পারি না। শক্তির অংশ প্রকৃতিই যখন শক্তির সম্মান করিতে ভুলিতেছে, তখন আর আশা কি ?

পরেশ—আশা, যুগ যুগান্তরের ষাট প্রতিধাতো হিন্দুধর্ম যার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

গুরু—বিজাতীয় সভ্যতার প্রবল জোতে বুকি সব ভাদিয়া যায়।

পরেশ—যে ভীষণ বজা গৃহাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তরুলতা, গো মেঘাদি ভাঙাইয়া লইয়া যায়, সেই বজাই আবর্জনা রাশি অপসারিত করিয়া বিধোক্ত ধরা বক্ষে স্বাস্থ্যের নবজীবন সঞ্চার করে। যে তপন করণে রোগ প্রবণতা শক্তি বিস্তারিত সেই তপন তাপ ই প্রাণী জগত ও উদ্ভিদ জগতকে সজীবিত ও সংবর্দ্ধিত করিতেছে। সুতরাং যে বিজাতীয় সভ্যতার ক্ষণ প্রভাব ভারতবাসী হিন্দুর হিন্দুত্ব বিসর্জন দিতেছে, সেই সভ্যতাই আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া অর্ধা শব্দের প্রবর্তিত বিধি নিষেধের সারবস্তা বুঝাইয়া দিতেছে ও দিবে।

গুরু—আশীর্বাদ করি ওয় যুক্ত হও, ধর্ম্যে তোমার অচলা ভক্তি থাকুক।

পুত্রার উজোগ আয়োজন হইল। সনাতনের প্রস্থ-ধাৎ সমস্ত অবগত হইয়া অন্নপূর্ণা সপরিবারে নবীন ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। পরেশের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও বিমল প্রভৃতি কেহ আসিল না।

মহাধুমধামে গ্রামা মার অর্জনা হইল। হেমলতার প্রমীলতা ও বিমল নম্রতা দেখিয়া অন্নপূর্ণা বিমুগ্ধ হইলেন। গুরুর মত লইয়া হেমলতার সহিত পরেশের বিবাহ দিবার জন্ত নবীন ডাক্তারের নিকট তিনি প্রস্তাব করিলেন। ডাক্তারও সানন্দে সম্মতি দিলেন ; কিন্তু পরেশ বিবাহ করিতে চায় না। গুরু ও নবীনের কথায় প্রতিবাদ করিয়া সে বলিল—“আমি যুদ্ধে যাইবার সক্ষম করিয়াছি, এমন বিবাহ করিতে পারি না।”

নবীন—বিবাহ তোমার কর্তব্য সম্পাদনে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে কেন ?

পরেশ—মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া কেন এতটা অবসার সর্সনাশ করিব ?

নবীন—ইচ্ছাশক্তির ইচ্ছা ভিন্ন কে কার সর্সনাশ করিতে পারে ? আমরা হিন্দু, কণ্ঠ কলে বিশ্বাস করি।

পরেশ—তর্কে আপনার সহিত আমি আটিয়া উঠিব না, তা জানি।

গুরু—শক্তির সহায়তার শক্তি সাধনা কত সহজ, তব্বে তাহার প্রমাণ বিজ্ঞানমান বহিরাছে। বাবা, তোমার জোঠাইয়ার মনে কষ্ট দিও না।

পরেশ নীরব হইল। নবীন বলিল—“বিবাহ সংস্কার দ্বারা পূর্ণতা লাভ কর, তারপর কর্তব্যাবধারণ করিও। উশ্বল চিত্ত প্রকৃত কর্তব্যাবধারণে সমর্থ হয় না।

জোঠাইয়াকে কষ্ট দিতে পরেশ অসমর্থ ; বিশেষতঃ নিজের চিন্তাও কেমন হইয়া গিয়াছে। তাই প্রতিবাদে তাহার বড় প্রবৃত্তি রহিল না। সুতরাং বিবাহ স্থির হইল। বিমলের নিকট পত্র গেলে হিম্মন্তুবালা সম্মতি দিলেন।

এই দুদিনে রাধুনী বামুনের খরচটা বাঁচাইতে পারিলে জানি কি ? বধাসময়ে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল । নিজে যে স্থান হইতে বিভাঙিত হইয়াছে, সেই দাদার বাসায় হেমলতাকে পাঠাইতে পরেশের আপত্তি থাকিলেও অগ্রপূর্ণার সেবা শুশ্রূষার জন্য পরেশ বান্ধিতমান সমস্ত বিসর্জন দিল । বিমল নববধূ সহ মাতাকে বাসায় আনি-লেন । পরেশ কার্যস্থলে চলিয়া গেল ।

(৪)

আবার দীপান্তি আসিল । অগ্রপূর্ণা ও হেমলতার সনির্বাক অনুরোধেও কোন কল হইল না, হিমাংশু বাগার দেখাই বজায় রহিল । বিমলের বাড়ীতে এবার আনন্দ-ময়ী আসিলেন না । অগ্রপূর্ণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু জুলাইলেন ; তক্ত চূড়ামণি পরেশ দেশে নাই, সে বিবাহের ছয় বাস পরেই মেসোপটেমিয়া চলিয়া গিয়াছে ।

দিন যেমন বাইতেছিল, তেমনই বাইতে লাগিল । গৃহকার্যের যাবতীয় তার হেমলতার উপর পড়িয়াছে, রাধুনী বামন ও দাসী উঠিয়া গিয়াছে । হেমলতা দবা-রাত্রি খরকার কাজে বাস্ত । তাহাতে তাহার আনন্দ তির্য অবসাদ নাই ।

প্রতিবেশিনী সবজ-পত্নী প্রমীলাদেবী ষিগ্রহরের পর বিমলের বাসায় বৈড়াইতে আসিয়াছেন । বাবুদের অফিসে থাকা কালে মেয়েদের এবাসার ওবাসার ঘুরিয়া বেড়ানটা সহরের চির প্রচলিত প্রথা । বিজলীর স্থল বন্ধ, সে এক থানা আরাম কেদারায় অর্দ্ধ শয়ন অবস্থায় থাকিয়া, ‘ঘরেবাইরে’ পড়িতেছে । হেমলতা পান সাজিতেছিল । বধা বিহিত অন্ত্যর্ধনা ও আসন গ্রহণের পর প্রমীলা হাসিয়া বলিলেন “মেয়েদের লেখাপড়া দেখা কত দরকার মিসের, এখন তা বুঝেছে । ওখানা কি বই বিছ ?”

বিজলি—রবি বাবুর ‘ঘরে বাইরে’ ?

প্র—বেশ বইখানা কিন্তু । আমাদের উনি আবার এ সব ভালবাসেন না ; বলেন পড়তে ছয় রামায়ণ মহাভারত পড় ।

হিমাংশু—ইংরেজী পড়লেই কুসংস্কার যায় না । এই দেখনা মহাভারতের মত কুৎসিৎ বই পড়বার লোকও এখন রয়েছে ।

হেমলতা—কেন দিদি, মহাভারত কুৎসিৎ কিসে ?

হিমাংশু মুখচলি করিয়া বলিল—কুন্তী জ্যোপদীর কথা ও কি কুৎসিৎ হ’তে পারে ? প্রাভঃশ্বরগীতাদের কথা !

হেম—আমরা একজনের মনই যোগাতে পারি না—আর জ্যোপদী পাঁচ স্বামীর প্রতি কেমন অচলা ভক্তি দেখে সংসারের পরীক্ষার পাড় হয়ে গেছে ! স্বামীদের সংকার্যে উৎসাহিত করে কত বড় বড় মহৎ কাজ করি-

য়েছে । বলতে গেলে জ্যোপদীর মত সহধর্মিণী হয় না,—সে আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত ।

হিমাংশু—তোর নেকামি বেধে দে । অহলা জ্যোপদী তার কুন্তীর নাম লইয়া তুই বর্গে বা, আমাদের ও স্বর্গের প্রাণোজন নাই—

হেম—কুন্তী দেবী পরম পবিত্রতাময়ী রমণী ছিলেন—মন তাঁর কখনও কলুসিত ছিল না ।

“তোর এমন বিত্তা হয় নি যে তোর কাছে আবার উপদেশ নিতে হবে ।” বলিয়া হিমাংশু বাগা উঠিয়া গেলেন । হেমলতা সজ্জিত হইয়া বলিল “আমারই অন্তায় ।”

প্রমীলা—কে বলে তোর অন্তায় ? তর্কে হেঁরৈ রাগ করলে কি করা যায় ?

হেম—দিদির সঙ্গে আমার তর্ক করাই অন্তায় । কাজকর্ম ছেঁড়ে তর্ক করা আরও অন্তায় ।

প্র—আচ্ছা ছোট বউ, রাতদিন খেটে খেটে তোয় কি একটুকু অবসাদও আসে না ?

হেম—দাদার মুখে শুনেছি, ভগবান বলেছেন মানুষকে তিনি এমন ভাবে সৃজন করেছেন যে মানুষ যুহুতও কর্ম ছাড়া থাকতে পারবে না । যদি তাই হয়, তবে কাজে বিরক্তি আসবে কেন ?

প্রমীলা—না হউক, একটু সাজ গোল, একটু আয়োদ প্রয়োদ কভেও কি তোয় ইচ্ছা হয় না ?

হেমলতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল “আমিতো বেশ আয়োদেই আছি ; হৃৎকৃত আমার কিছুই নেই ।

প্রমীলা—স্বামী তোয় রপক্ষেত্রে কি অবস্থায় আছে কে জানে ?

হেম—তাঁর কর্তব্য পালন কঠে তিনি সেখানে গিয়াছেন, এখানে আমার কর্তব্য পালন কঠে পারলেই আমি সুখী ।

প্রমীলা—কার জন্য খেটে খেটে শরীর মাটি কচ্ছিস্ ?

হেম—মাটির শরীর মাটি হবে, কেউ ফিরাতে পারেন না । তবে কর্তব্যে ধবংহলা করে নারী জন্য নিষ্ফল করবো কেন ?

প্রমীলা—রিজুর বিয়ের কি হলো ?

হেম—এত ছোট বেলায় বিয়ে দেওয়া দিদির ইচ্ছে নয় ।

প্রমীলা—নয়না বা দেখা যাচ্ছে,—

অগ্রপূর্ণার ডাকে ছোট বউ উঠিয়া গেল ।

(৫)

কাছারী হইতে রিক্সা পকেটে ফিরিয়া আসিয়া বিমল বাবু আজ আর টিফিন খান নাই ; বিমর্ষ চিত্তে বলিয়া কি ভাবিতেছিলেন । বৎসরটা ভরিয়াই এবার রিক্সা পকেটে ফিরিতে হইতেছে ; কিন্তু অল্প কোন দিন হো-এমন জীব

হন না। পত্নী বারবার জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন কারণ জানিতে পারিলেন না, তখন তিনি ক্ষুব্ধ মনে শয়ন করিতে বসিয়া নভেলের পাতা উন্টাইতে লাগিলেন। ভাঙের অক্ষুণ্ণ হইয়াছে ভাবিয়া হেমলতা কি অশুভ কামিয়ার জন্য একবার শাড়ীকে একবার ধোঁকাকে পীড়ন করিতেছিল। বিমল তাহা দেখিতেছিলেন আর নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন।

স্নাতন আসিয়া বলিল—“কর্তা মা, দ্বি'দমনির নেমস্ত্রণ, আজ আসিতে তার অনেক রাত্র হবে।

বিমল—সে কি এখনও স্থলে আছে?

স্নাতন—মা, গাড়ী করিয়া গেছেন।

হিমাংসু—বাবা বাহিরে আসিয়া বলিলেন “কার বাসার নেমস্ত্রণ?”

স্নাতন—তা জানি না মা।

বিমল—তা আর কেনে কি হবে? আমার যেমন অসুখে!

হিমাংসু—কেন গা, এমন কথা বলছ কেন? নেমস্ত্রণে গিয়েছে, তার হয়েছে কি?

বিমল—কি আর হবে? যেমন কর্ম আমি করেছি, ফলও তেমনি ভোগ করবো। এখন জাতি কুল সব বাবে।

হিমাংসু—মাথা ধারাপ হয়ে গেছে, তাই যা ঘুমে আসছে তাই বলছ।

বিমল—তা ঠিক, তবে ধারাপ আজ হয় নি, যে দিন তোমার ঘরে এনেছি সেই দিন থেকেই হয়েছে।

ক্রোধে হিমাংসু বালায় অধর কম্পিত হইল, মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া বিমল বলিল—আমার উপর রাগ করলেই দেশের লোকে ভয় পাবে না। দশজন আমার ষাটকও না প্রজাও না।

হিমাংসু—কোন হতভাগা বুঝি আমার বিজুর বরুড়ে তোমায় লাগিয়েছে, তাই বিশ্বাস করে বসে আছি। বিজু কি আমার তেমন মেয়ে? সে যে রোগে পড়ায় টেকা দিয়েছে তেঁর পান বাজানাতেও সকলের ভালবাসা কেড়ে নিয়েছে। আমার চাইতেও সে ভাল বাজাতে ও গাইতে পারে।

বিমল—বস, তবে আর কি! শৃঙ্খলযুক্ত পাখীর মত এখন যেখানে সেখানে গুরে বেড়াতে কিছা বা তা করতে আর দোষ কি?

হিমাংসু—দেখ, মিছে চি'চিও না। পাশের ঘরে তোমাদের গুরুদেব রয়েছেন।

বিমল—গুরুদেব এসেছেন? তবে যা আনন্দময়ীর কপা থেকে আমি এখনও বঞ্চিত হইনি। ব্রহ্মানন্দ আসিয়া একখানা চেয়ারে উপবেশন করিলে বিমল তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া নীচে দাঁড়িয়া উপবেশন করিলেন।

গুরু—ভাল আছ ত বাবা?

বিমল—আমার ভাল না থাকাই ভাল।

গুরু—কেন? এমন কথা কেন বল? তোমার লজ্জা সংসার।

বিমল—আমিও এদিন তাই মনে করতুম। এখন আমার সেই মোহ কেটে গেছে।

গুরু—কি হয়েছে—আমার খুলে বল তো?

বিমল—কি আর বলবো! আমি নিজের পাঁজ নিজে কুঠাখাত করেছি। জী কতাকে স্বাধীনতা দিয়ে এখন জাতি কুল হারাতে বসেছি। অজ্ঞানের আমার অজ্ঞ নাই। মার মনে যে কত কষ্ট দিয়েছি আপনি তা সবই জানেন। তাই পরেশকে নিরাশ্রয়ে ত্যাগ করেছি, কণ অসহায় হাঁসপাতালে পাঠিয়েছি। তার জী দিবারাত্রি দাসীর মত এ বাড়ীতে খেটে খেটে অবসর, তার দিকে একবার ফিরেও চাই নি; এর উপর আমার জীর থাক; যত্নগাও লাগাই আছে। শিক্ষাও সংসর্গ-ভাবে নাস্তিকতা আমার হৃদয় অধিকার করেছে, তাই মা আনন্দময়ীর জন্য সামান্ত ব্যয় করাটা অপব্যয় মনে করে মার বুকে শেল নিক্ষেপ করেছি।

গুরু—নিজের ভ্রম বুঝিয়াছে দেখে আমি বড়ই সুখী হইলাম। কুপুত্র হইলেও কুমাতা হয় না,—তুমি রিপণে গেলেও আনন্দময়ী তোমায় তাগ করেন নাই।

বিমল—বিজলী আমার সর্কনাশ করিতে উত্তম, এখন আমি কি করবো উপদেশ দিন।

গুরু—মাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই তোমার আনন্দময়ী। বিমল মাতার চরণ ধরিয়াই কান্দিয়া ফেলিলেন। মারও চক্ষু শুষ্ক ছিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে মা বলিলেন “চল সকলকে লইয়া বাড়ী যাই। সহরে বউ কির লজ্জা সবর থাকে না।

গুরু—সহরের দোষ অপেক্ষাও কর্তার দোষ অধিক। কতগুলি কুরুচ পূর্ণ পুস্তক তোমার কন্ঠার পাঠ্যরূপে নির্দোষ করিয়াছে, যখন দেখিলাম গৃহস্থাসীর কার্য কিছুই করিতে না দিয়া কতাকে বাবু বানাইতেছে, যখন দেখিলাম বুদ্ধ স্নাতনকে তিরস্কার করিতে তোমার কন্ঠা বিস্ময়াজ্ঞেয় দ্বিবাধোষ করিল না, এবং তোমাদেরও তাহাতে ক্রোধ নাই তখনই বুঝিলাম কন্ঠার মাথা ধাইতে বসিয়াছে। যখন দেখিলাম বউমা আনন্দময়ীর প্রতি ভক্তি হারাতেছে তখনই বুঝিলাম বিপদ নিকটবর্তী। এখন আর অসুস্থতা করিয়া লাভ কি? জীকন্ঠা সহ বাড়ীতে বাইরা কতক দিন বাস কর, পরে উপযুক্ত পায়ে কন্ঠা দান করিয়া সহরে আসিবে।

হিমাংসু বালায় নিবেদন সত্ত্বেও বিমল বাবু সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলেন।

(৬)

কার্তিকমাস, দেশের জল নিত্যই খারাপ। চারিদিকে নানা রকম ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এ সময় বঙ্গদেশের পল্লি-সমূহের প্রায় সর্বত্রই একরূপ অসুখা খটুরা থাকে। বারমাস কলের জল খাইয়া বিমলের পরিবার-বর্গের এই জল সহ হইল না। বাড়ীতে কলেরা দেখা দিল। প্রথমেই বিমল বাবু আক্রান্ত হইয়া শয্যা লইলেন। হিমাংশুবালা সহরে বাইবার জন্ত বিশেষ পাড়াপিড়ি করিয়াও কোন ফল করিতে পারিলেন না। হেমলতার পক্ষ পাইয়া নবীন দা ঔষধের বাস্তু সহ বিমলের বাড়ী আসিলেন। আজ হিমাংশুবালার আহ্বানে তাহাদের শুক্রবার জন্ত আসিল সহরে প্রতিবেশী পুল ফটিক গুরুকে প্রেরণ। প্রকুরকে দেখিয়া বিমলের আপাদ বস্ত্র ছুটিয়া উঠিল। বিজলী প্রাণ খুলিয়া প্রকুরকে অভ্যর্থনা করিল।

তুই দিন মা যাইতেই বালক অমলের দাঁত আরম্ভ হইল, শুনিয়া বিমলের অবসর প্রাণ আরও অবসর হইয়া পড়িল। অরুণা অহনিশি মা আনন্দ-ময়ীকে ডাকিতেছেন, আর রানোর বতকিছু মানস করিতেছেন। হেমলতার আহ্বার নিজ্ঞা নাই—যর কলার কাজ আছেই, তার উপর রোগীর শুক্রবার করার ক্লাস্ত বোধ নাই।

আজ বিমলের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ ডাক্তার আসিয়া কাছে বসিলেন। নানা কথায় অবসর বিমলকে উৎসাহিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। নবীন ব্রহ্মানের উত্তর সাধকতা করিতেছে এমন সময় সনাতন আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—“ডাক্তার বাবু, সর্বশ্রম হইল, রক্ষা করুন। ফটিক বাবু দ্বিদিমাকে ঘালের ঘাটে নৌকার তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছে। বিমল বালিসে মুখ শুকলেন,—ডাক্তার এক লাফে ঘরের বাহির হইয়া ঘালের দিকে ধাবিত হইলেন। ইহা সনাতন তাহার অমূল্য কারণ। অন্ধকারে আঁধা ঘাটে নৌকার অমূল্য হইল। নৌকা ধরা পড়িল। ফটিককে পাওয়া গেল না। বিজলীকে নিয়া সকলে ঘরে ফিরিল। তারপর তিন দিন কাটিয়াছে, রোগীর অবস্থা জমেই সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপরন্তু বিজলীরও ভেদ-বর্মন আরম্ভ হইল। এবার হিমাংশুবালার চৈতন্য স্ফূর্ত হইয়াছে, সে কাঁদিতে কাঁদিতে শাতড়ীর চরণ ধারিয়া বলিল—“কি উপায় হবে মা? আমার পায়ে যে সর্বশ্রম হইল!”

অরুণা—“বাছা, কাঁদিয়া কি হবে? আনন্দময়ীকে ডাকি কিছু শ্রম প্রস্তুত হইলে বিজলী সকলকে কাঁদাইয়া অমূল্য সময় নিশ্চিত হইল। মাতা কান্দয়া আকুল হইলেন। অরুণার চিংকারে পাড়া প্রতিবেশী

বাহির হইয়া উঠিল। হেমলতা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে ধোকা ও ভাস্করের শুক্রবা করিতে লাগিল। কাঁদিল না ফেল ব্রহ্মানন্দ আর বিমল।

আজ দীপাবলি। গ্রামা পুজার আয়োজন হইয়াছে। রোগী ঘরের অবস্থা অনেক ভাল। বড় ডাক্তার আর ভয় নাই জানাইয়া ভিজিট ও পাথের লম্বা চলিয়া গিয়াছেন। শাতড়ী বড় বধু সমস্ত দিন পুজার মণ্ডপে পড়িয়া রহিয়াছেন। হেমলতা সমস্ত কাজ করিয়াও পুজার আয়োজন ঠিক করিয়া দিয়াছে। পুজার বসিয়া ব্রহ্মানন্দ বলিলেন “সত্যি মা, তোর দশ হাত আছে।” নবীনের নিবেদন শ্রবণে বিমলকে মণ্ডপের বারেন্দ্রাং বিছানা করিয়া দিতে হইয়াছে।

পুজা শেষ হইল—শুরু বলিলেন “বলি দাও।” সকলে জোড় হস্তে মাকে ডাকিতে লাগিল। নবীন তীক্ষ্ণদার খেজে ছাগ মুণ্ড ছেদন করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনগণ কালী প্রীতে হরিধ্বনি দিয়া উঠিল। এমন সময় সনাতন পরেশ পরেশ বলিয়া চিংকার করিল। সকলে দেখিল পরেশ আসিয়া মণ্ডপের সমুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। হেমলতা একবার পরেশের পানে তাকাইয়া পরক্ষণেই প্রতিমার চরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে। তাহার অপাঙ্গ বাহিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। পরেশ বলিল “পাখাগি, সামান্য অপরাধে তুই এত বড় একটা বলি না নিয়ে ক্লান্ত হইলি না। বিজলীকে ছেড়ে না হয় আমার গ্রহণ কর্তি। বিমল অতি কষ্টে শব্দ উপর বসিয়া বাহুদয় প্রসার পূর্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল “আর তাই, আমার কোল দে। মা উচিত বিচার করেছেন।”

ব্রহ্মানন্দ ঠিক পরেশ মা উচিত বিচার করেছেন। করুণাময়ীর কত করুণা! বিজলীকে গ্রহণ কবে তিনি সর্বশ্রমে তোমাদের মঙ্গল করেছেন।

পরেশ—তবে তাই হউক। সর্বমঙ্গল মা, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

পরেশ যাইয়া বিমল প্রকৃতির পদগুলি গ্রহণ করিল। ব্রহ্মানন্দ বজ্র সমাপনান্তে সকলকে আলীঙ্গন দিলেন। নবীন প্রসাদ বাটুরা দিল। বুড়ে বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখাইয়া পরেশ কর্তৃপক্ষের প্রশংসা ও আদেশ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করার কলেই বিমল আনন্দ উপভোগ করিল। হেমলতা বলিল “মার করুণা সবার চেয়ে আমার উপরেই বেশী।” পরেশ হেমলতাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বলিল—“তাত হবেই তুই যে তাঁর পুজার যোগাড় দিয়াছ।”

উপেক্ষনার দত্ত গুপ্ত।
কমিক সং

সৌরভ

অষ্টম বর্ষ।

ময়মনসিংহ, শ্রাবণ ১৩২৭।

দশম সংখ্যা।

আলেকসন্দরের পঞ্চনদ আক্রমণ।

(২)

পুরু আনিতেন যে, গ্রীকেরা হস্তীর সহিত বিশেষ পরিচিত নহে। তিনি ভাবিলেন, তাহারা এই বিশাল কায় অস্ত্রদিগকে দেখিয়া নিশ্চয়ই বিশেষ ভীত হইয়া পড়িবে। এই ধানেই যে তিনি বিশেষ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন, তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব। রথের কথা আমরা প্রাচীন পুস্তক সকলে প্রায়ই দেখিতে পাই। ইহার বিশেষ বর্ণনা নিম্নরূপে। আমাদের দেশে রথ যাত্রার সময় যে প্রকারের রথ ব্যবহৃত হয়, ইহা প্রায় অবিকল সেইপ্রকার। প্রভেদ এই যে, প্রাচীন যুদ্ধের রথ সকল একতলা হইত। রথারোহীর পদমধ্যাদ্বারা ইহাতে এক হইতে আটটা পর্য্যন্ত ঘোড়া ব্যবহার করা হইত। পুরু সমস্ত রথেই চারিটা করিয়া ঘোড়া ছিল। প্রত্যেক রথের উপর ছত্রজন করিয়া লোক ছিল। ইহাদের মধ্যে দুইজন ধনুর্বাণধারী, দুইজন অশ্বধারী এবং অবশিষ্ট দুইজন চালক বা সারথি। প্রয়োজন হইলে সারথিরাও অস্ত্রধারণ করিত। প্রত্যেক হিন্দু পদাতিক সৈন্তের নিকট তরবারি ও ঢাল থাকিত। এতদ্ব্যতীত তাহারা বল্লম বা ধনুক ব্যবহার করিত। সে সময় ধনুকের দৈর্ঘ্য ঘোড়ার দৈর্ঘ্যের সমান ছিল। বাণ সকল ছয় হাতের কম হইত না। তীর চালাইবার সময় ধনুকের এক প্রান্ত ভূমিতেল রক্ষা করিয়া বাম পদ দ্বারা চাপিয়া ধরা হইত। এই বাণ সকল এমন তীক্ষ্ণ হইত এবং প্রকারে যেরূপে সাহিত ত্যাগ করা হইত যে, অতি

উৎকৃষ্ট বর্ষা এবং ঢালও অনায়াসে ভেদ করিয়া জেলিত। প্রত্যেক হিন্দু অশ্বারোহী সৈন্তের নিকট দুইটা করিয়া বল্লম এবং একটা ঢাল থাকিত।

আলেকসন্দর হিন্দু নরপতির সৈন্ত পরিবেশ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিলেন যে, সমুদ্র ভাঙ্গ হইতে আক্রমণ করলে বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। তিনি একদল অশ্বারোহীকে বিপকের বামপার্শ্ব আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। তিনি স্বয়ং তাহাদের পশ্চাতে রহিলেন। এই সময় একদল গ্রীক সৈন্ত যিশুর ঘাট হইতে নদী পার হইয়া হিন্দুদের পশ্চাত্ত গ আক্রমণ করিল। এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া হিন্দুদের উভয় বাহুর সেনারা বিশেষ সংকল্প হইয়া হস্তী সৈন্তের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহাতে একটা গোলোযোগ উপস্থিত হইল। হস্তীযুগ হিন্দুসৈন্তের মধ্যে গবেশ করিতে চাহিল। মাহতেরা তাহাদিগকে গ্রীকদিগের মধ্যে ঢালাবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহারা গ্রীকদিগের স্তম্ভীকরণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া অতি ভীষণ বেগে হিন্দু সৈন্তের মধ্যে প্রবেশ করিল। পুরু স্বয়ং স্বীয় ছত্রভঙ্গ সৈন্ত দগকে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। গ্রীকদিগের মতে, মহারাজা পুরু বিশাল বাহিনী একরূপে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হইয়া গেল। গ্রীকদিগের হতাহতের সংখ্যা ১৬০০ এর অধিক হইল না।

আমরা কিন্তু যুদ্ধের এই বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বৈদেশিকের লিখিত ভাষ্যত ইতিহাসের অনেক স্থানে আমরা এই ভাবের কাহিনী পাঠ করি। যে স্থানে বিদেশীয় ও দেশীয়ের মধ্যে যুদ্ধ

অভিনয় হইয়াছে সেই স্থানেই দেশীয়ের সংখ্যা। শিদেশীয়ের ১০:১২ ভাগ। অবশেষে দেশীয়ের সম্পূর্ণ পরাজয়, রাজার রাজ্যের দেশী হত এবং আহত; অথচ বিদেশীয়ে হতাহতের সংখ্যা অতি নগণ্য। উপরোক্ত যুদ্ধের বর্ণনাও কি অনেকটা এই প্রকার নয়? পাঠক দেখিয়াছেন, হিন্দু সৈন্তের সংখ্যা গ্রীক সৈন্ত অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। মহারাজ পুরু বীরত্বের জন্য আলেকসন্দরের পর্য্যন্ত প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে গ্রীকদিগের বীরত্বের কথা জানিতেন না, এমন নহে। একদল স্থলে ইহা কখনও সম্ভব নয় যে, তিনি যুদ্ধস্থলে একদল কাপুরুষকে ধরিয়া আনিয়াছিলেন। হয় হিন্দু কাপুরুষ ছিলেন, কিংবা তাহারা সংখ্যায় খুব অল্পা ছিলেন। আর যদি তাহারা গ্রীকদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় প্রায় চারিগুণ অধিক ছিলেন, তাহা হইলে পারস্য নিশ্চয়ই অল্পপ্রকার হইয়াছিল। যে দিক দিয়াই আমরা ইহার বিচার করি না কেন, গ্রীকদিগের বর্ণনা যে সত্য নহে, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

হিন্দু সৈন্ত পলাইল বটে, কিন্তু পুরু একা দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বন্দী হইলেন। সেই অবস্থায় যখন তাহাকে গ্রীক পত্নির নিকট আনয়ন করা হইল, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "আপনার সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা কঠব্য?" মহারাজ পুরুর সর্বাঙ্গ ক্রিয় প্রাবিত, চারিদিকে ক্ষত চিহ্ন। কিন্তু তাহার হৃদয় তখনও পর্য্যন্ত অদম্য ভেজে পূর্ণ হইল। তিনি গ্রীবা উন্নত করিয়া কহিলেন, "আমি আপনার বন্দী হইলেও ক্ষত্রিয় নরপতি। আপনি হিন্দু ন'ন বটে, কিন্তু আপনি বীর, এই জন্য আপনাকে আমি ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করি। সেই জন্য আমার বিশ্বাস, একজন ক্ষত্রিয় নরপতি অপর একজন ক্ষত্রিয় নরপতির সহিত যে প্রকার ব্যবহার করেন, আমি আপনার নিকট ঠিক সেই ব্যবহার আশা করি।"

আলেকসন্দরের সত্যসদেয়; একজন পরাজিত বন্দীর মুখে এইরূপ ভেজের কথা শুনিয়া বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এই কথা শুনিয়া গ্রীক বীর যখন সহসা পাশ্রোথান করিয়া পুরুকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ

করিলেন এবং বীর সিংহাসনের উপর স্থাপিত করিলেন, তখন চারিদিকে অশ্রুধারা পড়িয়া গেল।

এই ঘটনার পাশ্চাত্য ইতিহাস লেখকেরা আলেকসন্দরকে শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। কারণ, এ প্রকার ঘটনা তাহাদের ইতিহাসে খুব বিরল। কিন্তু আমাদের দেশে এমন ঘটনার কোনও অভাব নাই। আমাদের দেশের রাজারা অতি প্রাচীন কাল হইতে পরাজিত বিপক্ষের সহিত এই প্রকার ব্যবহারই করিতেন।

এই যুদ্ধের পর আলেকসন্দর দুইটি নগর স্থাপিত করেন। যেখানে পুরু পরাজিত হইয়াছিলেন, সে স্থানে 'নিকট' নামক এক নগর সংস্থাপিত হয়। আর যে স্থানে তিনি বিগ্ম নদী পার হইয়াছিলেন, তাহার প্রিয় অর্থ প্রাণত্যাগ করিয়াছিল তথায় এক সহৈর স্থাপিত হয়।

ইহার পর তিনি পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া কয়েকজন হিন্দু নরপতিকে পরাজিত করেন এবং নির্বিবাদে চেনাব নদী শতক্রম করেন। তৎপরে তিনি রাবি পার করেন। এই স্থানের অধিবাসীরা গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আর কলহ উপস্থিত হওয়াতে আলেকসন্দর অনায়াসে তাহাদিগকে দমন করেন। ইহার পর তিনি বিগ্ম নদী তটে উপস্থিত হন।

গ্রীক ইতিহাস লেখকগণের মতে, এই স্থানে গ্রীক সৈন্ত একত্র সম্মিলিত হইয়া আলেকসন্দরের নিকট উপস্থিত হয় এবং আর অধিক অগ্রসর হইবার সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। আলেকসন্দর তাহাদিগকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু আর অগ্রসর হইতে তাহারা কোনও যতে স্বীকৃত হইল না। আলেকসন্দর এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তিন দিন পর্য্যন্ত কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। চতুর্থ দিন যখন তাহার জ্যোতিষীদের তাহাকে বলিলেন যে, আর অগ্রসর হওয়া মঙ্গলকর নহে, তখন তিনি বাধ্য হইয়া শান্ত ভাব ধারণ করিলেন। সেইদিনই তিনি সৈন্তদিগকে ফিরিবার আদেশ দিলেন। (স্ট্র্যেবোর গ্রীঃ পৃঃ ৩২৬)। তাহার বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ তাম্র বিয়াসের ভায়ে দ্বাদশটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে সকলে বিজয়ের পূর্ব ভায়ে উপস্থিত হই-

লেন। এইখানে আলেকসন্দর সমস্ত সৈন্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। একভাগ সৈন্য প্রায় ২০০০ নৌকার সাহায্যে সমুদ্র পর্যন্ত গমন করিলে। অপর ভাগ আলেকসন্দরের অধীনে নদীর দুই কুলের পথে ঐ সকল নৌকার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলে। অক্টোবর মাসে গ্রীক সৈন্য এইভাবে কূচ করিল। পঞ্চম দিবসে গ্রীক সৈন্য বলিম্ ৬ চিনাবের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কথিত আছে, এইখানে তাঁহাদের কয়েক খানি বজ্রা ডুবিয়া যায়। পাঠক শ্রবণ রাখিবেন যে পঞ্চাদশ সমস্ত নদীই তখন অজ্ঞাপথে প্রবাহিত হইত। এই ভয়ঙ্কর অজ্ঞ প্রায় ২০০০ বৎসর পরে আলেকসন্দরের ফিরিয়ার সঠিক পথ জানা আমাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পশ্চিমমুখে তিনি মলয় নামক এক অতি পরাক্রান্ত পার্শ্বভ্য জাতিকে জয় করেন। ইহার প্রায় ১০০০০০ সৈন্য লইয়া গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। নানা কারণে তাহাদের মধ্যে আত্ম বলহের ক্ষুদ্রপাত হয় এবং অবশেষে কয়েকজন প্রধান ২ কর্ণধারী আসিয়া গ্রীকদিগের সহিত মিলিত হয়।

এই মলয়দিগের বিরুদ্ধে আমরা গ্রীকদিগকে অতি অল্পতর বীরত্ব প্রকাশ করিতে দেখি। ৫০৬০ হাজার মলয়কে সামান্য ২৩ হাজার গ্রীকেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে কচুকাটা করিয়া ফেলিয়াছিল। এই ইতিহাসের লোক অবশ্য গ্রীসের লোক। এইখানে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল। একবার এক চিত্রকর এক খানি চিত্রে দেখাইয়াছিলেন যে, একজন মদ্যুচ্ছ নিরস্ত্র অবস্থায় এক অতি ভীষণ সিংহকে পরাভূত করিতেছে। সমস্ত দর্শকই চিত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঘটনা ক্রমে এক সিংহী একটি শাবক লইয়া সেই পথে যাইতেছিল। সে ঐ চিত্র দেখিয়া তাহার শাবকটিকে বলিল “যদি চিত্রকর একজন আমাদের স্বজাতি হইত, তাহা হইলে চিত্র ঠিক বিপরীতভাবে চিত্রিত হইত।” এই কথার সার্থকতা আমরা ইতিহাসে অনেক সময় দেখিতে পাই।

ইহার পর গ্রীকেরা সিন্ধুদেশে প্রবেশ করে আলেকসন্দর এই স্থানের অধিবাসীদিগকে ও তাহাদের আচার

বাবহার দর্শনে অভিযয় বিম্বিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অশ্বাশ্রয়ী মৃত্যু আদৌ ছিল না। শতকরা ৯৪২৫ জন লোক ১২০ হইতে ১৩০ পর্যন্ত বাঁচিলেন। মাদক দ্রব্য কেহই ব্যবহার করিতেন না। দেশে শূন্য ও রৌপ্যের খনি অনেক ছিল, কিন্তু সে বিষয় সম্রাট কাহারও স্পৃহা ছিল না। অতি সামান্য দ্রব্য দ্বারা তাঁহারা ক্ষুধিত করিতেন। ভারতের অজ্ঞাত সমস্ত স্থানে ঐ সময় ক্রীতদাস রাখিবার কথা ছিল বটে কিন্তু প্রাচীন সিদ্ধিরা এট প্রথাকে অস্ত্রের সহিত যুগ্ম করিতেন। সমস্ত দেশের মধ্যে আইন কাছন বা আদালত ও পুত্রিণের কোনও অস্তিত্ব ছিল না, কারণ দেশের মধ্যে অত্যাচার কার্য বাড় একটা খতি না।

ঐ সময়ে সিদ্ধির মোহানার নিকট ‘পটল’ নামক এক শহর ছিল। ঐ স্থানের নরপতি দিনাযুদ্ধে গ্রীক রাজের অধীনতা স্বীকার করেন। আলেকসন্দর এই স্থানে উপস্থিত হইয়া এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করাইলেন।

এইখানে তিনি তাঁহার সমস্ত সৈন্য তিনভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশ কান্দাহার ও সিন্ধানু (প্রাচীন শকহান) হইয়া পারস্ত অভিমুখে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় অংশ একজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে আরব সাগর ও পারস্ত উপসাগরের মধ্যে দিয়া পারস্তে প্রেরিত হয়। তৃতীয় অংশকে তিনি শ্রয়ং লইয়া গিড্রোসয়ার (আধুনিক বেলুচিস্তান) তিতর দিয়া পারস্ত অভিমুখে গমন করিলেন (খ্রী. পূ. ৩২৪)।

আলেকসন্দর খ্রী. পূ. ৩২৭ সালের শেষ মাসে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া সেন্টের মাসে ভারতে প্রবেশ করেন। তাহার পূ. খ্রী. পূ. ৩২৫ সালের অক্টোবর মাসে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। শ্রবণে তিনি সর্বসমেত ২৫ মাস কাল এই দেশে আস্থান করিয়া ছিলেন।

ভারতে অবস্থান করাজীন তিনি এই দেশের কয়েক স্থানে কয়েকটি শহর স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত দুই একস্থানে তিন তাহার অদেশীয় স্কাটপ্ বা গণের নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার আড়াই বৎসর পরে তিনি ব্যাণলন সহরে প্রাণত্যাগ করেন।

এই ঘটনার পর কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষ হইতে গ্রীক অধিকার বিলুপ্ত হইয়া যায়। অনেকের মতে গ্রীক অধিকার লুপ্ত হইবার পরও আলেকসন্দরের পরিত্যক্ত গ্রীক সৈনিক পুরুষেরা এই দেশে থাকিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে তাহারা এই দেশের লোকের মধ্যে মিশিয়া যায়। ষাটতম বর্ষের ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠক জানেন, ভারত-নাশী মধ্য যুগের নিদেহী জাতি মিশিয়া গিয়াছে। গ্রীক জাতিরা এদেশে বাস করিতে আমাদের মধ্যে নপতি বিজ্ঞার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে গ্রীসের লোক শ্রুতকার শিল্প ও স্থপতি বিজ্ঞার লক্ষ্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। অপরদিকে গ্রীকরাও আমাদের নিকট হইতে জ্যোতিষ, দর্শন ও ধর্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান এবং ক্রমে ক্রমে এই সকল বিজ্ঞা তাঁহাদের নিকট হইতে যুরোপের সর্বত্র প্রচারিত হয়।

কিন্তু কেহ বলেন, আলেকসন্দর আদৌ ভারতবর্ষে পরিদর্শন করেন নাই; কারণ তাঁহার অভিযানের কথা ভারতের সমসাময়িক বা পরবর্তী কোনও পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইতে সাহস করি না। ইতিহাস লিখিবার প্রথা এদেশে কখনও ছিল না। বিশেষ আলেকসন্দর বিদগ্ধী, বিদগ্ধী ছিলেন এবং তাঁহার নিকট পদে পদে পরাজিত হওয়ার হিন্দুরা এসব কাহিনী লিপিবদ্ধ করা আবশ্যিক মনে করেন নাই। হর্ষচরিত সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক। ইহাতে মহাশয় হর্ষবর্দ্ধনের জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, যতদিন পর্য্যন্ত হর্ষ হিন্দু ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত কবি তাঁহার কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিবার পর কবি তাঁহার বিষয়ে আর কিছুই বর্ণনা করেন নাই। অশোক ও কনকের দ্বারা পরাক্রান্ত নরপতি ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দুধর্ম আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি কিন্তু তাঁহার কাহিনী আমরা কোথাও দেখিতে পাই না।

আলেকসন্দর যে সময় তক্ষশীলার অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন মগধের সিংহাসনে মহাপদ্ম নন্দ উপবিষ্ট ছিলেন। প্রমত্ত নামক জনৈক যুবক মগধের অতি

নিকট আত্মীয় ছিলেন। কোনও কারণে বশত তিনি নৃপতির কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইলেন। তিনি প্রাণত্যাগ মগধ ত্যাগ করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে গমন করেন এবং আলেকসন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি গ্রীক রাজাকে মগধ আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আলেকসন্দর তাঁহার নিকট মহাপদ্মের সৈন্যাদি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ অবগত হন। সে সময়ে নাকি মগধপতির অধীনে প্রায় ১০ লক্ষ সৈন্য ছিল। অনেকে বলেন, এই বিশাল বাহিনীর কথা শ্রবণ করিয়াই আলেকসন্দর মগধ রাজা আক্রমণ করিতে সাহসী হইতে নাই।

ঐ সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে বহুসংখ্যক দাবীন নর-পতি রাজত্ব করিতেন। ইহারা সর্বদা পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ করিতেন। একতা তাঁহাদের মধ্যে আদৌ ছিল না। তাঁহারা যদি একত্র মিলিত হইয়া আলেকসন্দরকে আক্রমণ করিতেন তাহা হইলে হয়ত এই অতি-বানের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইত।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত

সমস্যা।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলেন কলিকাতা পহুঁচিয়াই কলেজ হাসপাতালে চাকুরী লইয়াছে। চাকুরী তাহার করিবার ইচ্ছা ছিল না, হাতে লোক নাই বলিয়া প্রিন্সিপ্যাল তাহাকে খবর দিয়া আনাইয়াছেন; ছুটি মাসের জন্য কাজ করিতে হইবে মাত্র।

শৈলেনের একটা স্পেসিফিক ক্যামেরা ছিল। হাসপাতালের কার্য শেষ করিয়া বিকালে সেটা হাতে লইয়া শৈলেন চুর্নাদাস বাবুর বাড়ী চলিল।

বাড়ীর নীচের হলে পা দিয়াই শৈলেন দেখিল, তিতরের বারান্দার নীচে আশা তাহার রংএর বাজ লইয়া বসিয়া এক খানা ছোট ক্যান্ডুলাসে একটা পদ্ম ফুল আঁকিতেছে, আর পারুল পিলায়েটস দিয়া বাহিরে কাড়িয়া খুব মনোযোগের সহিত তাহা দেখিতেছে।

দুখটি শৈলেনের নিকট বড়ই জ্বলন্ত শোথ হইতেছিল। সে ধীরে ধীরে হলের ভিতর অগ্রসর হইয়া—জানালার পর্কা তুলিয়া তাহার প্লেটভর ক্যামেরায় দুখটি আটকাইয়া ফেলিল।

তারপর নীরবে উপরে চলিয়া গেল। শৈলেনকে দেখিয়া বকুল কলরব করিয়া উঠিল—“বাঃ, শৈলেন দা, কে, কে আসিলেন? আজ ফটো তুলিলেন নাকি?” শৈলেন ব্যাগটা সাবধানে এক কোণায় টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—“বাঃ বকুল দি যে! কে আসিলেন?” বকুল হাসিয়া কুটপাট হইল।

শৈলেন বলিল—“আমি কোথায় গিয়াছিলাম? তোমরাইতো কালী গেলে, আসিয়াতো ডাকিয়াও একবার জিজ্ঞাসা করিলে না?”

তাতা দৌড়িয়া বাইরা তাহার বড় দিদি কে খবর দিল। শৈলেনের আগমন বার্তা পাইয়া পারুল উপরে আসিল; সে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভাল আছেন, শৈলেন দা।”

শৈলেন বলিল—“বড় ভাল নই।”

“কেন? কি হইয়াছে?”

শৈলেন—“ভূমি আগে বল, কেন ভাল থাকবো?”

পারুল—“আপনারা ডাক্তার, কত নিয়ম পত্রের বক্তৃতা করেন, উপদেশ দেন, আর নিজের বেলায়ই ভাল থাকিবেন না?”

শৈলেন—“ডাক্তারী করিতে লোকের অন্তঃস্থ বিষয় হইবে বলিয়া—এবং চিকিৎসা পত্র করিব বলিয়া।”

পারুল—“তবে কি অন্তঃস্থ বিষয় মানুষের ধর্ম?”
“আমার তো মনে হয় তাই—শরীর ব্যাধিমন্দির।”
বলিয়া শৈলেন হাসিল।

হাসিতে হাসিতে শৈলেন বলিল—“নগেনকে কোথায় গমন করিলে?”

পারুল গম্ভীর ভাবে শাস না ফেলিয়া বলিতে লাগিল—“তার অন্তঃস্থ, কালীতে আছেন, প্লেগ হইয়াছিল। বাবা যোগ-জীবন ব্রহ্মচারী চিকিৎসা করিতেছেন। শরীর হইতে অনেক রক্ত ফেলিয়া দেওয়ার তিনি খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন।”

শৈলেন জিজ্ঞাসা করিলে—“সে খানে আর কে আছে, তোমরা কিরূপ অবস্থা দেখিয়া আসিলে?”

পারুল বলিল—“তিনি আমাদের সঙ্গে আসেন নাই। পর দিনও না পঁছায় এবং কোন চিঠি না পাওয়ার বাবা urgent টেলি করেন; তাতেও কোন উত্তর আসে না। আমরা আসিবার দিন তাঁহার শরীরে তর্কাতর্ক হইয়াছিল—তাই টেলিগ্রামের উত্তর না পাওয়ার আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম না। বাবা ঠাকুর মার নিকট চিঠি লিখেন ও টাকা পাঠান। পাঁচ দিন পর ঠাকুর মার চিঠির উত্তর আসিল—নগেন বাবুর প্লেগ হইয়াছিল—ব্রহ্মচারী রক্ত মুকণ করিয়া প্লেগ ধামাইয়াছেন—এখন আর আছে—শরীর বড় দুর্বল, ব্রহ্মচারী ঔষধ দিতেছেন—এবং বলিতেছেন আর ধীরে ধীরে যাইবে। অন্ততঃ এক মাসের কমে শরীর সুধরাইবে না। প্রয়োজন হইলে রক্ত আরও ফেলিয়া দিয়া তাজা রক্ত শরীরে প্রবেশ করাইতে হইবে। কাল বিধু বাবুকে তাঁহার শুশ্রূষার জ্ঞান পাঠান হইয়াছে। ডাঃ বাক্চির নিকটও বাবা চিঠি দিয়াছেন।

শৈলেন চিন্তিত হইল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—“তোমরা কোন তারিখে কালী হইতে রওনা হইয়াছ?”

পারুল—“৭ আগষ্ট—সোমবার।”

শৈলেন—“নগেনের বেদনা কোন সময় হইয়াছিল?”

পারুল—“বিকালে তিনটা চার টার মধ্যে ব্রহ্মচারীর নিকট গিয়াছিলেন, সেই খানেই তাঁহার বেদনা হয়। শৈলেন দা, আশ্চর্য্য হইবেন, ব্রহ্মচারীর কথা শুনিলে—তিনি নাকি নগেন বাবুর দিকে চাহিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াই বসিলেন, তোমার মহাশুরু তোমার উপর বিরক্ত,—তোমার অভ্যন্তরীণ সজ্জা হইবে না! নগেন বাবু কলিকাতা আসিবেন বলিলে ব্রহ্মচারী বলেন—আজ কলিকাতা যাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব! এইরূপ অনেক আশ্চর্য্য কথা। এখন দেখিতেছি, হয় ব্রহ্মচারীই পোপনে বুদ্ধকৃৎ দেখাওয়ার জ্ঞান কিছু করিয়াছে, নয় আর কি মিলিত?”

শৈলেন বলিল—“ব্রহ্মচারী মহাপুরুষ। তাঁহার কথা সত্য। ঠিক ঐ সময় ৭ই আগষ্ট সোমবার নগেনের

পিজা তাহার উপর খুব দুরীকা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আমি তাহার সম্মুখে ছিলাম। মগেনের সময় ভাগ নহে। এই সময় আমার তাহার নিকট য'ওয়া উচিত ছিল—কিছু কি করি?”

ব্রহ্মচারীর রক্ত চিকিৎসার ও কারলীর রাজ কুমারের কথা পাকুলের বলিবার বড় আগ্রহ ছিল; শৈলেনের মূখের ভাব দেখিয়া পারিল না।

পাকুল বলিল—আপনি আর কেন যাইবেন? কিছু বাবুই আছেন। ঠাকুর মাও সেট বাড়ীতে আসিয়াছেন। সে বাড়ী যে আমার ছ মাসের জন্ম ভাড়া করিয়াছিলাম; না হইলে প্রেগের রোগী লইয়া উপায় ছিল না।”

শৈলেন অনেক কথা বলিবে, পাকুলও শৈলেনের নিকট অনেক কথা বলিবে—উভয়ের এক্সপ ইচ্ছা ছিল। নগেনের বিপদ বার্তা উভয়েরই অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। উভয়ই চুপ করিয়া বহিল।

এই সময় গৃহিণী আসিয়া শৈলেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“কবে আসিলে বাবা?”

শৈলেন—“পরশ আসিয়াছি। আসিয়াই কলেক হাসপাতালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। এসিষ্টেন্ট বিদ্যার নিয়া গিয়াছেন, আজ একটু অবসর পাওয়াছি—তাই আসিতে পারিলাম।”

গৃহিণী বলিলেন—নগেনের কথা শুনিয়াছ তো! আমার ইচ্ছা ছিল না, তাকে রাখিয়া আসি। তার ঐ কুসংস্কার—ব্রহ্মচারীর কথায় ভুলিয়া—

পাকুল বাধা দিয়া বলিল—“না মা, ওই ব্রহ্মচারী বাবা নাকি মহাপুরুষ—এই না শৈলেন দা বলিলেন।”

শৈলেন গৃহিণীর নিকট পুনরায় সকল কথা বলিল।

গৃহিণী বলিলেন “এখন বাবা যদি তাহাকে আরোপ্য করিয়া দেন।”

এইবার গৃহিণী ঈশ্বর হাসিয়া বলিলেন—“শৈলেন, বাবা এবার কিছু কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি। বাবা বিবেচকের জাতি নষ্ট করিয়া দিয়া আসিয়াছি।”

শৈলেন বলিল—“সে কেমন?”

তখন পাকুল শাধা পল্লব বিস্তার করিয়া পুখুপু

পুখুপুপে বিবেচকের দর্শন ও স্পর্শন কাহিনী বিবৃত করিল।

শৈলেন হাসিয়া বলিল—“বিবেচকের যে জগতের সর্ব জাতিধর। তাহার জাতির কি আর কয় আছে?” হাসিয়া গৃহিণী কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

শৈলেন বলিল—“তবে আজ আসি।

পাকুল—“বিকালে চা না খাইয়া এতদিন পরে বাটতে পারিবেন না।”

শৈলেন—“মনটা বড় খারাপ হইয়াছে, তোমাদের সেই গানটা যদি শুনাইয়া দাও বতস্পন বল থাকিতে পারি। মনে এখন একটু শান্তির প্রয়োজন।”

“তবে বরাবর আসিবেন কি?” বলিয়া পাকুল বকলকে লইয়া গিয়া অগেঁন খুলিল।

* * * * *

শৈলেন মুগ্ধ চিত্তে গান শুনিল। তারপর চা পান করিয়া চলিয়া গেল।

যাইবার সময় পাকুল অঙ্গণ করাইয়া দিল “মনে থাকে যেন।”

শৈলেন বলিল—“পরের চাকরী। দেখা যাবে।”

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

আজ চৌদ্দ দিন। নগেন একভাবে শয্যায় শুইয়া আছে। সে যখনই চক্ষু মেলিয়া চায়, তখনই যেন জীবন্ত স্বপ্ন তাহার চোখের উপর খেলা করিতে থাকে। সে কিছু দিন পূর্বে ঠাঁরে আবুহোসেনের অভিনয় দেখিয়াছিল। তাহার মনে সে অভিনয় কিছুদিন বেশ আনন্দ দিয়াছিল—আজ কয় দিন যাবৎ যেন তাহার তাহার নিকট প্রত্যেক সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নগেনের অঙ্গ ছাড়িয়াছে কিন্তু ভাল করিয়া কথা বলিবার কি পার্থ পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা হয় নাই। চিৎ হইয়া নিশ্চক্ষে শুইয়া থাকে, আর সময় সময় তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট কিশোরীর প্রদত্ত চামচে দেওয়া বেদনানার রস ও ঈষৎ গরম দুগ্ধ পান করে। দুঃখনীও এক ঘুটে রোগীর মূখের দিকেই তাকাইয়া আছে। যখন রোগী চক্ষু মেলিয়া চাহিতেছে, তখনই সে চামচে করিয়া বেদনানার রস তুলিয়া দিতেছে। শরীর খামিলে শরীরের

যাম মুছাইয়া কাপড় টানিয়া গায়ে তুলিয়া দিতেছে। বাতাসের ঐয়োজন হইলে পাখায় বাতাস দিতেছে। স্নেহিতে যেন সকল কার্য্য হইতেছে।

হুর্গাদাস বাবু য়া এবং বিধু বাবুও যন্ত্রের ক্রটি করিতেছেন না; তাঁহারা রোগীর পথ্য প্রস্তুত কার্য্যে ও বাহিরের নানা যোগাড়ে ব্যস্ত। মহেশ ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ভীত প্রকৃতির লোক, সে মাঝে মাঝে বাহির হইতে সংবাদ লইয়া চলিয়া যায়। ব্রহ্মচারী কদাচিত আইসেন। বিধু বাবুকে প্রতি দিন ৮টায়া যাইয়া রোগীর অবস্থা তাঁহাকে জানাইয়া আসিতে হয়।

হুঃখিনীকে বৃদ্ধা কৃপার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। কানীধামের অজ্ঞাত কুলশীলা কিশোরী ও যুবতীদিগের প্রতি বৃদ্ধার সে যত্ন তাহা হুঃখিনীরও ছিল। মহেশ ভট্টাচার্য্য যখন উপায়হীন হইয়া শুশ্রূষাকারীর অভাবের কথা বৃদ্ধাকে প্রথম দিন বলিয়া ছিল, বৃদ্ধাই তখন তাহাকে বলিয়াছিলেন “টাকা হইলে কানীতে এমন লোকের অভাব হইবে না।” তারপরেই মহেশ এই যুবতীকে লইয়া উপস্থিত হয়, স্ত্রতরাং বৃদ্ধা তখন ব্রহ্মচারীর মা সুস্তোমের কোন বিশেষর অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন না। তাহাকে ঘূণার চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই দুই সপ্তাহ ধরিয়া তাহার ব্যবহারে ও সেবায় তাহার প্রতি বৃদ্ধার কৃপার ভাব বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিধু যখন প্রথম বৃদ্ধার নিকট যুগতীর পরিচয় চাহিয়া ছিল, তখন বৃদ্ধা বিধুর দৃষ্টিকে ভয় পাইয়া বলিয়াছিলেন “ওতে আমাদের কি দরকার বাবা, আমাদের কাজ হউক, স্নেহ দিলে—কঠিন, যাবদ্ব্যক রোগ,—লোক পাওয়া দায় হইবে। তখন খাটুনি বাড়িবে তোমারই বাবা বেশী।”

বিধু বুঝিয়াছিলেন, এবং বৃদ্ধের সন্দেহে লজ্জিত হইয়াছিলেন। ইহার পর বিধু এ সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও নিকট উত্থাপন করেন নাই। যুবতীর প্রতি তাহারও দৃষ্টি ঐতিহ্য ধারাই চলিয়াছিল।

বিধুর অনেক দিন ইচ্ছা হইয়া ছিল, হুঃখিনীর সহিত আলাপ করে, তাহাকে সহৃদয়তা দিয়া নারিকীর পথ্য হইতে উদ্ধার করে, এবং কালকাতা লইয়া গিয়া অমাণ আশ্রমে তাহার স্থান করিয়া দেয়।

পতিতার জীবনের ভবিষ্যৎ চিত্র ভাল করিয়া নাবুঝাইয়া দিলে, যৌবনোন্মুখ কিশোরীকে ললোভন হইতে রক্ষা করা যে অসম্ভব কার্য্য, তাহা বিধু বুঝিত, তাই দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা তাহার মনে ধর্ম্মভাব প্রদান করিবার অবসর সে খুঁজিতেছিল। বিধুর সেরূপ অবসর যথেষ্ট থাকিলেও হুঃখিনীর তাহা ছিল না। সে রোগীর শয্যা ছাড়িয়া অতি অল্প সময়ই উঠিত। বাহ্যি প্রত্যাশ ও গান-আহ'রের সময় ব্যতীত আর কোন কার্য্যে তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইত না।

বিপ্রহরে নগেনের তজ্জার ভাব দেখা গিয়াছিল। বৃদ্ধাও আহা করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। অবসর বুঝিয়া বিধু রোগীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া হুঃখিনীকে বলিল—“তুমি নিয়ত অবিশ্রাম খাটু হুঃখিনী, একটু rest নাও। আমি পাখা বন্ধছি। বসো তুমি ও দিকে একটু।”

হুঃখিনী উঠিল না। একটু পাছ ফিরিয়া বসিল মাত্র।

বিধু বলিল—“তুমি কি লেখা পড়া জান?” হুঃখিনী নীরবে বসিয়া রহিল। উত্তর করিতে পারিল না।

বিধু আরও কয়েকটা পাইল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু একটরও উত্তর দিল না। বিধু একটু নিরাশ হইল বটে কিন্তু কথা বলিতে নিরন্তর হ'ল না।

বিধু হুঃখিনীকে শুনাইয়া বলিতে লর্শগল “জগতে পাপীকে ঘৃণা কে না করে? পাপী যখন তাহার আশ্রয় পাপের আশ্রিত্য প্রত্যাক করে, তখন সেও নিজের প্রথম জীবনের হুঃখিয়ার জন্য repent করে থাকে, নিজকে বিকার দেয়, কিন্তু তখন তাহা too late-ও সময় দিলে তো তা আর জীবনের কোন উপকার আসে না। সময়ে নিজের mistake সম্মুখে চলাই উচিত। আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক, পাপকে ঘৃণা করি, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করি না। যদি এখনও ভুল তেজে সমাজের বন্ধে আশ্রয় লও, Rescue house বা orphanage এ তোমার স্থান করে দিতে পারি, জীবনকে সুপরিচালিত করবার সেখানে বিস্তর উপায় আছে। হঠাৎ কার্য্য, সেলাইর

কার্য্য, ধর্ম্মবিশ্বাস, সেবা ও শ্রম শিক্ষা করিয়া সমাজে good life lead কতে পার। পাত্তার জীবনের অল্প পরিণাম আর তোমাকে প্রত্যক্ষ কতে হয় না।—”

বিধু দুঃখিনীর দিকে চাহিয়া ধামিরা গেল।

দুঃখিনীর হৃদয় গভীর অশ্রু বড়িতেছিল।

বিধু মনে মনে বুঝিল “যখন অল্পশোচনা এসেচে তখন উদ্ধারের চেষ্টা হুস্তেট্টা হইবে না।”

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহিনী দুর্গাদাস বাবুকে বলিলেন—“এতগুলি খরচ-পত্র হইবে, ইহাতে কি মেয়ের মত নেওয়া প্রয়োজন না। পনের বোল বৎসরের, মেয়ে, ছেলের মতো নয়!”

দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—“নিতে চাও নেও।”

গৃহিনী বলিলেন—“অবশ্য পাকুল আমার ভেমন মেয়ে নয়। তথাপি তার মত নেওয়া খুবই উচিত। আমি আজই তাহাকে এ সম্বন্ধে হুচর কথা লিখাসা করিয়া বুঝিব।”

যথাসময়ে গৃহিনী কল্লাকে অন্তরালে লইয়া কথা পারিলেন।

“যতীন বোস যে আমাদের খরচে আমেরিকা যাই-তেছে, তাকি তুই জানিস মা?”

পাকুল হাসিয়া বলিল—“তা আর জানি না? নগেন বাবুও তো বাটবেন কথা ছিল, তার কি হইল মা?”

মা বাললেন, “নগেনের ব্যারাম হইয়া গেল, সে আর এবার যায় কি করিয়া, এবার একজনকেই পাঠান হউক, ইহার অবস্থা দেখিয়া বরং পরে—আগামী বৎসর তাহাকে পাঠান বাইবে। যতীন বোসকে আমরা কেন খরচ দিতেছি, তাহাও তুই জানিস তো?”

পাকুল হাসিয়া বলিল—খুব ভাল জানি না; তবে শুনিয়াছি। তা মা, এ বিষয়ে বকুলের মতটা নেওয়া উচিত, আমি মনে করি।”

মেয়ের কথায় মূর গোল বাধিল। তিনি কথটা আর একটু পরিষ্কার করিবার জন্য বলিলেন—“ওকে কেন লিখাসা করিব? ও কি তোমার মত বলিবে?”

পাকুল—“ও আমার মত কেন বলিবে, ও তারই মত বলিবে।”

মা হাসিয়া বলিলেন—তার মতের প্রয়োজন?”

পাকুলও হাসিয়া বলিল—“তবে আমার মতের কি প্রয়োজন হইবে?”

মা—“এখন তোমার মতেরই প্রয়োজন?”

পাকুল হাসিয়া বলিল—“তুমি না পার বরং আমিই লিখাসা করিব।”

তাই—মা বুঝিলেন পাকুল পূর্বে ভুল শুনিয়াছে, এখনও ভুল বলিতেছে। তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিলেন “যতীনের সহিত তোমারই বিবাহের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বড় বোনের না হইলে কি ছোট বোনের বিবাহ হইতে পারে?”

পাকুলের মুখ চোখ লাল হইয়া গেল—সে কোন কথা বলিতে পারিল না।

মা মেয়েকে আদর করিয়া নিকটে টানিয়া লইয়া গামছা দিয়া গা মুছিয়া দিতে দিতে বলিলেন—“তুই কি তা শুনিস নাই?”

পাকুল সংক্ষেপে উত্তর দিল—“না।”

মা হাসিয়া বলিলেন—“তবে এখনতো শুনি—উত্তর দে।”

পাকুল হাসিয়া বলিল—“আমাদের বাবালায় একটা প্রবাদ আছে—”

মা বুঝিয়া বলিলেন—“না হয় কাল বলিস, চিন্তা করিয়াই বলিস।”

“আমি বকুলের মতই তোমাকে জানাইব মা।” বলিয়া পাকুল চলিয়া গেল।

বকুল তাহাদের পাঠের কোঠায় বসিয়া মৃণালিনী পড়িতেছিল আর হারমোনিয়াম বাজে আস্তে আস্তে তাহার গানের সুর ভাজিতে ছিল। পাকুল গিয়া কোন ভূমিকা না করিয়াই তাহাকে বলিল—“তোমার যে বিবাহ বকুল।”

সে এই মাত্র মুখের গিরিকায়র কথা শুনিই চিন্তা করিতেছিল, তেমনি মুখের স্রাব বলিল—বর তুমি নাকি দিদি?” বলিয়াই বকুল খুব একদম হাসিল।

পারুল হাসিয়া বলিল—কেন লো ?

“বড় বোনের বিবাহটাওতো হওয়া চাই—তাই জিজ্ঞাসা করিলাম ।”

পারুল বলিল—“বর যতীন মাষ্টার ।”

সার বে গুরু, গুরুর সঙ্গে, কি শিয়ার বিবাহ হয় ? গুরুর সঙ্গে গুরুর বিবাহ । ভূমিও আমার গুরু, তিনিও আমার গুরু, গুরুতে গুরুতে মিল ।” বকুল আবার হাসিল ।

পারুল নিরাশ হইয়া বলিল—“সে কি কখনও হয় ?”

বকুল—“হয় না, বলিয়াই কি তোমার মাথার ভারি মোট আমার মাথায় ফেলিয়া দিবে ?”

পারুল বলিল—“সে তো আর আজই নয়—তুই বছর পরে—সাহেব হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলে পরে ।”

বকুল বলিল—“ও সাহেব সুবা লরেন্স ফটর, হারুন অল রসিদ—আমার উপর এ অত্যাচার কেন ?”

পারুল ঠাট্টার স্বরে হাসিয়া বলিল—“তবে আপনি চান কি ?”

“আমি চন্দ্রশেখরও চাই না, গোবিন্দলালও না, মগেন্দ্র নাথও না, নবকুমারও না—চাই আমি হেমচন্দ্র—।” বলিয়া বকুল হার্মনিয়ামে গান ধরিল—

‘আমার তরে যে সপিয়ে দেহ,
আমার তরে যে সপিয়ে প্রাণ
তার তরে মোর আধি বরষিবে
এ বীণা তাহার গাইবে গান ।—’

পারুল আশা ছাড়িল না ।

বিকালে চাএর বৈঠকে পারুল তাহাদের কুঞ্জবনে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিল । শৈলেন এ প্রস্তাবে খুব সমর্থন করিল । যতীন মাষ্টারেরও মত লওয়া হইল । বকুল দিদির অঙ্গুগামিনী, স্তব্ধরাজ তাহার মত হইতে অবশ্যই রহিল ।

রবিবার ৩ টায় টালিগঞ্জ বাওয়া স্থির হইল ।

দান ও দয়া

ব্যক্তিবিবেকের নির্কুঙ্কিতা নিয়া নানাক্রম কিংবদন্তী প্রায় সব দেশেই কম বেশী রহিয়াছে । কবে কোন ব্যক্তি, যে ডালে বাসিয়া ছিল, সেই ডালেরই গোড়া কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাই নিয়া আমাদের যত রসিকতা ; এবং পাছে জিনিষটা লোকে বিস্ময় হইয়া যায়, সেই জন্যই বোধ হয় কালিদাসের মত একটা প্রসিদ্ধ নামের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে ।

বস্ত বা বিষয়ের পারস্পর্য্য যে ঠিক মত রক্ষা করিতে পারে না, ইংরেজী প্রবচন অনুসারে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়, ঘোড়াটাকে গাড়ীর সম্মুখে রাখবার জন্য । এখানে অবশ্যই ইঙ্গিত হইতেছে যে, কোনও এক নির্দোষ ব্যক্তি ঘোড়া দিয়া গাড়ী টানাটিতে গিয়া গাড়ীরাপছনেই ঘোড়াটাকে জুড়িয়া দিয়াছিল ; কিন্তু কোথায় কবে যে এই ঘটনা ঘটয়াছিল, তাহা কোন প্রামাণ্যিকই বোধ হয় জানেন না । এই রকম একটা উল্টা বুদ্ধির কথা, বুদ্ধিমানকে অরণ্য করাইয়া দিয়া সতর্ক করিবার জন্যই বোধ হয়, হোলির রাজা ঘোড়ার লেজের দিকে লাগাম লাগাইয়া থাকেন ।

কার্য্যকারণের পৌরোপর্য্য অক্ষুর রাখিয়া চিন্তা করিতে বা কাজ করিতে সকলেই সকল সময়ে পারে না । ভুল ভ্রান্ত হওয়া মানুষের স্বাভাবিক ; “মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ” । কিন্তু এইরূপ ভুল ব্যক্তিরই বিশেষ করিয়া হয় সাধারণ লোকে ইহাই মনে করে । কদাচিৎ দেখা যায়, কোন কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা নিকট শ্রেণীবিশেষের উপর নানা ভাঙিতে নির্কুঙ্কিতার বোঝা চাপাইয়া দিয়া থাকেন । যেমন, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নানাপ্রকার নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার কাহিনী যদিও অসংখ্য ব্রাহ্মণ বিক্ষুব্ধাও রচনা করিয়াছেন, তথাপি সেটা বোধ হয়, ধনীরাই মনস্তৃষ্টির জন্য । ধনী যখন সমাজে প্রাধান্য উপভোগ করেন, তখন দারিদ্র্যকে নিয়া প্রদরস করা অস্বাভাবিক নয় । ঠিক তেমনই তাঁত, জোলা প্রভৃতিকে নিয়া নানাক্রম রসের কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে । তার মধ্যে গৌর ভাগই ইহাদের নির্কুঙ্কিতা নিয়া প্রচিত ।

এইরূপে দেখা যায়, ঘটনার প্রকৃত ভঙ্গুরপ যে মান-সিক ব্যাধি, সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে সেটা অনিশ্চিত ব্যক্তি বিশেষ বা নিকট শ্রেণীবিশেষকে অতিক্রম করিয়া অস্ত্রে সংক্রামিত হয় না। অর্থাৎ সমাজের ধারা শ্রেষ্ঠ, যারা শিষ্ট, তাঁহাদের কার্যে বা বিশ্বাসে বা ধারণায় কোন গুরুতর নিকরুদ্ভিতা বর্তমান থাকিতে পারে, ইহা আমরা সহসা মনেই করিতে পারি না। বরং শিষ্টদের আচারই অস্ত্রের আদর্শ, শিষ্টদের বিশ্বাস ধারণাই অস্ত্রের অনুকরণীয় “মহাজনো যেন গত্যঃ স পশ্যঃ”। আমরা সহসা ভাবিয়াই উঠিতে পারি না যে, যাহারা সমাজের নেতৃস্থানীয় তাঁহারা আবার ভুল করিবেন কি করিয়া। অবশ্যই ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনও এক যুগে, কোনও এক সমাজে অতি বড় বিশিষ্ট ধারা, তাঁরাও অবস্থা বিশেষে এমন এক এক ভুল করিয়া বসেন, যার জন্য পরবর্তীদের যথেষ্ট ভুগিতে হয়। ধর্মের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট রহিয়াছে; কেমন না, সেখানে পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদিগকে সাধারণতঃ ভ্রান্ত মনে করিবেন, ইহাই যেন নিয়ম। রাষ্ট্রের ইতিহাসেও ভুল জ্ঞতির কথা রহিয়াছে। ইহার জন্য নথী পত্র খাটিয়া নক্সার বাহির করা নিম্নয়োজন।

ঐতিহাসিক যে এরূপ বিশিষ্টদেরও ভ্রান্তি ধরিতে পারেন, তাহার মধ্যে মনস্তত্ত্বের একটি রহস্য নিহিত রহিয়াছে। ভুল আমরা সেই সব লোকেরই দেখিতে পাই, যাদের চেয়ে নিম্নেদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকি। প্রাচীনদের চেয়ে আমরা অনেক বিষয়ই বড়, এই বিশ্বাস আমাদের রহিয়াছে বলিয়াই আমরা উহাদের ভুল দেখিতে পাই। যেখানে সে বিশ্বাস নাই,—যেমন হিন্দু সমাজে,—সেখানে নবীনদের সহস্র ভুল চোখে পড়িলেও প্রাচীনদের বাক্য ঋণীক্য, স্মরণ্য অজ্ঞান।

নিজের বেলায় ব্যক্তি যে ভুল ধরিতে পারে এবং তজ্জন্ত তাহার যে অনুশোচনা হয়, তাহার মধ্যেও ঐ একই নিয়ম। যে মুহূর্তে আমি ভুল করি, তার চেয়ে, যে মুহূর্তে আমি ভুল ধরি, সেই মুহূর্তের আমি শ্রেষ্ঠ। কোনও এক অবস্থা বিশেষের উর্দ্ধে যে উঠিতে পারে না, সে কখনও নিজের ভুল দেখিতে পায় না। শিশু বধন

যুবক হয়, তখনই শৈশবের ভুল তার চোখে পড়ে; যে চিরকালই শিশু থাকে, তাহার জগতে কোন পরি-বর্তন নাই।

বর্তমানে আমরা শিক্ষিত শ্রেণী সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিয়া আসিতেছি। আমাদের চিন্তা এবং কর্মের গতি একটা বিশিষ্ট ধারা অনুসারে চলিতেছে। সেটাকে শ্রেষ্ঠ মনে করাই আমাদের স্বভাব। আর একটা মান-সিক পরিবর্তন না হওয়া পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিবে। সুতরাং এখন যদি এমন দুঃসাহস কাহারও থাকে, যাহাতে সে আমাদের ভুল দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে শুধু যে মতভেদ হইবে, এমন নয়; নানা বিশেষণে তাহাকে বিশেষিত করিতে আমরা মোটেই নারাজ হইব না।

কিন্তু আমাদেরও ত সভা সমিতির ভিড়ের বাইরে, হুই এক মুহূর্ত অবসর জোটে। সে সময় যদি তार्কিক-দের জিজ্ঞাসাটা পরিত্যাগ করিয়া একটু বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে ভুল কি একেবারেই চোখে পড়িবে না?

বর্তমানে সভা সমিতি এবং ধবরের কাগজে যে সকল বিষয় নিয়া ব্যস্ততা, ব্যগ্নিতা, চিন্তাশীলতা এবং স্বদেশ প্রেম একাধারে ফুটিয়া উঠিতেছে, সেগুলিকে সাধারণতঃ দুইটা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। একদিকে দেখা যায় দেশের দুঃস্থ ও নিঃস্বদের জন্য একটা করুণার ধারা যেন শাদরের গানের মত ঠেং ঠেং করিয়া ফুটিয়াছে। আর একদিকে এই করুণা দানে ও ত্যাগে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছে।

দান ও দয়া জিনিষটা চিরকালই ভাল। দাতাকে নানা দেশের লোক নানা ভাবে আশীর্বাদ করিয়া আসি-তেছে। ‘দাতা শতং জীবতু’ আর দয়া—সে ত সক-লের চেয়ে বড় ধর্ম। সুতরাং জিনিষ দুইটা সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই।

কিন্তু এমন একটা যুগে আমরা আসিয়া পৌছিরাছি, যখন একটু গভীর ভাবে বিষয়টা না দেখিলে আর চলে না। সেই জন্যই এত দীর্ঘ ভূমিকার পর আমাদের প্রণ করিতে হইতেছে:—দাতা যে দান করেন,

তাঁহার সে শক্তি আসিল কোথা হইতে? এক জনের কেন এমন অবস্থা হইল যে, তাহার দান গ্রহণ করা প্রয়োজন; আর এক জনের কিসে এমন দানের শক্তি সঞ্চিত হইল? তা ছাড়া, দানেতে যে দয়ার প্রকাশ, ইহাই কি দয়া দেখাইবার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি? আর যাহাকে দয়া মনে করিয়া আমরা ধন্যবাদ দেই, তাহার ভিতর কি কোন কর্তব্য বর্তমান থাকিতে পারে না?

কথাটা অবশ্যই বলা যাত্রাই পরিষ্কার হইয়া গেল না। কিন্তু যাক খানে আমরা একটা বাংলা প্রবাদ বাক্য মনে করিতে পারি। বাংলায় একটা কথা আছে, ‘গরু মেরে জুতা দান’। জুতা দান করিবার বিধান শাস্ত্রে রহিয়াছে; কিন্তু হিন্দুর পক্ষে গোবধ মহাপাপ; গরু না মারিলে জুতা হয় না। তাই বলিয়া জুতা দানের জন্ত গরু মারিলে, সে কার্যের কেহই প্রশংসা করিবে না। সুতরাং দানের দেশেও দানযাত্রাই অনিন্দ্য নয়।

ডাক্তার যদি ঔষধ বিশেষের পরীক্ষার জন্ত কোনও রোগীর ব্যাধি ইচ্ছা করিয়া দীর্ঘকাল অগাহত রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার সে প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করা কঠিন। তেমনই যদি কেহ অস্ত্র এক জনকে নানা ভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিয়া, পরে একটু ভ্যাগ বা দয়া দেখায়, তবে তাহাকেও প্রশংসা করিতে পারি না। লাথিটা মারিয়া জায়গাটিতে হাত বুলাইয়া দিলে, সেটা খুব সহজ হইল না।

সমাজে ধনী ও নিধনের প্রভেদ রহিয়াছে। ইহা বিধির বিধান, না, মানুষের চক্রান্ত, সে প্রশ্ন এখানে তুলিতে চাই না। কিন্তু এই প্রভেদ রহিয়াছে বলিয়াই, নিধন সর্বদাই বিপন্ন;—তাঁহার আহারের কষ্ট, বস্ত্রের কষ্ট, রোগে ঔষধ নাই, বিপদে আশ্রয় নাই। আর, ধনী যিনি, তিনি ইচ্ছা করিলে নিধনকে এই সকল দান করিতে পারেন। ধনী মাঝেই দাতা নহেন; কিন্তু ধনীদেব টাকায়ই বড় বড় ধর্মশালা; হাসপাতাল, ইঞ্জল কলেজ ইত্যাদি লোকহিতকর কাজ হইতেছে। ধনী-দেব উল্লেখ্য বাহাই হউক না কেন, তাঁহাদের এ সব কাজে লোকের উপকার হয়; এবং ‘রায়বাহাদুর’ ‘রাজা বাহাদুর’ প্রভৃতি খেতাব দিয়াই হউক, অথবা শুধু

সংবাদ পত্রের ভাঙে প্রশংসা বাক্য দ্বারা হউক, সমাজ নানা ভাবে এর জন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

কিন্তু যদি কোন ক্রমে ইহা প্রমাণিত হয়, যে, দরিদ্র যে দরিদ্র হইয়া রহিয়াছে, ইহা চন্দ্র সূর্যের গতিবিধির মত অসম্ভব বিধান নহে, তাহা হইলেই জিজ্ঞাসা হইবে, সমাজ কতকগুলি লোককে চিরকাল অভাবে নিম্পেষিত করিয়া মাঝে মাঝে করুণার কণা দেখাইয়া বাহাদুরী লইবে, এটা কি রকম ভদ্রতা?

একটা স্পষ্ট দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। আজ ভাল দেশে হাসপাতালের স্থিতি সংক্রমণে হইতেছে। হাসপাতাল স্থাপন করিয়া কিম্বা স্থাপিত হাসপাতালে টাকা দিয়া নয়-কেনে কত যে খেতাব পাইয়াছেন, তাহার কোন হিসাব নাই। তারপর, রাজ সরকার বিলাত হইতে বড় বড় ডাক্তার আনিয়া জায়গায় জায়গায় বসাইয়া রাখিয়াছেন। ইহাদের বেতন চার অঙ্কের কম নয়। নগদ খোল টাকা দক্ষিণা দিলে ইহারা লোকের বাড়ীতে যান। ইহা ছাড়া বিভিন্ন নামে অভিহিত বিভিন্ন পদবীতে আরও কত চিকিৎসক দেশময় ঘেঁজে ঘাসে শিবুল তুলার মত ছড়াইয়া রহিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাতেও অনেকের তৃপ্তি নাই; তাঁহারা প্রত্যেক গ্রামেই—এমন কি, সম্ভব হইলে, প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীর সামনেই একটা করিয়া দাওয়াই খানা এবং একজন করিয়া ডাক্তার দেখিতে চান। এই উচ্চ আদর্শ বাস্তবে পরিণত না হইলেও, দেশে চিকিৎসার বন্দোবস্ত যে রহিয়াছে—এবং গ্রামে তেমন না হইলেও সহরে যে উহা প্রচুর পরিমাণেই রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু দেশ বইতে অকাল যুগ্ম নির্ধারিত হইয়াছে কি? ব্যাধি কি এক এক বৎসর এক এক রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিতেছে না? ডাক্তারেরা অবশ্যই তৎক্ষণাৎ লাটিন কিংবা গ্রীক কিংবা জাপানী অভিধান খুলিয়া তাহাকে একটা দুরূহ নামে অভিহিত করিয়া ফেলেন। কিন্তু নাম দেওয়া হইলেই রোগটা নিকরদেশ হয় না, এবং লোকের কষ্টও তাহাতে এক বিন্দুও দূর হয় না।

‘আসিল কথা’, গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিলে হইবে কি? ব্যাধির কারণ দূর না করিয়া শুধু তাহার

চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলে চলিবে কেন? এটা অবশ্যই সকলই স্বীকার করেন, যে, এ দেশে যত প্রকার ব্যাধি আছে তাহার বেশীর ভাগেরই কারণ, অনাহার বা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস। এ সকলই ত অভাবের ফল। সেই অভাব দূর না করিয়া, অভাবজনিত ব্যাধির চিকিৎসার জন্ত হাসপাতাল স্থাপন করা কি লাভি মারিয়া প্রণাম করার মত নয়? এক জনকে নানা ভাবে অভাবগ্রস্ত করিয়া রাখিব, অথচ তাহার কুটিরের সম্মুখে সিভিল সার্জনের ত্রিভল অটালিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলিব, ‘একটা সোনার মোহর দিলে ইনি তোমাকে একবার দেখিয়া আসিতে পারেন’—এটা কি রকম দয়া? কি রকম সদাশয়তা? ডাক্তার সাহেবের স্পর্শেই, লোকের চতুর্কর্গ প্রাপ্তি হয় না। যোক্ষ প্রাপ্তি অবশ্যই অনেক সময় ঘটে, কিন্তু সে যোক্ষ ত কেহ চায় না! অথচ এরই জন্ত এই বিরাট ব্যবস্থা! দরিদ্রেরা প্রতিবারের দর্শনী দিবার জন্ত বোলটা টাকা কোথার পাইবে, তাহা আমরা ভাবি না। অথচ, সহরের মাঝে একজন বড় ডাক্তার প্রতিষ্ঠিত করিয়া কতই না বাহবা দাবী করিয়া বসি! তার চেয়ে যে টাকাটা খরচ করিয়া এত সব ডাক্তার এবং ঔষধ আমদানী করা হয়, সেটা যদি গরীব ছঃশীদের অন্নবস্ত্রের জন্ত ব্যয় করা হইত, তাহা হইলে বেচারাদের বোধ হয় আর চিকিৎসার দরকারই হইত না।

সরকারের দেখাদেখি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতিও দাওয়াই-খানা স্থাপন এবং ডাক্তার ও টীকাদার নিয়োগ করার জন্ত উঠিয়া পাড়য়া লাগিয়াছেন ইহাতে কাহারও আত্মীয় প্রতাপালনের সুবিধা হয়, এমন কথা বলি না। তবে ইহাতে কতকগুলি লোকের ভাত হয়। কিন্তু বাহাদুরের সুবিধার জন্ত ইহাদের ভাতের বন্দোবস্ত হয়, তাহারা কোন উপকার পায় না। ইহাতে একটা নয়া ব্যাক্তরও গায়ে কাপড় উঠে না, একটা উপবাসীও পেটে অন্ন পড়ে না; এবং ব্যাধির কারণ সম্পূর্ণ বর্তমান থাকে বলিয়া, একটা লোকেরও ব্যাধি কম হয় না; হঠাৎ ব্যাধিভের ব্যয়সাধ্য অথচ সন্নিহিতল চিকিৎসা এবং তার ফলে রোগীর আত্মীয়দের আরও

দুঃখবস্থা। এই কথাটা আমরা এখন আর না ভাবিয়া পারি না।

এখন আর কাশীতে অন্নসত্র দিলে লোক তেমন চিনে না। বাড়ীতে অতিথিখালা রাখিলে কেহ ‘রায় বাহাদুর’ ‘খান বাহাদুর’ হয় না; তাই এসব এখন উঠিয়া গিয়া সব দানের টাকা আসিয়া জড় হইতেছে দাওয়াইখানায়। আর বছরে দুইবার করিয়া উপাধি-বর্ষণের পালা। ইঁারা সম্মান দান করেন, তারাই বা কি ভাবেন, আর যঁারা সম্মান খুঁজেন, তাঁদেরই বা বুদ্ধি কি, ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু দেশের লোকে— এমন কি যারা কোনই উপকার পায় না, তারাও যে সঙ্গে সঙ্গে ‘বেশ বেশ’ বলে, ইহাই সকলের চেয়ে সেরা আশ্চর্য্য।

আবার একটা ধূয়া উঠিয়াছে, Maternity welfare;—কথাটা বাংলা করিলে আরও জমকালো হইবে, যথা ‘মাতৃদের উপকার’। ইহার জন্ত কতকগুলি প্রদর্শনী, অনেকগুলি বক্তৃতা এবং ধবরের কাগজে হৈট হইয়াছে। শিশুদের অকালমৃত্যু এবং প্রথম যঁারা জননী হন, তাঁদের স্বাস্থ্যরক্ষা, ইহাই হইল এই হজুগের উদ্দেশ্য। ইহাকে ‘হজুগ’ বলাতে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কলাফল দেখিয়া যদি কাজের গুণাগুণ বিচার করিতে হয়, তবে ইহা হজুগ ভিন্ন আর কিছু নয়; আর, উজ্জোকাদের উদ্দেশ্য যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে ইহা হজুগেরও নিম্ন পদবীতে স্থান পাইবে; কেন না, একাধিক স্থলেই ইহা বড়লোকদের সঙ্গে একটু আপ্যায়িত করার উপলক্ষ্য মাত্র।

এখানেও কারণ বর্তমান রাখিয়া কার্যের প্রতীকারের চেষ্টা রহিয়াছে। কেন শিশুরা অকালে মরে? কেন জননীদের অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়? আবার সেই এক উত্তর—অস্বাস্থ্যকর জীবন পদ্ধতি এবং তাহারও ঐ একই কারণ, অভাব। সেদিকে দৃষ্টি না দিয়া কতকগুলি ধাত্মী নিযুক্ত করিয়া দেশময় ছড়াইয়া দিলে জগতের কি যে উপকার হইবে, ভাবিয়া পাই না।

স্থলবিশেষে দাওয়াইখানায় যে প্রবন্ধনা ও অপহরণ প্রভৃতি রহিয়াছে, তাহার কথা উত্থাপন করা এখানে

অপ্রাসঙ্গিক। কেন না, উহা ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রের পরিচায়ক যাত্র; প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাহাতে কিছু প্রমাণিত হয় না। কিন্তু যে চিত্তাপন্নতা অনুসারে লোকে অন্নদানের চেয়ে ঔষধ দান এবং বস্ত্র দানের চেয়ে ব্যাণ্ডেজ দানকে বড় মনে করিতে শিখিয়াছে, সেটা যে ভ্রান্ত, এই কথাটাই আমরা বলিতে চাই। দানের প্রণালী সম্বন্ধে কোন কথা হইতেছে না। ইহা ব্যক্তিগত ভাবেও হইতে পারে, অথবা সংহত ভাবেও হইতে পারে। কিন্তু দানের সামগ্রী হিসাবে অন্ন যে ঔষধের চেয়ে বড়, এই কথাটা আমাদের এখন স্বীকার করা উচিত। বিশেষতঃ যেখানে ঔষধের প্রয়োজন হয় অন্নের অভাব হইতে, সেখানে লোকের অন্নকষ্টের বোল আনা কারণ বলায় রাখিয়া, ঔষধ দান করা দস্তুরমত নিষ্ঠুরতা।

দানের নামে আমরা এতই যুক্ত যে, দান দেখিলেই শত মুখে প্রশংসা না করিয়া পারি না। এবং সেই জন্য দানের সামগ্রীটুকি, এবং তাহার চেয়ে ভাল সামগ্রী আর কিছু আছে কিনা,—তাহা ভাবিবার অবকাশই আমাদের হয় না। তথাপি সাধারণ ভাবে ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এমন যদি কোন দেয় বস্তু থাকে, যাহা দান করিলে দ্বিতীয় আর একটি বস্তু দিবার প্রয়োজন হয় না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রথমটুকি দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রেরণ্য। সুতরাং ইহা যদি সপ্রমাণ হয় যে, গরীব লোকদের অন্ততঃ অনেক ব্যাধিরই কারণ অনাহার বা অল্পাহার, তাহা হইলে অন্নদান যে ঔষধ দানের চেয়ে বড়, ইহা স্বীকার করিতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না।

কিন্তু ইহাতেও সমগ্র ভ্রান্তি অপনোদিত হইল না। দানের মধ্যে শুধু তাহার সামগ্রীটুকি দেখিলেই যথেষ্ট হইল না। দান করিবার সে শক্তিটা দাতা কোথায় পাইলেন, তাহাও একবার বিচার করা প্রয়োজন।

জমীদার প্রভৃতির উপর কিংবা বড় উকীল তাঁহার মক্কেলের কিংবা বড় ডাক্তার তাঁহার রোগীর উপর জুলুম করেন, ইহা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু ইহা করিয়াও যদি তিনি প্রচুর ধনের অধিকারী হন এবং মরণকালে একটা সরাই কিংবা ডাক্তারখানা স্থাপন

করেন, তবে লোকের মুখে তাঁহার প্রশংসা ঘরিবে না। কিন্তু কেন? ইহার সোজা উত্তর, লোকে দানটাই দেখে; দানের টাকাটা কি করিয়া রোগগার করা হয়, সব সময় তাহা জানা যায় না। তাই, যেটুকু দেখা যায়, সেই টুকুরই গুণাগুণ ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু ইহা কি ঠিক? ইহা কি দুরদৃষ্টির পরিচায়ক?

একবার গঙ্গায় ডুগ দিলেই কোটা কোটা জনের পাপ জালন হইয়া যায়, ইহা যাহারা বলিতেন, তাঁহারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতেন কিনা, জানি না। কিন্তু সারাজীবন অপকর্ম করিয়া হঠাৎ একদিন কেহ দশ হাজার টাকা হাতছাড়া করিলেই তাহার নামে একটা ‘রামায়ণ’ রচনা করিতে হইবে, একথা আমরা মানি না। সুতরাং দাতার দানশক্তির উপচয় হয় কিরূপে, তাহা ভাবিবার অধিকার আমাদের আছে। এবং ব্যক্তির বেলা যদি এ অধিকার আমাদের থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সমাজের বেলাও উহা রহিয়াছে।

সমাজে এক শ্রেণী থাকিবে চিরকালই প্রতিগ্রাহী, আর এক শ্রেণী হইবেন দাতা, ইহার মূলে কি কোনও হেতু নাই? একজন নিশ্চয়ই আর এক জনকে কখনও বলিতে পারে না, ‘ওগো, তুমি দরিদ্রই থাক, তাহা হইলে, মাঝে ২ আমার মনে দয়াবৃত্তির বিকাশ হইবে।’ কাজেই, দরিদ্রকে দেখিয়া ধনীর মনে দয়ার উজ্জেক হইলেও এই দয়াবৃত্তির উজ্জেকের জন্ম দরিদ্রের দারিদ্র্য কখনও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। এবং হৃৎ দারিদ্র্যের লোপের সঙ্গে সঙ্গে দয়ারও যদি লোপ হয়, তবে সেটাকে একটা গুরুতর দুর্দৈব মনে করিবার কোন হেতু নাই। সুতরাং দারিদ্র্যের যদি কোন কারণ থাকে এবং সে কারণ যদি হ্রস্বপনেন না হয়, তবে দানের মাহাত্ম্যটা অত বড় গলায় কাটন করা উচিত নয়। দানের প্রয়োজন ও উপকারিতা ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ সমাজে কতকগুলি লোক অভাবের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। এবং যতক্ষণ তাহারা অভাবের নিপেষণে জর্জরিত থাকে, ততক্ষণই তাহারা অশ্রের অজুগ্ধের ভিখারী হয় এবং ততক্ষণই তাহারা দাতার শতাহু কামনা করে। কিন্তু যদি কখনও তাহাদের মনের এমন পরিবর্তন হয় যে,

বেটাকে এতদিন অনুগ্রহ মনে করা হইত, সেটাই স্মাথা প্রাপ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তাহার। ভিক্ষা না চাহিয়া দাবী করিবে, এবং সে দাবী মঞ্জুর না হইলে মনে করিবে, সমাজ অবিচার করিল ।

ঠিক এমনই একটা পরিবর্তন ইউরোপে যে না হইয়াছে, তাহা নহে । সেখানে মজুরদের ধর্মঘট ঝড় বুটির মত একটা নির্দিষ্ট সাময়িক ঘটনার পরিণত হইয়াছে । সেখানে চাকরেরা মাহিনা বৃদ্ধিটাকে ‘হুকুরের দয়া’ বলিয়া মনে করে না ; এটা তাহাদের স্মাথা প্রাপ্যের মধ্যে । তাহার। যদি কাজ করিতে পারে, এবং সে কাজে যদি সমাজের কোন উপকার হয়, তাহা হইলে তাহার দেহাচ্ছাদন এবং হুবেলা দুটো অন্নের সংস্থান কেন হইবে না ? ইহাতে দান ও দয়ার কথা উঠিবে কেন ?

আমাদের চাকরেরা অবশ্যই দুই টাকা মারনা বাড়িলেই এখনও বলে, ‘হুকুরের দয়া’ ; কিন্তু তাহার।ও নূতন বুলি শিখিতেছে, দয়া ভিক্ষার পরিবর্তে দাবী করিতে শিখিতেছে । ধর্মঘটের পালা এদেশেও আরম্ভ হইয়াছে । সুতরাং দানের মাহাত্ম্য কীর্তনের মধ্যেও আমাদের একবার তাহারা দেখা উচিত যে, আমরা কি এমন কিছু করিতেছি বাহা না করিলে অস্ত্রায় হইত না, না, শুধু এ যাবৎ অবহেলিত একটা কর্তব্য কার্য মাত্র করিতেছি । এগার লক্ষ টাকা দান দেখিলেই আমরা চক্কা মিনাদে ভবপৃথিবী প্রকল্পিত করিয়া তুলি ; কিন্তু একবার তাহাতে চাই না যে, প্রভুত্ব ধনের অধিকারী যিনি দাতারূপে সুখ্যাতি অর্জন করিতেছেন, অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রতি তাঁহার একটা কর্তব্যও রহিয়াছে ।

উচ্চ প্রশংসা আমরা সেইখানেই করি. যেখানে কর্তব্য এমন কোন কাজ করেন, বাহা করিতে তিনি স্বেচ্ছায় বাধ্য ছিলেন না । কিন্তু যদি তিনি তাঁহার বিহিত কর্তব্য টুকু মাত্র করেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন বিশিষ্ট প্রশংসার দাবী থাকে না । যে হেতু আমি কাহারও বাড়ীতে চুরি করি না, সুতরাং নববর্ষে আমাকে একটা খেতাব দেওয়া উচিত—একথা কেহ বলিতে পারে কি ? যেহেতু আমি সাড়ে দশটার আফিসে বাই এবং সাহেব

চলিয়া গেলে প্রত্যাবর্তন করি, যেই অস্ত্র কোন উচ্চ প্রশংসার দাবী আমার করা চলে না । নির্দিষ্ট কর্তব্যের অভিরিঞ্চ কিছু যখন করা হয়, তখনই প্রশংসার দাবী সঙ্গত হয় ।

সুতরাং লোকে যদি হঠাৎ এমনই একটা নূতন ধারণা ধরিয়া বদে যে, দাতার দানটা তাঁহার কর্তব্যের মধ্যে, তাহা হইলে ধবরের কাগজের সহস্র স্ততিবাদ বৃহত্তরের মধ্যে সাগরতীরে বালির বাঁধের মত নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবে । আর, ‘যদি’ই বা বলি কেন ? সত্য সত্যই কি দাতার কোন কর্তব্য নাই ?

ধোপা যে আমার কাপড় কাচে, সেটাকে আমি দয়া মনে করি না ; কেন না, তাহাকে আমি পরসা দেই । আর আমি যে তাহাকে পরসা দেই, সেটাকেও সে দান মনে করে না, কেন না সে আমাকে কাজ দেয় । সমাজের উচ্চশ্রেণীদের সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীদের এমনই সম্বন্ধ । চা-বাগানে যে কুলিদের অস্ত্র চিকিৎসালয় থাকে সেটা একটা অকারণ কল্পনার নিদর্শন নহে ; কেন না, কুলিদের বাহ/ কাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় । সেখানে ডাক্তারখানা করিয়া দিয়া কেহ যদি খেতাব না পান, তবে নিজের গ্রামে দিলেই এমন কি বিশেষ তারতম্য হইবে যে, সে দস্ত তাঁহাকে স্ততিবাদ করিতেই হইবে ? স্ততিবাদ না করিলে কেহ বলের মুখ খুলিবে না, জানি । কিন্তু মনে রাখা উচিত, থলে যাদের আছে, তাদের কর্তব্যও আছে ।

মনে হয়, দান ব্যাপারটাকে আমরা অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছি । ফলে হইয়াছে এই, কৈনটী শ্রেষ্ঠ দান, আর কৈনটী নিকট, অনেক সময়ই আমরা তাহা জানি না । আমরা দেখি শুধু পরিমাণটা । এগার লাখ । কি মহৎ দান ! কিন্তু যিনি এগার লাখ দিলেন, তিনি যে নিঃস্ব হইয়া দান করেন নাই—তাঁহার যে আরও দশবার এরূপ এগার লাখ দিবার ক্ষমতা রহিয়াছে ! কিন্তু যে ছেলেটা একটা পরসা জলখাবার পাইয়া সেই পরগাটাই দান করে ! তাহারই দানটা কি প্রকৃত পক্ষে বড় নয় ? যে শ্রেষ্ঠ সোনার থালা ভরিয়া দিয়া মুক্তা দান করিয়াছিল, ভগবান্ বৃদ্ধ তাহার দান স্বীকার করেন নাই ; আর, যে অর্জুনগা ভিখারিণী বনের

অন্তরালে তহু চাকিয়া নিজের পরিধানের ছিন্ন বস্ত্র-টুকু দান করিয়াছিল, তাহারই দান বুদ্ধের মনস্তপ্তি করিয়াছিল। পরিমাণে না হইলেও মূল্যে তাহাই ছিল শ্রেষ্ঠ দান।

পরিমাণ যেমন দানের মূল্য নিরূপণ করে না, দাতার শক্তির উপর যেমন উহার মূল্য প্রতিষ্ঠিত, তেমনি দানের সামগ্রীর উপরও উহার মূল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কেহ যদি চার কুটী খার তাহাকে যদি দেওয়া হয় কয়েক খণ্ড পাথর, তাহা হইলে সে দানের কোন মাহাত্ম্য নাই। কেহ যদি চার অন্ন আর তাহাকে যদি দেই আমবা ঔষধ, তবে তাহারই বা এমন কি মাহাত্ম্য? সুতরাং দানের বিচারে আমাদের সর্বদাই দেখা উচিত, দাতার শক্তি এবং দানের সামগ্রী। আর তাই যদি আমরা করি, তাহা হইলে মনে হইবে, বড় লোকের বড় দানের চেয়ে দরিদ্রের ক্ষুদ্র দান অনেক মূল্যবান। অবশ্যই যে ব্যক্তি জীবনে কখনও লক্ষ মুদ্রা দেখে নাই সে যখন শোনে, আর একজন দশ লাখ বিনা সবে দিয়া ফেলিল, তখন তাহার পক্ষে অশ্চর্য্যাবিব হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের আশ্চর্য্য বোধের উপর কোনও কাজের নৈতিক মূল্য নির্ভর করে না।

শক্তি ও সামগ্রী ছাড়া সর্বোপরি আমাদের মনে রাখা উচিত যে, দাতারও একটা কর্তব্য রহিয়াছে। গ্রহীতার কোন দাবী নাই, কোন অধিকার নাই, কিছুই প্রাপ্য নাই, এরূপ মনে করিলে চলিবে কেন? দানের ক্ষতিতে আধুনিক সমাজ যে দানোপজীবী প্রাচীর ব্রাহ্মণেরও এক কাঠি উপরে উঠিয়াছে, ইহা বড় শুভ লক্ষণ নহে। দানের মাহাত্ম্য কর্ত্তন আমাদের একটু সংবদ্ধ হইয়া করা উচিত, সীমাস্ত্রে বোলশেভিক উপস্থিত!

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথ।

মহাত্মা গান্ধী এবার ২রা এপ্রিল তারিখে আমেদাবাদের সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথকে বক্তৃতা দিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই ও গুজরাট ভ্রমণেও বাহির হইয়াছেন।

পত ১৬ই চৈত্র বর্জ্জমান হইতে বোম্বাই মেলে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই যাত্রা করেন। পথে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই; কেবল গাড়ী যখন জাকালপুর প্রভৃতি বড় বড় ঠেশনে থামিতেছিল—তখন অনেক তত্ত্বলোক রবীন্দ্রনাথকে গাড়ীতে অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত দেখিয়া বিম্মিত হইয়া ফুলের তোড়া এবং মালা দিয়া কবিকে সজ্জ্বিত করিতেছিলেন।

গাড়ী বোম্বাই পৌঁছিলে, অনেক সম্রাস্ত পুরবাসী রবীন্দ্রনাথকে ঠেশন হইতে লইবার জন্ত আসিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেদিন বোম্বাইতে মাত্র ৭ ঘণ্টা কাল ছিলেন। কিন্তু এই সময়টুকুও তাঁর বিশ্রাম করিবার উপায় ছিল না, ক্রমাগত মাতঙ্গণ্য ব্যক্তির তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত আসিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে দিন বোম্বাই পৌঁছেন ঠিক সেই দিনই মহাহুতব্রুবজ এণ্ড জ সাহেব আফ্রিকা হইতে বোম্বাই পৌঁছেন। ব্রুবজ এণ্ড জ সাহেব রবীন্দ্রনাথের চিত্র-সঙ্গী এখানেও সঙ্গে রহিয়া গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ সেই দিনই রাত্রি ৮টার সময় কোলাবা ঠেশন হইতে আমেদাবাদ যাত্রা করেন। পর দিবস প্রাতঃকালে গাড়ী যখন আনন্দ, নামেদাবাদ প্রভৃতি ঠেশনে থামিতেছিল, তখন সেখানে রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্ত রীতিমত ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। বিস্তালয়ের ছাঁজেরা, শিক্ষকেরা, আফিসের কেরানীরা, দোকানদাররা পর্য্যন্ত ফুলের তোড়া ও মালা হাতে করিয়া কবিকে একবার মাত্র দেখিবার জন্ত ব্যস্ত।

অবশ্যে রবীন্দ্রনাথ গাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বক্ষ, কণ্ঠ, মস্তক ফুলে, মালায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল—আকাশ কবিবরের

জয়ধ্বনিতে পুলকিত হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-দিগকে সন্বোধন করিয়া কিছু বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি নাই বলিয়া তাহা শুনিতেও পাই নাই।

গাড়ী আমেদাবাদে যখন আসিল তখন রবীন্দ্রনাথের কক্ষটি ফুলে মালায় পরিপূর্ণ। টেননে দারুণ ভিড়—চলা ফেরা একরকম প্রায় অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের জন্ম আগেই মোটর প্রস্তুত ছিল, তাহাকে লইয়া দ্রুতবেগে শাহিবাবাদের দিকে প্রস্থান করিল। শাহিবাবাদে আসা-লাম সারাতাই নামে একজন ধনী মিলওয়ালা থাকেন, রবীন্দ্রনাথ তাহারই অতিথি।

এই আমেদাবাদের শাহিবাবাদেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে তাঁহার প্রথম সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন আর আজ চল্লিশ বৎসর পরে সেই সঙ্গীতের স্বর্ণ-সোপান বাহিয়া জীবনের ও জগতের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া যে আবার এখানে ফিরিয়া আসিবেন, তখন তিনি ইহা নিশ্চয়ই ভাবেন নাই। পরের দিন অর্থাৎ ২রা এপ্রিল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পরিষদে বক্তৃতা দিবার কথা। সভা ১২টার সময় আরম্ভ হইল। এই সভার সভাপতি ছিলেন বড়োদা টেটের ভূতপূর্ব শিক্ষা-মন্ত্রী মহাশয়। ১২টা বাজিয়া ১৫ মিনিটের সময় রবীন্দ্রনাথ সভায় প্রবেশ করিলেন। ঘন ঘন জয়ধ্বনী ও করতালিতে সভাগৃহ বিকীর্ণ হইয়া বাইতেছিল। সভামণ্ডপ অসম্ভব ভাবে জনপূর্ণ। চারিদিকে কেবল টুপি আর পাগড়ী। এক পাশে নির্দিষ্ট যন্ত্রের উপর ঋজুদেহ, তত্বকেশ রবীন্দ্রনাথ পরদের কাপড় ও চাদর পারয়া এবং মাথায় কালো তেলভেটের টুপি দিয়া উপবিষ্ট—পাশেই সংযত বসনে মহাত্মা গান্ধী। প্রথমে কাশী হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ আনন্দশঙ্কর ঐব মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। উহা শুকরাটী ভাষায় লিখিত। উহার এক কাপি বাংলা করিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা শেষ হইলে বেলা ৫টার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সমস্ত সভাগৃহ নীরব। সকলে

নিখাস রোধ করিয়া শুনিতেছে। প্রেসের প্রতিনিধিরা একপাশে থস্ থস্ করিয়া লিখিয়া বাইতেছে। মাথার উপর বিছাতের পাখা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। আর কেবল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতোপম কণ্ঠস্বর সভা মণ্ডপের দূরতম কোনটিকে পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ভুলিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ছিল—মানুষের সব চেয়ে বড় প্রকাশ হচ্ছে—তার নিজের ভাব ব্যক্তনায়। সে যে আহ্বার করে—তার ক্ষুৎ-প্ররক্তিটাই সব চেয়ে বড় নয় সেটাকে ঢেকে রাখবার জন্য সে তার আবাহ্যটাকে এবং পাত্রটাকে সুন্দর করতে চেষ্টা করে। বস্তুতঃ সৃজন করাই মানুষের কাজ, অঙ্কুরণ করা নয়। আজ কালকার ব্যবসা বাণিজ্যের দিনে কি করে বস্তুটাই আমাদের কাছে বড় হ'য়ে উঠেছে—আমরা সৃষ্টি করতে ভুলছি। প্রয়োজনের ঘটটাকে ছাপিয়ে যে মুখা উছলে পড়ে—দেটার দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই। চারদিকে প্রয়োজন এবং কলিযুগের কলকি অবতারণার দানব লৌহ ছন্দ কল জিনিষটা এমন হৃদয়হীন যে মানুষের মাঝে বিভীষিকা সৃষ্টি করে তুলে তার সৌকুমার্য্য নষ্ট করে' ফেলেছে, সত্য এবং সুন্দরকে আচ্ছন্ন করতে চায়।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শেষ হ'তে প্রায় ১—১৫ মিনিট লেগেছিল। সভান্তরের পর ভাড়াভাড়ি সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, কবি ও কন্ঠী সভাত্যাগ করলেন।

আমেদাবাদ শুকরাটের রাজধানী, এখানে শুকরাটের বাঁটা পরিচয় পাওয়া যায়, এই একটা মাত্র সহরে ৭৫টা মিল সারাদিন আকাশে কালিমায় কালিময়, চারদিকে মরুভূমির বালি-রোড়ে দক্ষ প্রচুর পরিমাণে বাবলা গাছ আর প্রায়ই দেখা যায় সারিদিয়া উট চলিয়াছে। সহর-টির একপাশে সংরমভী নামে একটা নদী আছে। সেও যেন পথভুলেই এখানে এসেছে। কোন রকমে শীর্ণ-কায়া নদীটি বালু সৈকতের আচল খানি বুকের উপর টেনে তরু তরু করে' ধরে চলেছে।

ওরা তারিখে রবীন্দ্রনাথ সমবেত জন-সমূহকে

আলোয় আঁধার।

(১)

যরে বাইরে আগুন আমার আগুন মনের মাঝে !
কত রকম চেষ্টা করি মন বসেনা কাজে !
বায়স যেমন আলস ভরে,
দুপুর বেলা কেঁদে মরে,
তেমনি কোরে কাদছে সদাই আমার হৃদয় ধানি !
অজানা এক মন্ত দুঃখের জেপটা কেবল টানি !

(২)

হাকি হাওয়ায় উচ্ছলিত দীপার নীতল জলে,
হাকার তপন সীতার কেটে ঢেউ তুলিয়া চলে !
হাঁসগুলো সেই দীপির বুকে,
হেসে নেড়ায় মনের স্মৃতি,
ই টুছে মাথায় চৌকছে গোত্র সবুজ লাসের পরে !
গাছের নীচে পল্লীযুগা গল্প শুকব করে !

(৩)

সাদা আকাশ সাদা চোখে তাকায় সবার পানে।
সিনানু সারি তাইতো নারী বুকে আঁচল টানে !
দিবুছে ঘরে নতশিবে,
সিক্ত বসন হাঁসছে ধীরে,
মাথার উপর 'বৌ-কথা-ক' অমনি গেল ডেকে !
পল রাধিল বুকে বপুর চরণ-চিহ্ন একে !

(৪)

আজ যে এত শোভার বাহার আমার চতুর্দিকে,
অন্ধ-ধোওয়া আঁধার তারায় লাগছে ফিকে ফিকে !
মরার মত পেঁচে আছি,
মৃত্ত পেলো হয়তো পাঁচি,
ভাঙা বৃকের একতারাতে ব্যথার সুরই বাজে !
যরে বাইরে আগুন আমার আগুন মনের মাঝে !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সম্বোধন করে' মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে ইংরাজিতে একটি
ছোট বক্তৃতা দেন ; অমুক্ত ক্রিতিমোহন সেন মহাশয়
তাহার হিন্দী করিয়া বলেন। সভা ভঙ্গের পূর্বে শ্রীযুগা
সরলাদেবী “অগ্নি ভুবন মনোমোহিনী” গানটি গাহিয়া-
ছিলেন। যে কয়দিন রবীন্দ্র নাথ এখানে ছিলেন তাহার
তিল পরিমাণ সময়ও বিশ্রাম ছিল না। প্রায়ই তাহাকে
দু'বেলা দুটো সভায় যোগ দিতে হইত। তা ছাড়া
দুপুর বেলা এবং এবং সকাল বেলা অভাগত ব্যক্তিবর্গের
সহিত তাঁর দেখা করিতে হইত।

এই আবেদনবাদের মহাত্মা গান্ধীর একটি আশ্রম
আছে, নাম—‘সত্যগ্রহ আশ্রম’ এই আশ্রমেও একদিন
রবীন্দ্রনাথ গিয়াছিলেন, আশ্রমটির দুই ভাগ, একটি
আশ্রম, অপরটি স্কুল ; আশ্রমের অধিবাসীদের বেতনাদি
লাগেনা—তাহারা দেশের কাজ করিয়া বেড়ায়। এখানে
তাঁতে কাপড় বুনিবার খুব ভাল ব্যবস্থা আছে। আশ্রমের
প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুাদিই এখানে তাঁতে বুনিয়া এবং
হাতে সেলাই করিয়া প্রস্তুত করা হয়।

স্কুলের ছেলেদের পড়িতে হয় কিন্তু কোন পরীক্ষা
নাই। তাহাদের কেবল আহাৰ্য্য খরচটা নেওয়া হয়—
মাসিক ১৬ টাকা হিসাবে। স্কুলের ছেলেদের অনেক
কাজই জুতো করে, কিন্তু আশ্রমের অধিবাসীদের
সব কাজই নিজেদের হাতে করিয়া লইতে হয়।
আশ্রম ও স্কুল উভয় স্থানেরই অধিবাসীদের থাকিবার
জন্ত ছোট ছোট টালির ঘর, মাটিতে বিছানা করিয়া
শোবার ব্যবস্থা। ভোর ৪টার সময় উঠিয়া ছাত্র ও
আশ্রমিকগণের উপাসনা বন্দনা শেষ করিয়া পাঠ ও
কাজ করিতে হয়। ৩টার সময় সকলে দুধ পান করেন।
বেলা ১০টার সময় মধ্যাহ্ন ভোজন এবং সন্ধ্যান্তের আগে
শেষ ভোজন, রাহে পুনরায় ভজন গান করিয়া শয্যা
গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধী ও তাহার পত্নী এখানেই
ছেলেদের সাথে একটি ছোট গৃহে থাকেন। মহাত্মাজীকে
তাঁহার আশ্রম ও স্কুলের ছেলেরা বাপুজী অর্থাৎ পিতাজী
বলিয়া ডাকে। বরষতী নদীর পাড়েই এই আশ্রমটি।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

ত্যাগেন ভুঞ্জীথঃ ।

আমরা প্রাত্যহিক সঞ্চয়ের অল্পশ্রম প্রার্থ্যো, সহস্রবিধ
মায়াধোনে, চিত্তের সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলিকে নিবিড়রূপে
চাসিয়া রাখিয়াছি—কোনখানে লেশমাত্রও অবকাশ
যাহাতে না থাকে, সে দিকে প্রয়াসের অন্ত নাই—এবং
এই অচল ভাঙার যাহাতে চিরদিনের মত অক্ষয় হইয়া
থাকে, সেজন্য সমস্ত অনাগত বিপদ হইতে ইহাকে
যক্ষের ধনের মত করিয়াই রক্ষা করিতেছি—যদি কখনো
বাহিরে কোনো বড় বাদলের প্রবলতম সংঘাতে এই
প্রচুরতম পুঞ্জীভূত রূপ, অকস্মাৎ ঘোর ধ্বংস-লীলায়
শতদীর্ঘ হইয়া যায়, সেই ভাবনায় জীবনকে গুরুভারা-
ক্রান্ত করিয়া তুলিতেছি ।

আবার অপর দিকে লোভের অন্তহীন তাড়না
বিশৃঙ্খল হইতেও দিগন্তের হইয়া উঠিতেছে—তাই
প্রয়াসের পর প্রয়াসের অবিরত উত্তেজনায় সঞ্চয়ের
পরিমাণ খতাইয়া দেখিবারও অবসর নাই—উপকরণ
ভূরি পরিমাণে জমিতেছেই—কমিবার দিকে নজর দিতে
গেলেও বিপদ—তাই তিলতম অংশেরও হানি হইলে
হৃদয়ের দুর্দ্বন্দ্ব হাহাকার আরো অত্যাগ হইয়া উঠে
এবং সে জন্ত বিধাতাকে ও স্রীয অদৃষ্টকে কি বলিয়া
দোষ দিব ও বিকার দিব, তাঁর ভাষা খুঁজিয়া বাহির
করাও দুষ্কর !

যেন ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করিয়াই এ পৃথিবীতে
অবতীর্ণ হইয়াছি, কোনো ক্ষুদ্র বস্তুও লোভ ত্যাগ করা
যেন আমাদের প্রকৃতিতে লেখে না—তাই চাওয়ার পর
চাওয়ার আর বিরাম নাই—প্রার্থনার পর প্রার্থনা ।
“চাই চাই” এর সুতীক্ষ্ণ চীৎকারে গগনের সমস্ত রক্ত
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং ধরণীর বক্ষ দারুণতম বেদনার
ভরে বিদীর্ণ হইয়া গেল ।

সমস্ত বিশ্বের সমস্ত নির্বিকার উদার শান্তিকে অভিহত
করিয়া—চারিদিককার—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রিত প্রবৃত্তি একেবারে
হইয়া উঠিল । জগতের সমস্ত অহৈতুক আনন্দকে ধর্ক
করিয়া মানুষের প্রয়োজন মানুষের স্বার্থ স্পষ্টিত ধ্বংসের
মত আপনার সমুদ্রত জয়ন্তভট্টিকে অদ্ভুতদী করিয়া

ভুলিল ! মানুষের এই উদ্দাম কামনার সরোষ আফালন,
এই উদগ্র বাসনাবেগের ব্যগ্র হা হতাসের সাম্নে ত্যাগীর
সরল-স্তম্ভ সন্তোষ, সংযমীর ঋজুমুক্ত জীবনের দিব্যদ্ব্যতি
পরিমায় হইয়া গেল, প্রবৃত্তির জয়ঢাকটার উৎকর্ষ শব্দে
ত্রিভুগত কম্পাঘিত হইয়া উঠিল, তার কাছে বৈরাগীর
উদাত্তগন্তীর একতারাটি এতই ক্ষীণ হইয়া গেছে যে তাহার
শান্ত সঙ্করণ মুহূর্তনাটী আর স্রুতিপথে প্রবেশ করিতেছে
না । কেবল একটি মাত্র সুর মানুষের মর্ম্মকে পীড়িত-
মগ্নিত করিয়া সঘন বাক্যেরে দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত
করিতেছে—“চাই—চাই—চাই” !

মানুষের দুর্দাম আকাঙ্ক্ষার এই অপরিমিত ঔজ্জ্বল্যের
সাম্নে ভারতবর্ষের ঋষি একদিন অপরাহত প্রতিভার
বলে, নির্ভীককণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন :—

অধর্ম্মে নৈব তে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি ।

ততো সপত্নান্ জয়তি সনুগন্ত বিনশতি ।

অর্থাৎ অধর্ম্মের দ্বারা মানুষ বাড়িয়া ওঠে, অধর্ম্ম
হইতে সে আপন কল্যাণ দেখে, অধর্ম্মের দ্বারা সে আপন
শত্রুদিগকেও জয় করে, কিন্তু একেবারে গোড়া হইতেই
বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতি ছত্র রক্ত নিষিক্ত অক্ষরে
ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ।

পাপীর পরাক্রম যেদিন বিশ্ব পরমেশ্বরের সিংহাসন
পার্শ্বে আপন গর্জিত প্রতাপ জাহির করিয়াছে—সেদিনই
বিধাতার অমোঘ শাসন বজ্রের আঘাতে তার বৃগু মস্তক
ধূলিতলে অবলুপ্তিত করিয়াছে ।

তাই ত যুগে যুগে কত রাজ্য মহারাজ্য ভূগের মত
সুংকার মাঝে উড়িয়া গেল—কত দুর্দমনীয় অহঙ্কার
কালের নিষ্ঠুর প্রলয়াভিষাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল ।
একদিন বাহারা সুরের সু-উচ্চ অচলে ধরাকে সরা বলিয়া
জানিয়াছিল—তাহারা দুঃখের সুরধারিনিশিত ধরকট-
কাপূর্ণ পথে আপনার সমস্ত পরমস্পর্ধিত স্বাভাব্যকে
উৎসর্গ করিয়া দিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে তাহাদের পাপ লীলা
পরিসমাপ্ত করিল ।

শক্তি যেদিন অলৌক দণ্ডের দুর্দণ্ড আবেগে শাস্তির
যোগাশনকে বিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছে সেদিন সে কিছুতেই

নিষ্ঠার লাভ করে নাই। একের অমোঘ নিয়ম কে উল্লংঘন করিয়া আপনার প্রতিপক্ষে একান্ত করিয়া তুলিবে এমন কারো সাধ্য হয় নাই—যে শাসন বিশ্বের সমস্ত শক্তিকে ঘটনাকে অবস্থাকে অহং নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিতেছে।

তাই তো বলা হইয়াছে :—

ভয়াদস্তাশ্চি জপতি, ভয়াদপতি সূর্য্যঃ

ভয়াদিস্তাশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ

তঁারই অটল নিয়মে অগ্নি ও সূর্য্য তাপ দিতেছে—এবং মেঘ বায়ু ও মৃত্যু ধাবমান হইতেছে—তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইচ্ছার দ্বারা তড়িত নহে, তঁাহারই জ্বলের শাসনে পরিচালিত। যখন কোনো শক্তি সবলে সেই শাসনকে—সেই নিয়মকে উপেক্ষার সহিত ছিন্ন করিতে যায়—তখন মহত্ত্ব বজ্রমুগ্ধতং—সেই ভীষণ ভীষণাণাং তঁাহার রুদ্ধ দৃষ্ট দণ্ডাঘাতে সেই অতিবুদ্ধি প্রাপ্ত শক্তির উদ্দাম আন্দোলনকে চিরতরে নিরস্ত করিয়া দেন।

তাই বলিতেছি, প্রবৃত্তি যতই প্রবল হউক, বাসনা যতই প্রচণ্ড আকার ধারণ করুক, একদিন তাগার পতন হইবেই—একদিন সমস্ত ভূরিপরিমাণ সঞ্চয় অপঘাত মৃত্যুর ককারাকীর্ণ মরুপ্রান্তরে ঘোরতর ধ্বংসাবসানে পর্য্যবসিত হইবেই।

আধুনিক যুরোপের পণ্ডিতগণ বলিতেছেনঃ—“হইলই বা ধ্বংস, যতদিন থাকি ততদিনই ত লাভ। মরিতে ত হইবেই কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের সুখটুকু ছাড়িব কেন? জীবনের কয়েকটা দিন বীরদর্পে সকলের উচ্চ, সকলের চেয়ে বড় হইয়াই কাটাওয়া দাও—তাই ত জীবনের চরিতার্থতা।”

কিন্তু ভারতবর্ষ বলিতেছে, যে সকলের চেয়ে বড় হওয়াই মানব জীবনের লক্ষ্য নহে; বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিই না হয় হইলে, না হয় জগতের অগণ্য জনগণ মণি মাণিক্য স্তূপাকারে পুঞ্জীকৃত করিয়া সমস্ত জীবনটা তাহার ভোগে একেবারে ফুকিয়া দিলে কিন্তু—ততঃ কিম্? ততঃ কিম্? ততঃ কিম্?

তাই ভারতবর্ষ বলিতেছে, “যে নাহং নাশ্রুতা স্মাৎ কিমহং তেন কুৰ্য্যাম্” মৃত্যুর দ্বারা আমরা কখনো বড়,

হইতে পারি না—ধনবন্তই বল আর বাহ্য সুখসম্পদই বল এ সবই ত মৃত্যুরই রূপ! তাই ভারতের সবচেয়ে বড়, সব চেয়ে প্রাচীন বৈরাগ্যের বাণী হইতেছে, বাহিরের সুখকে ত্যাগ কর—যদি বড় হইতে চাও, ত বড় হইতে হইবে বীৰ্য্যের দ্বারা—অন্তরের অন্তরতম সেই অপরিমেয় সম্পদের দ্বারা—যেহা অবিনশ্বর, যাহা মিত্য, যাহা সত্য।

তাই ভারতের শ্রেষ্ঠতম কথা হইতেছে—

“ত্যাগেন ভূজীধাঃ”

অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা লাভ করিবে; সুখ সম্ভোগকে ত্যাগ করিয়া পরমানন্দকে লাভ করিবে; অপরিমিত উপকরণ ত্যাগ করিয়া সরল শুদ্ধ সম্ভোগকে লাভ করিবে। বাহিরের ধন সম্পদকে ত্যাগ করিয়া অন্তরের চরম তৃপ্তিকে লাভ করিবে।

ঈশা বাস্তুমিদং সৰ্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যা জগৎ

জগতের যাহা কিছু সমস্তই ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিবে। তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন যাহা কিছু তাহাই ত মৃত্যু! তাই ভারতবর্ষ বলিতেছে—জগতের যাহা কিছু গ্রহণ করিবে—বৈরাগ্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা! ত্যাগেন ভূজীধাঃ—মৃত্যু হইতে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক তাহার পরিপূর্ণতার ভিতরেই সমস্তকে গ্রহণ করিবে। তাহা হইলেই সমস্তকে সমস্ত বলিয়াই না জানিয়া অশ্রুও একেরই অন্তর্গত করিয়া জানা হইবে—এবং সেই জানাই সত্য—সেই জানাতেই আমরা বড় হই—ভূরিপরিমিত সঞ্চয়ের দ্বারা নহে—কদাচ নহে!

পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের কয়েকজন দার্শনিক প্রচার করিয়াছিলেন যে যাহা কিছু দেখিতেছি, শবণ করিতেছি ও স্পর্শ করিতেছি, তাহা সমস্তই মৃত্যুরই রূপ—তাহা মিথ্যা—শুধু মিথ্যা নহে—অসম্ভব। অর্থাৎ এই জগৎ, ব্রহ্মের অবিজ্ঞা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব

“মায়ায়মিদ্দমপি লং দ্বিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশান্তি বিদিতাঃ”

কিন্তু মায়া ত চতুর্দিকেই আনাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে—তাহাকে অতিক্রম করিব কি করিয়া? সেই জন্তই মায়াকে পরমুণ্ড ও ছাগনাংস প্রভৃতি উপাটকন প্রদান পূর্বক কোনও মতে তাহাকে খুদী করিয়া তাহার কবল হইতে নিষ্কৃত লাভ করাই হইল সাধনা!

ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ ত্রন্ধকে বিশ্বত হইয়া যায়। ইহা উপাসনার ব্যাপ্ত রহিল—যে মায়া ত্রন্ধের প্রকাশ নহে, যাহা স্বতন্ত্র স্বয়ভূত—যাহা বীভৎস ও বিকৃত। সে পূজার উপকরণ হইল সুরা ও পণ্ড। ব্যাভিচারই হইল সাধনা, উন্নততাট হইল মুক্তির সোপান।

ভারতবর্ষের ইহা বিরুদ্ধিই বলিতে হইবে কেননা ভারতবর্ষই এককালে বলিরাছিল—

“অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যে ইবিজামুপাসতে

ততো ভূয় ইব তে ভমোহউবিজাম্যন্তরতাঃ।”

যে লোক ত্রন্ধকে বাদ্ দিয়া মায়া উপাসনা করে সে অন্ধকারে নিমগ্ন হয়, কিন্তু তদপেক্ষাও গাঢ়তম অন্ধকারে মগ্ন হয় তাহার। যাহারা মায়াতে বাদ্ দিয়া ত্রন্ধের উপাসনা রত থাকে। ভারতবর্ষের নিরাকার সাধনার শোচনীয় পরিণামের দিকে তাকাও—ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

সে যাক্। ভারতবর্ষের যাহা সত্যতম সাধনা—যাগ চিরন্তন তপস্যা, তাহাট হইয়াছে—“ঈশবাস্তমিদ্ধং সর্বং স্বকিঞ্চ জগত্যং জগৎ”—জগৎকে পরিত্যাগ করিবে না, কিন্তু ইহাকে ত্রন্ধের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিবে এবং সেই ভাবেই ইহাকে গ্রহণ করিবে।

যুগের পর যুগে ভারতবর্ষে কত বিচিত্র মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে—কত অলোক কল্পনাকালে তাহার মানস-প্রকৃতি বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে—কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম যাহা সাধনা কিছুতেই তাহাকে বিলুপ্ত করি গেল না—তাহা আজও অটুট ও অচল রহিয়াছে।

আজ সমস্ত জগৎ যে—মৃত্যুর করাল-ছায়ার আচ্ছন্ন রহিয়াছে—একমাত্র ভারতবর্ষই তাহাকে অমৃতলোকের দিব্যালোকমন্দিরে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে—এই তার তাহার উপরে আছে। যে সত্যকে লাভ করিয়া সে একদা অমর হইয়াছিল—সেই তাহার বহু-দিবস-লক্ সত্য আজ বিশ্বমানবের মুক্তিদান করিবে।

ভারতবর্ষই আজ জগৎকে দান করিবে—তাহার সূচির-সাধন-ধনটিকে, সে আজ শিখাইবে—মায়াবের অন্তরের দিকে কি মহিমার—কি ভূমার অধিষ্ঠান, সে আজ শিখাইবে যে সেই ভূমার দ্বারা ওতপ্রোত করিয়া বিশ্বকে জানাই মুক্তি। এমনি করিয়াই সে বাহিরের সহিত ভিতরের মিলন-সেতু নির্মাণ করিবে।

এবে কল্পনা নহে—সত্য; তার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। দেখা গিয়াছে, সমুদ্রের এপার হইতে যে কোনো প্রতিভা-বান্ এই সত্যটিকে বহন করিয়া ওপারে গিয়াছেন—পশ্চিম তীহাকে আত্মরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানে অর্জিত পূজিত করিয়াছে—তীহাকে শ্রেষ্ঠ গৌরবে বিভূষিত করিয়াছে। বর্তমান কালের বিশ্ববরণ্য কবীজ রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পঁচিশ বছর পূর্বে বিবেকানন্দও উহার অঙ্গ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।

ইহাতেই অন্তরে অন্তরে নিশ্চিত বুঝিতেছি—নৈশ অন্ধকার অপগত হইয়াছে—পূর্ব-উদয়াচলের উচ্চতম-শিখরটিতে নব-আলোক উদ্ভাসিত হইল বলিয়া—বিশ্ব মানব-জীবনের সৌভাগ্যাকাশে অজ যে নবপ্রভাতের উদ্বোধন সঞ্চারিত হইবে—তার যে আনন্দ কলকাকলী তাহা নৈশ-স্বপ্নের বিমূঢ় প্রলাপ নহে—তার যে চঞ্চলতা যে আকুলতা তাহা প্রবৃত্তিবেগের ক্ষণিক আক্ষেপ নহে। এলাগরণ মনুষ্যের জাগরণ। অজ স্পষ্টই দেখিতেছি—সমস্ত বিশ্বলোক মুগ্ধিত করিয়া অনতিবিলম্বেই ধৈর্য-বিনি বিশ্বগগনের রঞ্জে রঞ্জে প্রতিধ্বনিত হইবে, তাহারি অমুকরণ দিগ্দিগন্ত পরিনিদ্রিত করিবে—নিখিল বীণার তারে তারে মঞ্জুল বাজারে। সেই নব-যৌগল জয় গানমঞ্জিত হইবে বিশ্ব মহেশ্বরের সিংহাসন তলে—অজ সকল-কল-নিমাদ উদ্গাধিত করিয়া।—সেই বাণী বোনের বাণী—ত্যাগের মহীয়সী বাণী—বৈরাগ্যের বাণী—সেই আনন্দ-সঙ্গীত-ধ্বনিত-লোকে যে নবরূপ ছটা বিচ্ছুরিত হইবে, তাহাতে সব অস্পষ্ট আলোক-ছায়া-কুহেলিকাময়ী মায়া বুটিয়া বাইবে। এই উদ্বোধন প্রভাতের দিয়া জ্যোতির পানে চাহিয়াই কবি গাইয়াছেন,—

“শুভ্রে নবীন সূর্য্যজাগে।

ঐ যে তাহার বিশ্ব চেতন কেতন আগে।

অনুচে নুতন দীপ্তি রতন তিমির মথন তরু-রাগে।

মশাল তম লুপ্তধূলার নিত্যদিনের স্তুতিমাগে।

আনন্দলোক দ্বার খুলেচে আকাশ পুলকময়।

জয় ভুলোকে, জয় ছালোকে, জয় আলোকে, জয়

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

পিতৃ-ভক্তি।

বুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই দুর্দান্ত জয়গণনে নান্নি আক্রমণ করিল। হটাত এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে নগরবাসীগণের আতঙ্কের আর সীমা রহিল না। নান্নির বুদ্ধ শাসন কর্তা নৃবকের ন্যায় পূর্ণ উদ্ভয় লইয়া মাতৃ ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নগরবাসীদিগকে প্রাণস্পর্শি ভাষায় স্বদেশের গৌরব কথা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপণে দণ্ডায়মান থাকিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। নাগরীকগণও বুদ্ধ শাসন কর্তার জীবন্ত ও জলন্ত উৎসাহ বাক্যে অশ্রু-প্রাণিত হইয়া শত্রুর গোলার সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দিয়া ঐতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পারিশে সংবাদ গিয়াছে, ঈতিমধ্যে তথা হইতে সৈন্যসাহায্য আসিয়া পৌঁছিলে তাহারাও পূর্ণ উদ্বেগে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারে; নতুবা অপ্রস্তুত অবস্থায় নগরবাসীগণের পক্ষে একরূপ প্রবল শত্রুর সম্মুখে মৃত্যু ব্যতীত অন্য উপায় আর কি থাকিতে পারে?

কুমারী টেলিসিয়া বুদ্ধ শাসন কর্তার একমাত্র কন্যা। এই মাতৃ হারা কন্যার আকর্ষণে বুদ্ধ সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারেন নাই; টেলিসিয়াও পিতার এমন 'বান্ধব' হইয়া পড়িয়াছিল যে পিতা ছাড়া এ বিশ্ব সংসারে সে আর কিছু বুঝত না; ক্রমে তাহার বয়স অষ্টাদশ অতিক্রম করিলেও সে তাহার পিতার স্নেহ বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া গিয়া পৃথক সংসার পত্তনের চিন্তা করিতে পারে নাই, পিতার সেবায় নিজের দেহ মন সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছে।

বিপদ অকস্মাত্ গৃহদ্বারে সমুপস্থিত দেখিয়া টেলিসিয়া পিতার সহিত বুদ্ধ সঙ্ঘায় সজ্জিত হইল এবং পিতার সুরে সুর মিলাইয়া নগরবাসীদিগকে প্রদীপ্ত-কণ্ঠে শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বুদ্ধ পিতা ও যুবতী পুত্রীর মুখে জগদ্ব্যমির গৌরব গাথা শ্রবণ করিয়া নান্নির আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আরো অধিকতর উৎসাহে মাতিয়া উঠিল, তাহারা তাহাদের অবরুদ্ধ অবস্থার বাধতীর দারুণ দুঃখ

কষ্ট, অভাব-অভিযোগ ভুলিয়া তাহাদের তীব্র পরিণামের জন্য সানন্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

জয়গণ সেনাপতি অনবরত চেষ্টা করিয়াও যথুন কিছুতেই সেই দুর্ভেদ্য নগর বিজিত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার সমস্ত ক্রোধ উগ্রমুষ্টি ধারণ করিয়া নান্নির শাসন কর্তার জন্য পুঞ্জিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে সেই হতভাগ্য শাসন কর্তাকে শুলে চড়াইয়া তাহার পোর অবিস্মৃৎকারিতার ফল প্রদান করিতে লাগিলেন।

উপর্যুপরি গোলার আঘাতে একদিন নগরপ্রাচীর উড়িয়া গেল। বাঁধযুক্ত জলস্রোতের ন্যায় শত্রু সৈন্য নগর প্রাণিত করিয়া ফেলিল। নান্নি অধিকৃত হইল।

নান্নির শাসন কর্তা কোথায়? সেনাপতির পুঞ্জিত ক্রোধ সেই বুদ্ধ শাসন কর্তাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইয়া গেল; কেহই তাঁহার খোজ বলিয়া দিল না।

সেনাপতি নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা—সকলকে শঙ্কিত করিয়া আনিয়া বলিলেন—“কে নান্নির শাসন কর্তা, তোমরা আমাকে বলিয়া দাও। আমি তাহাকেই চাই, তোমাদিগকে আমি মুক্ত করিয়া দিতেছি।”

বুদ্ধ শাসন কর্তা ও তাঁহার বীর চুহিতা সেই শৃঙ্খলিত জনগণের সহিত তথায়ই উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিল না।

জনমগুণী নীবব। সেনাপতি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া আদেশ করিলেন—“নগরবাসীদিগকে সমানে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান কর এবং সেই শ্রেণীবদ্ধ নরনারীর প্রতি দশম ব্যক্তিকে শুলে চড়াইয়া দিয়া তাহাদের পাপের সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতে দাও।”

সেনাপতির আদেশ কার্যে পরিণত হইতে চলিল। সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান করা হইল। পুনরায় সেনাপতির পূর্ব আদেশ সকলকে শুনাইয়া দেওয়া হইল—“কোথায় শাসন কর্তা বলিয়া দাও—তোমাদিগকে এখনই মুক্ত করিয়া দেওয়া যাইবে।”

তথাপি কাহারও মুখে কোন কথা ফুটিল না।

গণনা আরম্ভ হইল। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ। দশম ব্যক্তিকে পৃথক করিয়া সেনাপতির সম্মুখে নেওয়া হইল। সেনাপতি প্রশ্ন করিলেন—“মরিতেই প্রস্তুত আছ, না শাসনকর্তার খোজ বলিয়া দিবে?”

নাগরীক উত্তর করিল—“মরিব।”

সেনাপতি কোধ কল্পিত স্বরে বলিলেন—“তাহাই হউক।”

টেলিসিয়া পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। সে গণনা করিয়া দেখিল, তাহার পিতা গণনার দশম স্থানীয় হন। সে পিতাকে তাহা না বলিয়া হটাত সরিয়া পড়িল, এবং পুনরায় আসিয়া পিতার অপর পার্শ্বে দাঁড়াইবার স্থান করিয়া লইল এবং পিতাকে এক পা সরাইয়া দিল। বৃদ্ধ শাসন কর্তা হুহিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না, তিনি তখন তাঁহার সামান্য তুচ্ছ জীবনটীর জন্য যে কত নিরপরাধ মহৎ জীবন নষ্ট হইতেছে, আকুল প্রাণে তাহারই চিন্তায় বিভ্রত ছিলেন।

গণনা চলিয়া আসিয়া টেলিসিয়ার উপর পড়িল। দশম স্থানে টেলিসিয়া। টেলিসিয়া অগ্নান বদনে পিতার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছে। এইবার বৃদ্ধ পিতার চমক ভাজিল। তিনি তখন কত্নার স্থান পরিবর্তনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন।

বৃদ্ধ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—“আমিই দশম স্থানে ছিলাম, ‘অতএব আমিই বধ্য—আমাকেই তোমরা লইয়া যাও।’”

টেলিসিয়া আপত্তি করিয়া বলিল—“তোমরা যাহাকে দশম স্থানে পাইয়াছ, তাহাকেই লইতে আরম্ভ: বাধ্য; আমিই দশম স্থানে প্রাপ্ত—”

ঘটনা বিচার্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইলে উভয়ই সেনাপতির সম্মুখে নীত হইলেন।

টেলিসিয়া বলিল—“বহাশ্বর, আমাকেই দশম স্থানে পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং আমিই বধ্য।—”

বৃদ্ধ পিতা কত্নার কথার বাধা দিয়া বলিলেন—

“কে দশম স্থানীয় সে বিচার আর আপনাকে করিতে হইবে না, আপনি নগরের শাসন কর্তাকে অবশ্য করিতেছেন, আমিই সেই ব্যক্তি, আপনি আমার প্রতি আপনার অভিক্রটি যত শাস্তির ব্যবস্থা করণ, আমার এই তুচ্ছ জীবনের জন্য এতগুলি নিরপরাধ মরনারীর জীবন লইবেন না—আমার এই ভক্ত বিশ্বাসী নগরবাসীদিগকে ও এই পিতৃ-ভক্ত কণাকে ছাড়িয়া দিন—”

বৃদ্ধ শাসন কর্তার সৌম্য মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া ও পিতৃ-ভক্ত কত্নার অপূর্ণ পিতৃভক্তির কাহিনী শুনিয়া সেনাপতির পাবাণ হৃদয়ও সেই মুহূর্তের জন্য যেন জ্বলিত হইয়া গেল। তিনি কয়েক মিনিটের জন্য টেলিসিয়ার সরল অন্তর মুখখানির উপর তাঁহার স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া—অর্ধ কোষাঙ্গুষ্ঠ অসি ধীরে ধীরে কোষ বদ্ধ করিয়া বলিলেন—

“আপনার পিতৃভক্তিরই জয় হইল।”

ভারতে ইংরেজ ।

খ্রীষ্টীয় সোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ও দিনেমারগণ ভারতের বিপুল বিভবে অঙ্গপুষ্টিকরিত ছিল। ইংলেণ্ডের দৃষ্টিও এই উপলক্ষে শূন্য ভারতের বিস্তৃত ধন ভাণ্ডারের উপর নিপতিত হইয়াছিল।

কথিত আছে, ৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ও নাকি ইংলেণ্ডের রাজা আলফ্রেড ভারতীয় বস্ত্র সংগ্রহের জন্য সিগেলমাস (Sighelmus) নামক সেরবারণের বিশপকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ঐ বিশপ মহোদয় ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর ধনবস্ত্র ও সুগন্ধ মসলা দ লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

উপর্যুক্ত ঘটনা সত্য হউক কি মিথ্যা হউক—ভারতবর্ষ যে বস্ত্রগর্ভা একথা বৈদেশিকের নিকট চিরকাল বিদিত ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ—জলরাজ্যের অধীশ্বর, স্পেইন বাহুবল দৃষ্ট বিজয়ী নাবিক; এমম অবস্থায়

ইংলণ্ডের পক্ষে জলপথে প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে মনে করিয়া ইংলণ্ডীয় বণিকগণ ভারতে আগমনের নূতন পথ আবিষ্কারে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

তাহারা প্রথমতঃ এসিয়ার উত্তর উপকূল ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আগমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্ত ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিন খানা সুদূত জাহাজ লইয়া সার হিউ উইলবি ইংলণ্ড ত্যাগ করিলেন। তখন সমুদ্র পথে জল দস্যুর ভয়ানক উপদ্রব। উইলবি জল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া লেপলেণ্ডের উপকূলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তথায় নীতে ও অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার সঙ্গী রিচার্ড চেনসেলার একখানা জাহাজ লইয়া মকোনগরে প্রত্যাগমন করেন। এইরূপ পরীক্ষাতে ঐ পথ ভয়াবহ ও বিপদ সম্বুল বলিয়া পরিত্যক্ত হয় এবং ইংলণ্ডবাসীগণ নূতন পথ আবিষ্কারের উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত হন।

এই সময় কোন একব্যক্তি স্থলপথে রুব ও পারস্ত রাজ্যের উপর দিয়া ভারতবর্ষে আগমনের সহজ উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্ত অগ্রসর হন। আর একদল ইংরেজ স্থলপথে কাস্পিয়ান অতিক্রম করিয়া বোলদাদ নগর পর্যন্ত অগ্রসর হন; তাহারাত্ত ভারতবর্ষের সন্ধান করিতে না পারিয়া অবশেষে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। এইরূপে ইংলণ্ডের লোক অনেক চেষ্টা এবং বহু অর্থ নাশ করিয়াও অনেক দিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোনও খোজ ধরন করিতে পারেন নাই।

অধ্যবসায়ী ইংরেজ এইরূপে পুনঃ পুনঃ বিফল মনোরথ হইয়াও নিরাশ হইলেন না। পুনরায় জল পথে ঘুরিয়া ভারতবর্ষ প্রাপ্তির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

এবার আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া, আমেরিকার উপকূল ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসিবার কথা স্থির হইল। কাবোট, ডেবিস, ক্রবিসার ও হডসন এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু তাহারাত্ত সকল মনোরথ হন নাই। ১৫৭৬ হইতে ১৬১৬ পর্যন্ত ঐ পথ আবিষ্কারের চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই ঐ পথে ভারতে আসিবার উপায় নির্দ্ধারিত হয় নাই।

এদিকে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত নাবিক স্যার ফ্রেনসিস ড্রেক দক্ষিণ সমুদ্র-পথে ভ্রমণ করিতে অভিলাষী হন। তিনি, ইন্ডোপূর্বে পশ্চিম-দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকার উপকূল প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ঐ অর্থে পাঁচ খানা অর্ধবগোত বিবিধ সরঞ্জামে সজ্জিত করিয়া, ১৩ ডিসেম্বর প্লাইমাউথ পরিত্যাগ করিলেন। পর বৎসর আগষ্ট মাসে তিনি মেক্সেলন প্রণালীতে ও সে স্থান হইতে কামিগনিয়া গমন করেন। অতঃপর তিনি মালকা-প্রান্তরও নানা স্থানে ঘুরিয়া ১৫৮০ অক্টোবর ২০ শে সেন্টেবর প্লাইমাউথে উপনীত হইলেন। ইংলণ্ডের স্বরং এই ভূপ্রদক্ষিণ কার্যকে সম্মান স্বচক “নাইট” উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

ড্রেকের কৃতকার্যতার ইংলণ্ডের বণিকবর্গের উৎসাহ বর্ধিত হইল। অনেকে তাহার পদানুসরণ করিতে অগ্রসর হইলেন। টমাস কেবেন্ডিস নামক এক-ব্যক্তি তাহার বিপুল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রে পরিভ্রমণ মানসে বহির্গত হইলেন।

এদিকে ডিভেন্স নামক অনেক পর্তুগীজ কর্মচারী গোয়া নগরে আসিয়া ভারতের বিপুল ঐর্ষ্য অবলোকন করিয়া স্বদেশে তাহার এক বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের লোক ঐ বিবরণ কোন উপায়ে পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়া ভারতের জন্ত একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

তখন জন নিউবেরী ও রলফ্ ফিচের অনিধন্যকবে একদল ইংরেজ বণিক ভূমধ্যসাগর পথে ভারতবর্ষে আসিবার জন্ত ইংলণ্ডের তদানিন্তন রাণী এলিজাবেথের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাণী উৎসাহের সহিত অনুমতি প্রদান করিয়া দিল্লীর আকবরের নিকট ও চীন রাজের নিকট হইখানা অনুরোধ পত্র প্রদান করিলেন।

নিউবেরী ও ফিচ সহচরগণের সহিত ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহারাত্ত কতক দিন আলিঙ্গো ও বোম্বাদে কাটাইয়া বসোরাতে উপস্থিত হন এবং তথ্য হইতে অরমাজ বাইরা করিবার

করিতে আরম্ভ করেন । প্রথমে তাঁহার কোন বাধা জ্ঞাত হইলেন না । পরিশেষে মাইকেল ট্রোপন নামক জর্মন ইটালিয়ান বণিক তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন, তাহার বড়দয়ে পর্তুগীজরা নিউবেরী ও ফিচকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিল এবং তাঁহাদিগকে ভারতের পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া নগরীতে বিচারের জন্য পাঠাইয়া দিল ।

এইরূপ উপায়ে ইংরেজ প্রথম ভারতবর্ষের ভূমি স্পর্শ করিয়াছিলেন ।

সংগ্রহ ।

পতিরক্ত ।

সকল দেশেই যে দ্রোলোকগণই পুরুষের প্রতি অহরন্তর এবং সেই অহরন্তর যে সকল দেশেই সমপ্রমাণে বিজ্ঞান এমন নহে । পরন্তু সকল দ্রোলোকেই—যে সকল পুরুষের সহিত প্রেম মত্ত হয় তাহাও নহে । কোন একটি বিশেষ গুণের পক্ষপাতি হইয়া পুরুষের প্রতি নারী জাতি অহুবাগ প্রদর্শন করে । কথায় বলে “মাকুষ গুণে বশ” সর্বগুণ আবার এক ব্যক্তিত্ব সম্ভব নয় । গুণের মধ্যেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়, আবার গুণ গ্রাহকেরও ভিন্ন আভিরাচ । “ভিন্নাচিহ্নি মানবাঃ” সেই জন্য বিভিন্ন দেশের দ্রোলোকের পতি নির্বাচন সম্বন্ধে কি অভিরুচি কোন অভিজ্ঞ লেখকের লেখা হইতে আমরা নিম্নে তথ্য উদ্ধৃত করিলাম ।

ফরাসী বলাসিলীগণ বীর ও রসিক স্বামী কামনা করেন ।

জাফান রমণীগণ স্থির প্রণয়ী ও চিত্তবিন্যাসী পতিতে রত ।

ওলন্দাজ কামিলীগণ যে স্বামী নিরবচ্ছিন্ন সুখ স্বচ্ছন্দে রাবিত্তে পারেন, সেরূপ পতিতে রত । তাহার চান যে এই সুখ স্বচ্ছন্দে কেহ না বিয় উৎপাদন করে, ইহাতেই তাহার সুখী ।

শেন নারীরা বৈর নির্ঘাতনকারী স্বামী ভাল বাসেন ।

ইটালী রূপসীগণ কবিত্ব ও কল্পনাপূর্ণ ভক্তা লাভে যত্নবতী ।

দিনেমার ললনাগণ, স্বামী যদি তাহার বর্তনের দেশকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বসুখাধার বলেন তবে সেই স্বামীকে তাহার প্রাণ পছন্দ করেন ।

রুশিয়ার সীমানীগণ—স্বামী যদি ইউরোপের পশ্চিম বিভাগীক জাতিদিকে অসত্য ও দুঃভাগী বলিয়া ঘৃণা করেন, তবে সেইরূপ স্বামী—তাঁহাদের প্রণয় উপযোগী ।

ইংরাজ বীরসনাগণ ধনবান স্বামী চাহেন ।

আমেরিকার সোহাগিলীগণ বিজ্ঞানবিদ ব্যক্তিকে স্বামী-রূপে গ্রহণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে ।

নিগ্রো জীগণ বনবাসী স্বামী চান ।

আফ্রিকার সাকারাগণ নৃত্যগীত পারদর্শী স্বামীতে রত ।

নিউবিয়ার বয়বলীগণ যে স্বামী নানারূপ রসগ্রাহ্য বেশ সাজিতে পারেন, এমন পতিই ভালবাসেন ।

চীন নিতম্বীগণ চিত্রাঙ্কন ও কলাবিজ্ঞানভিত্তিক ভক্তা ভক্ত ।

জাপান বয়গণ বীর ও বাণিজ্যপ্রিয় পতি চান । তিস্ত লক্ষ্মীবা সঙ্কট ভাবাদয় ধারিক স্বামী লাভে দৃঢ়চিত্ত ।

ব্রহ্মদেশীয় দ্রোলোক শির বিজ্ঞা বিশারদ ভক্তা ভালবাসেন ।

কাশ্মিরী বিহুসীগণ সুসত্য স্বামীর সেবাপরায়ণা, মাড়বারি মেয়েরা স্বয়ংরত ও স্নেহভক্ত পতি গ্রহণে ব্যস্ত ।

পশ্চিমা নারীগণ বলবান পতি চান ।

বোম্বায়ের জীগণ বাঁশদার-দক্ষ পতি লাভে কৃতসঙ্কল্পা ।

মাদ্রাজ শ্রামালীগণ ইংরাজী ভাষা দক্ষ পতি প্রিয় ।

উৎকল যোবৎগণ মুখ অগচ কৃষিকার্যে পারদর্শী এমন স্বামী চান ।

বাঙ্গালী সতীগণ সন্ধ্যাপ্রাপ্তি গহনী দিতে পারেন এমন স্বামী পছন্দ করেন ।

আসামী শূকেশিনীগণ বদেন ভক্ত ভক্তা ভক্ত । গারো মেয়েরা প্রতিহিংসাপরায়ণ পতিতে রত ।

বঙ্গিয়া ও জয়ন্তীয়াগণ বন বিদ্যেভাবাপন্ন স্বামী চান ।

আরব সুগোচনাগণ—পার্বত্যবাসী স্বামী ভালবাসেন ।

কোল ও ভীল নারীগণ শত্রুদলনে সক্ষম স্বামীর সঙ্গ চান ।

রাজপুত রমণীরা বীর ও অচল প্রতিজ্ঞ স্বামী ভক্ত ।

জাট কুলকামিলীগণ সমরদক্ষ পতির পক্ষপাতিনী ।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় ।

সৌরভ

অষ্টম বর্ষ।

ময়মনসিংহ, ভাদ্র ১৩২৭।

একাদশ সংখ্যা।

“চিত্রাঙ্গদা” কাব্য প্রসঙ্গ।

পুরাতন ‘সাহিত্য’ পত্রের পাতাগুলি উন্টাইতে উন্টাইতে ৮ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের “কাব্যো নীতি” শীর্ষক প্রবন্ধে রবি বাবুর ‘চিত্রাঙ্গদা কাব্যের’ বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহার উপর চোখ পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রসিদ্ধ কবি-সমালোচক অক্সফোর্ডের The Critic as Artist নামক গ্রন্থের কলাকুশলতা ও সমালোচনী শক্তির বিভিন্নতা বিষয়ক মন্তব্যগুলির কথা মনে পড়িল। বস্তুতঃ, সর্বস্বতোমুখী প্রতিভার আধিকারী ছ’চার জন সৌভাগ্যবান সাহিত্যিকের কথা ছাড়িয়া দিলে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি এবং রসগ্রাহিনী সমালোচনী শক্তির একত্র সমাবেশ কদাচিত্ দেখিতে পাওয়া যায়। হংরাঞ্জি সাহিত্যে ডাইডেন্ কল্লিঙ্ক, জার্মানিতে গোটে, আমাদের দেশে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও কাব্য-সমালোচক বটেন। কিন্তু সচরাচরই দেখা যায়, প্রত্যেক কবির কাব্য-লক্ষ্যই যেন এক একটি সীমাবদ্ধ বিশিষ্ট গুণের ভিতরে নিচরণ করেন, যাহার বাহিরের সমুদয় জগৎ তাহার নিকট অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, অথবা কুৎসিত অনাস্থ্যই মাত্র। এবং ইহার কারণও ওয়াইল্ড নির্দেশ করিয়াছেন এই যে, শ্রেষ্ঠ কবিদের সমুদয় মানসিক শক্তি ও কল্পনাশক্তি নিজ নিজ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রেরণায় অন্তর্মুখান হইয়া জড়গত আদর্শের মধ্যে একরূপ ঘনিষ্ট ভাবে আবদ্ধ, ও কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে যে অন্তবিধ আদর্শের সম্ভাবনীয়তাও তাহারা কল্পনা করিতে পারেন না। এজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, যখনই কোন প্রতিভাবান কবি

অপর কবির কাব্য সমালোচনা করিতে গিয়াছেন তখনই গুরুতর ভ্রম প্রমাদে পড়িয়াছেন। শেলী, বায়রন্, ওয়া-র্ডস্-ওয়ার্থ, এমন কি দিব্যদৃষ্টি মিল্টনেও এই ত্রুটি লক্ষিত হয়। আমাদের দ্বিজেন্দ্রলালও প্রতিভার ঐ স্বাভাবিক সীমাতার গভী অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার আর সহ্য শ্রেষ্ঠ-তাই থাকুক না কেন, রবীন্দ্রনাথের বাহা বিশেষত্ব—প্রবর অদৃষ্টি, মানব-হৃদয়ের স্ফুর্তি-স্বপ্ন তত্ত্বসমূহের অপরোক্ষ অনুভূতি, এবং তাহা বিশ্লেষণের অনাধারণ শক্তি, তাহা তাঁহাতে (দ্বিজেন্দ্রলালে) নাই। রায়-কবিকে সাধারণ ভাবে Narrative poet, বর্ণনা-কুশল কবি—বলা যাইতে পারে। যে সকল বাহ্য ঘটনাবলী, কিংবা স্থল অনুভূতি সাধারণের হৃদয় মনের অধিগম্য, তাহার বিশদ মনোহারী শব্দচিত্র অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত।—তাঁহার সরল হৃদয়ের আন্তরিকতার সংযোগে ঐ সকল বিষয়কেই তিনি সঙ্গীত-ময় ছন্দবৈচিত্রে এবং সরল আবেগময়ী ভাষার উজ্জল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এজন্যই তাহার ‘হাসির গান’ এবং স্বদেশ-প্রীতি-মূলক সঙ্গীত-ও নাটকগুলি অপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু, কোন্ কোন্ গুপ্ত গিরি-গহ্বরের বাসনা-পঙ্কিল, আবদ্ধ-বারিরাশি হইতে কী রেখার করিত হইয়া কত বহুর নৈল পথের উপর দিয়া বহিয় কত রাসায়নিক পদার্থের সহযোগে বিসৃজ্য হইয়া পরি শেষে মানব-প্রেম পাবনী স্রবধুনীতে পরিণত হয়,—মানব জীবনের ভিতরকার ইতিহাস কৃত বিরোধ-সংগ্রাম, ক আশা ও ছায়া, পাপ ও পুণ্য, উত্থান-পতন, কত আশা

নৈরাশ্য, অশ্রু ও হাস্য, কত মিলন ও বিরহের সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠে—এই সকল গূঢ় কাহিনী রবীন্দ্র নাথের কাব্যে কত চিত্রিত রাগিনীতে সঙ্গীত ময়ী মূর্তি প'রগ্রহ করিয়াছে; অথচ এ সকলের আভাষ-ইঙ্গিত স্বিকল্পদ্বারায় কাব্যাদিতে পাই না। বস্তুতঃ যেখানেই স্বিকল্পদ্বারায় চিত্রিত চিত্রিত করিতে গিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে দেখিতে পাই। দুষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার নুরজাহান চরিত্র এবং 'সিংহল বিজয়ে' বিজয় সিংহ চরিত্রের উল্লেখ করা যাউতে পারে। প্রতিভার এই বৈষম্য হেতু স্বিকল্পদ্বারায় রবীন্দ্রনাথ 'যেতে নাহা দব' উপভোগ করিতে পারেন, 'গোরার' সৌন্দর্য্য এবং ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের আদর্শ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু "চিত্রাঙ্গদা" এবং অপরপর যে সকল অল্পম কাব্যাদিতে রবীন্দ্রনাথ মানব হৃদয়ের অতলে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিকট দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট, তুর্নীতিপূর্ণ। এজন্যই তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের অর্জুনকে "জঘন্ত পশু," কুমারীর ধর্মানাশ-কারী, এবং চিত্রাঙ্গদাকে ব্যাভিচারিণী উপাচিকা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রেষ্ঠ কাব্য-রসিক ও প্রিয়নাথ সেন "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যের সৌন্দর্য্য এবং স্বিকল্পে বাবুর অভিযোগগুলির ভিত্তিহীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে আর একটু আলোচনা বোধ করি বাহ্যিক হইবে না। স্বিকল্পে বাবুর মতের অযাযাতি এবং অযাযাতি পরীক্ষা করবার পূর্বে উক্ত কাব্যের গল্পাংশটিকে কাব্য-সৌন্দর্য্যের পরিবেষ্টন হইতে পৃথক করিয়া অল্পসরণ করিব। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা বুঝবার সুবিধা হইবে।

অপুত্রক মনিপুররাজের একমাত্র দুহিতা, পুত্ররূপে পালিতা ও শিক্ষিতা চিত্রাঙ্গদা—যে অস্ত্রপুরবাস কিংবা লক্ষ্যভঙ্গ কাহাকে বলে জানিত না, যে স্বপ্নের 'পুষ্পধ্বজ' মনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোমল' তার কোন সন্ধান পাইতে নাই, যে শিখিয়াছিল শুধু ধর্ম্মবিজ্ঞান আর পুরুষের বশে যেচ্ছামত ব্রতীয়া ফিরিয়া যুগ্মজীবনে রাজকাব্যে চলিতে—সেই চিত্রাঙ্গদা ঘটনাচক্রে কিংবা কামদেবের প্ররোচনায় বিধানে মনিপুরের দুর্গম অরণ্যপথে ব্রহ্মচারী

ব্রতধারী বিশ্বজগী অর্জুনকে দেখিতে পাইল; আর যেই দেখিল, সেই মুহূর্ত্তে আবাল্যের সকল শিক্ষা দীক্ষা ভুলিয়া গেল—সেই "বীর্ষাশেল-শূঙ্গ প'রে নিত্য একাকিনী রমণী" এই প্রথম জানিল সে নারী, এই প্রথম দেখিল, সমুদ্রে পুরুষ মূর্ত্তি। এই অঘটন সংঘটনের হেতু স্বয়ং কামদেবই প্রকাশ করিয়াছেন—

'আমিই চেতন করে' দিই

একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষেণে

নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।'

তাই সেই পুরুষপ্রাণ, পৌরুষসত্তাব নারী তার নারী প্রকৃতি ফিরিয়া পাইল,—তার শৌর্ষাবীর্ষ্য স্পর্শাগর্ভ মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল, সে পার্থের চরণে আত্ম-সমর্পণ করল।

চিত্রাঙ্গদাত আত্মসমর্পণ করিল, কিন্তু সে যে কুরূপা। তাই তার শুধু "বীর্ষ্যমস্ত্র অস্ত্রের বশে," "কিনাদিত কঠিন বাহির" বন্ধনে পুরুষ আদিম্যধরা দবে কেন? মধুহীন কুম্ভের জ্বর কুরূপার প্রেমকে অর্জুন-হৃৎ প্রত্যাখ্যান করিল;—লজ্জা বজ্রের মত চিত্রাঙ্গদার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার নারী মর্ম্মস্পর্শ দারুণরূপে আহত হইল। কিন্তু এই আঘাতে তার সকল দম্ব টুটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার এই জ্ঞানেরও উদয় হইল, অবলার বল, নিরস্ত্রের অস্ত্র, নারীসৌন্দর্য্য তাহার নাই। সে বুঝিল—

'অবলার কোমল মৃগাল বাহু দুটি

এ বাহির চেয়ে ধরে শতগুণ বল।

ধন্য সেই মুক্কা মূর্ত্তা ক্ষীণতমূলতা

পরাবলম্বতা, লজ্জাভয়লীনাসিনী

সামান্য ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে

মানে পরাভব বীর্ষ্যবল, তপস্তার

ভেজ।'

চিত্রাঙ্গদা তার কুমার হৃদয়ের নবীনোচ্ছল প্রেমের অপ-
মানের বেদনার আজ প্রথম বুঝিল—

"রমণীত—

সহজেই অস্ত্রবাসিনী, সলোপনে

থাকে আপনাতে; কে তারে দেখিতে পায়,

হৃদয়ের প্রত্যাঘাত দেহের শোভায়

প্রকাশ না পায় যদি।'

তাই, ‘শুভ প্রেম’ কবিতার কুরুপা নারীর সেই বাণিত
কল্পই যেন চিত্রাঙ্গদার জন্ম মথিত করিয়া উঠিতেছে—

“তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে

রূপ না দিলে যদি বিধি হে!

পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,

পূজিব তারে পিয়া কি দিয়ে!

মনে গোপনে থাকে প্রেম যায় না দেখা,

কুসুম দেয় তাই দেবতায়।

দাঁড়িয়ে থাকি যারে চাহিয়া দেখি তারে

কি বলে আপনারে দিব তার।”

কিন্তু চিত্রাঙ্গদা ত দীনা, লীনা অন্তরবাসিনী রমণী নহে,
যে সে ‘মনের অঙ্গকূপে’ আপনার জন্ম-কল্পানী প্রেমকে
শুভ বাখিয়া স্বয়ংভাবে অদৃষ্টের অব্যর্থ দান বলিয়া গ্রহণ
করিবে? চিত্রাঙ্গদা বীরঙ্গনা, পুরুষকার কাণকে বলে
তাঁহা সে জানে, তাই আপনার বীর্যমন্ত্র অস্ত্রের বলে
প্রেমসাধনায় সিদ্ধ হইয়া অস্ত্রের নারীকে সার্থক করি-
বার জন্য তাঁহার এই অটল সঙ্কল্প :—

“এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে;

যে নারী নিকরী ধৈর্য্যে চির মর্ম্মব্যথা

নিশীথ নয়ন জলে করয়ে পানন,

দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসি তলে,

আজন্ম বিষবা, আমি সে রমণী নাহ;

আমার কামনা বড় হবে না নিকল!

আপনারে বারেক দেখাতে পারি যদি,

নিশ্চয় সে দিবে পরা!”—

তাই চিত্রাঙ্গদা ‘অম্বদাতা’ বশীতার পিনাদোষে অত্যাশ
নারীর কুরুপা স্ফটিক জন্মদেবতার পূজার জন্য মৌন্দর্য্য-
কুসুম লাভ করিবার অনন্ত কঠোর ব্রত ধারণ করিল,
এবং তপস্তার তাপে যৌবনকুসুম থিন্ন মলিন করিয়া দেহ-
তার প্রসন্নতা লাভ করিল। ভুবন-বিজয়া কামদেব ও
ঋতুরাজ বসন্তের বরে, এখন চিত্রাঙ্গদা অপূর্ণ সুন্দরী হইয়া
উঠিয়াছে, যেন মৃত্তকের মাঝে অনন্ত বসন্ত তার অক্ষয়
ভাঙারের সমস্ত সৌরভ-শোভা চিত্রাঙ্গদার সর্বাঙ্গে মাথাইয়া
দিল, দেখিতে দেখিতে নবীন যৌবনোচ্ছ্বাসে তার সর্ব
দেহ ‘লক্ষ্মীর চরণসঙ্গ পায়ের মতন’ অপূর্ণ পুলকভরে

প্রস্ফুটিয়া উঠিল। সেই পূর্ণেশ্বর কুরুপা, প্রত্যাখ্যাতা
চিত্রাঙ্গদাই এখন আবার আপনার দেবদত্ত সুদর্ভ
মৌন্দর্য্যের অর্থা লইয়া অক্ষয়ের কাচেন্টপস্থিত হইল,
তখন সেই সন্ন্যাসী অক্ষয়ই মৃত্তকের মাঝে তাঁহার জন্ম-
ঘরে ‘প্রেমার্ঘ্য অতিথি’ হইয়া প্রার্থনা জানাইলেন :—

“যে হলভ লোকে

করেছে তাহ’রে স্থান দান, সেথা হতে

আর তা’বে কোনোনা বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য

সংসর্গ হতভাগা সম।”

অক্ষয় ত আশিয়া ধরা দিল,—তাঁহার সকল পৌরুষগর্ভ
বীরবে’ নিত্যকীর্তিভূষণ, পূর্বমৌন্দর্য্যকপিণী চিত্রাঙ্গদার
চরণে প্রেম সমর্পণ করিল :—“পশুরাজ সিংহ যথা সিংহ-
বাদিনীত ভুবনগঞ্জিত অরুণ চরণ তলে লুটাইয়া পড়ে’
সেইরূপ আপনার সর্গস্ব লইয়া চিত্রাঙ্গদার চরণে লুটাইয়া
পড়িল;—কিন্তু কই, চিত্রাঙ্গদাকেত এবার বাসনার বাণ
অটম্বো আপনার জন্মদেবতাকে একেবারে বক্ষে
আঁকড়িয়া ধরিতে দেখি না? কেন? এই ঔদাসিন্যের,
এই প্রত্যাখ্যানের কারণ কি প্রতিহিংসা রুত্তি, অথবা
লব্ধ চিত্রাঙ্গদার প্রেমের ছন্দা কলা মাঝ? এই প্রত্যা-
খ্যানের মুখে তাঁর নারীমর্যাদাবোধ, প্রেমকে উপেক্ষা
করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অক্ষয়ের তুচ্ছ রূপের প্রতি লালসা
দেখিয়া দারুণ মর্ম্মব্যথা, মিত্যাক্রোধ দ্বারা সত্য নারী-
জন্মের মৌন্দর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অত্যাধম;
এবং সংকীর্ণতা, আহত অভিমানের সঙ্গে ভেমের, সম্পূর্ণ
স্বাধীন মর্প্পনক্ষার স্বত্ব—এই সকল প্রবির মনোরমির
পাশ্চাত্যাত্মত দেখিতে পাঠ বসন্ত : চিত্রাঙ্গদার এই
প্রত্যাখ্যান বর্ণনার প্রতি বর্ণে কবি অতি গোপনে চিত্রা-
ঙ্গদার ঈকান্ত নারী মাহাত্ম্য, তার জন্মের প্রশস্ততা,
যে’র সমুচ্ছিন্ন স্তম্ভক করিয়া আমাদিগকে দেখা-
ইয়াছেন :—

“ধিক্, পার্ধ ধিক্!

কে আমি, কি আছে খোর, কি দেখে খেঁচুনি,

কি জানি আমারে! কার লাগি আপনারে

হেঁচছে বিশ্বস্ত! মৃত্তকে সত্য ভঙ্গ

করি, অর্জুনের করিতেছ অনর্জুন
কর তরে ? যোর তরে নহে । এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে ; এই দুটি
নবনী-নিন্দিত বাহুপাশে সবাসাণী
অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করে' ফেলে' সত্যের বন্ধন ! কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা ! কোথায় রহিল পড়ে'
নারীর সন্ধান ! হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
অগম্যায়ী ! এতক্ষণে পারিলু জানিতে
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব ভোমার !

— যাও যাও ফিরে

যাও, ফিরে যাও বীর মিথ্যারে কোরোনা
উপাসনা । শৌর্য্য বীৰ্য্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়োনা মিথ্যার পদে । যাও, ফিরে যাও !”

অর্জুনের প্রতি এই কঠোর সংসনার ভিতরকার

অর্থ :— অপবিত্র ও করপন্ন
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে ;
মনে কি করেছ বঁধু
ও হাসি এতই মধু,
প্রেমনা দিলেও—চলে
ওধু হাসি দিলে ?

কিন্তু চিত্রাঙ্গদা কি এতই হৃদয়হীনা যে আত্মাভি-
মানকেই বড় করিয়া অর্জুনকে ফিরাইয়া দিয়া থাকিতে
পারে, যে অর্জুনের অক্ষয়নাম সমস্ত জগৎ হ'তে লুপ্ত
করিয়া তার সমস্ত কুমারীহৃদয়কে পূর্ণকরিয়া লুকাইয়া
রাখিয়াছে ; যে অর্জুনের নয়নের দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহ
হ'য়ে তাহাকে কাঁড়িয়া লইতে চাহিতেছে,—যাহার উত্তম
হৃদয় সর্লাজ টুটিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতে চাহি-
তেছে, যাহার অন্তরের ক্রন্দন-ধ্বনি যেন প্রতি অঙ্গে
ধ্বনিত হইতেছে ? আর, মান-অপমান, লজ্জা-সম্মান
সম্প্র-ব্যথা—সর্ব্বত্র যদি হৃদয়-দেবতার চরণে উৎসর্গ
করিতে না পারিলাম তবে আর প্রেম হইল কই ? তাই
চিত্রাঙ্গদা তার রূপের সপত্নীকে বহুস্তে সাধাইয়া নিজের

আঁকাঙ্ক্ষা-তীর্থের বাসর-মন্দির পাঠাইয়া প্রতিজন অন্ত-
রের অবমাননা ও দেহের সোহাগ দেখিয়া হিংসানলে
নারী-হৃদয়টিকে আহুতি দিয়া অর্জুনের ভোগ-তৃষা
মিটাইতে স্বীকৃতা হইল ।

এইরূপে অর্জুন চিত্রাঙ্গদার মিলন, দেহের সঙ্গে
দেহের মিলন সংঘটিত হইল । তারপর বর্ষব্যাপী সন্তো-
গ-কামনার তৃপ্তিহীন অনলে অবিশ্রাম আহুতি দান,—রাজা
অধরের অমৃত-বিষেতে মাখা তপ্ত মদিরা পান, বাহুবন্ধে
বন্দী হয়ে এণয়ের সুধাময় চিরপরাঙ্গর, রাঙা পরনের
রসে প্রবাস দিবসগুলি গঁথে গঁথে গ্রিয়-কণ্ঠে মালা
দান, রূপের চঞ্চলা বায়া মূর্খীর পশ্চাৎ বাসনার মদমত্ত
কুরঙ্গের উর্দ্ধবাস প্রদান । কিন্তু এই ভোগের মধ্যে
রহিয়া রহিয়া ভোক্তার হৃদয় কাঁটিয়া অতৃপ্তির দীর্ঘ শ্বাস
গুণিতে পাই, এই সৌরভের বেড়া ভাঙ্গিবার জন্ত,
স্বপনের জাল ছিন্ন করিবার জন্ত, স্রবের সাগরে ডুবিতে
ডুবিতে কোথাও টাঁই না পাইয়া, রক্ত শ্বাস হইয়া মৃত্যিকার
জন্ত পরাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে—

বাধীন করিয়া দাও বেঁধনা আমার,—

বাধীন হৃদয় থানি দিব তব পাশ ।

—কড়ি ও কোমল ।

কারণ, শুধু দেহের কণিক সৌন্দর্য্য, ‘কেবল মেঘের
সুবর্ণ-ছটা, গন্ধ কুসুমের, তরঙ্গের গতি’ ‘কিংবদন্তের’
একটি-পল্লব-প্রান্তভাগে একটি শিশির কণা, কি মানব-
হৃদয়ের অনন্ত আঁকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিতে পারে ?
মানুষের অন্তহীন তৃষা কি এই হাসিটুকু, এই কথা
টুকু, নয়নের দৃষ্টিটুকু, প্রেমের আভাস টুকুতে সন্তুষ্ট থাকিতে
পারে ? সে যে চায় সমগ্র-মানব হৃদয়টিকে নিঃশেষে
আপনার আত্মার মধ্যে লাভ করিতে । যে পর্য্যন্ত
মানুষের এই হৃদয়, আত্মার রহস্ত লোকে প্রবেশ
করিবার জন্ত দুর্ভাগ্যবান, না সফল হইয়াছে সে পর্য্যন্ত
তার হৃদয়ের ক্রন্দন শান্ত হইবার নহে । তাই বতই
চিত্রাঙ্গদা—

“হায় হায়, আঁক এত হয়েছে অন্ধটি

নারীর সৌন্দর্য্যে, নারীতে খুঁজিতে চাও
পৌরুষের বাদ” ইত্যাদি—তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে অর্জুনের

ব্যক্তি হৃদয়কে বিদ্ধ করিতেছে ততই বাসনার মায়ালোক
বর্জন করিয়া চিরন্তন প্রেমের ধ্বলোকে সত্যের আশ্রয়
পাইয়া আত্মাকে মুক্তিদান করিবার জন্য অর্জুনের সমস্ত
অস্ত্রায়া অসহ্য বেদনার অধীণ হইয়া উঠিয়াছে :—

“বুঝিতে পারিনে

আমি রহস্ত তোমার ! এত দিন আছি,
তবু যেন পাইনি সন্ধান ! তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা ;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অস্ত্রায়ে থেকে, আমারে করিছ দান
অমূল্য চূষন-রত্ন,—আলিঙ্গন সুখা ;
নিজে কিছু চাহনা, লহনা । অঙ্গহীন
ছোঁহীন প্রেম প্রতিফলে পরিতাপ
জাগা ! অন্তরে ! তেজস্বিনি, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায় ।
তার কাছে এ সৌন্দর্য্যরাশি মনে হয়
মুক্তিকার মূর্তি শুধু, নিপুণচিত্রিত
শিল্প যবনিকা ।”

তাই অর্জুনের হৃদয়ের প্রার্থনা :—

“সাধকের কাছে প্রথমেতে প্রাপ্তি আসে
মনোহর মায়া কায়া ধরি ; তার পরে
সত্য দেখা দেয় ভূষণ বিহীন রূপে
আলো করি অন্তর বাহির ! সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তাহে ।
আমার যে সত্য তাই লও । প্রাপ্তিহীন
সে মিলন চির দিবসের ।”

প্রার্থনা পূর্ণ হইল, দেহের মিলনের পর এতদিনে
আত্মায় আত্মায় পূর্ণমিলন সজ্জাটিত হইল—মধু যামিনীর
বোবনোৎসবের অবগানে ‘অক্ষয় অমর রমণী’ নির্মল
দিবালাকে অবগুষ্ঠন মুক্তা হইয়া আপনার নগ্ন মাধায়ে,
পুণ্য জ্যোতিতে শুভ কলাগী মূর্তিতে প্রকাশিত হইলেন ।
বোবন-দেবতা ধুয়াব বসন্তের সেই আশাস বাণী—

“ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাল
তখন প্রকাশ পায় কল । যথাকালে
আপনি করিয়া পরে যাবে তাপক্লিষ্ট

লবু লাবণোর দল ; আপন গৌরবে
তখন বাহির হবে ; হেরিয়া তোমারে
নূতন সৌভাগ্য বলি মানিবে কানুনী ।”
সফল হইল—অর্জুন ধন্য হইল ।

(আগামীবারে সমাপ্য) ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর ।

প্রান্তা ১

সই, পেলেত এখন পরিচয় ?
নন্দের ছালিয়া, চিকণ কালিয়া
বড়ই কুটিল কু আশয় !
কি কহিব সই, করমের লেখা,
নহিলে সবি ত চক্ষে মোর দেখা—
বাঁকা কটি খানি ছিলত না ঢাকা ?
বাঁকা সে নয়ন ঘর ?
বাহিরে গে জন কুচকুচে কালো,
সে কিলো কখন হ’তে পারে ভাল ?
চাহনিটা তার বাঁকা চির কাল,
বুঝিছ না সে সময় !

পিরীতি করিয়ে লম্পটের সনে
ফিরিতে হইল শুধু বনে বনে ?
প্রদোশে এসেছি তার অধেষণে—
এখন অরুণোদয় !

জাগে নাই কেহ, এই অবসরে
চল সাধি, যাই নিভ নিভ ধরে,
ভ্রমলে হবে কি পুলিন উপরে ?

কালো অতি নিরদয় !
চল মোরা গিয়ে যমুনাত্তে নাই,
ঝাপ দিয়ে জলে এ আলো জুড়াই,
বাসি ফুল মালা ভাসাইয়া বাই,
আছেত কলঙ্ক ভয় ?

শ্রীমহেশচন্দ্র তট্টাচার্য্য, কবিভূষণ ।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ।

মগধ অতি প্রাচীন রাজ্য। মগধভারতের সময় এইখানে জরাসন্ধ রাজত্ব করিতেন। পাণ্ডবদিগের রাজত্ব যজ্ঞে ইনি যোগদান করিতে অস্বীকার করিতে ভীমসেন ইঁহাকে মল্লযুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাজগৃহ বা রাজগিরি বা গিরিপ্রজ মগধের রাজধানী ছিল। তাহার পর আমরা মগধাধিপতি শিশুনাগের নাম শুনিতে পাই। এই বংশের প্রথম নরপতি বিষ্ণু-সার বা শ্রেণিক এক নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহার সময় অঙ্গ রাজ্য (আধুনিক ভাগলপুর ও মুন্সের) মগধের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইঁহার অজাতশত্রু নামক এক পুত্র ছিলেন। ইনি বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সময় শাকা যুনি মগধে নবধর্ম প্রচার করিতেছিলেন। তিনি এই মহাপাণের কথা শুনিয়া অজাতশত্রুর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে নানা প্রকার ভৎসনা করেন। গঙ্গার উত্তর দিকে ঐ সময় লিচ্ছবি নামক এক অতি পরাক্রান্ত জাতি বাস করিত। ইহারা সুযোগ পাইলেই নদী পার হইয়া মগধে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিত। অজাতশত্রু ইহা নিবারণের জন্য গঙ্গার তীরে এক দুর্গ বেষ্টিত নগর স্থাপন করেন। ইহাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাটলিপুত্র।

প্রাচীন কালে আমাদের দেশে কোশল নামে এক রাজ্য ছিল। অযোধ্যাপতি ত্রীরামচন্দ্রের মাতুল ইহার অধিপতি ছিলেন। এক সময় সমগ্র অযোধ্যা এবং গঙ্গা গওক ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত স্থান কোশল রাজ্যের অধীন ছিল। ক্রমে ক্রমে এই বিপুল রাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

উপযুক্ত শিশু নাগের বংশে মহানন্দ নামে এক জন রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার ঔরসে ও এক সূত্রার গর্ভে মহাপদ্ম নন্দ জন্মিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, এই মহাপদ্মের সূত্রার পর তাঁহার আটজন পুত্র মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের কথা আমরা পূর্বপ্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি।

ইনি মগধ হইতে বিতাড়িত হইবার পর পঞ্জাবে যাইয়া আলেকসন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গ্রীকবীর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পর চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। আলেকসন্দরের পরিত্যক্ত গ্রীক সৈন্য সকল তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া ক্রিয়দংশ স্বদেশাভিমুখে চলিয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ এইখানে থাকিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়া যায়। ইহার পর চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজ্য আক্রমণ করেন এবং নন্দদিগকে পরাজিত ও নিহত করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। কথিত আছে, এই ব্যাপারে চাণক্য (কোটীয়া বা বিষ্ণুগুপ্ত) নামক জনৈক ব্রাহ্মণ চন্দ্রগুপ্তকে বিশেষ সাহায্য দান করেন। নন্দ ভূপতিয়া এই ব্রাহ্মণকে কোনও সময় অপমানিত করিয়া ছিলেন বলিয়া তিনি চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সর্বনাশ সাধন করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৃত্যু নাশি জনৈক নীচ জাতীয়া রমণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন বলিয়া তাহার বংশ ইতিহাসে ‘মৌর্য’ বংশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

ঐ সময় ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্তের ছাত্র ক্ষমতা-শালী আর কোনও নরপতি ছিলেন না। তাঁহার অধীনে ৩০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০০ কস্তা সৈন্য, ২০০০ রথ এবং ৬০০০০০ পদাতি সৈন্য ছিল। ইঁহার সাম্রাজ্য পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ দিকে নন্দয়া, উত্তর দিকে হিমালয় এবং পশ্চিম দিকে হিন্দুকুশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আলেকসন্দরের মৃত্যুর পর এশিয়া খণ্ডের সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার দুইজন সেনাপতির—এটিগোনশ এবং সেলিউকস্ নিকাটর—মধ্যে বিভাদ আরম্ভ হয়। প্রথমে বিজয় লক্ষ্যে এটিগোনশের প্রতি প্রসন্ন হয়েন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে (খ্রীঃ পূঃ ৩১২) সেলিউকস্ নতুন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ স্থান অধিকার করেন। পাঠক জানেন, আলেকসন্দরের ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পর চন্দ্রগুপ্ত পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়েন। সেলিউকস্ তাঁহার নিকট

জনৈক দূত পাঠাইয়া সিন্ধু নদের পশ্চিম কুলস্থ সমস্ত স্থান ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার এই অনুরোধে কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করিলেন না। সেলিউকস আলেকসন্দরের অতি প্রিয় সেনাপতি ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের এই ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এক বিশাল সৈন্যদল লইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। সিন্ধুর পূর্ব তীরের কোনও এক স্থানে হিন্দু সৈন্য গ্রীক সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। কয়েক ঘণ্টা ভীষণ যুদ্ধের পর সেলিউকস সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হইলেন। পরাজিত সৈন্যের সহিত প্রাচীন হিন্দুশক্তি কোনও দিন শত্রুর আয় ব্যবহার করিতেন না। তাহা যদি করিতেন, তাহা হইলে সে দিন সিন্ধু তীর হইতে বোধ হয় এক জন গ্রীকও স্বদেশে ফিরিয়া যাইত না। তাহার পর উভয় পক্ষ সন্ধি করিলেন। “ইহার সর্তীকৃত্যে চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশ লাভ করিলেন এবং সেলিউকসের এক কন্যাকে তিনি পত্নী-ভাবে গ্রহণ করিলেন। শত্রুরের সম্মানার্থ মগধরাজ ৫০০ অশিক্ষিত হস্তী তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

আলেকসন্দরের দিগ্বিজয় কাহিনী গ্রীক ইতিহাস লেখকেরা অতি বিবদ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেলিউকসের কাহিনী বিবৃত করা তাঁহার আবশ্যক মনে করেন নাই। এই গ্রীক সেনাপতি যদি বিজয় লাভ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কখনও এ বিষয়ে এ প্রকার উদাসীন থাকিতেন না।

সন্ধি হইবার পর সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তের নিকট এক জন দূত প্রেরণ করেন। ইতিহাসে ইনি মিগাস্থিনিস নামে প্রসিদ্ধ। ইনি কয়েক বৎসর মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে বাস করিয়া মগধ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক কথা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার এই ইতিহাস হইতে আমরা চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার সাম্রাজ্য সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারি।

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য সম্বন্ধে মিগাস্থিনিস লিখিয়াছেন :—

পাটলিপুত্র—এই মহা নগরী গঙ্গা ও সোন নদীর

সম্মিলনে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ইহা নয় মাইল ও প্রস্থে প্রায় দুই মাইল। ইহার চারিদিক অদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। সমগ্র নগরের মধ্যে ৩৪৮৮ ফটক; ঐ প্রাচীরের মধ্যে ৫৭০টি তোরণ নির্মিত হইয়াছিল। সমস্ত সহর অতি গভীর খাত দ্বারা সুরক্ষিত।

মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত যখন বাহিরে আসিতেন, তখন স্বর্ণনির্মিত ও মাণ্যযুক্তাশ্বচিত শিবকা ব্যবহৃত হইত। তাঁহার পারিচ্ছদ এমন সুন্দর ছিল যে, মিগাস্থিনিস তাঁহা বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যখন মহারাজ স্বয়ং সাম্রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হইতেন, তখন প্রায়ই হস্তী ব্যবহার করা হইত। সাম্রাজ্য দূর যাইতে হইলে কখন কখন অশ্বে আরোহণ করিতেন। চন্দ্রগুপ্ত হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, বণ্ড প্রভৃতির যুদ্ধ দেখিতে খুব ভালবাসিতেন। কখন কখন এই সকল জন্তুর সহিত মনুষ্যের যুদ্ধ হইত। এবং ইহাতে জয়লাভ করিলে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হইত। অনেক সময় ১২ ০০০ হস্ত পরিমিত ভূমি গোলাকারে ঘেরা হইত। ইহার মধ্যে বড় বড় বলদের গাড়ীতে ঘোড়া এবং বলদ জুতায়া ছাড়া হইত। সাধারণতঃ মধ্যে একটা ঘোড়া এবং দুই দিকে দুইটা বলদ জোতা হইত। এই দৌড়ে (race) যে শকট প্রথম হইত তাহার অধিকারীকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইত।

চন্দ্রগুপ্ত মধ্যে মধ্যে শীকারে বাহির হইতেন। ঐ সময়ে মহারাজ হস্তীর উপর এবং তাহার চারিদিকে সশস্ত্র রমণী সকল অশ্বের উপর গমন করিতেন। এই সকল রমণী পারশ্ব, তুর্ক প্রভৃতি দেশ হইতে ক্রয় করিয়া আনা হইত। যে পথে মহারাজ যাইতেন উহার উভয় পাশ্ব বেজুবারা রক্ষিত হইত। উহার মধ্যে জন সাধারণ যাইতে পারিত না।

প্রাসাদের ভিতর সমস্ত স্থান উপযুক্ত রমণীগণ বহু রক্ষিত হইত। তাঁহারা উৎকৃষ্ট তরবারি হস্তে সর্বদা চারিদিকে সুরক্ষা বেড়াইতেন। মহারাজ সপ্তাহে একদিন প্রকাণ্ড দরবারে বসিয়া সাধারণের আবেদন প্রভৃতি গ্রহণ করিতেন। এক্ষণে শীকার, যুদ্ধ কার্য বা পাক্ষন উপলক্ষে প্রাসাদের বাহিরে আসিতেন।

চন্দ্রগুপ্ত প্রজাদিগের বিশেষ প্রিয় ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা কয়েকবার হইয়াছিল। এই জন্য তিনি কখনও দিবসে নিদ্রা যাইতেন না। দুই রাত্রি উপযাপি তিনি এক কক্ষে শয়ন করিতেন না। তাঁহার শয়ন কক্ষের সঠিক সংবাদ তিনি কাহাকেও বলিতেন না। মূদ্রারাক্ষস নাটকে আমরা এই ঘটনা সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারি।

সৈন্যাদি :—তাঁহার অধীনে ৬ লক্ষ পদাতিক, ৩০,০০০ অশ্বরোহী, ২০০০ হস্তী এবং ৮০০ রথ ছিল। প্রত্যেক অশ্বরোহীর নিকট দুইটা বল্লম ও একখানা করিয়া চামরার ঢাল থাকিত। প্রত্যেক পদাতিকের হস্তে একখান তুরবারি এবং তীর ধনুক থাকিত। তীর এত সজোরে ছুটিত যে অতি ক্ষুদ্র বস্তু পর্যন্ত ভেদ করিয়া ফেলিত। প্রত্যেক রথের উপর দুইজন যোদ্ধা ও দুইজন চালক থাকিত। এবং হস্তীর উপর মাহত ছাড়া তিনজন করিয়া তীরন্দাজ অবস্থান করিত। অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের সময় ৬২০০০ সৈন্য সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিত।

সমস্ত সৈন্য বিভাগ (Military Department) ছয়ভাগে (Boards) বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বোর্ড পাঁচ জন কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হইত। ছয়টি ভাগের নাম (১) নৌ বিভাগ (Admiralty)। বুদ্ধার্ঘ সমস্ত রণতরী ও নৌ সৈন্য ইহার অধীনে ছিল। (২) কমিসরিয়েট :—খাজাদি সমস্ত এই বিভাগ কর্তৃক জয় ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত। সাধারণ ভূতা, কুলি, কারিগর প্রভৃতি ইহার অধীন ছিল। (৩) পদাতিক সৈন্য বিভাগ (৪) অশ্বরোহী সৈন্য বিভাগ। (৫) হস্তী সৈন্য বিভাগ। (৬) রথ সৈন্য বিভাগ।

চন্দ্রগুপ্তের এই সৈন্য শাসন প্রণালী (War administration) দর্শনে আধুনিক যুরোপীয়েরা পর্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন। সেই প্রাচীন যুগে যেভারতীয় সভ্যতা চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল তাহা এই সকল বিষয় দেখিয়া তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

অনেকে মনে করেন, যুদ্ধাদি কার্যে যুরোপীয়েরা চিরদিনই ভারতবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের এই শাসন প্রণালী ও পেনিডকসের পরাজয় দ্বারা আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, ভারতবাসীরা যুরোপীয়দিগের অপেক্ষা এ বিষয়েও নূন ছিলেন না।

রাজ্য শাসন প্রণালী :— সমস্ত রাজধানী শাসনের জন্য এক সভা ছিল। ইহা ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগে পাঁচজন করিয়া অভিজ্ঞ ও প্রাচীন কর্মচারী ছিলেন। প্রত্যেক ভাগের (Board) কার্য প্রণালী নিয়ে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

১ম বিভাগ—সহরের সমস্ত কারিকরের কার্য ইহার অধীন ছিল। তাহাদের পারিশ্রমিকের হার ইহা দ্বারা নির্দিষ্ট হইত। বাহাতে শিল্পী কোনও প্রকার মন্দ দ্রব্য ব্যবহার না করে, সে বিষয়ে ইহার কর্মচারীরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। সে সময়ে অনেকে অল্প শিল্পীদিগের হস্তাদি নষ্ট করিয়া নিজের শিল্প কার্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে চেষ্টা পাইতেন। এ প্রকার অত্যাচার কার্যের জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

২য়—ভিন্নদেশীয় ভ্রমণকারী, সওদাগর প্রভৃতির উপর লক্ষ্য রাখা ইহার প্রধান কার্য ছিল। প্রয়োজন হইলে এই বিভাগ হইতে পার্শ্ব রক্ষক, পথ প্রদর্শক, উপযুক্ত বাসস্থান, ভূতাদি ও চিকিৎসক পর্যন্ত প্রবাসীদিগকে দেওয়া হইত। কেমনও বিদেশী দেহভ্যাগ করিলে তাহার দাহের বা কবরের এবং তাহার পর তাহার দ্রব্যাদি তাহার উত্তরাধিকারীর নিকট প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করা হইত। এই সকল বিবরণ হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, ঐ সময় ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বহুতর লোক মগধে উপস্থিত হইতেন।

৩য়—এই বিভাগ কর্তৃক জয় ও মৃত্যুর হিসাব রাখা হইত। যাহারা চিরদিন প্রাচীন ভারতবাসীকে অর্দ্ধ অসত্য বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা চন্দ্রগুপ্তের এই বিভাগের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করেন। যুরোপেও—যাহার সভ্যতার জন্য পাশ্চাত্য জাতি আজকাল সর্বদা দর্প করিয়া থাকেন,— এই বিভাগের প্রতিষ্ঠার কাল খুব পুরাতন নয়।

৪র্থ—বাণিজ্য ও ব্যবসায় প্রকৃতির সমস্ত কার্য এই বিভাগের অধীন ছিল। আমদানি ও রপ্তানির শুক নির্ণয়, সমস্ত সাম্রাজ্যের জন্য একই প্রকার ওজন নির্ধারণ প্রকৃতি ইহার কর্তব্যচারীরা স্থির করিতেন। কেহ যদি শুক হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অত্যাশ্রয় উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তাহার অতি কঠিন শাস্তি হইত।

৫ম—স্থল শিল্প কার্যের সমস্ত ভার এই বিভাগের অধীন ছিল।

৬ষ্ঠ—হাট, বাজার প্রকৃতির সমস্ত বন্দোবস্ত এই বিভাগের হস্তে গৃহ্য ছিল।

সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রধান ২ নগরই ঠিক এই ভাবে শাসিত হইত। চন্দ্রগুপ্তের পূর্বে ভারতবর্ষের নগর সকল কি প্রকারে শাসিত হইত, তাহার উল্লেখ মেগাস্থিনিস্ করেন নাই। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহার পূর্বেও রাজ্য সকল এই প্রকারে শাসিত হইত। এ প্রকার শাসন প্রণালী যে চন্দ্রগুপ্ত একবারে আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহা কখনও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। চন্দ্রগুপ্ত হয়ত স্বীয় শাসন প্রণালীর বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু মূল প্রণালীর জন্য যে তিনি পূর্বতন নরপতিদিগের নিকট শ্রী ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

সমস্ত সাম্রাজ্য কয়েক ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক ভাগে (Province) একজন করিয়া রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) নিযুক্ত ছিলেন। সাধারণতঃ সম্রাটের নিকট আত্মীয়েরা এই পদ প্রাপ্ত হইতেন। যোগলদিগের সময়ও এই নিয়ম ছিল। তবে বাহিরের লোক যে একবারে নিয়োজিত হইতেন না, এমত নহে। যোগলদিগের সময় মানসিংহ, টোডরমল, জয়সিংহ প্রকৃতি হিন্দুরাও আদেশিক শাসন কর্তার পদ লাভ করিয়াছিলেন।

শাসনকর্তা ও অস্ত্রাশ্রয় প্রধান ২ কর্তব্যচারীদিগের কার্যের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য একদল কর্তব্যচারী ছিলেন। মহারাজ অশোকের সময় ইহারা 'পুলিসানি' ও 'পতিবেদক' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুসলমানদিগের সময় ইহাদিগকে 'আস্‌বাব নবীশ' নামে অভিহিত করা হইত। ইহারা সম্রাট কর্তৃক নিয়োজিত হইতেন।

কর্তব্যচারীদিগের কোনও অস্ত্রাশ্রয় কার্য দেখিলে ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্রাটের কর্ণগোচর করিতেন। এন্নিয়ান নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন ঐতিহাসিক বলেন, "এই কর্তব্যচারীরা কখনও মিথ্যা রিপোর্ট করিতেন না, কারণ ভারতবাসীরা প্রায়ই মিথ্যা কথা বলিতেন না। মিথ্যাকে তাঁহারা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।"

চন্দ্রগুপ্ত একবার সাম্রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সর্বসমেত প্রায় ৪০০০০ লোক ছিল। মেগাস্থিনিস্ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, "হিন্দুদিগের মত সম্রাটের পরায়ণ জাতি আমি আর দেখি নাই। এত লোক একত্র থাকিত বটে, কিন্তু অস্ত্রাশ্রয় আচরণের কথা প্রায়ই শুনিতে পাইতাম না। সাম্রাজ্য চুরি ভিন্ন অপর কোন অপরাধের কথা আমি খুব শুনিয়াছি। কিন্তু এই সাম্রাজ্য অপরাধেও খুব কঠিন সাজা দেওয়া হইত। চুরির জন্য প্রায়ই চৎম শাস্তি হইত। কেহ কাহারও অঙ্গের হানি করিলে তাহারও ঐ অঙ্গ ছেদন করা হইত। মিথ্যা সাক্ষী দিলে হাত পা বা নাসিকা ছেদন করা হইত। ব্যাভিচার অপরাধে মস্তক মুণ্ডন করিয়া ঢাক বাজাইতে ২ রাজ্য হইতে ব্যাভিচারিকে দূর করিয়া দেওয়া হইত। ইহার মত অপমানকর শাস্তি আর ছিল না।

জমির চতুর্থাংশ ভাগের উৎপন্ন রাজা পাইতেন। মেগাস্থিনিসের এই মত আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। এ দেশের সনাতন হিন্দু প্রথা ভূমির বীটাবংশ রাজ্য গ্রহণ। চন্দ্রগুপ্ত যে কিজন্য এই প্রাচীন প্রথা বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাহার কোনও কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। মেগাস্থিনিস্ যাহা বলিবেন তাহাই যে মানিয়া লহিতে হইবে এমত কোনও কথা নাই। এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন যে, হিন্দুরা সাত প্রকার জাতিতে বিভক্ত ছিলেন :—(১) দার্শনিক (বোধ হয় তিনি ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন), (২) কৃষক, (৩) পশুপালক, (৪) শিল্পী, (৫) সৈনিক পুরুষ, (৬) গুপ্তচর, (৭) মন্ত্রী। তাঁহার এই জাতি বিভাগ দর্শনে আমরা কি বলিব? এই ভাবের আরও অনেক কথা উল্লেখ করা বাইতে পারে।

সৈনিক কার্যে সস্রাচর ক্ষত্রিয় জাতিকে নিযুক্ত করা হইত। কৃষক সম্প্রদায়কে কখনও এই কার্যে লওয়া হইত না। কৃষিকার্যের উপর সম্রাটের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইহার উন্নতির জ্ঞা তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। যাহারা মনে করেন যে কৃষিকার্যের জ্ঞা খাল প্রভৃতি খননের ব্যবস্থা নিতান্ত আধুনিক, তাহারা শুনিয়া হস্ত বিম্বিত হইবেন যে, ইহার জ্ঞা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এক বিশেষ বিভাগ খুন্সিয়া ছিলেন। কৃষিকার্যের জ্ঞা যেখানে জলের প্রয়োজন হইত, সেখানে খাল বা কূপ খনন করা হইত। অবশ্য ইহার জ্ঞা শুক আদায় করা হইত। অনেক স্থানে ঝটির জল ধরিয়া রাখা হইত। আনন্দের সময় এই জল কৃষকদিগকে দেওয়া হইত। চন্দ্রগুপ্তের শালক পোষগুপ্ত এই প্রকারে 'সুদর্শন' নামক এক কৃত্রিম হ্রদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের সময়ের বিবরণে আমরা এই জাতীয় হ্রদের উল্লেখ অনেক স্থানে দেখিতে পাই।

সাধারণ লোক অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দভ ও এক বা দুই ঘোড়ার রথ যাতায়াতের জ্ঞা ব্যবহার করিত। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা হস্তী, অশ্ব এবং চারি বা আট ঘোড়ার রথ ব্যবহার করিতেন। সাধারণ লোকের শেযোক্ত যান ব্যবহার করিলে শাস্তি হইত। রাস্তা ঘাটের উপর দৃষ্টি রাখিবার জ্ঞা একদল কর্মচারী ছিলেন। রাজপথ সকল যথাযথ পরিষ্কার রাখা হইত এবং প্রত্যেক অর্দ্ধ কোশ অন্তর পাথর (Mile stone) বসান থাকিত।

অনেকে মনে করেন যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন নীতি গ্রীকদিগের অনুকরণে প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই রাজনীতির সহিত তৎকালীন গ্রীক রাজনীতির তুলনা করিলে এই কথা যে অমূলক তাহা আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারি। যদি আমরা আমাদের প্রাচীন পুস্তক সকল বেশ সাবধানের সহিত অনুসন্ধান করি, তাহা হইলেই আমরা আমাদের প্রাচীন রাজনীতির কথা জানিতে পারি। চন্দ্রগুপ্ত প্রাচীন হিন্দু রাজনীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের নিকট এ বিষয়ের জ্ঞা তিনি হিন্দুশাস্ত্রও ঋণী নহেন। সূত্রের বিষয় এই যে, ভিনসেন্ট স্মিথ্ প্রমুখ প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখকগণও আমাদের এই মত সমর্থন করেন।

চন্দ্রগুপ্ত ভারতের যে একজন অতি প্রতাপশালী সম্রাট ছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাহার জ্ঞা একছত্র মহারাজ চন্দ্রবর্তী ভারতে বড় একটা জন্ম গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বিশ্বের কথা এই যে, আমাদের তৎসাময়িক পুস্তকে তাহার কথা আদৌ উল্লেখিত হয় নাই। এমন কি, তাহার পর প্রায় এক হাজার বৎসর পর্যন্ত তাহার নাম আমরা কোনও সংস্কৃত পুস্তকে দেখিতে পাই না। ইহার কোনও সঠিক কারণ বুঝিতে পারা যায় না। অনেকে বলেন, তিনি নীচ জাতীয় ছিলেন এবং তাহারই বংশে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সম্রাট অশোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারেরা তাহার নাম, পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে 'মুদ্রা রাক্ষস' নামক একখানি নাটক রচিত হয়। ইহার মধ্যে আমরা চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য প্রভৃতিকে দেখিতে পাই। সংস্কৃত সাহিত্যের আর কোনও পুস্তকে আমরা চন্দ্রগুপ্তের উল্লেখ পাই না। মুদ্রা রাক্ষস নাটক হইতে আমরা একটি কথা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারি—চন্দ্রগুপ্তের নাম ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলিবার জ্ঞা যতই চেষ্টা করুন না কেন, তাহারা সকল মনোরথ হইতে পারেন নাই। জনসাধারণ যে তাহার কথা বিশ্বস্ত হয়েন নাই, তাহারই সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণই—এই নাটকখানা।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

স্বর্গীয় পণ্ডিত দুর্গানন্দ্র কৃতিরত্ন ।

বর্তমান বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গ পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ সভার ধর্মোপদেষ্টা, সংস্কৃত ভারতীয় একনিষ্ট সেবক, ঋষিকল্প পণ্ডিত দুর্গানন্দ্র কৃতিরত্ন মহাশয় আর ইহ জগতে নাই। বিগত ২০ শে আষাঢ় রাত্রি দুই ঘটিকার সময় পণ্ডিত পাবনী জাহ্নবী তীরে তাহার অমর আত্মা চির জৈমিষ্ঠ দিব্য ধামে প্রয়াণ করিয়াছে। তাহার অভাবে আজ বঙ্গদেশের যে নিদারুণ ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

কৃতিরত্ন মহাশয় বাঙ্গালা ১২৫০ সালের ১০ই মাঘ

নগরে জয়গ্রহণ করেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জন্মদান করিয়া যে সেবপুর দেশ বিদেশে সম্পূজিতা, পণ্ডিত দুর্গাহন্দরও সেই সেবপুরের গৌরব ও পূজা এতদিন উজ্জল রাখিয়াছিলেন। আজ সেবপুরের এই শেষ উজ্জল নক্ষত্রটিও চিরতরে অস্তমিত হইল। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে ইঁহার অভাব খুব সহজে পূরণ হইবে না। হিন্দুসমাজ তাঁহার অভাব পদে পদে অনুভব করিবেন।

কৃতিরত্ন মহাশয়ের পিতা ৬৯শানচন্দ্র গ্রায়রত্ন মহাশয়ও সেবপুরের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব পুরুষ কাশীরাম গ্রায়ালঙ্কার মূর্শিদাবাদ হইতে এখানে আসিয়া স্থানীয় বৈষ্ণব ভূম্যধিকারীদিগের পূর্বপুরুষ রমানাথ মন্সী মহাশয়ের গুরুপদ স্বীকার করিয়া সেবপুরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা বাৎস্য গোত্রীয়, বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

কৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রাথমিক শিক্ষা তাঁহার পিতৃদেবের টোলেই আরম্ভ হইয়াছিল। পিতৃদেবের নিকট ব্যাকরণের প্রাথমিক প্রকরণ শেষ করিয়া সেবপুরের স্বর্গীয় হরহন্দর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট তিনি ব্যাকরণের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। অতঃপর নবদ্বীপ বাইয়া নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্নের নিকট ভ্রাম্যশাস্ত্র এবং সর্বপ্রধান স্মার্ত পণ্ডিত স্বর্গীয় ব্রজনাথ বিজ্ঞারত্নের নিকট স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জ্যৈষ্ঠ ও স্মৃতি শাস্ত্রে কৃতিরত্ন লাভ করিয়া কৃতিরত্ন মহাশয় ৬ কাশীধামে গমন করেন; তথায় যাইয়া ষড়দর্শনের আলোচনা করিয়া তৎবিষয়েও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অতঃপর জন্মভূমি সেবপুরে আসিয়া চতুর্পাটি স্থাপন করত জ্ঞান বিতরণ করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময় সেবপুরের অবস্থা স্কুতান্ত উন্নত হইয়া দাঁড়ায়। ইতঃপূর্বেই পণ্ডিতাগ্রগণ্য হরহন্দর তর্করত্ন মহাশয় ৬ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (পরে মহামহোপাধ্যায়) মহাশয় নিজ নিজ গৃহে টোল স্থাপন করিয়া বহুব্রহ্মচারী স্থানের শিক্ষার্থীদিগকেও শিক্ষা দিতেছিলেন, এইবার কৃতিরত্ন মহাশয়ও গৃহে আসিয়া টোল স্থাপনা করিয়া বসিলেন। তখন সেবপুর প্রকৃতই বাণীর বিনোদকুঞ্জে পরিণত হইল।

এই সময় এই তিন টোলে ক্রায় শতাধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তখন সেবপুরের টোল সমূহের সন্মান এতদূর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল যে নবদ্বীপ এবং বিক্রমপুর হইতে পাঠ শেষ করিয়া আসিয়াও অনেক শিক্ষার্থী একবার সেবপুরে পাঠ করিয়া বাইবার ইচ্ছা সঞ্চার করিতে পারিতেন না। সেবপুরের “স্মৃতির ব্যবস্থা” এই সময় নবদ্বীপ ও কাশীর ব্যবস্থার জায় সম্মানিত হইতে; কোন কোন স্থলে সেসকল স্থানের ব্যবস্থা লইয়াও সেবপুরের ব্যবস্থা না পাইলে লোকে তাহা অসম্পূর্ণ মনে করিত। সেবপুরের সেই গৌরবের অঙ্গদ সমূহ ক্রমে নিঃশেষ হইয়াগেল।

ইঁহারা যে কেবল সেবপুরের—ময়মনসিংহের বা বাঙ্গালারই গর্বের আশ্রয় ছিলেন তাহা নহে; সমগ্র ভারতের ইঁহারা গৌরবের সামগ্রী ছিলেন।

কৃতিরত্ন মহাশয় সেবপুর ত্যাগ করিয়া গজাভীরে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বহরমপুরের রাণী আলাকালী জুবিলি চতুর্পাটির কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া বহরমপুর লইয়া যান। এইস্থানে কৃতিরত্ন মহাশয় স্বীয় কৃতিরত্ন প্রকাশের সুবিধা পান। তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য দর্শনে বহরমপুর সঙ্কত পরীক্ষা সমিতি তাঁহাকে তাহার সঙ্গাপতিত্বে বরণ করিলেন।

বহরমপুর হইতে কৃতিরত্ন মহাশয় কলিকাতা বিদ্যাসনন্দ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে রদুবীর বেদান্ততীর্থ, যোগী বা, প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতগণ এবং ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ৬ রামধাদ ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

এই সময় তিনি মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের যোগে কলিকাতা এন্সিয়াটিফ সোসাইটিতে পরিচীত হন এবং সেই সোসাইটির অধুরোধে সোসাইটির প্রকাশিত “প্রজ্ঞাপারমিতা” গ্রন্থ সম্পাদন করেন। এই ব্যাপারেই কৃতিরত্ন মহাশয়ের নাম পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠে। কলিকাতায় তিনি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া সম্মান লাভ করিতে পারেন।

বিশ্বজ্ঞানন্দ বিভাগয়ের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার শাস্ত্র ব্যবস্থাপকের পদে বৃত্ত হন, এই সময় তাঁহার ব্যবস্থাই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইতেছিল এবং ইনিই বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মার্ত পণ্ডিত বলিয়া সম্মান লাভ করিতেছিলেন ।

কৃত্তিবাহু মহাশয় সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের সদস্য ছিলেন এবং কিছুকাল কলিকাতা সংস্কৃত কলেজেও অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন । ইনি গবর্ণমেন্ট হইতে গৃহীত সংস্কৃত পরীক্ষারও পরীক্ষক ছিলেন ।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা প্রথম ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনের অধিবেশনে কৃত্তিবাহু মহাশয়কেই সভাপতি পদে বরণ করিয়া তাঁহার সমুচিত মর্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন ।

গত ১৩২১ সালে মুক্তাগাছারি প্রসিদ্ধ জমিদার রাজর্ষি শ্রীযুক্ত গৌপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বার্ষিক ব্যক্তিকে বর্ষ্য কৈয়র প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন । ষষ্ঠা কালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সভাপতিত্বে ময়মনসিংহ দুর্গাবাড়ীতে এক পণ্ডিত সম্মেলন হয় । বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহূত হন । এই সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে কৃত্তিবাহু মহাশয়ই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বার্ষিক বলিয়া সম্মানিত হন এবং তাঁহাকেই রাজর্ষি মহোদয়ের প্রদত্ত—রৌপ্যাধারে বর্ষ্যকৈয়র ও বর্ষ্যপ্রাপ্ত ক্রজাকমালা প্রদান করা হয় ।

তিনি কয়েকখানা সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা অপূর্ণাঙ্গ মুদ্রিত হয় নাই ।

তাঁহার জীবনে তিনি অত্যন্ত সচল করিতে কম করেন নাই । এ অত্যাশ্রিত ভিতর, প্রভূত অর্থের প্রয়োজনও তাঁহার সম্মুখে কম দেখা দেয় নাই । কিন্তু তিনি তাঁর অভাবেও কাহাকে ধর্ম্মবিগর্হিত ব্যবস্থা প্রদান করিয়া জ্ঞানের পথ লঙ্ঘন করেন নাই । আত্মজীবন নির্ভিক ভাবে চলিয়া কর্ম্মময় ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন ।

তিনি ৭৪ বৎসর বয়সে গঙ্গাগাত করিয়াছেন । চারিদিন মাত্র রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন । রোগাক্রান্তের পরদিন তাঁহার কোঠপুত্র শ্রীযুক্ত শশীকুমার বিভাভূষণ আসিয়া পঁহছিবা মাত্রই তাহাকে

বলিলেন—“আমাকে গঙ্গার নিলিমা ।” তাহার এই উপদেশ মত তখনই তাঁহাকে মোটর গাড়িতে ‘গঙ্গাবাসি’ নেওয়া হয় । মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্বে গঙ্গাতীরে ও দশমিনিট পূর্বে গঙ্গানীরে তস্থ স্নান করান হয় ।

তাঁহার তিন পুত্র বর্তমান । ভগবান তাঁহাদিগের শৌকার্ত্ত প্রাণে সাধনা দান করুন ।

শ্রীদুর্গাসুন্দর বিদ্যাবিনোদ ।

সমস্যা ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ ।

বিধুবাবু যে দিন দুঃখিনীকে পতিতার জীবনের দুঃখ-ময় ফল বুঝাইতে গিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, দুঃখিনীর মন সেদিন হইতেই দুর্ধিসঙ্গ যাতনার অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল । সেইদিন হইতে সে লক্ষ্য করিয়াছিল, যেন বাড়ী শুদ্ধ সকলেই তাহাকে ভেমনি স্থগার চক্রে অবলোকন করে । এই অশ্রদ্ধা ও অবহেলার কথা মনে করিয়া সে প্রায়ই একা একা বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিত ।

নগেনের বিছানা হইতে গঙ্গার দুর্বর্তী চলন্ত উদ্ভি-লীলা বেশ স্পষ্টর দেখা যাইত । দুঃখিনী সেই দিকে মুখ করিয়াই বসিয়া থাকিত, আর আকাশ পাতাল চিন্তা করিয়া দিন কাটাইত ।

বিধু তাহার এ ভাব লক্ষ্য করিয়া একদিন সন্নেহে বলিয়াছিলেন—“দুঃখিনী, repentance বার হয়, দয়াল প্রভু তাহার সাহায্য হন । তোমাকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে যেতে পারে আমার বেনারস আসা স্বার্থক হতো । ভূমিও জীবনের গতি নির্ণয় করে নিজের প্রয়োজনকে সম্যক প্রকারে অনুভব করে, আশ্রয় করে নিতে পাও এবং জীবনকে সকলতার Goal এ নিয়ে বেয়ে পৌছে দিতে পাও ।”

দুঃখিনী সেদিনও কোন উত্তর দেয় নাই । উত্তরের অস্ত্র বিধু খুব লালসিত ছিল না, দুঃখিনীর যে অশ্রু-শোচনা হইয়াছে, ইহা তাহিরাই সে আশাশ্রিত ছিল ।

নগেনের অবস্থার খুব উন্নতি দেখা যাইতেছিল না । সে, কথা বলিতে পারিত বটে, কিন্তু পার্থক্যপরিবর্তন করিয়া

কি নড়িবার শক্তি তাহার একেবারেই ছিল না। ব্রহ্মচারী তাহার শরীরে ভাষা রক্ত প্রবেশ করাইবেন, বলিয়া গিয়াছেন। তাহার জন্ত একটু শক্তির প্রয়োজন। আর এক সপ্তাহ মধ্যে শরীর সেরূপ উপযুক্ত হইবে, ইহাই তাঁহার আশা।

হুঃখিনী নগেনের মনে প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই নিরীহ প্রাণীটি কি প্রকারে, কোন সংশ্বে তাহার শব্দ্যার পার্শ্বে আসিয়া মোরসি পাট্টার অধিকার লইয়া বলিল—সে অনেক সময় চক্ষু বুজিয়া তাহা চিন্তা করিত। সে যখনই চক্ষু মেলিয়া চাহিত, তখন তাহাকে—নিঃশব্দে তাহার ইলিতের প্রতীক্ষায় বলিয়া আছে,—দেখিতে পাইত। যে তাহারই সেবায় এইরূপ আশ্রয়ভাগ করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা অস্ত্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানা নগেন নিত্যন্ত অস্ত্রায় বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাই হুঃখিনী তাহার নিকট একটা প্রহেলিকার সামগ্রীই রহিয়া গেল। সে নিজেই তাহার নিকট তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, ইহা মনে করিয়াই সে আর কাহারও নিকট কোন কথা এ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নাই।

আটটার বুদ্ধা গঙ্গায় চলিয়া যান, বিধুও তাহার ‘পলিসির’ অনুসন্ধান ও এজেন্সির কার্য্যে বাহির হন; তারপর ব্রহ্মচারীর নিকট রোগীর দৈনিক সংবাদ প্রদান করিতে যান।

নগেন চক্ষু মেলিয়াই দেখিল হুঃখিনী তাহার সেই অধিকৃত স্থানেই বসিয়া আছে।

নগেন তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

হুঃখিনী নীরবে কাদিতে ছিল—চক্ষের জলে তাহার রক্তিম গণ্ড ভাসিয়া বাইতেছিল।

নগেন ধীরে ধীরে হুঃখিনীর ডান হাত থানা টানিয়া লইয়া বলিল—“তুমি কাদিতেছ।”

হুঃখিনী ভাড়াভাড়া বস্ত্রাঙ্কলে চক্ষু মুছিয়া চামচ দ্বারা বেদনামার রস তাহার মুখে তুলিয়া দিল।

হুঃখিনীর সহিত নগেনের আজ এই প্রথম আলাপ। নগেন ধীরে ধীরে বলিল—“তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব?”

হুঃখিনী বেদনামার বাটার দিকে চক্ষু রাখিয়া বলিল—“হুঃখিনী।”

নগেন—“হুঃখিনী, তুমি যেই হও, আমার পরম বন্ধুর কার্য্য—আত্মীয়ের কার্য্য করিতেছ, স্মৃতগাং তোমার হুঃখের কারণ আমার জানিবার অধিকার আছে। ক্ষুদ্র শক্তি হইলেও আমি যদি তাহার কিছু করিতে পারি—”

নগেন কথা বলিয়া কাহিল হইয়া পড়িল। হুঃখিনী কোন উত্তর দিল না। নগেন কয়েকবার শ্বাস ফেলিয়া পুনরায় বলিল—“বলিবে কি? আমি তাহার কি করিতে পারি?”

হুঃখিনী তাহার স্বাভাবিক কোমল স্বরে বলিল—“আপনাকে অধিক কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।”

সে মধুর ধ্বনি নগেনের অন্তর মধুময় করিয়া দিল। সে একরূপ কথা আরও শুনিতে চায়। একরূপ কথা দিন ভরিয়া শুনিলে বিনা ঔষধে, বিনা রক্ত প্রয়োগেই তাহার রোগ উপশম হইবে—ইহাই যেন তাহার দৃঢ় বিশ্বাস।

নগেন বলিল—“তুমি কথা বলিলেতো আমাকে আর বলিতে হয় না।

হুঃখিনী নীরবে নীচের দিকে চাহিয়া রহিল।

নগেন কিছুক্ষণ হুঃখিনীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় ডাকিল—“হুঃখিনী।”

হুঃখিনী নগেনের মুখের দিকে চাহিয়া আবার মাথা নোঙাইয়া ফেলিল।

নগেন বলিল—“বল হুঃখিনী, আমার যদি সাধ্য থাকে, আমি তোমার হুঃখের তার মাথা পাতিয়া লইব।”

নগেনের সহানুভূতিতে হুঃখিনীর হুঃখের ভার অনেক খানি লাঘব হইল। তাহার সহনশক্তির তার অন্তর নীতল হইল—কৃতজ্ঞতায় তাহার চক্ষু হইতে দু ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল।

নগেনের দৃষ্টি হুঃখিনীর মুখের উপর স্থাপিত ছিল; তাহার চক্ষে জল দেখিয়া নগেন হাত তুলিয়া তাহা মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—“ছিঃ হুঃখিনী কাদিও না, ও তে আমার হুঃখ হয়। আমি বরং তোমাকে আর ও কথা জিজ্ঞাসা করিব না।”

হুঃখিনীর কপোল স্পর্শ করিয়া নগেন দুর্বল হইয়া

পড়িল, তাহার হৃৎপিণ্ড ছর ছর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সে ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিল ।

হৃৎখিনী উঠিয়া একখানা অয়েল রুথ আনিয়া ধীরে ধীরে বলিল—“সাত্বে নষ্টা হইয়াছে, এখন মাথা ধুইয়া দিব ।”

নগেন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, শব্দ করিল না ।

হৃৎখিনী ধীরে ধীরে তাহার মাথা তুলিয়া উপাধান তৈরিয়া মাথার নীচে অয়েল রুথ বুলাইয়া দিল ; ধীরে, অতি সাবধানে ঠাণ্ডা করা গরম জল মাথার চালিয়া মাথা ধুইয়া দিল । তারপর শুকনা নেকড়া দিয়া মুছিয়া দিয়া নিজ হাতেই মুখ চোখ ধুইয়া দিল ।

নগেন ডাকিল—“হৃৎখিনী ।”

হৃৎখিনী নিকটে আসিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইল ।

নগেন কহিল—“কোথায় যাও, এইখানে বসো ।”

হৃৎখিনী মুহূর্ত্তে বলিল—“আপনার পথ্য প্রস্তুত করিতে ।”

নগেন—“তুমি বসো, ঠাকুর মা কোথায় ?”

হৃৎখিনী—“তিনি মন্দিরে । পথ্য আনিব না ?”

নগেন—“তুমি আমার লজ্জা আর কত খাটিবে ?”

হৃৎখিনী—“স্বাম্যের পরই বে ছুধ বালি দিতে হয় ।”

নগেন চুপ করিয়া রহিল । হৃৎখিনীও মন ব্যাধার তরিয়া গেল । “তিনিও কি আজ আমার হোঁরা গরম ছুধ বালি খাইবেন না ?” হৃৎখিনীর রূপে এ আঘাত অত্যন্ত গুরুতর পীড়া দিতেছিল—সে দাঁড়াইরাছিল—যেখানে বসিয়া পড়িল—তারপর মনের আঘাতে চক্ষুর বাঁধ ভাঙিয়া গেল—দরদর আরার অঙ্গ-প্রাবনে তাহার গণ্ড বহিয়া বাইতে লাগিল ।

নগেন ডাকিল—“হৃৎখিনী, এ দিকে আইস ।”

হৃৎখিনী উঠিয়া নিকটে বাইরা দাঁড়াইল ।

নগেন ধীরে ধীরে বলিল—“হৃৎখিনী, আবার কাঁদিতেছ ; বসো—এদিকে বসো,—বাৎস দাও ।”

হৃৎখিনী অস্থানে বসিয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিল ।

নগেন বলিল—“তোমার চক্ষের জল আমার ব্যথা

বৃদ্ধি করে । তুমি কি তাহা ভালবাস ?” বলিয়া নগেন হৃৎখিনীর কাপড়ের অঞ্চল দিয়াই ধীরে ধীরে তাহার চোখ মুছিয়া দিল । হৃৎখিনী চুপ করিয়া রহিল । একটু নড়িলও না ।

নগেন হৃৎখিনীর বাম হাতের কাঁচের চুড়ি ছুপাছি নখে খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—“এখন পথ্য করিবার সময় হইয়াছে কি ?”

হৃৎখিনী—“আমিই আনিব কি ?”

নগেন—“সে তোমার ইচ্ছা ।”

হৃৎখিনী—“আপনি বলিলেই আনিতে পারি ।”

নগেন—“দাও, কিন্তু খাইয়া কি হইবে, আর কি বাঁচিব হৃৎখিনী ?”

হৃৎখিনী—“আপনি কথা বলিবেন না—এতে শরীর আরো দুর্ব্বল হইয়া যার ।”

নগেন—“তুমি যদি কথা বল, তবে তো আমাকে এত কথা বলিতে হয় না ।

হৃৎখিনী ঠোঁটে পথ্য গরম করিয়া নগেনকে পথ্য করাইল ।

নগেন বলিল—“হৃৎখিনী, আজ আমার শরীর অনেক ভাল বোধ হইতেছে । তুমি কথা কও, আমি শুনি । তবেই আমার শরীর শুধরাইবে । তোমার কথাই আমার ঔষধ ।”

বৃদ্ধা মন্দির হইতে আসিয়াছেন দেখিয়া নগেনের জিহবার কিয়া বদ্ধ হইল, কিন্তু তাহার তৃপ্তি দৃষ্টি হৃৎখিনীর নির্মল সৌন্দর্য্য সাগরেই ডুবিয়া রহিল ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

রবিবারে পারুলের প্রস্তাবিত উত্তান সম্মিলন হইয়াছিল । এই সম্মিলনে বাহিরের লোক কেহ ছিল না । পারুলদের ভাই বোনেরা ছিল, আর ছিল যতীন বোস ও শৈলেন ।

বে উদ্দেশ্যে পারুল এই উত্তান সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিল, সে উদ্দেশ্য তাহার সকল হয় নাই—বকুল ধরা দেয় নাই । সে দিন সে শৈলেনের করমাইস মত দিদির সঙ্গে বেশ মনোযোগ দিয়া গান গাহিয়াছে ।

যতীন বোসের দুই একটা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে—
তাঁহার নিকট যেমন মাথা নিচু করিয়া সমস্যামে পাঠ
দেয় সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছে।

এই সম্মিলনে বকুল ব্যতীত আর সকলেই বাহার
তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বেশ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।
যতীন বোস তাঁহার বক্তৃতার ইয়ুরোপীয় বলসেভিক
ভাবের প্রাধান্য যে তথ্যের স্রী জাতির মধ্যে অস্বামিক
ভাব (Nationalisation of women) প্রবল হইয়া
উঠিতেছে—ইহার সহিত সামরিকজিটে ভাবের সমন্বয়
করিয়া—তাহা বাঙ্গালার সমাজে বিস্তৃত হইলে এই
বঙ্গ সমাজের যে অগ্নি দীড়াইবে—তাঁহার একটা চিত্র
অঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করেন এবং এই সঙ্গে ব্রাহ্ম
সমাজের মহিলা বিভাগের অনাবশ্যক ইয়ুরোপীয় ভাব
প্রবণতার উল্লেখ করিয়া তাহা দ্বারা সমগ্র বঙ্গ সমাজের
ভবিষ্যৎ অকল্যাণের বিষয় গুলি ইঙ্গিতে দেখাইয়া দেন।

শৈলেনও বঙ্গ সমাজের কয়েকটা ভবিষ্যৎ সমস্যার
উল্লেখ করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিল। শৈলেন
বলিয়াছিল—“দারিদ্র্য, কলকারখানার আবির্ভাব, অতি-
রিক্ত বংশবৃদ্ধি—এদেশে জীবন সংগ্রাম বৃদ্ধি করিয়াছে।
এই সকল কারণে এদেশের ঘরে ঘরে বিলাতের দৃশ্য
দেখা যাইবে—দেশীয় পারিবারিক প্রথা লুপ্ত হইয়া গিয়া
হোট্টেলে আহার বিহারের প্রথা প্রবর্তিত হইবে বলিয়া
আশঙ্কা হইতেছে।

সমাজের উপকারের জন্যই একদিন মানব সমাজে
বিবাহ রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল, পুনরায় দেশ, কাল,
পাত্র বিবেচনায় এক প্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই সেই
বিবাহ বন্ধন ছুলিয়া দিতে আন্দোলন উপস্থিত করিয়া-
ছেন। এ সমস্যা প্রাচ্য সমাজের একটা বিষম সমস্যা।

বঙ্গ সমাজে আমাদের আগের পন্থা অপেক্ষা ব্যয়ের
প্রয়োজন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছে—দেশের জন
বৃদ্ধি ধনবৃদ্ধির পরিমাণকে অতিক্রম করিয়াছে, পাশ্চাত্য
আবহাওয়ার স্রী সমস্যাও শতটাপর হইয়া উঠিতেছে,
personality বা ব্যক্তিত্বের ভাব আমাদের মহিলা
সমাজে বেক্সপ ক্রান্তগতিতে সংক্রামিত হইতেছে, ২৫/৩০

পুরুষের অধীনে থাকিতে চাহিবে, তেমন মনে হয় না।
এ সমস্যাগুলি আমাদের চিন্তনীর বিষয়। বঙ্গীয় মহিলা-
দিগেরই এ সমস্যা বিষয়ে বেশী করিয়া ভাবিবার
প্রয়োজন—কেননা তাঁহারাই বাঙ্গালার শান্তিকুঞ্জের
মূর্ত্তিমতী চিত্রশাস্ত্রী।”

পাকুল “বঙ্গীয় মহিলা সমাজে তত্ত্বীভাবের প্রসার”
সম্বন্ধে বলিয়াছিল—“মাতৃ ও পত্নী বঙ্গ সমাজে যত
অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে—পরসেতার ভাব বা ভগিনী
ভাব তত ফুটিয়া উঠে নাই। সে ভাবের ভিতরই সম্পূর্ণ
আত্মত্যাগ। মাতৃ ও পত্নীতে আত্মত্যাগের—স্বার্থ
সম্পর্কেরই সম্পূর্ণ বিকাশ।

বঙ্গীয় মহিলা জীবনকে আমরা যতই পরসেবার
বিলাইয়া দিব, ততই জাতীয় জীবনে আমরা শক্তি সঞ্চয়
করিতে পারিব। ভগবানের কার্য্যও বেশী পরিমাণে
করিতে পারিব। বাঙ্গালার সমস্ত কল্যাণদিকে যে পত্নী
এবং মাতাই হইতে হইবে, তাহা ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য
নহে। কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া জনসেবা দ্বারাও
জগতের কল্যাণ করিতে হইবে। তাঁহার জন্য আমাদের
সমাজেরও লোক আবশ্যক। বঙ্গীয় মহিলা সমাজের
অন্ততঃ শতকরা কয়েকজন সেবাধর্ম্মে নিজেকে দীক্ষিত
করুন—বর্তমান যুদ্ধ তাহার প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র
এবং সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত ইয়ুরোপীয় তত্ত্বীরা তাঁহার
আদর্শ।”

হুর্গাদাস বাবু শুনিয়া বলিয়াছিলেন—“বক্তৃতার
কথায় আর প্রকৃত কার্য্য—এ দুইতে অনেক প্রভেদ।
যতীন আমেরিকা যাউক, ইহার মধ্যে সব বক্তৃতার ভাব
তলাইয়া যাইবে। আর না হয়, তাহা দ্বারা একটা
ব্যবসায়ই আরম্ভ করা যাইবে। জায়েনিতে গেলেই
ভাল হইত, তা বখন আর হইল না, আমেরিকাই
যাউক।”

ইহার পর যতীন বোস চলিয়া গিয়াছেন। তাহাকে
হুর্গাদাস বাবু পুত্র কল্যাণের সহিত গিয়া হাওড়া টেসনে
আশীর্বাদ করিয়া ছুলিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

হুঃখিনী এখন নগেনের ইচ্ছিতে তাহাকে দ্বিন তরিয়া বুকের সংবাদ পড়িয়া শুনায়ে । নগেন ঘুমাইয়া পড়িলে বা শুনিয়া শুনিয়া অবসাদ বোধ করিলে হুঃখিনী মনে মনে পড়িয়া শ্রবণ করিয়া রাখে, নগেনের ঘুম তাহা দিলে বা অবসাদের অবসানে, পল্ল করিয়া তাহা শুনাইয়া দেয় । ইহাতে নগেনের খুব ক্ষুষ্টি—এই ক্ষুষ্টি তাহার শরীরের এবং মনের মধ্যে পরিবর্তন আনিয়াছে । সে নিজকে ইহাতে খুব অস্থির করিয়া থাকে ।

হুঃখিনীই এখন বলিতে গেলে তাহার আরোগ্যের ঔষধ, শক্তির পথ্য ।

নগেন হুঃখিনীর দক্ষিণ হস্ত খানা ধরিয়া তুলিয়া নিজ বুকের উপর রাখিয়া বলিল—“দেখ, হুঃখিনী আজ বুকেটাও বেশ পরিষ্কার ।”

হুঃখিনী বুকে হাত রাখিয়াই বলিল—“আজ বিকালে আপনার শরীরে রক্ত প্রবেশ করাইবেন ; তারপর আপনার শরীর সারিতে আর সময় লাগিবে না ।”

নগেন বলিল—আজ যে আমার শরীরে রক্ত প্রবেশ করাইবে, তাহা তোমাকে কে বলিল হুঃখিনী ।”

হুঃখিনী—“বাবা ব্রহ্মচারী কাল রাত বলিয়া গিয়াছেন ।”

নগেন—“রক্ত কোথায় পাইবেন, তোমাকে বলিলেন কি ?”

হুঃখিনী মুহূর্ত্ত করিয়া বলিল—“সেজন্ত কি ঠেকা হইবে ।”

নগেন উত্তর হইয়া বলিল—“রক্ত কি যে সে ই দিতে পারে, না বাহার তাহারই নেওয়া বাইতে পারে ? তিনি কাহার রক্ত দিবেন, তাহা কি বলিয়াছেন ?”

হুঃখিনী—নগেনের মুখের দিকে চাহিয়াই বলিল—“আমিই রক্ত দিব—কোন আপত্তি করিবেন না ।”

নগেন মুখ কাল করিয়া বলিল—“তোমার বড় বেশী সাহস হইয়াছে ।”

হুঃখিনী চমকিয়া গেল । মাথা নিচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল । তাহার মনেকৈবলি চিন্তা হইতে ছিল—

তিনি আমার রক্তের দোষই ভাবিতেছেন । হায়, হায় আমার গতি কি হইবে ?

নগেন বলিল—“ব্রহ্মচারী বাবাতো কাল আমাকে একথা বলেন নাই । তোমাকে কখন বলিলেন ?”

হুঃখিনী ধীরে ধীরে বলিল—“আমাকে বাহিরে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন ।”

নগেন—তিনি কি তোমাকে রক্ত দিতে অস্থির করিয়াছিলেন ?

হুঃখিনী—“না । তিনি রক্ত হইলেই এখন রোগ আরাম হইবে বলায়—আমি নিজ হইতেই যীকার করিয়াছি ।”

নগেন—“রক্ত কিরূপে টানিয়া লওয়া হয় ও তাহার পরিণাম কি, তাহা তুমি জান কি ?

হুঃখিনী—“বাবার নিকট সব শুনিয়াছি—তিনি আমাকে সকলই বলিয়াছেন ।”

নগেন—“শরীরের রক্ত দান করিয়া এইরূপ শয্যা লইয়া দ্বিন কাটাইলে—তোমাকে দেখিবে কে ? আর তোমার কে আছে ?”

হুঃখিনী চুপ করিয়া রহিল । তাহার রক্তই যদি দোষিত তবে তাহার আর উত্তর কি ?

নগেন বলিল—“সে সব চিন্তা করিয়াছ কি ? উত্তর দাও ।

হুঃখিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“আমার রক্তই যদি আপনি দোষিত মনে করেন, তবে আর উত্তর দিবার কি আছে ?

নগেন হুঃখিনীর হটাৎ দমিয়া যাইবার কারণ বুঝিতে পারিয়া তাহার হাতখানা টানিয়া পুনরায় বুকের উপর রাখিয়া বলিল “বুকেটা ধরিয়া রাখ ।”

হুঃখিনী বুকের উপর হাত রাখিলে নগেন বলিল—

“তোমার রক্তের বিচার আমি করিতে পারি না—আমার মনের ভাব তাহা নহে হুঃখিনী । তুমি রক্ত দিবে, সেই রক্তে আমি শক্তি লাভ করিব, আর তুমি চির রোগী হইয়া পঁচিয়া মরিবে, এরূপ অকৃতজ্ঞ ও নৃশংস ব্যবহার আমার দ্বারা হইবে না, আমি করিতে পারিব না—তোমাকেও করিতে দিব না ।”

হুংখিনী সাহস পাইয়া বলিল—“খুব অল্প রক্তেই হইবে, ওতে আমার শরীরে খাটুনির শরীর নষ্ট হইবে না, বরং ভালই হইবে। আমার শরীরে নাকি দিবার পরিমাণ রক্ত আছে।”

নগেন—“খাটুনির শরীরে রক্তের প্রয়োজন বেশী। ও কিছুতেই হইবে না। আমি তোমার শুশ্রূষাতেই সাহায্য উঠিব। তোমার শ্রম বহু কুসুমকে বহুচ্যুত করিয়া জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা যেন কদাপি না হয়।”

নগেনের কথায় হুংখিনীর হৃদয়ে বড়ই সান্ত্বনা আসিয়াছিল। সে চোখে অশ্রু, মুখে হাস্য লইয়া বলিল—“বহু কুসুম নিঃস্রাব্যকনেই করিয়া পড়ে, তাহা যদি-দেব পূজার প্রয়োজনে আইসে, তবে তাহার জীবন স্বার্থক হয়; বৃথা করিয়া পড়েনা।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“এ বোধ হয় সংবাদ পত্র পাঠের ফল?”

হুংখিনী লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। এই সময় বিধু বাবু আসিয়া খবর দিলেন—ব্রহ্মচারী বাবা ওইটা গটর মধ্যে এসে ‘ওপারেসন’ করবেন।

বিধু এখন আর সাহিত্যিকের ভাবের বৃহৎ রচনা করিয়া কথা বলেন না। নগেন তাহাকে শোধরাইয়া দিয়াছে, বুঝাইয়া দিয়াছে—ওরূপ কথা সহজ বোধ্য নহে—সুতরাং ব্যবসায়ের কথায় তাহা নিতান্ত অনোপযোগী। বিধু সেই হইতে তাহা কিছু কিছু করিয়া ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

নগেন বিধুকে ইঙ্গিতে বলিতে বলিল। বিধু বলিয়া বলিল—বুড়ের সংবাদ বড়ই ভয়ানক, কোলে অধিকার করেছে, উপার নেই।

নগেন হাসিয়া বলিল—“আমাদিগকে ইহার ভয় কি করিতে হইবে?”

বিধু—“আমাদিগকে পরাংপরের নিকট মনঃসংযোগ করে উপাসনা কতে হবে।”

নগেন—“তাহাতে কি হইবে?”

বিধু আতঙ্কিত হইয়া বলিল—“আপনি বলছেন কি? আমরা না চিন্তাই কতে পারিবে Prayer তাই যে আমাদিগকে দিতে পারে। More things are

brought by prayer than this world dreams of এ মত আমার নয়—জোবার্টের।” ও লোকটাও জ্ঞানী।

নগেন বলিল—“বিধু বাবু, আপনাকে রোজ কত দিতেছি, আমার শরীর শীঘ্র সারিবেন, আপনি কত কাল অপেক্ষা করিবেন? আপনার বড়ই ক্ষতি হইতেছে।”

বিধু হাসিয়া বলিল—“নিরাশ হ’লে চলবেন। আমি এখানে বেশ আছি, আপনার শুশ্রূষা কতে পারিতেছে একটা কাজই হ’তো। জন-সেবা পাড়িতের সেবা—দে কি কম সৌভাগ্যের বিষয়। তাহা হচে ন হচে স্বার্থ সিদ্ধি। Policy ও agencyর কাজটা Benares-এ মন্দ হলোনা নগেন বাবু।” বলিয়া বিধু হাসিয়া গেলেন তারপর ধামিয়া বলিলেন—“কু বাবুদের আশীর্বাদে আপনার আর অধিক কষ্ট পে হইবে না—আপনি পেয়ে উঠবেন আর কি?”

নগেন মনে মনে এই সরল বক্তৃতির প্রশংসা করিয়া প্রকাশ্যে বলিল—“কেউতো আমাকে আশীর্বাদ করে না বিধু বাবু, আর আশীর্বাদেহাঃ লোক ভাল হয়। পরম আত্মার জোরওতো প্রচুর থাকে চাই।”

বিধু বলিল—“আশীর্বাদ, ক বলছেন। এই দেখুন, হুগাঁদাস বাবুর letter রোজ আসছে; যখনই প্রয়োজন, টাকা পাঠাচ্ছেন—পাকল, শৈলেন প্রতিদিন আপনার অবস্থার জ্ঞাত চিঠি লিখে আত্ম কটে তুলে। এখানে এই হুংখিনী কতো খাটেছে—ওরতো তুলনাই নেই ঠাকুর মা সেদিন নাকি—ওক বণে, তার কাছে—ধরা-দিয়ে ছিলেন—আব কি চান? এতলোকের আশীর্বাদ কি বুঝাই যেতে পারে? মহামতী চলন্ত বলেছেন All men live not by the care they take of themselves, but by the love there is in men. আত্ম চেষ্টা অপেক্ষা পরের আশীর্বাদের শক্তি বেশী।”

নগেন লক্ষ্য করিল, বিধু বিশ্বেশ্বরের নাম লইতেছেন না। সে বলিল—“ঠাকুর মা কোথায়, বসে ছিলেন বিধু বাবু?”

বিধু হাসিয়া বলিল—থাক থাক—ও সব আলোচনা এখন।

নগেন—খাকিণে কেন ? আপনার মুখে সে নাটকী লইতেই হইবে ।

বিধু বলিল—বিশেষের নাম লইতে আপত্তি নেই কিন্তু ইহাতে পৌত্তলিকতাকে সম্মান করা হয়, তাবপর একটা—বিধু মুখ নিরুত করিল ।

নগেন জোরে হাসিতে পারিল না; নতুবা সে হাসিয়া সকল বর কাঁপাইয়া তুলিত ।

মুহু হাস্য করিয়া নগেন বলিল—“হুর্গদাস বাবু সপরিবারে কিন্তু এই * * * দেবভাটীর মাঝার বিষপত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন ।”

বিধু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—“বলুন কি ! অবাক করেন যে ?”

নগেন বলিল “এগুলি কিন্তু” আপনার ভাষায় কু-সংস্কার ।”

এই অবসরে হুর্গদাসী রানে চলিয়া গিয়াছিল । বিধু অবসর বুঝিয়া অত্র প্রসঙ্গ তুলিল । বিধু বলিল—

“দেখুন নগেনবাবু ও হুর্গদাসীকে কিন্তু আর ছেড়ে যাওয়া হবে না, ওকে আমাদের orphanage-এ রাখব, জীবনটা ওর সংপর্শে খাবিত হবে । আমি ওকে দুদিন পতিতা জীবনের পরিণাম বিষয়ে বলেছি—ওর রিপোর্ট এস হয়েছে । কেঁদেচে—”

নগেন—“ওর সবকিছু কি আপনি কিছু জানিয়াছেন নাকি ?”

বিধু—“কিছুই না । বেনারেসের মেয়ে—ওদের সবকিছু কিছুই জানতে হয় না, ওসবকে ঘৃণাও করে নেই—পাপকেই ঘৃণা ।

নগেন বলিল—“তার এখনও ভয় বরষ হয় নাই । আপনি সেরূপ কোন কথা বলিলেন না, ওতে ওর হৃৎক হয় । ওর সবকিছু বা হয়, ব্রহ্মচারী করিবেন ।”

বিধুর মিকট ব্রহ্মচারীর বরাতটা ভাল লাগিল না । সে বলিল—“ব্রহ্মচারী ওর কি করবেন ? ও Beneres থাকলেই নষ্ট হবে, বলে দিচ্ছি ; ওকে নিয়ে যেতে হবে । নেহাৎ যদি কেউ সমাজে নাই নিতে চায়, আমিই বরং তার তার গ্রহণ করে রাখি হব । মেয়ে টি জানেন কি—খাটে বেশী খায় কম ; তাহে বেশী, কথা বলে কম, জগৎ লোক সহজে পোষা যায় ।

নগেন হাসিয়া বলিল—বকুলের কি যত হইবে ?”

বিধু হুঃখিত হইয়া বলিল—“সেওতো আপনি—নগেন বাবু উড়িয়ে দিলেন । এই মা চিঠি, গত বুধবারে বোম্বে Mail-এ বতীন বোস্ America চলে গেল ; আপনি একটু বল্লই হতো ?” বলিয়া বিধু তার পকেট হইতে এক গাছা চিঠি বাহির করিলেন ।

নগেন বলিল “এ শৈলেনের চিঠি না ?”

বিধু—“হ’, শৈলেন লিখেছেন, তিনি চেষ্টা করেও বিদ্যে পেলেন না । যাই হক অতীবের আপনার সঙ্গে গিড়িডিতে দেখা করবেন ।”

নগেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—“অতীবের গিড়িডিতে ! সে কেমন ?”

বিধু—ওকে যে প্রিন্সিপ্যাল মেডিকেল হাস্পিটালে দুমাসের জন্য ৫০৭ টাকার দাবি এসিষ্ট্যান্টের কাজে নিযুক্ত করেছে ।

নগেন—“গিড়িডিতে কেন ?”

বিধু—হুর্গদাস বাবুর পরিবার অতীবের তাঁদের গিড়িডির বাড়ীতে change-এ আসছেন ; আপনার শরীর একটু সেরে উঠলেই আপনাকে গিড়িডিতে নিয়ে যেতে হুর্গদাস বাবু লিখেছেন ।

নগেন—“ওসব কোন খবরইতো আপনি আমাকে দেন না ?”

বিধু—“এত দিন ব্রহ্মচারীর নিবেদন ছেল—কোন কাগজ পত্র বা চিঠি পত্র দিতে বা জানাতে ।”

নগেন—“ও কাগজগুলি কি ?”

বিধু উৎসাহের সহিত বলিল—“তারি হোপ্‌ফুল মিউস্—আমার কথা ! ওহুন—বলিয়া বিধু একখানা ছাপার কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিল—

অর ও বঙ্গ সমস্তা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্তা —

নগেন বলিল—“রক্ষা করুন—মুখে বলিয়া কেহুন, এত ভবিষ্যৎ বৈধ্য আমার নাই ।”

বিধু—“সেই লজ্জাইতো চিঠিপত্র দিতে নিবেদন ছেলো, মোট কথা—হুর্গদাস বাবু মিকানিকস্ শিখতে বতীন বোসকে আমেরিকা পাঠিয়েছেন ; এদিকে বেঙ্গল কটন-মিলস্ স্থাপনের এই হেডবিলস্ দিয়ে ১০ টাকা করে ৫০

হাজার টাকার সেরার চাচ্ছেন। Miniature form এ আপাতত একলক টাকা কপিটাল নিয়েই স্ত্রীর কল আরম্ভ হবে। বাকী ৫০ হাজারের share তিনি নিজে নিচ্ছেন। ওদিকে সুসল পাছাড়ে ও বিল টিপারায় প্রচুর কমি নিয়েচেন, ওতে তুলো হবে—A grand aggrandisement. এখন দয়াল প্রভুর ইচ্ছে। টাকার অভাব হোনো। এ কদিনেই এখানে আমি ২০ হাজার টাকার share বিক্রয় করুন। ডাঃ ব্যক্তি ১০ হাজারের share একাই নেবেন।” বলিয়া বিধু বাবু উৎসাহের হাসি হাসিলেন।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“ভুতসংবাদ বটে! এখন দেখুন, যদি তুলার চাবে রাজি হন, না হয় আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। বতীম বোস তো আর দুজনকেই নিবেন না। আর একটা চেয়ার তো ভেঙেটাই রইল।”

বিধু বলিলেন—“আপনার শুভ চেষ্টা, আর আশার অদৃষ্ট।”

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্রী বিতাত্ত্বণের চেষ্টার পীরপুরের অনেক বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু সামাজিক সমস্যার সমাধান হয় নাই।

একটা শ্রাদ্ধ ও একটা বিবাহ তিনি—উভয় সমাজকে বাদ দিয়া—এমন ভাবে স্থাৎ স্থিৎ করিয়া করাইয়াছেন যে দরিদ্র কর্মকর্তাদের একটা পরশাও ধার করিতে হয় নাই। অবশ্য লোক নিন্দাকে এই সব ব্যাপারে বরণ করিয়া না লইতে পারিলে হয় না—তাহা কর্মকর্তা রা অণ-এক হস্তার পরিবর্তে করিয়াছেন। উপায় নাই।

নমশ্রু সমাজে একটা বিধবা বিবাহ হইয়াছিল। তাহা লইয়া গ্রামে ও নমশ্রু সমাজে দলাদলির পোচনা হইয়াছিল—শাস্ত্রী মহকুমা মাজিষ্ট্রেটকে ও জমিদারের নামেবকে উপস্থিত রাখিয়া সেই বিধবার হাতে নমশ্রু সমাজের সকলকেই অন্ন গ্রহণ করাইয়া তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন।

পীরপুর স্থলের বালকেরা প্বেষক সমিতির সভ্য হইয়া প্রতি গৃহ হইতে রোল মুক্তি-তিকা সংগ্রহ করিতেছে; তাহাতেও বাসে ২৫, ৩০ টাকা আদায় হইতেছে।

সুখে পাটের বিক্রি বন্ধ হইয়া বাঙালার দরিদ্র কৃষক দিগকে ঐ অর্থ হইতে ঋণ দান করিয়া সাহায্য করা হইতেছে। এইরূপ নানা উপায়ে শাস্ত্রী-বিতাত্ত্বণ গ্রামের দরিদ্রবিগের সাহায্য করিয়া আশীর্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

পাটের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠার জরনগরের খাজানা বন্ধ হইয়াছে; খামারের আত ধাত্ত প্রকারা খাইয়া ফেলিয়াছে। স্ত্রীর তারচরণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অণে আকর্ষ নিমজ্জিত, হাত পাতিবারও ঠাই নাই। উপায় হীন হইয়া তিনি গ্রামের মামলা জুটাইয়া টর্নির কার্য্য করিতেছেন।

শৈলেন কলিকাতা পঁহঁছিয়াই তারচরণকে একখানা কার্ডলিখিয়া জানাইয়াছিল যে—তাহার দুর্ভাগ্য বজ্রের স্তায় তাহার পুত্রের বন্ধে আঘাত করিয়াছে—এবং সে সেই দিন হইতে শ্বেগে শয্যাশায়ি হইয়াছে।”

চিঠিপাইয়া প্রথমে তারচরণের রাগ হইয়াছিল, পরে তিনি চিন্তিত হইলেন। চিন্তা ব্যতীত কোন প্রতি-কাণের তাহার তখন কমতা ছিল না; কানীতে বাইবার অর্থতো তাঁর নিকট ছিলই না। ছেলের বিপদ জানাইয়া কোন প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া গেলেও—বাড়ীর আর উপায় ছিল না। অভাবে পড়িয়া জীর গহনা ওলি পর্য্যন্ত তিনি বন্ধক রাখিয়া সংসার চালাইয়াছেন—এখন নিকপার স্ত্রীর ছেলের শুভ কামনা ব্যতীত তাহার অন্য কপীর আর কি হইতে পারে?

তাচরণ শৈলেনের নিকট হইতে কানীর ঠিকানা আনাইয়া নগেনের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলেন—প্রায় পনের দিন পরে—বিধুজ্ঞপণ শস্যার বাকর করা এক চিঠিতে তিনি নগেনের বিমুত অবস্থা জানিতে পারিয়া-ছিলেন। ইহার পর চিঠিরাই পুত্রের সংবাদ জানিতে-ছেন; ইহার বেশী তাহার করবার কমতা ছিল না—করিতেও তিনি কিছু পারেন নাই।

পুজার পূর্বে তারচরণ বিপদে পড়িয়া গেলেন। ছেলের স্থলের বেতন চলিতেছে না—না হয় কিছু দিন স্থল বাধা হইবে। ছেলে মেরদের কাপড় নাই—না হয় ঘরের বাহির না হইবে। বিত্ত ঘরে যে একটা পরশা

নাই, পাইবারও কোথায় উপায় নাই—যরে যরে হাও-
লাত চাইরাছে—তাহার উপায় কি ?

নিভাত উপায় হীন হইয়া তারাতরণ আড়াই হাজার
টাকায়ই আশ্রয়গ্ৰামে নগেনের বিবাহ স্থির করিয়া
ফেরি পাঁচ শত টাকা অগ্রিম লইয়া আসিলেন,
আপাতত জাত বাঁচল ।

টাকা আনিয়াই তারাতরণ কানী বাড়ী করিবেন স্থির
করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা আবল্যে বাটতে পারিলেন
না । প্রথম দীননাথের ফৌজদারী মোকদ্দমার তবির—
তাণাকে স্থানীয় তদন্তে উপস্থিত থাকিতে হইবে—দ্বিতীয়—
নাথু পোদ্দারের ঘর জালানি মোকদ্দমার তিনি প্রথম
শাস্তি । তব—আদালত বন্ধের দিনে চুটী মোকদ্দমা দায়ের
করাইতেই হইবে ; ন করািলেই নয়—৪র্থ—জয়নগর না
গেলেই নয়—৫ম—পূজার নিশ্চয়ই প্রবাসী বাবুরা বাড়ীতে
আসিয়া শাস্তি বস্ত্রভূষণের বোগে সমাজ সমস্তা মিটা-
ইতে চেষ্টা করিবেন—তাঁহার অসুপস্থিতি সে ক্ষেত্রে
কোন ক্রমেই সমস্ত হটবে না—চতুর্থ ।

সুতরাং তিনি মনে করিলেন, কাচারী খুলিলে তমাধির
আরজি শুনি দাখিল করাইয়াই কানী বাওয়া সমস্ত
এবং নিশ্চিত ।

পূজার বন্ধে বাস্তবকই সমাজ-সমস্তা লইয়া একটু
আন্দোলন হইয়াছিল ; ফল কিছুই হয় নাই । তারাতরণ
উপস্থিত না থাকিলে কি হইত, তাহা বলা যায় না ।

এই সময় পীরপুর মধ্য ইংরেজী স্কুলটিকে উচ্চ ইংরেজী
স্কুলে পরিণত করিবার চেষ্টা হইল । তারাতরণ খুব
অগ্রণী হইয়া কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন । রিক্তহস্ত হইয়াও
বধাসাধ্য চাঁদা স্বেচ্ছায় করিলেন । সকলের সমবেত
চেষ্টায় অর্থের অভাব রহিল না ।

তখন তারাতরণ পুত্রের জন্ম চাকুরী প্রার্থী হইলেন ।
নগেনের প্রতি শত্রু মিত্র সকলেরই প্রেম ছিল—নুতন
লোক বলিয়া হেতুমাষ্টারের পদ হইল না ; তাহার জন্ম
৬০১ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিককের পদ রক্ষিত হইল ।
তারাতরণের ভরসা হইল ; বাহাই হটক উপবাসতো
আর করিতে হইবে না । স্থির হইল জাহ্নবীর হইতে
নুতন ক্লাশ খোলা হইবে ।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

অগ্রহারণে নগেন কানী হইতে কলিকাতা চলিয়া
আসিয়াছিল । নগেনের শরীরে সামান্য কিছু রক্ত
প্রবেশ করাইতে হইয়াছিল । তাহা তাহার অমতে,
কেবল ব্রহ্মচারীর ও ছাঃধিনীর আগ্রহেই হইয়াছিল ।
অতি সামান্য রক্তই লওয়া হইয়াছিল, অথবা তাহাতে
তাহার বধেষ্ট উপকার হইয়াছিল ।

গিড়িডি বাওয়া ব্রহ্মচারীর অভিপ্রায় না হওয়ার
তাহাকে গিড়িডি বাইতে হয় নাই । বিদায় কালে ব্রহ্ম-
চারী ছাঃধিনীকে নিজ পালিতা কস্তা বলিয়া নগেনের হস্তে
সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন । নগেন স্ত্রীর বর্নের মর্যাদা
রক্ষা করিয়া তাহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে ।
এ বিষয় বিধু তাহাকে বধেষ্ট সাহস দিতে ক্রটি করে
নাই ।

নগেন প্রিমিয়ারি আইন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হই-
য়াছে । শৈলেন খুব প্রসঙ্গার সহিতই উত্তীর্ণ হইয়াছে ।
সেকন্ড প্রিমিয়ারি শৈলেনকে কার্যে পাকা করিয়া লই-
য়াছেন—বেতনও একশত টাকা হইয়াছে । অনিন্দা
সত্যোত্তম শৈলেন সে শৃঙ্খল উন্নয়ন করিতে পারে নাই ।
আপাততঃ কিছু সম্বল হইলে শীঘ্রই করিবে, ভরসা করি-
তেছে । শৈলেন পূজার বাড়ী বাইতে পারে নাই ; তাই
একমাসের ছুটিতে বাড়ী গিয়াছে ।

নগেন ও ছাঃধিনীকে দুর্গাদাস বাবু পুত্র কস্তাগণ
সহ ষ্টেশনে গিয়া আদর করিয়া নিজ বাসাতেই আনিয়া
রাখিয়াছেন ।

ছাঃধিনীর স্বভাবে দুর্গাদাস বাবুর স্ত্রী একেবারে মুগ্ধা
হইয়া গিয়াছেন । পাকুল ও বকুল নুতন সাথী পাইয়া
আনন্দে উৎফুল্ল । ছাঃধিনীর কথা লইয়া পাকুল
ও বকুল নগেনকে খুব জল্প করিত ; আবার ছাঃধিনীকেও
ঠাট্টার ভাষায় আলাহায়া মারিত, নগেন তাহা হাসিয়া
উড়াইয়া দিত ; ছাঃধিনী তাহাতে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া
বাইত । পাকুল ছাঃধিনীকে ‘সই’ বলিয়া আদর করিত ।
ছাঃধিনী পাকুল ও বকুলের ভার বাড়ীর বাহিরে বাইত না
—সে গৃহিনীর আজ্ঞা-শ্রুতি থাকিয়া তাহার সহিত কাণ
কণ করিত ।

হৃদয়ের প্রাবল্যে যখন ইন্দ্রিয়োপাধি বাণিজ্য বন্ধ হই-
বার উপক্রম হইল তখন দুর্গাদাস বাবুর এবং আরও
কতিপয় জন নারকের অর্থে ও উত্তোগে কলিকাতায়
একটা সওদাগরী ব্যবসায়ের সূচনা হইয়াছিল। ক্রমে
দুই তিন মাসের মধ্যেই তাহার ভবিষ্যৎ বেশ আশাশ্রয়
মনে হইতে লাগিল।

দুর্গাদাস বাবু নগেনকে সেই স্বদেশী সওদাগরী
আফিসে একশত টাকা বেতনের একজন এসিষ্ট্যান্ট করিয়া
দিলেন। আর বিধবাবুকে আগরতলা তুলার চাষের
বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইয়া দিলেন।

চাকুরী লইয়া নগেন নূতন বাড়ী ভাড়া করিল। কিন্তু
দুর্গাদাস বাবু তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ইতো-
মধ্যে বজ্রিনারায়ণ হইতে বাবা যোগজীবন ব্রহ্মচারীর
এক চিঠি পাইয়াছিলেন। সে চিঠিতে দুঃখিনীর সম্বন্ধে
২১১ টা কথা ছিল। সেই চিঠির কথা ও অন্তান্ত নানা
বিষয় ভাবিয়া তিনি বলিলেন—“শৈলেন বাড়ী হইতে
আমুক, তারও থাকিবার ভাল ব্যবস্থা নাই—হইলেন
এক বাসা করিয়া থাকিও, খরচ কম লাগিবে। টালিগঞ্জে
বাড়ি থাক, সে ও মন্দ হইবে না—অনর্থক বাড়ী ভাড়া
কেন দিবে?”

নগেন কোন উত্তর করিতে পারিল না; নূতন
বাড়ীতেও তাহার যাওয়া হইল না।

প্রকৃতির প্রতি।

(১)

কে তুমি গো দেখছো জ্বন টালের চোখে চেরে।
সকল প্রাণী আকুল থোলো দিটির আলো পেয়ে।
সবুজ পাতার রং-মহালে, কোকিল ডেকে মন মাতালে,
শিহরিয়া উঠলো হিরা পুলকে গান গেয়ে।

(২)

তরুর কচি কোমল পাতার রঙের ঝিলঝিলি।
পাখীরা সব কুজন করে—মধুর কিলিকিলি।

হাওয়াতে আল মগনভাসে, শিউলি সুবাস ছুটে আসে,
গন্ধে শেবে অন্ধকোরে মনটি কেড়ে নিলি।

(৩)

ক্যোনা ওলে কি আঙুলে দিলি আলিঙ্গন।
যর বাড়ী ঘোর হাসছে পেয়ে হাতের পরশন।
তুমি কাহার প্রেমের লাগি, দিনবারিনী আছ লাগি,
আজ অবধি শেষ হোলো না পূজার আয়োজন।

(৪)

লক্ষ তারার আলো জলে গগন-টাদোয়ার।
দ্বিধুরা দাঁড়ায় ঘিরে চুটি-সীমানার।
তুমি আপন ধ্যানে মগন, প্রাণে পুলক—অশ্রু নয়ন,
কোরগার খেত ওড়নাখানি অদোষোতা পার।

(৫)

পর্যায়ের কাণ সজাগ আজি, শুনাও বন্দনা।
ঝড়ারিয়া উঠুক হিরা পেয়ে সুখের না।
গাইছে কি তুর আকুল-করা, ধরি ধরি যায় না ধরা।
কাণটি পেতে বোসে আছি, আরতো অন্ধ না।

(৬)

কবে তোমার গোপন কথার জাগবে আমার প্রাণ।
তোমার প্রেমের কথা পেয়ে ভুলবো অতিমান।
কটিবে আমার অমানিশা, থাকবে না আর সূখের ভ্রা,
গেয়ে যাবো পুলক-তরা পাগল-করা গান।

(৭)

পূজার প্রস্থান নাইকো আমার, কণ্ঠে নাই সে বাণী।
আশাত-পাণ্ডুর কান্না-তরা আছে হৃদয়খানি।
তোমার সাথে পূজ্য তীর্থে, ডাকছো বটে মধুর ডাকে,
নাও না তবে আপন কোরে হাত দুখানি টানি।

(৮)

মলিন বোলে সবাই যবে ভাঙলো আমার মন।
তখন তুমি দেখা দিলে, দিলে আলিঙ্গন।
কেন এখন পথের মাঝে, কাদাও নানান বাজেকালে।
পূজাও আমার প্রাণের আশা ভালোবাসার জন।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ফুল ভুল ।

বেলুদু মঠের বাজী লইয়া গ্যাসেকার ট্রেন পূর্ণগতিতে ধুম উল্লসরণ করিতে করিতে হাওড়া অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার স্থিরভাবে আসন লইয়া, আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া জগদীশ বাবু বলিলেন—“কি ঝগাট, দেখ দেখি !”

বিনোদ বাবু বলিলেন—“বাক, একটা কাজ হয়ে গেলো তো—ঝগাট তো জীবনে চিরদিনই রয়েছে।”

তারপর বিনোদ বাবু এবটু অসুস্থস্থানে জগদীশ বাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“বলি, টিক থানা বে দেখচি না; কেলে এলেন নাকি—জগদীশ বাবু ?”

জগদীশ গরিত হাসি হাসিয়া বলিলেন—“তুমি কি মনে করো বিনোদ বাবু, ভুল ! আমার ভুল ! চিহ্ন গুণের হিসাবে ভুল !” জগদীশ হাতের বস্তিধানা উঠাইয়া ধরিয়া পুনরায় জিন্দে গরুর হাসি প্রকাশ করিলেন।

বিনোদ বলিলেন—ভুলের কথা, সেতো মানুষেরই হয়। বার ভুল হয় না, বার তে হবে—হয় সে দেবতা, নয় সে পশু।” কথাটা বলিয়া বিনোদ তাহার সরল মনের সাধা তাব হাসির লহর তুলিয়া ব্যক্ত করিলেন।

জগদীশ দর্পভরে বলিলেন—“আর ভুল হয় না আমাদের—এই একাউন্টস ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানের; দেখচো তো—ভুল হ'লে কি এত মোটা মাইনে দিয়ে গভর্নমেন্ট এতগুলি কুপোন্স পোষতো—কোন দিন দু-র করে বের করে দিও—!”

দ্বিতীয় শ্রেণীতে গ্যাসেকার ছিলেন, আর একটা তত্ত্বালোক। তিনি জগদীশ বাবুর গরিত তাবে ও কথার আকর্ষ হইয়া নিজের সোনার চসমার ভিতর হইতে উৎসুক দৃষ্টি জগদীশের মুখের উপর স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি ?”

জগদীশ সেই জিজ্ঞাসা তত্ত্বালোকটির আগ্রহকে

তাত্পর্যের সহিত উপেক্ষা করিয়া নিজকে অপেক্ষাকৃত আরও একটু গভীর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন।

জগদীশের এই কষ্ট-সাধ্য অতিরিক্ত পার্জীব্য তত্ত্বালোকটির মনে বেন বেশ আশ্রয় প্রদান করিতেছিল; তিনি তেমনি ভাবে উৎসুক দৃষ্টিতেই তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিনোদ বাবু তত্ত্বালোকটির প্রশ্ন জিজ্ঞাসার তাব বুঝিয়া বলিলেন—“ইনি একাউন্টেন্ট জেনারেলের হেড্‌ এসিস্টেন্ট—বাবু জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত।”

তত্ত্বালোকটি সমস্তই তাঁহাকে দেশী কায়দার অভিবাদন করিয়া বলিলেন—“বটে। যা হোক দেখা হ'লো, পরিচয় হলো। আচ্ছা মসার বলুন দেখি, আমাদের T. A. বিলটার এই এক কাল পরে এরূপ নির্দয় ভাবে গলা বাজার ব্যবস্থাটা হলো কেন? টাকা যে কবে, কোন বুগে হজম হয়ে গিয়েছে—এখন এত দিন পরে ফেরত দেওয়া কি সম্ভব কথা নাকি ?”

জগদীশ বীর গাভীর আরও সমাহিত করিয়া বলিলেন—“গলাবাজার ব্যবস্থা বলচেন, সেটার ভেতর সেরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা কিছু ছেলো বলেই সে ব্যবস্থা হয়েছে—ও সব কথা অফিসের বাইরে কেন—”

তত্ত্বালোকটি লজ্জিত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ইবৎ হাসিয়া বলিলেন—“দেখুন, সে হচ্ছে বার তার পরকে; পরজ বড় বালাই—আর মানুষ সহজেই ঝগাট ঘুগাইতে চায়—এটাও মানুষের স্বাভাবিক একটা ধর্ম—”

জগদীশ বাবু তত্ত্বালোকটির কথার প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই বিনোদ বাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—“ভুলের কথা বল বিনোদ বাবু, ভুলের কথা শুনেলো আশ্চর্য্য হবে—আমরা যদি না থাকতুম—অবশ্য আমাদের ডিপার্টমেন্টের কথাই হচ্ছে—তবে গভর্নমেন্টের অর্ধের যে লুট হচ্ছিল—তা—বেদম চলতো—সে কথা তাবতেও দ্বত কম্প হয়। আর এই T. A. বিলগুলি—একজিতো এক একটা প্রকাণ্ড জোচ্ছুরী। অথচ এ জোচ্ছুরী গুলি করেন তাঁরা, বার স সরকারের মোটা মাইনের সজাভ কর্তৃত্ব—ইহারাই আবার সজাভ। এরা যদি সজাভ, বলি তবে জোচ্ছুর কে ?”

ভ্রলোকটি বিনোদ বাবুর দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—“পরম আপ্যায়িত হলেম।”

জগদীশ বাবুর কথার উল্লিতে ভ্রলোকটি লজ্জিত হইয়াছেন দেখিয়া বিনোদ বাবু বলিলেন—“গের জুয়াচের না হলে কি পরের চুরী জুয়া চুরী কেউ সহজে ধরতে পারে? আমাদের হয় ছোট ভুল, আমরা করি ছোট চুরী; আর একাউন্টস ডিপার্টমেন্টে হচ্ছে দিনে দুপুরে ডাকাতি; আর ভুল, সেতো কথার কথার—

কথাটা শেষ না করিয়াই বিনোদ বাবু সজোরে ঢেউ তুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ভ্রলোকটি ছিলেন খুব আলাপী লোক। তিনি এই অশ্লিষ্ট আলোচনার দিক হইতে আলোচ্য বিষয়টিকে ফিরাইয়া লইবার জন্য এবার গভীর ভাবে বিনোদ বাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনারা গিয়েছিলেন কোথায়?”

সিগারেটে আগুন ধরাইতে ধরাইতে বিনোদ বাবু উত্তর করিলেন—“দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলুম—জগদীশ বাবুর শিশু পুত্রের মানস আদায় কন্তে। ঐর অনেকগুলো ছেলে মেয়ে নষ্ট হয়ে হয়ে শেষ একটি ছেলে টিকেচে— সেও এই সব এক বছরে পা দিয়েচে। ঐর স্ত্রী, ছেলের জন্য দক্ষিণেশ্বরে মানস করেছিলেন—তাই সব শুদ্ধ সেখানেই আসা গেছিল।”

ভ্রলোকটি বলিলেন—“ফেরি টিমারে দক্ষিণেশ্বর তো বেশ সুবিধার যেনে পাড়েন—

“হিসেব খানার বড় কত্তা হিসেব পত্র আদায় করে দুটোই করে নিলেন, দুটোর ককাটাই ভোগ করা গেল— এসেছিলাম টিমারে দক্ষিণেশ্বর, এখন যাচ্ছি রেল বেলায় হ’তে।

বিনোদ উচ্চহাস্য করিলেন।

* * * *

গাড়ী হাওড়া আসিয়া থামিল।

টেননে একজন কেরানী দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী যে স্থানে থামে তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে-ছিল; গাড়ী থামিবার মাত্র সে তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় শ্রেণীর বাজী দিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “বেলুর

টেননে কেউ একটা শিশু সন্তান কোলে রেখে এসেছেন কি?”

জগদীশ বাবু তাম্বুলের হাসি হাসিয়া কেরানীকে বলিলেন “সে গরজ তোমার কেন এত বাবা, বে কোলের শিশুকে বেখে আসতে পারে, সে হয়ত তার নিকেকেও হারিয়ে ফেলেছে—এমনি ভুলও হয় হে?”

কেরানী উত্তর করিল—“আমার কর্তব্য আমি মরে গেলুম মসায়, সেকেন্ড ক্লাশের পা দেয়ারদের জানাবার জন্য এ ‘টেলি’ বেলুর হতে এসেছে—”

বিনোদ বাবু ইতি মধ্যেই নামিয়া যেয়ে গাড়ীর দিকে গিয়াছিলেন। তিনি হাঁকাইতে হাঁকাইতে দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন—“সর্বনাশ হয়েছে—খোকা ঐর কোলে নেই, তিনি বলছেন, খোকা ডেগো আগনার কোলে—

জগদীশ একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়া শুক কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন—“এঁা নেই, বল কি, আমি তাঁর সম্মুখেই যে টেনস ক্রমের সোফাতে খোকাকে শুইয়ে রাখলুম—।”

ভ্রলোকটি বিনোদ বাবুর দিকে চাহিয়া সম্বাস-ভূতির সুরে বলিলেন—“ছি—ছি—ছি! শুধু পরের ভুলই দেখেন—এমন ভুলও লোকের হয়?”

মেয়ে গাড়ীতে জন্মের রোল উঠিয়াছিল। জগদীশ বাবুর মাতা, স্ত্রী, ভগিনী কাঁদিয়া প্লেক ফরমে এক করুণ দৃষ্টের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এদিকে জগদীশ হতাস ভাবে টেননের সেই কেরানীটির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভ্রলোকটি বলিলেন—“মসায়, ওই যে প্লেক করুমে গাড়ী প্রস্তুত, এখনি ছাড়বে—উঠে পড়ুন বেবুড় বলে। একটা ছোট ভুল হয়েছে মাত্র—গোলমাল করে আর একটা বড় ভুল করবেন না—এ গাড়ীটা মিস করবেন না।”

* * *

আকিসের কর্ণে জগদীশ বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, এই সময় চাপরাসি আসিয়া একখানা কার্ড উপস্থিত করিল। কার্ড দেখিয়া জগদীশ সম্মুখের টেবিলটিকে অতি তাড়াতাড়ি

ভাড়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন ; তারপর চাপরাসিকে বলিলেন—“পেলায় জানাও সাহেব কো।”

সাহেবি পোষাকে সজ্জিত আগন্তুক মিষ্টার মিত্রকে দেখিয়া অগদীশ বাবু লজ্জিত হইলেন—সেই কল্যাণার তাঁহাদের সখীর বেগুড়ের যাত্রিক। তিনি এত বড় কান করেন।

অগদীশ উঠিয়া অভ্যর্থনা করিলে তত্ত্বলোকটি পরিচিতির হাসি হাসিয়া বলিলেন—“শিতটিকে নিরাপদেই পেরেছিলেন তো?”

অগদীশ লজ্জার হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—“আজ্ঞে হাঁ, ভগবানের ইচ্ছায় নিরাপদেই ছেলো।”

“আমাদের সেই T. A. বিলটা দিয়েই বড় সাহেবের নিকট আসাগেছিল, আপনার খবরটাও নিয়ে গেলুম।” বলিয়া তত্ত্বলোকটি মুচকি হাসিয়া বলিলেন—“ভুলটা কিন্তু বেশ ক্ষুদ্রই ছিল।”

অগদীশ লজ্জিত হইয়া বলিলেন—“আর লজ্জা দেবেন না।”

রজক ও রাসভ ।

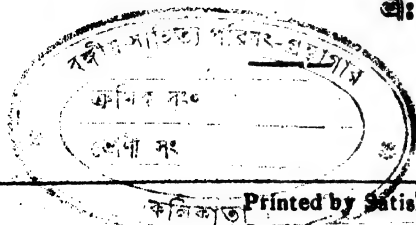
রজক রাসভে কহে—“বোকা আরো দিব ?

বোকা বহা ভোমাদের জাতের স্বভাব।”

রাসভ কহিল—“প্রজ্ঞে ! যত দাঁও নির্ধ,

এ নহে স্বভাব দোষ—স্বাধীনতাভাব।”

ত্রিঃ—



গ্রন্থ-সমালোচনা ।

বিক্রমপুরের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ব্ল্যাকপড়ে বাধা ৩ ভিন টাকা।

এই গ্রন্থে বিক্রমপুরের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রামের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিক্রমপুর, ইতিহাস-প্রখ্যাত প্রাচীন স্থান। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। ইহার পল্লী ভূমির সহিত কত কত মহাত্মার বাল্য জীবনের খেলা ধূলার স্মৃতি বিরাজিত, ইহার পুত্র রেণু কণার সহিত কত ঐতিহাসিক উপকরণ অলঙ্কৃত লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই সুপ্রসিদ্ধ পরগণার কতিপয় প্রধান প্রধান গ্রামের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, সাহিত্য, শিল্পকলা, প্রবচন এবং খ্যাতনামা পণ্ডিত ও মনস্বি ব্যক্তি দিগের জীবন কথা আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থখানা লিখিত হওয়ার এই গ্রন্থ কেবল যে বিক্রমপুরবাসীরই মনোরঞ্জনের জিনিষ হইয়াছে তাহা নহে, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত কাহিনী প্রকাশিত করিয়াছে সুতরাং ইতিহাস পাঠক যাদেরই নিকট এই গ্রন্থ আদরের সামগ্রী হইবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে। ইতঃপূর্বে গ্রন্থকার তাহার বিক্রমপুরের ইতিহাস লিখিয়া যে বনঃ অর্জন করিয়াছেন সমালোচ্য গ্রন্থখানা কাহার সেই পূর্বাঙ্কিত বনঃ অক্ষুণ্ণ রাখিবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলি একটু সংক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থে কয়েকখানা চিত্রও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছাপা পরিষ্কার।

স্বস্তিকা—শ্রীকিত্তিঅনাথ ঠাকুর। ব্ল্যাক হর আনা।

এই গ্রন্থে কয়েকটি আধ্যাত্মিক কবিতা আছে। কবিতাগুলিতে ভক্তের প্রাণের ব্যগ্রতা বর্তমান। পাঠক-গণ স্বতিকা পাঠে স্বস্তি লাভ করিতে পারিবেন।



সোহাগ

অষ্টম বর্ষ।

ময়মনসিংহ, আশ্বিন ১৩২৭।

দ্বাদশ সংখ্যা।

‘চিজাদদা’ কাব্য প্রসঙ্গ।

“চিজাদদা” কাব্যে অর্জুন-চিজাদদার যে সম্মুখ চিত্র অঙ্কিত হইরাছে তাহার মূল রেখা ওলি (out-line) মাত্র উপরে অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু ইহার ভিতরে যত্ন বর্ষ বৈচিত্র্যের রসিগাতে যে অতুলনীর সৌন্দর্যের ছবি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং মানব-জীবনের গুণিগুণ বিশ্লেষণে যে প্রেমের রহস্য-লোক সৃষ্ট হইরাছে, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে কাব্য খান। আগা খোঁড়া পাঠ করা আবশ্যিক। কারণ, কাব্য-সৌন্দর্য্য বুঝিবার জিনিষ, বুঝাইবার নহে। শ্রেষ্ঠ কাব্য পাঠের কমে পাঠকের চিত্তে যে এক সমগ্র, সুনিবিড় আনন্দ সঞ্চিত হইয়া তাহাকে বিষয়-পুলকিত ও সযত্ন করিয়া তোলে তাহা যত্ন বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব, যেমন বৈজ্ঞানিকের যত্ন সাহায্যে কুসুমের নোয়ত-স্বভাব বিশ্লেষণ করা অসম্ভব।

সাহায্য উপরে রবীন্দ্রনাথের অর্জুন-চিজাদদা চরিত্রের যে আভাস দিতে চেষ্টা করিলাম, তরসা করি তাহা হইতে বিশেষ বাবুর উক্ত কাব্য সম্বন্ধে সম্ভাব্য ভঙ্গির অবলম্বন। অনেক পরিমাণে হুস্পষ্ট হইবে। বিশেষ বাবুর অভিযোগ সংক্ষেপতঃ তিনটি, যথা :— (১) যদি বাবুর চিজাদদা ‘উপযাটিকা’, ‘ব্যতিকারিক’—তাহার ভঙ্গি অস্বাভাবিক। (২) “চিজাদদা” কাব্যে চিত্রকল্প অর্জুনকে ‘অস্বস্ত পত করিয়া’ চিত্রিত করা হইরাছে—‘কিন্তু যদি বাবুর হাতে পড়িয়া অস্বাস্থ্যে একটি সত্যজ্ঞতার পরিচয় করিলেন?’ (৩) ‘পরিচয়

নাই, সফোচ নাই, বর্ণনাই, বর্ষকাল কেবল ভোগ, ভোগ—আর তার নিঃশব্দ বর্ণনা।’—একটি একটি করিয়া এই উক্তিগুলির মূল্য কি আর একটু বিচার করিয়া দেখিব।

প্রথমতঃ চিজাদদার কথা। অর্জুনকে দেখিবামাত্র কুরগা বীরাদনার প্রেম ভিকার প্রতি, এবং দেবতার বরে রূপের ব্রহ্মাণ্ডে সজ্জিতা হইয়া অর্জুনের বীর-স্বরূপকে পরাক্রম করার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রাথমিক উক্ত বিশ্লেষণ ওলি প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু চিজাদদা কুমারী ছিল, সে কজিরা ললনা ছিল,—এবং চিজাদদা বেমন আবালায়র শিকার শুধে লক্ষ্য। সফোচের ধার ধারিত না, তেমনি তার ঐ বাহিরের শিকার আবরণের ভিতর প্রকৃতির দান, নারী-স্বরূপটি শুদ্ধ ছিল—এই কথা ওলি বিশ্লেষণে বাবু ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পাত্রের বিবাহ-বিধি প্রাচীন কজির সমাবে যে dead letter পরিণত হয় নাই তার প্রমাণ সহুতলাদি প্রাচীন কাব্য। ঐ সকল কাব্য ও প্রাচীন ব্যবহার শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি, কজির পুরুষ-স্বামী মনের বিলম্ব হইলেই তৎপুত্রাণ্য বিনিময়ে তাহার। বৈধ বিবাহ-সূত্রে মিলিত হইতে পারিত, তৎকৃত কোমলরূপ তরবার কিবা পিতা মাতার সম্মতির প্রয়োজন হইত না। আর, প্রকৃতির জীবা-নিকেন্দন মণিপুরের বিলম্বারণ্যে মাণ্য রচনার লভ পুষ্পের কোন অগ্রাচর্য্য ছিল না, তার প্রমাণও অর্জুনের বাক্য হইতে প্রাপ্ত হয়—“দেখিতেছি পুষ্প-বৃত্ত ধরি কোবল অঙ্গুলি ওলি হুটিতেছে না।।”

তাই, অর্জুন-চিজাদদার যে অভিপ্রায় বিশদকে এত

অনার্যে বৈধ মিলনে পরিণত করা বাইত তাহাকে তাঁহার অবৈধ রাধিরা দিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু তৎকালে পাইনা। বস্তুতঃ তাঁহাদের মিলন যে বিধি সঙ্গত ইহার স্পষ্ট প্রমাণ কাব্যের উৎসাহের ভাগে প্রাপ্ত হই, পরে তাহা দেখাইব।

তারপর, প্রাচীন ধর্মব্রতের প্রচার ভাৎপর্ষ্যও কি এই নহে যে, কজির কুমারী আপনার মনোনীত কজ বীরের প্রেম ভিক্ষা করিয়া লইবার অধিকারিণী ছিলেন? অধিকন্তু, অর্জুন যে-সে বীর ছিলেন, না—তিনি “ধর্মবীর সর্গশ্রেষ্ঠ কুলে সর্গশ্রেষ্ঠ বীর” ছিলেন। এই অর্জুনের চরণে ধর্মবীর যে কোন রাজ-কুল-হৃদিতার পক্ষে জীবন-বোবন, লক্ষ্য-সম্মত উৎসর্গ করিয়া দেওয়ার একে অস্বাভাবিক বা অর্থহীন আচরণ বলিয়া কোন নিরাক্ষপ, মানবহৃদয় তৎকাল বিচারকই ব্যাখ্যা করিবেন না। হয়ত বলিবে, সেই পুরুষ-সত্যবা চিত্রাঙ্গদার পক্ষে হঠাৎ অর্জুনকে দেখিবা মাত্র তাঁর প্রেমে পড়া অস্বাভাবিক,—অন্তত ইহা প্রেম হইতে পারে না, প্রেমের বিকৃতি—কাম মাত্র। কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়া না বাই, কবি বার বার আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন চিত্রাঙ্গদা প্রেমহীন পাবাণ-হৃদয়া ছিল না—

“সেহে নারী, বীর্য্যে সে পুরুষ।”

* * *

এক দেহে

“তিনি পিতামাতা অমরত প্রজাদের।

সেহে তিনি রাজ-মাতা, বীর্য্যে সুব্রাহ্মণ।

* * *

হৃষ্টনগরের

বিজয় লক্ষীর সত আর্তি প্রজাগণে

করিছেন বরাভয়দান। দরিদ্রের

সংকীর্ণ ছয়ারে, রাজার মহিমা যেথা

নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃ রূপ

ধরি’ সেথা করিছেন দয়া বিতরণ।

সিংহিনীর সত চারিদিকে আপনার

বৎসগণে রয়েছেন আপলিয়া, শত্রু

কেহ কাহে নাহি আসে ডরে। করিছেন

মুক্তলজা, ভয়হীন প্রসন্নহাসিনী,

বীর্য্যনিধে পরে চড়ি অগভ্রাজীদয়া।”

এই স্নেহরূপিনী, তেজস্বিনী, বীর-রমণী বীরের কেশরী অর্জুনের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে পতিবে বরণ করিবে না ত কে করিবে? বস্তুতঃ চিত্রাঙ্গদার প্রেম যে বাহুরের মধ্যে শূন্য হইতে মুহূর্ত্তেকে সফল বন্ধে পরিণত হয় নাই তাঁর স্পষ্ট ইঙ্গিত কবি নানা রূপে আমাদিগকে দিয়াছেন :—

“এই পার্শ্ব? আজকের বিষয় আমার।

* * *

এই সেই পার্শ্ববীর।

বাণ্য চুরাশায় কতদিন করিয়াছি

মনে, পার্শ্ব-কীর্তি করিব নিশ্চয় আমি

নিজ ভুলবলে, সর্গিব অব্যর্থ লক্ষ্য,

পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম

তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।”

আমরা জানি, এইরূপে বিষয়ই প্রণয়ের অগ্রদূত। তাই দেখিতে পাই, অর্জুনের দূরপ্রান্ত বীরত্বকাহিনী চিত্রাঙ্গদার বীরত্বপ্রিয় হৃদয়কে পূর্য্য হইতেই বিষয়রসে সিক্ত করিয়া আপনার দিকে উন্মুখ করিয়া রাধিয়া ছিল; এবং যেইমাত্র চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের সেই “ধর্মবীর বন শ্রাম” আপনাতে আপনিগুণে নৃত্যি’ স্বচক্ষে দেখিল, অমনি রমণীর বিষয় রমণী-প্রেমে রূপান্তরিত হইল—বীরত্বের কঠিন শৈলবন্ধ তালিয়া ছুরিয়া প্রেমের নিখরিশী ছুটিয়া সমস্ত কুমারীহৃদয়টিকে আকর্ষিত করিয়া দিল;—অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের কাছে পুরুষের ছদ্মবেশে বীরত্বের পরিচয় না দিয়া পরিপূর্ণ নারীত্বের পরিচয় দিল। এবং ইহাইই স্বাভাবিক, ইহাইই নারী-ধর্মের সহজ প্রকাশ।

প্রত্যাখ্যাতা, কুরুপা চিত্রাঙ্গদা কিরূপে প্রেম-তপস্তায় দেবতার প্রসন্নতা লাভ করিয়া স্বয়ং-দেবতার পূজার উপচার স্বরূপ দুর্গত সৌন্দর্য্য-কুহব অর্জুন করিল, এবং অবশেষে প্রেমের প্রভাবে অর্জুনের বীরকীর্ত্তিকে পরাজয় করিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। চিত্রাঙ্গদার এই প্রেম-সাধনার সিদ্ধিলাভকেই সম্ভবতঃ স্মৃতিচারণী সমালোচকগণ কুল-ললনার অমোচরসীর অসিষ্টে বিলাস-চাতুরী বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন; কিন্তু বাহ্যিক কতিপয়

মন তাঁহার। চিত্রাঙ্গদার এই প্রেম-সাধনার কুমারী-
দ্বয়ের সেই একনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ প্রেমেরই পরিচয় পাইবেন
বাহার প্রেরণার কুমারী উমা উমাপতিকে লাভ করিবার
জন্ত যৌবনে যোগিনী সাজিয়াছিলেন;—যে একনিষ্ঠার
প্রভাবে সাবিত্রী পিতা-মাতার অস্বরোধ-উপরোধ,
অশ্র-উপদেশ উপেক্ষা করিয়া স্বল্পজীবী সত্যবানকেই
পতিভে বরণ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর অমোঘ বিধান-
কেও ব্যর্থ করিয়া সত্যীত রূপিণী বলিয়া নারীকুলের
চিরপূজ্য হইয়াছেন। এই চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের প্রতি
নানারূপ বর্ণ্য বিশেষণ প্রয়োগদ্বারা নারী-প্রকৃতির উপর
যে কলঙ্ক আরোপ করা হইয়াছে তাহা আজ আমরা
নীরব ওদাসিত্য দ্বারা মানিয়া লইলেও সর্বদর্শী কালের
বিচারে এই অপরাধের মার্জনা নাই, ইহা নিশ্চিত।

এখন রবীন্দ্রনাথের অর্জুন-চরিত্রের দিকে আর
একবার দৃষ্টি করুন। চিত্রাঙ্গদার নিজ মুখেই অর্জুন
তুলিয়াছেন, যে গুপ্ত কামনা সাধনের জন্ত চিত্রাঙ্গদা
একমনে শিবপূজার রত হইয়াছিল সেই কামনার ধন
জন্ত কেহই নহে স্বয়ং—

“অর্জুন, গাভীৰ-ধনু, ভুবনবিজয়ী।

সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম

করিয়া লুপ্ত লুকায়ে রেখেছি যবে

কুমারী-হৃদয় পূর্ণ করি।”

এই অর্জুন নামে দীক্ষিতা কুমারীর আত্মহারা প্রেমের
প্রতিদান করিয়া যদি রবীন্দ্রনাথের অর্জুন ‘অনর্জুন’
হইয়া থাকেন—নারীর ধর্ম-নাশী অবস্থা পত্ত হইয়া
থাকেন তবে মহাত্মারতের অর্জুনও একাধিকবার এইরূপ
পত্তত্বের পরিচয় দিয়াছেন। নারী-সৌন্দর্যের নিকট
সম্মান-ব্রতধারী অর্জুনের ব্রতভঙ্গের দৃষ্টান্ত মহাকবি
বেদব্যাস অনেকবারই প্রদর্শন করিয়াছেন; কারণ তিনি
সুনিশ্চয় জানিতেন, অলোকসামান্য নারীর প্রেম-
সৌন্দর্যে প্রকৃত বীরেরই জায়া দাবি আছে। কণ্ঠশ্রান্ত
মানবের যেমন স্নানিহারিণী নিজের শীতল অঙ্গে আশ্রয়
গ্রহণ করিবার প্রকৃতিমত অধিকার আছে, তেমনি
রমণীর অলোক প্রেম-লোকের অধা পানে বীরের কীর্তি-
ক্লিষ্ট জীবনকে সজীবিত করিবার বিধিবদ্ধ স্বত্ব রহিয়াছে।

বিশেষতঃ বাবুর কথার ভিত্তিতে মনে হয় রবি বাবুর
অর্জুন বেন কামাক পত্তর জ্ঞান কুমারী চিত্রাঙ্গদাকে
প্রলোভিত ও পণ্ড্রান্ত করিয়া, তাহার রূপের মদিরাটুকু
নিঃশেষে পান করিয়া, অবশেষে তাহাকে নিঃসহায়া
পথের ভিখারিণী করিয়া শূন্ত পাত্রের মত ভূতলে
নিষ্ক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মূল কাব্যে
আমরা ইহার ঠিক বিপরীত প্রমাণ প্রাপ্ত হই। রূপ-
সন্তোষ যখন অত্যন্ত ভিত্ত হইয়া অর্জুনের চিত্তকে
অধীর করিয়া তুলিয়াছে তখনও তাঁহার দাম্পত্য কর্তব্য-
বোধ ও একনিষ্ঠা দেখিতে পাই—

“আমি বেন পাইয়াছি, প্রভাতে জাগিয়া

স্বপ্ন হ’তে, স্বপ্ন-লক্ষ অনুল্য রতন।

রাধিবার স্থান তার নাহি এ ধরায়;

ধরে রাখে এমন কিরীট নাই কোথা,

গেঁথে রাখে হেন সজ্জ নাই, ফেলে যাই

হেন নরাধম নহি; তারে লয়ে তাই

চিররাত্রি চিরদিন ক্ষত্রিয়ের বাহ

বহু হয়ে পড়ে’ আছে কর্তব্যবিহীন।”

আবার, চিত্রাঙ্গদার ভূষণবিহীন সত্য রমণী-হৃদয়টিকে
লাভ করিবার জন্ত ভোগশ্রান্ত অর্জুনের অন্তরের ব্যাকুল
ক্রন্দন শুনিয়া চিত্রাঙ্গদার নেত্র-কোণে যখন আনন্দ
মিশ্রিত বেদনারয় অশ্রুবিম্ব স্ফুটিয়া উঠিল, তখনকার
অর্জুনের উক্তিটিও দেখুন—

“অশ্রু কেন

প্রিয়ে? বাহতে লুকায়ে মুখ কেন এই

ব্যাকুলতা? বেদনা দিচ্ছে প্রিয়তমে?

তবে থাক! তবে থাক! ওই মনোহর

রূপ পূর্ণফল মোর। এই যে সজীব

শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্ত সমীরে

এ যৌবন-যমুনার পরপার হ’তে,

এই মোর বহুভাগ্য। এবেদনা মোর

স্বপ্নের অধিক সুখ, আশার অধিক

আশা, হৃদয়ের চেয়ে বড়, তাই তারে

হৃদয়ের ব্যথা বলে মনে হয় প্রিয়ে।”

উক্ত বাক্যগুলির প্রত্যেকটি কথার বীর-হৃদয়ের

যে বিবিধ বেবশীলতা, পতীর সববেদনা,—এবং প্রেমবশে
দাক্ষিণ্য অতীতকেই ভুতি, বেদনাকেই সুখ; নৈয়াতকেই
আশার সন্ধানতা বলিয়া বানিয়া নইবার যে উদারতার
পরিচয় পাই ইহা “অমৃত পতঙ্গের” পরিচায়ক কিনা
সুধীন্দ্র বিচার করিবেন। ইহার পর আমরা দেবিরাহি
কল্পে বর্ষব্যাপী শান্তিহীন ভোগের পর, বেহের বাহ্য
মিলনের পর, অর্জুন চিত্রাদদা আশ্রয় আশ্রয় মিলনে,
চিরদিনের শান্তিহীন অকর মিলন-মুখে প্রথিত হইয়া-
ছেন। বস্তুতঃ “কড়ি ও কোমলের” যৌবন-বর্ণনামিষ্ট
কবির ভোগ-সমুদ্র চিত্তে নারী-সৌন্দর্য যে অপার্বিক
পুণ্যময়ী বৃত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল তাহা অর্জুন-
ছবিরেও বাননী প্রতিমা :—

“এমনে খেলার ধন, যৌবনের আশ,
বলোনা ইহার কানে আবেশের বাণী ;
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাকে আনিওনা টানি ;
এ তোমার স্নেহের মল আখাল,
বর্জের আলোক তব এই মুখখানি ।”

এখন “চিত্রাদদা” কাব্যের যে ভোগ বর্ণনা পাঠে
কবি বিশেষজ্ঞান লজ্জার মাথা তুলিবার অবসর পান
নাই তাহারই কথা বলিব। আমরা কিন্তু অর্জুন-চিত্রা-
দদার এই “যৌবন-সন্তোষ বর্ণনার মত এখন সুরুচি-
সমত, বিতন্ম অথচ সুসজ্জল কবিত্বময়ী ভোগ-বর্ণনা অত্যন্ত
দেবিরাহি-বলিয়া মনে হয় না। বৈকব কবিতার রাধা-
ককের যে পূর্ণরূপ ও সন্তোষ বর্ণনা পাই, তজ্জিহ্ন ভাবে
গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আশ্রয় না লইলে,
তুচ্ছ কাব্য হিসাবে তাহা ‘কামপঙ্কে’ তরপুর বলিয়া
সকলকেই বীকার করিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা-
নৈপুণ্যে, রুচির উচিতার, বিতন্ম সৌন্দর্য্যভূতি ও
মানব-স্বরের স্নেহ বিশেষণের কলে অর্জুন-চিত্রাদদার
সন্তোষ বর্ণনার, সন্তোগের মধ্যে বাহ্য কিছু স্থল,
অসুন্দর তাহার আভাস-ইন্দিভ ও প্রাপ্ত হই না। অসু-
ভূতির যে তীব্রতা এবং সৌন্দর্য্যোপনতির যে সমগ্র ভূতি
কবি রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা তাহা তাহার নারক অর্জুন-
চরিত্রেও পরিচুট দেখিতে পাই। তাই অর্জুনের

যৌবন-সন্তোষ যেমন বাসনার উগ্র আবেশে কেনি-
লোচ্ছল, তেমনি ভোগেরই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ
তীব্রতম ভোগ-বিরতি, বা বৈরাগ্য ভোক্তার হৃদয় বীর্ণ
করিয়া, ভোগের অবশ্যভাবী পরিণতি দেখাইয়া সন্তোষ-
বর্ণনাটিকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ এই
কাব্যে যৌবন-সন্তোগের সঙ্গে নৈসর্গিক শোভা ও
অলৌকিক নারী-সৌন্দর্যের আত্মবিস্তৃত পতীর উপভোগ
একীভূত হইয়া এক অপূর্ণ সন্তোষ-ভীর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে।
এই ভোগের চিত্রকে কবি উদারমুখ নীলাকাশতলে,—
পুষ্পকামোদিত, বিহগকুজিত, স্নেহ-ভুক্তিত, চন্দ্র-সুখ্যা-
লোচিত আবেষ্টনের মধ্যে,—বিজনারণ্যের স্তম শোভার
প্রচ্ছদপটে, বিচিত্রবর্ণে অঙ্কিত করিয়া ব্যক্তিগত সন্তো-
গকে বিশ্ববিস্তৃত উদারতা ও শোভনতা দান করিয়াছেন।
তাই অর্জুন-চিত্রাদদার সন্তোষ-বর্ণনার মধ্যে মিথিলের
চিরন্তন যৌবনোৎসব বেশ আহরিত, কেন্দ্রীভূত, জীবন্ত
হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রাদদার বহন-বসন্তের নিকট
হইতে অলৌকিক রূপ-লক্ষণ্য লাভের রূপকের তাৎপর্য-
ইত এই। তাই চিত্রাদদার রূপের ‘আলোক আলোক
মাকে’ আকাশের সকল আলোকছটা বিচ্ছুরিত হইয়া
পড়িতেছে,—তার স্বলিত-বসন, অগ্নান-নৃতন ওজ
সৌন্দর্যের পরে বাদশীর নদী সমস্ত হিম্মতে ঢালিয়া দিয়া
সার্বিকতা লাভ করিতেছে—তার বন্ধের প্রতিশ্রুতনে
বন-বনান্তের আনন্দ সঞ্চারিত হইয়া উঠিতেছে—প্রতি
ভূতির আলোকে ‘মধ্যাহ্নের রবি-রশ্মি-রেখাগুলি’ রতিন
হইয়া উঠিতেছে,—নবনীলিমিত বাহুবল্লরীর আন্দো-
লনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রকৃতির সত্যবল্লরী নৃত্য করিয়া
উঠিতেছে। এক কথায়, অর্জুন-চিত্রাদদার যৌবনোৎ-
সবের সঙ্গে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন এক পতীর আনন্দের
সমবেদনার উৎসবময়ী হইয়া উঠিয়াছে।

নারী-সৌন্দর্য্য রবীন্দ্রনাথে যেমন চরমোৎকর্ষ লাভ
করিয়াছে অত্যন্ত তাহা দেখিতে পাইব না। তাহার
কাব্যে নারীর দুই চিরন্তন বৃত্তি দেখিতে পাই ;—একটি,
রূপসী প্রেরণীর বৃত্তি, অপরটি, পুণ্যময়ী কল্যাণী বৃত্তি।
“সুগ-সুগভর হ’তে বিশ্বের প্রেরণী” রূপসী নারীর
পরিপূর্ণতা দেখিতে পাই “চিত্রা” কাব্যের উর্বনীতে—

সেই অবিদ্যমান-বর্ণে ‘অমরজিনি’; ‘বোবনে গঠিত’
পূর্ণ প্রকৃতি’ উল্লিখিত—যার লব্ধতার পাদপদ্ম বিকশিত
বিশ্ববাসনার অরবিন্দমাকৈ’ চিরবিরাজিত, বাহার বিশাল
‘কটাক্ষধারে ত্রিভুবন বোবন-চঞ্চল’, বাহার লীলা
মৃত্যুর—

হৃদে হৃদে নাচি উঠে লিঙ্গমাকৈ ভরনের দল,
মৃত্যুধীরে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল।

বাহার

‘মদির গন্ধ অজবাহু বহে চারিভিতে,

মধুমত্ত জ্বলন, মুগ্ধ কবি কিরে

সুস্ফুট, উদার সঙ্গীতে!’

আবার, “রাজে ও প্রভাতে” নামক কবিতাংশে
নারীর দুই মূর্তিকেই পাশাপাশি দেখিতে পাই। যে
নারী ভোগের ‘মধুস্বামিনীতে জ্যোৎস্না মিনীধে’ প্রেরণী
রূপে কেনিলোচ্ছল বোবনমুখা পান করিয়াছিলেন তিনিই
যখন ‘নির্মল বার শান্ত উবার নির্জন মদীতীরে’ স্নানশেষে
শুলবসনা মলময়ী দেবীবেশে, সীধিবুলে অরুণ সিন্ধুর
লেখা আঁকিয়া, বাম করে শুভ্র পুষ্পতার বহিরা শুচিহাতে
সুদুখে উদ্ভিত হন তখন পুরুষের ভক্তি-মন্ত্র স্বরভরে
সকল কাম বাসনা বিলস হয়। নারীর এই কল্যাণী
বিজয়িনী মূর্তির পূর্ণাভিব্যক্তি “চিত্রার” ‘বিজয়িনী’
কবিতায়, যেখানে বিশ্ববিজয়ী পুষ্পধনুকে নভোজাহ্ন হরে
নির্ঝাক বিশ্বরে নভশিরে বিজয়িনী নারীর পদপ্রান্তে
পূজোপচার বরূপে পুষ্পশরভার সমর্পণ করিতে দেখি। *

স্ববীজনাথের চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে একই সঙ্গে এই দুই
নারীর আভাস প্রাপ্ত হই। তার বোবনে গঠিত,
জ্বলন্ত নবনীকোমল সৌন্দর্যের অন্তর্দেশে যে কল্যাণী
দেবী সঙ্কুচিতা হইয়া ছিলেন তিনি পুণ্যপ্রভার পূর্ণ
প্রকৃতি হইয়া আত্ম-বরূপে প্রকাশিতা হইবার জন্য
কিরূপ চকলা হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাহার সত্য

মূর্তির দর্শন লাভের জন্য ভোগপ্রাপ্ত অর্জুনের অন্তরাশ্রা
কিরূপ অধীর হইয়াছিল তার মুগ্ধ প্রমাণ ভোগ-বর্ণনার
ছন্দে ছন্দে, দারুণ অভূতির মুহূর্হু দীর্ঘবাস্তব এবং অপ্রাপ্ত
ক্রন্দনের মধ্যে সুব্যক্ত। এবং অবশেষে, কাব্যের উপ-
সংহার ভাগে, যৌবনমুখমার ছন্দবেশ ছিন্ন করিয়া, অধ-
শূন্য মৃত্যু চিত্রাঙ্গদা যখন নির্মল প্রভাতালোকে আত্ম-
প্রকাশ করিল, তখন দেখিলাম, সেই ‘হৃদয়ের জীবনের
অকলঙ্ক শোভার স্থানে’ কোথা হইতে অন্ধর অমর এক
রমণী আসিয়া দাঁড়াইল! অর্জুনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা
চিত্রাঙ্গদার সত্য পরিচয় পাইয়া বৃত্ত হইলাম। কিন্তু
ইহা কথঞ্চিৎ পরিচয় মাত্র, সম্পূর্ণ নহে। ‘কারণ আপনার
পরিচয় দেওয়া বহুদৈর্ঘ্যে, বহুদিনে ঘটে, চিরজীবনের
কাল, জন্ম-জন্মান্তরে ব্রত।’ চিত্রাঙ্গদা এই জন্মজন্মান্তরে
ব্রত উদ্বাপন করিয়া কিরূপে আপনার সত্যকার পরিচয়
দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে তাহা তাহার নিজ মুখেই
শুনুন :-

“আমি চিত্রাঙ্গদা।

নহি দেবী, নহি আমি সামান্তা রমণী।

পূজা করি’ রাখিবে মাধার সেও আমি

নই, অবহেলা করি’ পুথিরা রাখিবে

পিছে সেও আমি নহি। যদি পার্শ্ব রাখ

যোরে সন্ধ্যার পথে, হুহু চিত্তার

যদি অংশ দাও, যদি অজ্ঞমতি কর

কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,

যদি সুখে দুঃখে যোরে কর সহচরী,

আমার পাইবে তবে সত্য পরিচয়। পর্তে

আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি

পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিবে

দ্বিতীয় অর্জুন করি’ তারে একদিন

পাঠাইয়া দিব ববে পিতার চরণে,

তখন জানিবে যোরে প্রিয়তম।

আজ

শুধু নিবেদিত চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা,

রাজেন্দ্র-নন্দিনী।”

উদ্ধৃত বাক্যগুলির প্রত্যেক বর্ণে যে আদর্শ পরীক্ষার
গর্ভ, যে মাতৃ কর্তব্যের আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে, এবং

* Haggard গ্রন্থ “She” ও “The World’s Desire”

নামক উপভাসবরে বর্ণিত বিশ্বাসনা-রূপিনী নারীর চিত্র, এবং
Hugo গ্রন্থ “Ninety-Three” নামক উপভাসের মাতৃচিত্রের
কথা আমি ভুলিয়া বাই নাই। তবে এই সকল চিত্রের তুলনার
সমালোচনার অবসর এই স্থলে নাই। — সেখক।

“যামি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্র-নন্দিনী” এই সংক্ষিপ্ত কথা শুনিতে যে পিতৃকুলের গৌরব-বোধ স্ফুটত হইতেছে, তাহা কি কোন কুলত্যাগিনী ব্যভিচারিনীতে সম্ভবে? অশুচি বিজ্ঞানলাল অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার সম্মিলনকে অবৈধ সম্বোধন বলিতেছেন। বস্তুতঃ আমাদের মতে, এই কাব্যের মধ্যে আধুনিক বিবাহ-পদ্ধতির লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, তন্ত্র-মন্ত্র, চাক-চোল প্রভৃতির সমাবেশ দ্বারা সমগ্র কাব্যের সহজ গতি ও পরিণতির পথে বাধা জন্মাইয়া রসাত্তিব্যক্তির ব্যাঘাত ঘটাইলে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাস শিল্পীর পক্ষে অসম্বন্ধীয় অপরাধ হইত। প্রতিভার লক্ষণই এই—ইহা সর্বদা অনাবশ্যককে বর্জন করিয়া থাকে—কোন স্থলে কোনটি এবং কতটুকু প্রয়োজন ও শোভন, এই ওজনবোধ স্বয়ং বোধ সকল প্রতিভাবান শিল্পীই প্রকৃতির হাত হইতে পাইয়া থাকেন। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের এই উপসংহারে অতি কোমল, প্রসন্ন ক্রমে দুই একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের ইঙ্গিতে অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার বৌন-সম্মিলন যে বৈধ উপায়ে ঘটিয়াছিল, তাহার। যে গাঢ়ত্ব বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হইয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিয়া স্থলকৃষ্টি পাঠকের সকল সংশয় দূর করিয়া দিলেন।

আবার উক্ত বাক্যগুলিতে চিত্রাঙ্গদার যে পত্নীত্বের ও মাতৃত্বের আদর্শ প্রাপ্ত হই, আধুনিক ভারতবর্ষ, আমাদের নারী-জীবনে সেই আদর্শের সকলতার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছে। এই আদর্শের প্রেরণায় বঙ্গ-গৃহের লজ্জাবনতা, লীলাদিনী ললনাকুল শুধু ‘যামিনীর নন্দ-সুহচরী’ না থাকিয়া ‘দিবসের কর্মসংচরী’ হইয়া উঠিলে,—প্রেমের সঙ্গে কর্ম, সেবার সঙ্গে সাহচর্য, সৌন্দর্য ও শীলতার সঙ্গে শৌর্য সম্মিলিত করিয়া পূর্ণ নারী-মহিমার সূচীরা উঠিলে,—এক কথায়, আমাদের গৃহলক্ষীর্ণ বীরকায় ও বীরমাতারূপে ভক্তের সঙ্গে বীর-শিকার বীজ বঙ্গ-সমাজের ধর্মনীতে আটপালন সফলিত করিয়া দিলে আমাদের গৃহে গৃহে দ্বিতীয় অর্জুন জন্মলাভ করিবে এবং তখনই আমাদের জাতীয় জীবনের সকল দুর্বলতা, ভীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা হ্রাস হইবে; তখনই কবি বঙ্গমাতাকে সম্বোধন করিয়া যে দারুণ দ্বন্দ্ব-ব্যথা প্রকাশ করিয়াছিলেন—

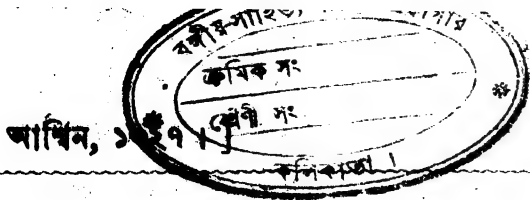
“শত কোটি সমানেবে হে দুঃখা জননী,
রেখেছ বাদলী করে মাজন করনি।”

তাহার উপশম হইবে।

এই আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম “চিত্রাঙ্গদা” কাব্য দুর্নীতিপূর্ণ, পাপের উজ্জল চিত্র নহে,—এই কাব্যে মহাত্মারতের অর্জুন আপনার পার্শ্ব গৌরব হইতে চুল পরিমাণেও বিচ্যুত হন নাই। রবীন্দ্রনাথের অর্জুন একাধারে বীর এবং প্রেমিক—তাঁহাতে ক্ষাত্র বীরের কাঠিন্যের সঙ্গে প্রেমের কান্দ্য মিশিয়া চরিত্রগত সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। আবার, ব্যাসদেবের কাব্যের উপেক্ষিতা চিত্রাঙ্গদা, সেই অস্পষ্ট রেখাপ্রণীত চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রনাথের কুলিকার ঐজ্ঞানালিক স্পর্শে সমস্ত বিষের সৌরভ-শোভায়, আলোকে পুলকে সুগঠিত। সৌন্দর্য-প্রতিমা হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাই নহে,—রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রে জগতের চিরন্তন নারী-রহস্য যেন তার সকল বৈচিত্র্য, শোভা ও পরিপূর্ণ ব্যঙ্গনা লইয়া সহস্রবল পদ্যের ভ্রাস আপনাআপনি পূর্ণ প্রকৃতি হইয়াছে। এই কাব্য পাঠে আমরা বুঝিলাম, রূপ-যৌবন কুল দলের লঘু লম্বাণের মত ক্ষণভঙ্গুর হইলেও তাহা নিরর্থক নহে—তাঁহা দেবতার দান; কারণ যৌবন-সম্পদের বাহ্য উপচারেই প্রেমদেবতার উদ্বোধন,—ভোপের মদিরা হইতেই সর্বত্যাগিনী প্রীতির অমৃত উদ্ভূত হয়—কামের পঙ্ক হইতেই প্রেমের স্বর্ণকমল জন্ম লাভ করে, বাহা ‘কেহ দেয় দেবতা-চরণে, কেহ রাখে প্রিয়জন তরে।’ এক কথায়, যে “অরূপ রতনের” জন্য মাহুদ সৃষ্টির আদি হইতে ঘুরিয়া কিরিতেছে ‘রূপ লাগরে ডুব দিয়াই’, সেই অরূপ পরম স্নহরের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই সর্বাদ্বন্দ্বের, মলমাকর শ্রেষ্ঠ কাব্যের বিকৃত ব্যাখ্যা নীরবতা দ্বারা মানিয়া লইয়া আমরা যে সাহিত্যিক অন্তের পাপভাগী হইতেছি তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য কি সাহিত্য-সমাজপতিগণ অর্জস্বর হইবেন না?

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।



আশ্বিন, ১৩৭৭

সমস্যা।

২৬৩

সমস্যা।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নগেন বলিল—“এখন তো তবু একটু ভালই দেখায়, বাবা হইয়াছিলাম, আর ধানের ভাত খাইব, ভরসা ছিল না।”

শৈলেন নিজের ক্রটি দেখাইয়া বলিল—“আমিতো ভাই গিয়া যে একবার দেখিয়া আসিব, সে অবসরও করিতে পারিলাম না।”

নগেন হাসিয়া বলিল—“এই বুঝি স্বাধীনতার বক্তৃতায় পরিণাম।”

শৈলেন—“তা কি করিব ভাই, প্রিন্সিপাল বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া ডাকাইয়া লইল। অস্বীকার করি, শেষ বেটা ফেল করিয়া দেয়—আমি নানা দিকে ঠেকিয়া কাজ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আর না করিলেও খাওয়ার তো সংস্থান চাই; বাড়ী হইতে আর কত আনা চলে?”

নগেন বলিল—সে তো ঠিক। আমাদের কলেজেরীবনে এটাই কিন্তু আমাদের স্বরণ থাকে না।

শৈলেন বলিল—এখন যদি বৎসর খানেক চাকুরীতে থাকিয়া একটা Dispensary খেওয়ার টাকাটাও জমে, তবেই—আর না।

নগেন বলিল—“তারপর—বাড়ীর, আমাদের বাড়ীর অবস্থা কেমন? বাবা তো চাকুরী ঠিক করিয়াছিলেন—বাই নাই বলিয়া খুব রাগ হইয়াছেন, না?”

শৈলেন—“খুব! না গিয়া কিন্তু ভালই করিয়াছ। গ্রামে, বিশেষ নিজ গ্রামে কি চাকুরী করিতে আছে? ওতে সন্মানও থাকে না, শেষ বিড়ম্বনাও যথেষ্ট।”

নগেন—“এ মাস হইতে ৫০ টাকা করিয়া ভাতাকে মাসে মাসে দিব। তাতেই বোধ হয় খুদ চলিয়া খোরাকীও চলিয়া যাইবে। চাকুরী না হইলে এখন আমাদেরও সামান্য বিপদে পড়িতে হইত না।”

শৈলেন হাসিয়া বলিল—“কাকাতো ভাবগ্রান বিবাহ ঠিক করিয়া টাকাও লইয়া আসিয়াছেন। বলিলেন, বাব কান্দেনেই তোমার বিবাহ।”

নগেন চমকিয়া উঠিয়া বলিল—তিনি নিজেই বলিয়াছেন কি?

শৈলেন—হাঁ, তিনি আসিবার দিনও আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন। তোমার শরীর কাতর, তাই এতদিন তাহা লিখেন নাই। এখন মাষ্টারীতে বাও নাই বলিয়া রাগ করিয়া বোধ হয় লিখেন নাই। বাড়ী গেলেই সব নিজে বলিবেন, এরূপ বোধ হয় ইচ্ছা ছিল।”

নগেন কতকগুলি শৈলেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—সে যেন এই সমস্যার উপায়ই দেখিতে ছিল না।

শৈলেন বলিল—“ভাবিলে আর কি হইবে? এখন তোমার কথা বল।”

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নগেন বলিল। “মিলনের ভাবটা, প্রকৃতির আবাহন টা—আমার ভিতরে যেন ভাল জমিয়া উঠিতেছে না। অন্তর প্রকৃতির তেমন সাড়া না পাইলে আমি বিবাহ করিতে পারিব না—সে বার তাহা পরিষ্কার বলিয়া আসিয়াছি।”

পারুলদের বার্ষিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাই দুই ভয়ীতে কোথায় গিয়াছিল। আসিয়া শৈলেনকে দেখিয়াই পারুল হাসিয়া বলিল—“নূতন ধর কি শৈলেন দা? বাড়ীতে গেলে বুঝি আর মনেই হয় না। চিঠিগুলির পর্য্যন্ত উত্তর দিলেন না।” কথাগুলি বলিয়া পারুল যেন রাগ করিয়া তাহার কোঠার চলিয়া গেল।

বকুল বলিল—“আমাদের একটা নূতন সাথী হইয়াছে কিন্তু শৈলেন দা।”

শৈলেন বুঝিল ‘পাখী’। বলিল—“কি পাখী? কেমন, দেখি?”

নগেন হাসিল, পারুলও আসিয়া হাসিয়া হুটপাট হইল; বকুল হাততালি দিয়া শৈলেনকে জ্বল করিয়া দিল।

শৈলেন দরবারে জ্বল হইয়া বাড়ীর ভিতরে দালি মাকে দেখিতে চলিল। পারুল ও বকুল সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

শৈলেন বারান্দার বাইরাই হটাৎ যেন কি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর কিরিয়া আসিল। বকুল হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল।

পারুল বলিল “পাখী দেখিলেন ?”

বকুল হাসিয়া বলিল—“পাখীর মালিক কিন্তু নগেন বাবু। ও পাখী আমাদের জায় উড়িয়া চড়ে না। গিল্লরে থাকে।”

গৃহিণী আসিয়া শৈলেনের সহিত হলে দেখা করিলেন। তাহার গাল মুখ হাতাইয়া দিয়া তাহার কুশল মদল, বাড়ীর সকলের কুশল মদল জিজ্ঞাসা বাদ করিলেন।

গৃহিণী চলিয়া গেলে, নগেন বলিল—“অনেক পরামর্শ আছে তোমার সঙ্গে, চল না একটু কোয়ারে বাইরা বাস—একটু নির্জন—।

পারুল বলিল—“আমরা চলিয়া যাইতেছি, এখানেই আগুনারা বহুন না—নর বাবার রিডিং রুমেই গিয়া বহুন।”

বকুল হাসিয়া বলিল—এখন নগেন বাবুর কত কথা, পাখীর কথা, গোপনীর কথা, অর গৃহস্থীর কথা, ও সকল কথা কি আর ঘরে হয় ?

নগেন হাসিয়া বলিল—“আমার পক্ষে সন্ধ্যার পূর্বে একটু অরণের ব্যবস্থা আছে ; সে লগ্নই বিকালে কোয়ারে বাইরা থাকি। চাঁর সময় চলিয়া আসিব, গান শুনিব, উপাসনা করিব—সবই করিব। চল শৈলেন।

পারুল বলিল—“শৈলেন দাকে নিয়া আসিবেন কি ?”

গোলাদোষীর হাতার তিতর এক থানা বেঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া শৈলেন প্রশ্ন করিল—“পাখী ঘরিলে কোথায় ?”

নগেন হাসিয়া বলিল—“বাবা বিবেচনের দান।”

শৈলেন—“এ দান মিলিল কি প্রকারে ?”

নগেন হৃষিনী সন্ধ্যা যতক্ষণ আনিত, সবিত্তারে শৈলেনের নিকট বলিয়া শেষ বলিল—হৃষিনীর সন্ধ্যা যতই বেশী আনিত বাই, ততই তাহার সন্ধ্যা আমার না জানার নিকটায় পরিণত হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং হৃষিনী কে তাহার নিজ সন্ধ্যা অধিক কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া আনি প্রয়োজন মনে করি নাই। ৬ কাশী বায়ে একটা অত্যন্ত কুশীলা কুমারী ও যুবতীর অত্যন্তই নাই ; তবে গুরুদেব বলিয়াছেন—বলিয়া নগেন বুক

করে তাহার গুরুকে উদ্দেশে প্রণাম করিল—হৃষিনী তাহার পালিতা ব্রাহ্মণ কন্যা, নিশাপ চরিত্র—ইহার উপর কথা বলিবার আমার কিছু ছিল না, সুতরাং কোন বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিবারও প্রয়োজন মনে হয় নাই।

শৈলেন—“এখন ইহাকে রাখিবে কি প্রকারে ? যুবতী, ব্রাহ্মণ কন্যা—সমস্তা খুব সহজ কি ?”

নগেন বলিল—তুমি আসিলে এক থানা ছোট কোঠা বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিব, একপই হুর্গাদাস বাবুর মত।

শৈলেন—এই যুবতীকে লইয়া আমরা দুজন থাকিব, একি খুব বুদ্ধি সমত মত ? ইহা অপেক্ষা তুমি ইহাকে গুরু দান বলিয়া সরল অঙ্গকরণে দিবা শূন্য মনে গ্রহণ কর, সে উত্তম। কোম কথা থাকিবে না।

নগেন বলিল—“তাহা অসম্ভব। আমার পক্ষে এখন বাবার মনে নতুন করিয়া আখাত দেওয়ার চেষ্টা অসম্ভব—আমি তাহা পারিব না। হৃষিনীকে পাত্রান্তরে সমর্পণ করাই আমার ইচ্ছা। বিধু বাবু তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত—।”

শৈলেন—“এ সন্ধ্যা তুমি ইহার মত লইয়াছ কি ? তোমার গুরুদেবেরই রা আদেশ কি ?

নগেন—“গুরুদেব সেই রূপই উপদেশ দিয়াছিলেন—হৃষিনীর মত অল্পরূপ হইতে পারে না।”

শৈলেন—“হিন্দু সমাজে ইহার কোন গতি হইতে পারে না ?

নগেন—“অসম্ভব—গুরুদেব তাহা প্রত্যাশা করেন নাই, হৃষিনীও তাহা করে না। তুমি যদি পার, চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার। আমার বাবা সমাজপতি—আমি এইরূপ ব্যাপারের সংশ্রবে নিজকে অধিকতর অগ্রসর করাইয়া পিতার মতক অবনত করাইতে এখন আর ইচ্ছা করি না।”

শৈলেন হাসিয়া বলিল—“তোমার এই পরিবর্তন কত দিন হইতে ? হুর্গাদাস বাবুর আদাই হইবার ইচ্ছা কি ইহার মধ্যেই চলিয়া গেল ?

নগেন বলিল—“রোপে তুমি পারিত্রিক অবস্থার জার সাময়িক অবস্থাত অত্যন্ত দুর্জন হইয়া গিয়াছে।

বর্ষীয় ও বন পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে কোন নূতন চিত্রা ও নূতন হাঙ্গামা কাগজ ঢুকাইতে সাহস করি না।”

শৈলেন—“তবে প্রাক্ষণ্যের জমিদার যবেই—মাথা বিকাইবে?”

নগেন—“বাবা যদি নিজকে বিপন্নই করিয়া থাকেন, তবে আর অন্য উপায় কি?”

শৈলেন হতাশ ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“বুঝিলাম।”

এই সময় আর একটি ভ্রমলোক আসিয়া তাহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিল—“শৈলেন, কবে আসিলে হে? তারপর, কি কথা হইতেছে?”

শৈলেন হাসিয়া উত্তর করিল—“আসিয়াছি আজই; হইতেছে কথা—তোমাদের সম্বন্ধেই।”

ভ্রমলোকটির নাম রমেশ বাবু, তিনি ব্রাহ্ম সমাজের লোক, পূর্ব-নিবাস পীরপুর—শৈলেনদের এক-গ্রামেই।

রমেশ বলিলেন—“আমাদের সম্বন্ধে? দে কেন?”

শৈলেন—“এই—বিধু শর্ম্মার কথা; লোকটা বাড়ী বাড়ী গিয়া ঘরা দিতেছে, অথচ তোমাদের সমাজে একটা মেয়ে তাহার জন্ত জুটিল না; ব্রাহ্ম সমাজের এই লামা নীতির কথাই অজ্ঞতার আলোচ্য বিষয়।” বলিয়াই শৈলেন উচ্চ হাস্ত করিল।

রমেশ হাসিয়া বলিল—“ও বঙ্গোপসাগরের কথা বলিও না। সে নিজে নিরশ্রমীর ব্রাহ্মণ, অথচ ঘুরে সে ফুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ের খোজে, এদিকে অবস্থাতো—ন অন্ন ন বস্ত্র।”

শৈলেন—“ব্রাহ্ম সমাজের এ কৈলি-কাকন-সমস্যা আর হিন্দু সমাজের জাতি ভেদ সমস্যা বর্তমান বঙ্গ সমাজকে সাম্য নৈজী ও বাবীনতার পথে লইয়া বাইবার পক্ষে কি পরিমাণ সাহায্য করিতে পারে—হু জনাতে বলিয়া আমরা আজ তাহারই হিসাব নিকাশ করিতেছি।”

রমেশ হাসিয়া বলিল—“আলোচনার উদাহরণ হইতেছে বোধ হয়—বিধু বঙ্গোপসাগর একদিকে, আর শাস্ত্রী বিভাভূষণের কথিত হিন্দুসমাজের কলহ আর একদিকে, না?”

শৈলেন হাসিয়া বলিল—“ঠিক বয়িয়াছ।”

নগেন বলিল—“হিন্দুসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজ উভয় সমাজেরই অধঃপতনের দিগ্ধ খুব নিকটবর্তী বলিয়া আমার মনে হইতেছে। আমার মনে হয়, আমরা যতই আমাদের নামের অগ্রে ও পশ্চাতে ‘সাদু’, ‘ভাই’, ‘স্বাভাবি’, ‘আনন্দ’ ইত্যাদি বিশেষণ জুড়িয়া নিজকে শ্রেষ্ঠ বার্ষিক বলিয়া জাহির করিতে বাহতিচি, ততই নিজকেতো দেশের মধ্যে অপদস্থ করিতে ছুই সমাজকেও ধীন করিয়া ফেলিতেছি। রবিবাবু নাকি এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন—

নিজেরে করিতে সম্মান দান, কেবলি নিজেরে করি অপমান

রমেশ গভীর ভাবে বলিল—“এরূপ মনেকরা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অজ্ঞার। ইহা গ্রীক, আদার ব্যাপার হইয়া জাহাজের খবর নেওয়ার জায় অনধিকার চর্চা। তুমি কি জানহে ব্রাহ্ম-সমাজের? আগে সমাজকে প্রজ্ঞাকর, ভালবাস, তার ভিতর প্রবেশ করিয়া হিতাহিত বিবেচনা কর, তারপর দোষ ক্রটির কথা বল—তোমার কথার মূল্য হইবে। বাতে তোমার প্রজ্ঞানাই, বার গুচর্ম্ম তোমার পক্ষে অনধিগম্য—তার সম্বন্ধে তোমার যতের মূল্য কি?

শৈলেন বলিল—“তা হইতে পারে; কিন্তু তোমার ব্যাতিচার যদি আমাকে কলঙ্কিত করিবার উপকরণ করে—সমগ্র দেশ ও জাতির পক্ষে অনিষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহার বিরুদ্ধে বলবার পক্ষে অধিকারী অনধিকারীর বিচার অনাবশ্যক। আমি আদর্শ সমাজেরই পক্ষপাতী। ব্রাহ্মসমাজও বুঝি না, হিন্দুসমাজও বুঝি না। আদর্শ লোক চাই। আমি জানিতে চাই—রাগা বাহার বীজ বপন করিয়াছিলেন, আর বহুবি বাহার মূলে বার শিকন করিয়াছিলেন—সেই উন্নাতমূল কল্লবক আজ এই প্রায় এক শতাব্দীর ভিতর দেশ ও জাতিকে কোন বাহিড় কল প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন? আর রত্নলক্ষ্মণের নাগপাসে অষ্টে পুষ্টে-বহু আত সাবধানী রত্নলক্ষ্মণ সমাজইবা এ জাতিকে কোন অপারিষ জাতীয় আদর্শ দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন?”

রমেশ ভাল বক্তৃতা দিতে পারিত, সে তখন উত্তেজিত হইয়া ভরানক বক্তৃতা আরম্ভ করিল। তাহার বক্তৃতা জিনিয়া লোক জমিয়া গেল। তখন সে লাকাইয়া বেঞ্চের উপর দাঁড়াইল। অবস্থা বুঝিয়া শৈলেন ও নগেন দীর্ঘ দীর্ঘে সরিয়া পড়িল।

স্বাক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ ।

শৈলেন কলেজের সম্মুখে কলেজ স্ট্রীটের উপর শৈলেন ও নগেন একটি বাড়ী ভাড়া লইয়াছে। বিতলের উপর ছ'টি কোঠা আছে, বারান্দার এক কোণে রান্নাঘর। নীচে কলেজ কল ও পারখানা, বাড়ীর মাঝের ছ'টি কোঠা ১৪ টাকার উপর। নগেনের অল্প রাখিয়া ছ'বারের ৪টি কোঠা অল্প ভুলন ভরণ্যককে পুনঃ ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। মাঝের কোঠার সম্মুখে শৈলেন ও শৈলেন থাকে, ভিতরের কোঠার দুঃখিনী থাকে ও জিমিস পত্র রাখিত হয়। নীচের তলার একটি পুস্তকালয়। ছোকরা ঢাকর নগেনের বাইতি, নিবাস মোদনপুর, শৈলেনদের মনের ঢাকরের তাই। নগেনের প্রাচ্য আহারের পর তাহার দাদার সহিত গিয়াই শয়ন করে।

একদিন যাত্রার পরে বারটার পর শৈলেন ও দুঃখিনীর মধ্যে এইরূপ আলাপ হইতেছিল।

শৈলেন—“দুঃখিনী আমার কথা উত্তর দাও, আমার প্রভাবে তোমার সম্মত আছে কি?”

দুঃখিনী মাটির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—“আমাকে কী করবেন, নগেন বাবুর ব্যবহার উপর আমার নিজের কোন মত থাকিতে পারে না। আমি অল্প কষ্টেরও কোন ব্যবহার বা পরামর্শে বাক্য হইতে পারি না। যতই পারি না। তিনি যাহা করবেন, তাহাই হইবে।”

শৈলেন—“বরং আরো ভাবিয়া দেখ।”

দুঃখিনী চুপ করিয়া রহিল। উত্তর দিল না।

শৈলেন বলিল—“দুঃখিনী! নগেন যে তোমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে, এমন বিবাহ আমার নাই। তাহার ব্যবস্থা আমি তোমার চেয়ে ঢের বেশী জান।”

দুঃখিনী নীরব। তাহার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল।

শৈলেন—“সে কি তোমার নিকট সম্মত দিয়াছে?”

দুঃখিনী কহিল—“তারপর ধীরে ধীরে বলিল—“আমি এত রাস করিবেন না, আমার অবস্থা আমার বিবেচনা। আমার আমাকে উপদেশ দিবেন; আমাকে বাধ্য করিতে হয় বলিবেন। আপনাকেও আমি নগেন বাবুরই মত পরামর্শের মনে করি। আপনি

গতি কি হইবে, এক ভগবান ব্যতীত আর কেহ তাহা জানে না—কিন্তু আমি এখন একমাত্র নগেন বাবুরই জানি। তিনি কি এতদিন পরে দুই হাতে তেলিয়া আমাকে ফেলিয়া দিতে পারিবেন? দুঃখিনীর কল্প ভগবানের চক্ষু না থাকিতে পারে—তাঁহার তো ঘর আছে? বাবা যে তাঁহারই হাতে আমাকে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন।”

শৈলেন—“আজ রাতেই যাহা হয় হইবে, নগেনের বাপ যে ব্যবস্থা করিবেন, নগেন তাহা উপেক্ষা করিতে কখনই পারিবেন না। কেননা, তিনি তাহার বিবাহের টাকা অগ্রিম লইয়া আনিয়া রাখিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার জমিদার, তিনি টাকা ফেরৎ দিলেই যে তাঁহার তাহাকে ছাড়িয়া দিবে, এমন নহে। কেননা ঘটাইবে।

দুঃখিনীর চক্ষে জলধারা বহিতেছিল। সে বলিল—“তাঁহাকে বিপদে ফেলিয়া, পিতার অবস্থা করিয়া, আমি কোন অসুযোগ করিব না। বরং আমাকে লইয়া তিনি বিপদে না পড়েন, তাহা করিতেই আমি সর্বদা তাঁহাকে অসুযোগ করিতেছি। আমার অদৃষ্টে, তিনি যে ব্যবস্থা করবেন তাহাই হইবে। চারটি ভাত সিদ্ধ করিয়াই না হয় তাহার নিকট থাকিব। এ অধিকার হইতেও কি তিনি বঞ্চিত করবেন?”

শৈলেন—“ইহাই তোমার তবে শেষ পণ?”

দুঃখিনী—“আপান রাগ করিবেন না। আমার কোন পণ নাই। বাবার ইচ্ছায় আমি নগেন বাবুর অধীন আছি, নগেন বাবু এখন আমার ব্যবস্থা যাহা করিবেন—”

দুঃখিনী আর বলিতে পারিল না—কাদিয়া আকুল হইল।

শৈলেন হৃস্পিটেল হইতে আসিয়াছিল, আবার হৃস্পিটালে চলিয়া গেল।

দুঃখিনীর মনে আজ শান্তি নাই। শৈলেন যাহা বলিয়াছে—এখন তাহাতে বাসিয়া দুঃখিনী দোবল, তাহা ঠিক—নিতান্তই দুঃখিনী, উন্নত যৌবনের অগ্র পশ্চাৎ দুঃখিনী কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই না। পোন্দর্য্য মোহে, কৃতজ্ঞতার বিনম্র, সে নগেনের চিত্ত যতখানি অধিকার করিয়া লইয়া বাসিয়াছে—পিতার দুঃখ অ.দেখ, ও সমাজের তাল কথাতালের বিভীষিকার নিকট তাহা কতকণ টিকিবে?

আজ নগেনের পিতা আসিয়াছেন। রাত তাঁহাদের দীর্ঘ আলোচনার ছাঁধিনীর ক্ষুদ্র জীবনের একমাত্র আশ্রয় হুলটা ভীষণ ভূকম্পের প্রবল ধ্বংসের ভয় ধসিয়া পড়িবে। হার, হার, তখন তাহার গতি কি হইবে?

ছাঁধিনী সারা দিগ্ধর তাহাই চিন্তা করিয়া কখন হু কাইয়া কাঁদিয়াছে—কখনও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে চাহিয়াছে। সমস্ত দিনের কান্নার তাহার চক্ষুটি জবা ফুলের ভায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

নগেন আকিস হইতে আসিয়া ছাঁধিনীর মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল। ছাঁধিনী তাহাকে দেখিয়া নতমুখে চলিয়া গেল।

হাত মুখ ধুইয়া নগেন ডাকিল “পাখি!”

‘ছাঁধিনী জলখাবারের লইয়া আসিল।

নগেন বলিল—তোমার মুখে চোখে এমন রক্ত জবার মত দেখায় কেন? কাঁদিয়াছ কি?

ছাঁধিনী—“কান্না লইয়াই যখন আসিয়াছি, তখন হাসি আর কোথায় পাইব?”

নগেন “বাবা তোমার হাতের খাইবেন না, আমাকে আজ রান্না করিতে হইবে। শৈলেন আসিয়াছে কি?”

ছাঁধিনী নীচের দিকে চাহিয়া হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—“বারটা একটায় একবার আসিয়াছিলেন, পরে আর আসেন নাই।”

নগেন জল খাবার খাইতে খাইতে ধীরে ধীরে বলিল—বাবা আমার বিবাহ ঠিক করিয়াছেন, তুমিতে ছ ফাক্সমেই বিবাহ, বিবাহের পণ্ড কতক তিনি অগ্রিম লইয়াছেন—এ সম্বন্ধে তোমার মত কি?

ছাঁধিনীর চক্ষে জল সঞ্চিত হইতেছিল, এইবার গভ্র প্রাবিত করিয়া ধারা বহিল। ছাঁধিনী দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া পড়িল।

নগেন ছাঁধিনীর দিকে চাহিয়াই বলিল “আমি তোমার জন্ত কি করিতে পারি বল?”

ছাঁধিনী নিজ হাটুর উপর কপোল নিশ্চল করিয়া বসিয়া যোহন করিতে লাগিল। কোন কথা বলিল না।

নগেন কথা বলিতে বাইতেছিল, কথা মুখে আটকাইয়া গেল। সে গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল—“তোমার

এবং আমার মিলন, বাহা আমরা আশা করিতেছিলাম—ভগবানের তাহা অভিপ্রায় নহে। হিন্দুসমাজে থাকিয়া সেরূপ ব্যবস্থা অসম্ভব।”

ছাঁধিনী বস্ত্রাকলে চক্ষুজল মুছিয়া বলিল—“আপনাকে ছাড়িয়া অস্ত্র বাণের, আমার পক্ষেও আর অসম্ভব।”

নগেনের বাবা দিগ্ধর তাহাদের বাড়ীতে আহার করেন নাই। সহরে বামনীদের হাতে তিনি আহার করেন না, এমন অবস্থার ছাঁধিনীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব কে তাহার নিকট উপস্থিত করিবে? অথচ ছাঁধিনী নগেনের চিত্ত এতদিনে সম্পূর্ণভাবেই অধিকার করিয়া লইয়াছিল। তাহা তথু তাহার অপরাধ নৌন্দর্ষের খাতিরেই নহে; জন্মের মাধুর্য্যে, শ্রীতির অমৃতত্বে, নারীর নারীত্ব ও মহত্বে সে নগেনকে আপনায় করিয়া লইয়াছিল।

নগেনের বয়স অবশ্যই রাতারাতি বিত্তন হইয়া যায় নাই। কিন্তু অর্থ উপাধ্বনি করিতে বাইয়া সে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় গভীর হইয়া পড়িয়াছিল। পিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া অজ্ঞাত কুলশীলা কোন যুবতীকে গ্রহণ করিবার চপলতা তাহার কল্পনা হইতে ক্রমে অপ-সারিত হইতেছিল। আজ তাহার নিজ বধন আসিয়া ছাঁধিনীকে রান্না করিতে দেখিয়া উকীলের বাড়ীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তখন আর তাহার সাধনা রহিল না। সে মুহূর্ত হইতেই জাতি-সমস্তা বৃষ্টি ধরিয়া তাহার সমুখে দাঁড়াইয়াছে। আজ সমস্ত দিন ভরিয়া নগেন কেবল ছাঁধিনীর কথাই ভাবিয়াছে—তাহার সর্বোপরি নির্মল-সত্য, কোমল প্রকৃতি, গভীর প্রেম, উচ্চ আত্মত্যাগ। কিন্তু ইহার কিছুকৈ সে তাহার পিতার সম্মানের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না। পিতার মাথা হেঁট করা ইয়া ছাঁধিনীর পাশি গ্রহণের নজির সে কিছুতেই সংগ্রহ করিতে পারিতেছিল না। অথচ ছাঁধিনীকে বশতঃ অগ্রাহ্যও সে করিতে পারে না। অনোত্তপার হইয়া নগেন ধীরে ধীরে বলিল—“হিন্দুসমাজে তোমার বিবাহ হইতে পারে না ছাঁধিনী!”

ছাঁধিনী তেমন কিছু প্রতিবাদী করিয়া বলিল—“হিন্দু

সমাজেই আমার বিবাহ হইয়াছে—ব্রহ্মচারী বাবাই আমাকে আপনায় হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমার আর অন্তর বিবাহ হইতে পারে না।”

নগেন হাসিয়া বলিল—তিনিতো তোমার বিবাহ দিয়া বান নাই, তোমার রক্তের তার দিয়া গিয়াছেন। আমি তোমাকে কোন সৎপায়ে পাকিচ্ছি করি, ওরদেবের তাহাই ইচ্ছা।”

হুগুধিনী অপেক্ষা কৃত একটু তীব্রভাবে বলিল—ওরদেবের তাহা ইচ্ছা থাকিতে পারে, কিন্তু আপনায় তেমন ছিল না, তাই আপনি আমার নারী স্বর্গ্যাদার আশ্রিত করিয়াছেন, আমিও আপনায় ব্যবহার তেমন তাবেই গ্রহণ করিয়াছি।”

নগেন লজ্জিত হইয়া বলিল—“আমি কি কখনও তোমাকে এতি স্বর্গ্যাদার হানিকর কোন কার্য করিয়াছি?”

হুগুধিনী—“সেইরূপ কোন কার্য না করিলেও আপনায় কথা বার্তা ও ব্যবহার আমাদের মধ্যে অন্ততাবের ছিল না। এখন অন্ত তাবের হইলে তাহাতে নতাবতঃই নারীস্বর্গ্যাদা ক্ষুদ্র হইবার কারণ হয়।”

নগেন—মনে মনে নিজের জটী বুদ্ধিতে পারিরা চুপ করিয়া রহিল।”

হুগুধিনী বলিতে লাগিল—নিতাকে উপেক্ষা করিতে আপনি পারেন না—কথাচ তাহা করিবেনও না। আমাকেও উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আমি আপনায় বর্ষ পরী। আমার মান সন্মত—

হুগুধিনী আর বলিতে পারিল না। কাঁদিয়া কেলিল।

নগেন বলিল—“আমি তোমাকে কখনো উপেক্ষা করিব না। কিন্তু সম্প্রতি ব্যবহারইবা তোমার সহিত চলিবে কি একারে? এ বে নবা সমতা।”

এই সময় শৈলেন—আলিয়া উপস্থিত হওয়ার তাহা-
য়ের কথা এইখানেই থামিয়া গেল।

প্রয়োজিত্ব পরিচ্ছেদ ।

ভার্যচরণ কান্তনের মধ্যভাষে বিবাহের দিন স্থির করিয়া পুত্রের নিকট জানিতে আসিয়াছেন। বাণ্যর আদিয়া ছিল যে অবস্থা ও ব্যবস্থা দেখিতে পাইলেন,

তাহাতে তাহার পুত্রের প্রতি আর-ভরসা রহিল না। হুগুধিনী বুঝতী বাবুন ঠাকুরাণটির প্রতি চাহিয়া—তিনি এতদিন মানা বুধে যে রটনা তুলিয়াছিলেন—সে ব্যাপার যে সত্য, তাহা বুঝিবার পক্ষে তাহার আর কোনই অন্ত-বিধা হইল না।

ভার্যচরণ প্রথম জীবনে বিস্তর অনাচার করিলেও এখন সমাজপতি হইয়া আর অনাচারে পা দিবেন না, তাহিরাই প্রাতঃকালে তাহার এক বাসাবস্থার গৃহে আহাির করিবেন বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

বিকালে নগেন রাত্তি কহিতে গেল, শৈলেন তাহাকে বাইরা লইয়া আসিল।

রাজিতে আহািরান্তে বসিয়া ভামাক টানিতে টানিতে ভার্যচরণ বলিলেন—“ভাকুগ্রামের বিবাহই স্থির করিয়াছি।”

নগেন নীচের দিকে চাহিয়া কহিয়া পিতার কথায় সন্মতি দিয়া বলিল—“আচ্ছাঃ”

ভার্যচরণ সাহস পাইয়া বলিলেন—“আড়াই গজারই দিবে—পাঁচ শত টাকা অগ্রিমই দিয়াছে—”

নগেন বিজ্ঞাসা করিল—“সেই টাকাটা কি সাতাল বাবুকে দিয়াছেন?”

ভার্যচরণ একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—“খুচরা খণ্ডগুলি পরিশোধ করিয়াছি। গত ভাত্রে চাউল কিনিতে হইয়াছিল—আউল কলস বাতা বাওয়ার এমন বিপদই গিয়াছে—তার উপর পাটের বাতার একদম বন্ধ—”

নগেন পিতার নতবা ও কৈকিরত শিরোধাৰ্য্য করিয়া লইয়া বলিল—“এখন আদর্য্যে কিছু চাউল কিনিয়া রাখিলে বোধ হয়—”

ভার্যচরণ দম ছাড়িয়া বলিলেন—“টাকা হইলেতো সেস্রূপ বন্দোবস্ত করা ভালই ছিল। কিন্তু গ্রামের দেস্রূপ অবস্থা—রাখিতে সাহস হয় না।”

নগেন বলিল—তবে কাল নাই। হুজ বামিলে চাউল প্রকৃতি দেশভাত ক্রয় কলস অপেক্ষাকৃত সস্তাই থাকিবে।

ভার্যচরণ—১৪ই কান্তন বিবাহের তারিখ স্থির হই-
রাছে। বিবাহের বরতের আদ্যাক কিছু এখন রাখা
প্রয়োজন, তাহা রাখিতেই হইবে

নগেন বীরে বীকে শৈলেনের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল—“কান্তনে বিবাহ।”

নগেনের অবস্থা বুঝিয়া শৈলেন বলিল—“কান্তনে! অসম্ভব কথা।” এখন ইহাও বেরিবার অবসর নাই। এই সব কারবারের আন্তে, টাকা কলের মত খরচ হইয়া যাইতেছে—এই কান্তনে—অসম্ভব।”

ভার্যচরণ ব্যস্ত ভাবে বলিলেন—“যেদের বরস চৌক, কিছুতেই তাঁরা কান্তন পার হইতে দিবেন না; সম্মুখে অকাল; আর ততস্ত নীর—এই সকল ততকার্যে আপত্তি উচিত না। সে আর কদিনেরইবা কাল, এক সপ্তাহ বিদায়—বিবাহ কান্তনেই হইবে।”

ভার্যচরণ হুঃখিনীর রূপ লাভ্য ও বরস দেখিয়া ভয় পাইয়া পিরাচ্ছিলেন, এখন শৈলেনের আপত্য তুলিয়া মনের সন্দেহ গভীর হইয়া উঠিল। তিনি হকার দম টানিয়া পুনরায় বলিলেন—“না বাবা তোমাদের সঙ্গ ভাল নহে; বরস কালে তোমাদের এত প্রলোভনের মধ্যে বাস করা আমি সম্ভব মনে করিতেছি না। তোমরা একটা বাবুন ঠাকুর রাখিয়া লও—বিবাহটা কান্তনেই হইবে।

হুঃখিনীর প্রতি এই ইঙ্গিতে শৈলেন ও নগেন উত্তেজিত লজ্জিত হইল। কেহ কোন প্রতি-উত্তর করিল না। ভার্যচরণও এ সম্পর্কে আর অধিক বাড়ি বাড়ি করা সম্ভব মনে করিলেন না। তিনি বিবাহের কথাই বলিতে লাগিলেন।

“বিবাহ এমন স্থানেই ঠিক করিয়াছি—বাহার সম্মুখে গৌকে হুঁ কথাটা বলিতে পারিবেন। তাঁরা মনে মনে বেশের সম্মুখের প্রদান ব্যক্তি। আমার ছেলে কি বাহার তাঁহার ঘরে বিবাহ করিতে পারে।”

নগেন মাথা হেঁট করিয়া রহিল। শৈলেনও এখন নূতন কোন কথা উপাধনের সময় নহে মনে করিয়া ভার্যচরণের আশ্রয় প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠার কাহিনীই শুনিতে লাগিল।

ভার্যচরণ হকার এক এক বার চান দিতে লাগিলেন, আর কানিতে কানিতে নিজ পিতৃপুত্রের উক্ত সমস্ত বাণের কথা এবং পিতা-মাতা স্বকল্পনের প্রতি জ্ঞিত

ধাকাই যে জীবনের একত উন্নতির মূল, সে সম্পর্কে সন্তোষ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।”

ভার্যচরণ ধামিলে নগেন বীরে বীরে বলিল—“আপনি তাঁহাদিগকে ভার্যচরণ পরিবর্তনের কথা লিখিয়া দেখুন, যদি স্বীকার না করেন, তবে এখানেই কার্য হইবে; বিদায়ে যাইতে পারিব না।”

ভার্যচরণ—অগত্যা পুত্রের কথার স্বীকৃত হইলেন।

চতুর্জিংশ পরিচ্ছেদ।

হুঃখিনী শৈলেনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে শৈলেন পাকুলের ভালবাসার গভীরতা মনে মনে অনুভব করিতে লাগিল। পাকুল অধীর ভাবে তাহার মনের কোন চাকল্য ভাব শৈলেনের নিকট প্রকাশ না করিলেও, পাকুল যে শৈলেনকে খুব প্রীতির চক্ষে, খুব মেহের চক্ষে, এমন কি ভালবাসার চক্ষে দেখিত, তাহা তাহার প্রত্যেকটা কথারও ব্যবহারে অনুভূত হইত।

শৈলেনের মনে পাকুলের সেই সকল ব্যবহার এক একটা করিয়া উদয় হইতে লাগিল, আর শৈলেন বেন পাকুলের সেই মেহ প্রীতির নিকট কিছু কিছু করিয়া অবনত হইতে লাগিল।

হুঃখিনীর প্রতি শৈলেনের মন বিজ্রোহীত্ব নাই। হুঃখিনী নগেনের জীবনে যে একটা বিষয় সমস্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—নগেন তাহা বহুর নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। নগেন ইহাও শৈলেনকে একদিন বলিয়াছিল—যে তাহার পিতা যিনি সম্মুখের মেতা হইবার প্রলোভন ছাড়িতে পারেন নাই—বিষয় দারিদ্র্যও যাহাকে তাহা হইতে দূরে রাখিতে পারে নাই—তিনি তাঁহার পুত্রের একরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশ্নর কথনও দিবে নাই। আর সেও পিতার মর্মে নির্দয় আঘাত দিয়া, সম্মুখের সম্মুখে পিতার উন্নত মতক অবনত করাইয়া—একরূপ সম্মুখের কাহী করিতে পারিবে না। যদি সে হুঃখিনীকে কোন সৎ পাত্র পাওয়া করিতে পারে তবেই সে নিজে বিবাহ করিবে, নতুবা পিতা বিবাহ করাইলেও হুঃখিনীর স্থান না হওয়া পর্যন্ত সে হুঃখিনীর মতই নিঃসঙ্গ জীবন বাপন করিবে।

যজুর জীবনের এই বিষয় সমস্ত সমাধান করিবার জন্যই শৈলেন অগ্রসর হইয়াছিল।

শৈলেনের প্রত্যাহার উত্তরে ছাখিলী বাহা বলিয়াছে, তাহাতে শৈলেন মনে তখন একটু আশ্বস্ত অনুভব করিয়া থাকিলেও সে তাহার প্রত্যাহার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

চাকুরী পাইয়া অর্ধ উপার্জন করিয়া শৈলেনের মনে বোঝানের চাকল্য দেখা দিয়াছিল। ছাখিলীর সংসর্গ হইয়াছিল এই চাকল্যের ইচ্ছা। এই সময় শৈলেনের বউদি বে একেবারেই তাহার কথা ভুলিয়া বলিয়াছিলেন তাহা নহে। তাহার মাহুলি আশ্বাস—“জীবনে বসন্ত আসিয়াছে কি ?” “কাল কুকিলা ডাকিয়াছে কি ?” “কোছনা ফুটিয়াছে কি ?” তখনও চলিতেছিল। শৈলেনের নিকট ঐক্লপ ‘পরের মুখে বালি খাওয়ার’ লব্ধ মেহাটাই ছেলে খেলা বলিয়া মনে হইতেছিল। তাই সে এইবার তাহার বৌদির চিঠির এক কড়া উত্তর লিখিয়া দিয়া পুনরায় বাইরা পাকুলদের চা বৈঠকের নিয়মিত সভা হইয়া বলিল।

শৈলেন ও নগেন পৃথক বাসার পিরাছে পর আর শৈলেন চূর্ণদাল বাবুর বাড়ী আইসে নাই ; নগেন বা হুই এক দিন আসিয়াছে—কারবারের কথা লইয়াই আসিয়াছে ; ভাল করিয়া বলিয়া কথা বলিবারও অবসর হয় নাই। সে মাত্র পাকুল ও বকুল একটু চুপিত ছিল।

শৈলেনকে পুদিরায় পাইয়া তাহার প্রথমে তাহাকে ঠাঠা করিয়াই অস্থির করিয়া ফুলিল। তারপর প্রীতির ভাবে গ্রহণ করিল।

শৈলেন এখন প্রতিদিন চূর্ণদাল বাবুর বাড়ীর বৈকালিক চা পান বৈঠকে উপস্থিত থাকে। তারপর সাজি ৮টা, কখন কখন ৯টা ১০টা পর্যন্ত তথায় থাকে ; উপাসনার যোগদান করে ; সঙ্গীত শ্রবণ করে ; ঘেরে ছেলে দিককে পড়াও বলিয়া দেয়।

পাকুল ও বকুল তাহার ব্যবহারে পূর্বের ভায় মুগ্ধ। কোন দিন কোন কারণে শৈলেন উপস্থিত না হইতে পারিলে উভয়েই সন্ধান চুপিত হয়, তবু লইবার লজ্জা লোক পড়াইয়া দেয়।

শৈলেন এখন তাহাদের নিকট পূর্বাগেকাও বেনী আপনার জন হইয়া উঠিয়াছে। নগেনের অভাব তাহার তাহাকে পাইয়া একেবারেই অনুভব করিতেছে না।

শৈলেনের মনটা তবু যেন ভরিয়া উঠিতে ছিল না। একদিন শৈলেন পাকুলকে একাকী পাইয়া বলিল—“পাকুল, আমার মনটা যেন বড়ই খালি খালি বোধ হইতেছে—কি যেন একটা কি রকম,—কিছুই বুঝিতেছি না।”

পাকুল হাসিয়া বলিল—“বসন্তের হাওয়া বহিলেই ভরিয়া যাইবে।”

শৈলেন বলিল—“বসন্তের হাওয়াও বেশ ফুটিয়াছে—কিন্তু তবু যেন—কাঁকা—শুভ্র—উত্তলা—উদাস—”

পাকুল হাসিয়া একটু ক্ষুদ্র টানিয়া বলিল—“কান্ডন প্রান্তের উত্তলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী” তবে সে উত্তলা-উদাসী ফাঁকা স্থান টুই ভর্তি করিয়া নিম্ন না—”

শৈলেন—কল্পনার না কার্য ?

পাকুল—যেমন খুসি।

শৈলেন একটু গভীর ভাবে কথাটা শেষ করিয়া ফেলিল। বলিল—“এই সুবসন্তে তোমাদের কুসবনে একদিন ছুবোনের গান শুনিবার সৌভাগ্য হইতে পারে কি ?”

পাকুল বলিল—সম্ভব। কালই চলুন না।

শৈলেন পাকুলের সহিত একটু অগ্রসর হইয়া নিরবরে বলিল—“প্রয়োজন যে কেবল তোমারই পাকুল !”

পাকুল বলিল—“তাই হবে। আপনি কাল যখন আসিবেন তখনই যাইব।”

বক্তব্য দিয়া শৈলেন সেদিন বিদায় হইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

অগ্রাহ্যে পাড়ী লইয়া আসিয়া শৈলেন পাকুলকে লইয়া গেল।

কুসবনের একটা উচ্চ স্থান শাখার পত্রাভরণে বলিয়া তখন কাল কোকিল ডাম ধরিয়া কুহ ডাকিতেছিল। পত্র রালের উগ্র পত্র ও খোলাপের মুহু মুহু পত্র দিশিয়া কুসবনের গগন পদম সুরভিত করিতেছিল।

পাকুল পাভাসহ একটি গোলাপ ফুল তুলিয়া শৈলেন-
নের পকেটে রাখিয়া দিল, আর একটি তাহার হাতে
দিল; একটি নিম্ন হাতে লইয়া আসিয়া একখানা আসনে
উপবেশন করিল।

শৈলেন কুজবনের ঠিক মধ্যস্থলে—পরিচ্ছন্ন শশপাসনে
বসিয়া পাকুলকে সেখানে আসিয়া বসিতে বলিল।
পাকুল আসিয়া নামিয়া বসিল। বাগানের মালী হার-
মোনিয়ায় তাহাদের নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল।

শৈলেন হাসিয়া বলিল—“গাও, একটি খুব নূতন
সাময়িক গান গাও, তরলও না হয় জম্বাটও না হয়।

পাকুল অপাঙ্গে হাসি জমাইয়া হারমোনিমে সুর
বহিল, তার পর পাইতে লাগিল—

আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।

সন্ধ্যাবেলার চামেলিপো, সকালবেলার মালিকা,
আমার চেন কি?

চিনি তোমার চিনি নবীন পাত

বনে বনে উড়ে তোমার রক্তন বসন প্রান্ত।

ফাগুন রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী

তোমার পথে আমরা ভেঁসেছি ॥

যর ছাড়া এই পাগলটাকে, এমনকরে কুগো ডাকে,
করুণ গুজরী।

যখন থাকিয়ে বিণা বনের পথে বেড়াই সুরী।

আমি তোমার ডাক দিয়েছি ওগো উদাসী
আমি আমার মজরী।

তোমার চোখে দেখার আগে, তোমার স্বপন চোখে লাগে
বেদন জাগে গো

আমি না চিনিতেই ভালবেসেছি ॥

যখন হুড়রে বেলা, চু করে বেলা তপ্ত ধূঁির পথে

ধাব করা ফুলের রথে, তখন সব কে লবি?

লব আমি মাধবী।

যখন বিদায় বাঁধীর সুরে সুরে, তখনো পাতা বাবে উড়ে
তখন সব কে রাবি?

আমি সব উদাস হব; ওগো উদাসী?

আমি ভরুণ করবী।

সমস্তের এই জলিত রাগে, বিদায় বাঁধা মুকিরে রাগে
ফাগুন দিনে গো

আমি কাঁদন ভরা হাসি বেঁসেছি।”

শৈলেন দক্ষিণ হাতে গোলাপটা নাকের কাছে বহিয়া
কাত হইয়া বাম হাতের উপর ভর দিয়া শুইয়া মুগ্ধ চিত্তে
তনিত্তেছিল। গান শেষ হইলে বলিল—“হৃদয় পানটা,
তোমার নিকট বতরুণ থাকি মনটা বেশ ধাঁকে, বাকী
দিনটা যেন কি একটা অভাবের ভাবে একেবারে কাটি-
তেই চায় না।”

পাকুল হাসিয়া বলিল—“সে আমার মৌভাগ্য।”

শৈলেন দ্বিবেৎ হাসিয়া বলিল—“জীবনকে শান্তিতে
রাখিবার উপায় কি? কৌন ব্যবস্থা বলিয়া দিতে
পার কি?”

পাকুল হাসিয়া বলিল—“এ মন্দ নয়, ডাক্তার আপনি
আর রোগের ব্যবস্থা করিণ আমি? এবার দেখিভোহ,
ডাক্তারিই পড়িতে হইবে।”

শৈলেন বলিল—“আমার ইচ্ছা, তুমি নার্সিক্রোশে
ভর্তি হও। তাহা হইলেই যেন তুমি তোমার সে দিনকার
বক্তৃতার উচ্চ আদর্শে জীবনকে পরিচালন করিতে
পারিবে।”

পাকুল আগ্রহের সহিত বলিল—ঠিক বলিয়াছেন।
শৈলেন দা, আমি ‘মেট্রিক’ দিয়াই নার্সিক্রোশে ভর্তি
হইব! আমরা আমাদের পাঠ্য পুস্তকে টলষ্টেরের
“Where Love is, God is” গল্পে পড়িয়াছি একবার
জন সেবাই ভগবানের সেবা। আমরা নাকি ভগবানের
কার্যেই এই জগতে আসিয়াছি—নিজের নিজের সংসার
করিবার জন্ত নহে।”

শৈলেন—“তা ঠিক, কিন্তু সংসার করা যে ভগবানের
ইচ্ছা নয়, সেটা বোধ হয় ঠিক নয়—

পাকুল—“তা হোক। তথাপি যেন আমার মনে
হয়, যে আমাদেরকে কেবলি জ্ঞা ও বাতা হইলে চলিবে
না। জনসেবা যে উচ্চতাব জাগ্রত করে সে ভাবই
জাতীয় জীবনে অধিক শক্তি সঞ্চার করে। এ ভাবটা
ইয়ুরোপের আমদানী—একটা অস্বকরণ করিবার মত
বিষয়। প্রাচীন ভারতে এই বেচ্ছা সেবার ভাবটা ছিল
বলিয়া জানা যায় না—ইং বড়ই আশ্চর্য্য বিষয় কিন্তু।”

শৈলেন বলিল—“ঠিক ধরিয়াছ তুমি, বেচ্ছা সেবার
প্রথা প্রাচীন ভারতের অমর্ত্যন সমূহে দেখিতে পাওয়া

বার না। কবি সমীচীন সেন তাহার কৃষ্ণকোরে বোধ হয়
এখন তাহা দেখা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর এখন
হঠাৎ লক্ষ্যমণের সেবা কথাটারও একটু বেশ চম্ভিত
দেখা যায়; এটা আধুনিক ভাব।

পাকুল—“যুদ্ধের সুসংস্কার কথা বতাই বলেন—যুদ্ধ
ক্ষেত্রের ঐ নানি প্রথাটা খুঁট অসংকে দেবকে—প্রতিষ্ঠিত
করিয়াছে; ভারতীয় রমণী সমাজে এই ভাবটা সংক্রা-
মিত হয়—আমার প্রাণের ইচ্ছা।”

শৈলেনের নিকট এত সকল কথা ভাল লাগিতে
ছিল না, সে বিভ্রান্তা করিল—“তুমি কি দাম্পত্য ধর্মের
পক্ষপাতী নও?”

পাকুল বলিল—“দাম্পত্য ধর্মের আমি কোন দিন
বিরোধী নহি। দাম্পত্য ধর্মে জাতি হুঁট হয়, জাতির হুঁটই
না হইলে তাহার শক্তি লক্ষ্য হইবে কোথা হইতে?
আমার মত, নারী জাতির অন্ততঃ শতকরা কয়েক জন
সেবা ধর্মে দিক্রান্ত হউক।

শৈলেন—“আমাদের সমাজে বাহারা বিধবা আছেন,
তাহাদের ভিতর কি ঐ ভাব কম দেখা যায়? বরং খুব
অধিকই দেখা যায়।

পাকুল বলিল—“এ সেবাতাব কেবল নিজ পরিবারের
ভিতর—কেবল কোন নির্দিষ্ট পুত্র ভিতরই ক্রিয়া করে,
বাহিরে তাহা বাইতে পারে না।”

শৈলেন—“তাহাদিগের হাতে সমাজ সেবার ভার
কল্প করিলেইতো ভাল হয়।”

পাকুল বলিল—“পারবারের কর্তা তাহার পরিবারের
বিধবাকে নিজ সমান হাস্যর ভরে পর সেবার দেন না;
অথচ নিজ পরিবারেও পুত্র কন্যাদীন বিধবার অবস্থা অতি
শোচনীয়।”

শৈলেন বলিল—“ইহার আলোচনা করিতে গেলে
অনেক কথা বলিতে হয়। এখনতঃ আমাদের সমাজের
পুঙ্খবোধ্য দুই কল্যাণ (Cultured) নছেন; নারী
জাতির উপর ক্রিয় প্রভাব সহিত দৃষ্টি করিতে হয়,
আমাদের। এইখানে আর একটা কথা উঠে—সেই
কথাটি যেখানেই এখানে জীব বাধীনতাও নিরাপত্তা নহে।
এই কারণে কারণে বিধবারা বাঁচী বাঁচী বাঁচিয়া বা

প্রাণান্তে বাঁচিয়া পর সেবার রত হইতে পারেন না।
জীলোকেরাও বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারেন না।
এ বিষয়ে আমাদের এই শোচনীয় সমাজ ‘কৃষ্ণার পক্ষ
যুদ্ধ, কর্তৃত্ব বিধ।’

পাকুল বলিল—“আমনি কি আপনাদের মেরেদের
বিপদে আপনাদের যুঁটটা টানিয়া ছুঁপ করিয়া বলিয়া থাকি-
বার পক্ষপাতী?”

শৈলেন হাসিয়া বলিল—“নিশ্চয় না। টিকেট
কিনিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিয়া দৈব ক্রমে নিজে
গাড়ীতে উঠিতে না পারিলে যে মেরেগুলি লক্ষ্য
যুঁটটা টানিয়া বসিয়া বসিয়া গাড়ীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত
চলিয়া বাইবে, এরূপ লক্ষ্যবীনতার ও পরাধীনতার আমি
পক্ষপাতী নহি।”

কথা শেষ করিয়া শৈলেন পাকুলের ডান হাতখানা
টানিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—

“এখন তোমার নিশ্চয় সম্বন্ধে—পাট কথার—বল
দেখি—তুমি বিবাহ করিব কি না?”

পাকুল হাসিয়া বলিল—“বিবাহটা আমার নিকট
মিতাওই বেন একটা উত্তম কাণ্ড বলিয়া মনে হয়
শৈলেন দা।”

শৈলেন—“তবে করিব না?”

“আপাততঃ না।” বলিয়া পাকুল হাসিয়া উঠিল।
সভ্যার বাতালে হাসনা হেনার গল্প ছুটিতে ছিল। শৈলেন
বলিল—“হাসনা হেনার গল্পটা আমি কিত্ত বুঝা পেন না।”

পাকুল—“হুলের গল্প কি লোকের উপভোগের অন্তই
মুখু—তাহাইলে যে ভগবানের ব্যবহারকে দোষারূপ করিতে
হয় শৈলেন দা।”

শৈলেন—“তবে হুলের ছুটিয়া ও গল্প বিস্তার করিয়া
বার্ধক্যতা কি?”

পাকুল—“তার কোটাতেই বার্বক্যতা।” বন্ধ বিলা-
মতেই বার্বক্যতা।

শৈলেন—“হুঁট উদ্বেগ তো বুঝিতে হইবে।”

পাকুল—“তবে হুলের কোটার উদ্বেগ—তার নিম্নের
নিকট—এ কোটার প্রকাশ ও গল্প বিস্তার করি। ততের
নিকট তাহা ছুঁনিয়া দিয়া সুখার আশ্রয়। বার্বক্য

ফ্রেন্ডসের নিকট—তাঁহার প্রেমস্বপ্নের পলকেশ্বর শোভা
হ্রাস্ত করা। কিন্তু এগুলি সব বে বাস্তবের কল্পনিক উদ্দেশ্য
—রূপবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়। ভগবান বাস্তবের
কতই ব্যস্ত নহেন; তিনি তাঁহার অপকল্প প্রকৃতি
সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত। তাঁহার উদ্দেশ্য অপ্রকাশ। আমার
বোধ হয় বাস্তব নিজ এরোমনে তানিয়া-পড়িয়া তাঁহার
সৃষ্টিকে বিকল করিয়া দিতেছে।”

পাকুল বে এত ভর্ক করিবে, শৈলেন তাহা ভাবে
নাই; তাঁহার এত দিনের ব্যবহারেও তাহা প্রকাশ
পায় নাই। তাঁহাদের সহবাসেই বে তাঁহার এই অভ্যাস
হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত, সুতরাং সৈকন্ত শৈলেন তাহাকে
দোষ না দিয়া প্রীতির ভাবেই বলিল—“দাম্পত্য জীবনভতো
বেচ্ছা সেবার অন্তরায় নয়।”

পাকুল হাসিয়া বলিল—খুব অন্তরায়। এর ভিতর
বেচ্ছা তাবটী আছে, কিন্তু দাম্পত্য জীবনে ভারতীয় স্ত্রীর
Personality (ব্যক্তিত্ব) নাই, সুতরাং বেচ্ছা—সেখানে
বেচ্ছাচারিতা। এদেশে স্ত্রীলোকের এরূপ বেচ্ছা বিহারে
কোন স্বামী প্রশংসা দিবেন না; দিতে পারেন না।
আপনি দিবেন কি?”

শৈলেন গভীর ভাবে বলিল—“কার্যের বিচার তাঁহার
উদ্দেশ্য দিয়া, এরূপ নয় উদ্দেশ্য বাহাতে নিহত, তেমন
কার্যে কোন স্বামী স্ত্রীকে উৎসাহ না দেয়।”

পাকুল হাসিয়া বলিল—এ তো হইতেছে বক্তৃতার কথা।
শৈলেন না, কোন কাজের কথা নয়। যদি তা হইত,
তবে দেশের সেবা কার্যে ইরোরোগীর Red-crossএর
মহিলারা আসে কেন, আমাদের দেশে কি মাতা ভগ্নী
নাই? যেরে যেরেই আছে। কিন্তু ওই ভাবগ্নী নাই। ‘মাছও
ধরিব, জলও ছুইব না’। ঠিক এই ভাব থাকিলে এ সকল
মৎস্য কার্য হয় না। এর জন্য রীতিমত সমাজ চাই।”

মধ্যা অতিক্রম করিয়া পিয়া কোৎমা উঠিয়াছিল
শৈলেন বলিল—“চল এখন যাওয়া যাউক। রাঁধি হইয়া
গেল। বাড়ীতে কিছু বলিবে না কি?”

পাকুল বলিল—“রাঁধি চটা পর্যন্ত হইতে পারে, বলিয়া
আনিয়াছি।”

শৈলেন বলিল—“রাঁধি হউক, খোঁড়াও হউক আমি পার

দিতে পারিলাম না। বেচ্ছা সেবার তোমার ইচ্ছা
থাকিলে দাম্পত্য বর্ষ প্রতিপালন করিয়াও যে কেন তুমি
তাঁহা করিতে পারিবে না, আমি তাঁহা বুঝিতে
পারিতেছি না।”

পাকুল একটু হুগুণিত হইয়া বলিল—“নারীর বৌবন
কি কেবল পুরুষের উপভোগের জন্যই হইত বলিয়া তবে
আপনি মনে করেন? তার কি আর কোন স্বার্থকতা
নাই? পুরুষ বৌবনে অপভোগের কত কল্যান সাধন করি-
তেছে, কেন নারীর—”

শৈলেন নিজেকে একটু অপমানিত বোধ করিয়া ক্রুদ্ধ
ভাবে বলিল—“যথেষ্ট হইয়াছে, আর কাল নাই, চল
এখন।”

পাকুল হাসিয়া বলিল—“রাগ করিবেন না শৈলেন দা।
কই, পান তো শুনিলেন না আপনি, একটা উপসংহার
গাইয়া চলুন—”

পাকুল হারমোনিয়ামে সুর টানিয়া বলিল—“শৈলেন
দা, এই কোৎমার স্বার্থকতা সবচেয়ে আমাদের কবি-
ভগিনী কিরণ গাহিয়াছেন শুভ্রম—

“এখন টানিনী মধুর বাহিনী সে বদ্বিপো শুধু আলিত।

পরানে এখন আকুল পিরাসী সে বদ্বিপো ভালবাসিত।

এ মধু বসন্তে এত শোভা হাসি, এ নব বৌবনে এত রূপরাশি,
সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি সে বদ্বিপো পোস্তু চাহিত।

মিথ্যা বিধি তুমি, মিথ্যা তব সৃষ্টি,

কেন এ সৌন্দর্যে নাহিতব সৃষ্টি,

হলাহলে তরা প্রেমসুখা মিষ্টি, তবে, কেন প্রাণ ভূষিত।

গানের মিষ্ট সুরে শৈলেন রানি, অপমান জুলিয়া গেল।

তাঁহারা চলিয়া যাঁতেছে দেখিয়া বাগানের মালি
হুইজনের হাতে দুটী ফুলের মালা ও ফুলের স্তবক দিয়া
সেলাম করিল। শৈলেন তাহাকে পুরস্কৃত করিল।

পাকুল তাঁহার হাতের মালা গাছটা শৈলেনের গলে
পড়াইয়া দিল। শৈলেন তাঁহার হাতের মালা গাছ
পাকুলের গলে দিতে বাইরা ধামিয়া গেল।

পাকুল মাথা নোয়াইয়া বলিল—“দিন না, ও সকল
কলংকারের দ্বার খারিবেন না।”

শৈলেন কম্পিত হতে তাঁহার মালা গাছটা পাকুলের
গলায় দিয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া লইয়া গিয়া পাড়ীতে
উঠিল।

বদররানী ।

('প্যারিডি' বা ব্যঙ্গাত্মকরণ)

বদন শোভন গগন ব্যাপিরা অলস জীবন হাতে ;
নভের নকশে স্বাক্ষর আঁসয়ে, বাসে ঘিলে ব্যাং ডাকে,
এহেন নদীর বাহানী কে বলে—‘কোথা নেকুলেশখানি ?’
আবার আলিরানী সে বে গো—আবার বদররানী ।
কুটি কাটা রোমন হই কোরে বদন বারসেরা পানি বাতে,
একই স্তম্ভল স্রোত পরসে সবে হাঁকছেড়ে বাতে ;
কখন হাঁতানে নবোন্মো কলহার শানিত স্নিগ্ধবাহী—
আবার আলিরানী সে বে গো—আবার বদররানী ।
আ'কসে আলয়ে বাটে বরধানে চুইট-কুচিত না বে,
ভাহারই বাহানী ভাগে স্বপ্নে, ভাহারই সানিক বাজে,
নদী স্রোতের কাছে হুড়ে সেই আবার আলিরানী
আবার আলিরানী সে বে গো—আবার বদররানী ।
তোমাদের বেলা হইব আমার আপন আলর বানী,
'কোন্সে হুড়েছে' বলিয়া ভাহার হেরিব নদুর হাসি,
ভসিব তখন কোকিল কণ্ঠে ভাহার সোহাগ বাণী
আবার আলিরানী সে বে গো—আবার বদররানী ।

ঐক্যপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

মেসুমেরিজম ।

(ইংরেজী গল্প)

বদন মিঃ কপের শিতলভারের হাত উঠিতে আরম্ভ
হয় তখন বেতারা রাতে অত্যন্ত অশান্ত হইল। উঠিয়াছিল ।
নভান নদুন পিতা পুত্রের অস্ত্র একই বেশী মজার বহ-
শীল হইয়াছিলেন এবং বস্ত্রখানি মনোযোগ ভাৱে আত
বেতারা স্নানকৃত ছিল তিনি তাহা অগত্যা বেশীই দিতে
প্রস্তুত হইয়াছিলেন । রাতে পুত্র বদন পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন
করিয়া উঠিল, মিঃ কপ, কিছু রাত বিরক্ত না হইয়া
অর্ধোন্মত্ত বেগে উঠিয়া শিতলকে কোণে বসিলেন এবং
তাহাকে মালা একত্রে ধোয়াইয়া, তন তন করিয়া হুকা
পাখিয়া দাঙ করিতে চেষ্টা করিলেন ; এরূপ ভাবে উঠিয়া
শান্ত করিবার পাল্লা বদন পকসন হইতে বোতল দাঙ

অধিকার করিয়া তখনও ভাৱাই বৈকল্যের কোন
লক্ষণ দেখা গেল না । ভাৱার বে সত্যকথিত্য পড়িত ও
সাহসের সত্যকথা নাই একথা ভাবিয়া তিনি আশ্রয়
অনুভব করিতেন এবং অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত শিতল
বদন পায়াইতেন ।

একদিন রাতে শিতল কিছু অধিক রাজার অধির
হইয়া উঠিল, এবং সারাগাত অনিশ্চিত থাকিবার ভয় বেন
হির সতর্ক করিয়া বসিল ; মিঃ কপ, কয়েক মণ্টা বসিয়া
তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়া অবশেষে অকৃতকার্য
হইলেন, তখন ভাৱার দ্বীপ দিকট প্রত্যক্ষ করিলেন,
একটা দাত হইবার 'পিল' উত্তরে বাতায়িয়া দিলে তান
হইত, কারণ শিতলই পেটের বেদনার উহাকে এরূপ
অধির করিয়া ছুনিয়াছে ।

প্যারোনেটিভ পিল, কলকই ছিল, তিনি আনিবার
অন্ত বিসেস কপকে নীচে ডেকেমাগারে বাইতে হইল ।

বিসেস, কপ, গ্রহান করিল, মিঃ কপের মনে পড়িল,
অনেকের বেদনা বেশেবেরিজন অতি সহজে উপশমিত
হয়, এরূপ কথা শোনা গিয়াছে ; বস্ত্রতা সম্বোধনের
এত প্রবল শক্তি আছে কি না সে বিষয়ে ভাৱার নিম্নের
কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না । এই সব চিন্তায় তিনি অত-
নন্দ হইয়া শিতল অনুশলন করিয়া বর্ণন করিতে লাগি-
লেন এবং ভাৱার মাথা হইতে পা পর্যন্ত করেবাব বীরে
বীরে হাত বুলাইয়া গেলেন । তিনি লইয়া বিসেস, কপ,
বদন সোপনারোধন করিতে ছিলেন তখন মিঃ কপ, আশ-
চর্য্য সহিত চাহিয়া দেখিলেন শিতল সম্পূর্ণ শান্ত হইয়া
পতীর নিজায় নিদ্রা হইয়াছে । বিসেস, কপ, আলিয়া
উহাকে ভাৱার বিধানার পরম করাইলেন । সে রাতিতে
আব ভাৱারের ঘুম ভাঙ্গিল না ।

পরদিনও বেলা গেল শিতল শিত্তিকভাবে দিয়া বাই-
তেছে ; কলী বলিলেন, বরতো উহার হাত বাহির
হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই সে এক আশ্রয় বোধ করি-
তেছে । মিঃ কপ, কয়েকপে বলিলেন “হইতে পারে” ।
কিন্তু ভাৱার স্বপ্নে একটা মনে-হের কীণ রেবার উদর
হইয়াছিল ।

প্রান্ততোল সমাপন করিয়া মিঃ কপ, উপরে পরম
কপে দেখিতে গেলেন, শিতল তখন অশান্ত হইয়াছে কি

না? দেখিলেন, কয়েক সেরিভিট। বড়দারা তাহার নিদান-প্রদান অল্পতব করিলেন, কয়েক দান দান দিলেন, অবশেষে উভয়েই কানিরা দান পরিহার করিলেন, কিন্তু কিছুতেই উহার যুগ আসিল না। বিঃ কপ্‌ তাঁত চিত্তে তাহার টুপিটি ভুলিয়া গিয়াছিল। আকিসে বাইবার উযোগ করিলেন। কতী ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, “নবর বরজা বেশী ছোড়ে বহু করিয়ে না, বোকাই যুগ আসিয়া যাইবে।”

বিঃ কপ্‌ কিছু প্রাণপণ পড়িতেই এবাট বহু করিলেন। এবং শিকড়ির আত্ম আশিবার সত্যতা নাই, চিত্তা করিতে করিতে রাত্তার আসিয়া পড়িলেন।

“যদি যে কমান্ড কয়েক বৎসর পরিত। যুগাইতে থাকে, তবে কি হইবে? মনে করুন অর্ধ শতাব্দী এইরূপ ভাবে যুগাইয়া একেবারে বৃদ্ধাচার প্রাপ্ত হইল, মাতানিত। কে, তাহা জানিল না, সংসার সবচে কোনও অভিজ্ঞতা নাই।”

এই চিত্তার বিঃ কপ্‌ উমানের বহু হইয়া উঠিলেন; Rip-Van-Winkle এর কথা তাঁহার মরণ হইল। কিছু দিন পূর্বে বাহুবরে তিনি এক বৃদ্ধকে দেখিয়াছিলেন, সে বিনবৎসর ব্যাপিরা নিজা বাইতেছিল, কেবল মাঝে মাঝে কয়েক মিনিটের জন্য আগিয়া খাইতে চাহিত। তাহিলেন, হয়তো তাঁহাদের বৃত্তার পর শিকড়িকে কোনও বাহুবরে লইয়া রাখিয়া দিবে। এই সব চিত্তার তাহাকে অস্থির করিয়া ছুঁল। আকিসে বাইরা ছুই একটা কাল হাতে লইলেন কিন্তু কোনটাই পূস্পন্ন করিতে পারিলেন না; অবশেষে গৃহে কিরিয়া আসিলেন। বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, মিসেস্‌ কপ্‌ একটু উবেগ অল্পতব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন “তপো প্রভুই আকর্ষ। বোকা এখনও জানিল না, বোধ হয় দারিদ্র্য প্রভির জন্য এতদূর হইরাছে; আরা বেচারি। আমি কিন্তু একটু চিত্তিতই হইয়া পড়িয়াছি।”

মিস্‌ কপ্‌ আরও ভীত হইলেন; উপরে গিয়া জীর অসাক্ষাতে বোকার পায়ে একটা শিশু, হুড়িয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহার নিজার কোনও বাসাত হইল না। কয়েকবার এই প্রকার প্রক্রিয়া করিয়া অবশেষে উহাকে প্রাপ্ত করিবার সকল আশার সমাপ্তি দিয়া মিস্‌ কপ্‌

পুনরায় আকিসে প্রত্যাপন করিলেন। এবং তাহার বলিয়া বলিয়া চিত্তা করিতে পারিলেন—পূর পরিভাষা করিয়া পক্ষায়ন করিব না জীর শিকড় বাইরা সকল কথা বোকার করিব।

কয়েক বর্ষ পরে তাহার জী মিলেই তাহার আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, “তপো, বোকা এখন পর্যন্তও যুগাইতেছে, আমি কিছুতেই উহাকে কানিাইতে পারিলাম না; উহাকে ডাকিয়া, বীকাইয়া, সব বহু করিয়া দেখিয়াছি, কিছুতেই উহার নিজা আসিল না; উহার হইল কি? ভয় হয়, বৃদ্ধি ভিতরে সাংঘাতিক কিছু ঘটরাছে।”

“হয়তো বোকা মিলের বেলা একটু বেশী যুগাইয়া লইতেছে, তাহা হইলে যাহা অরিকল্প আগিয়া ইহার মন পূর আদার করিয়া লইবে।” অতিক্রমে তৎপ্রাপ্ত হাত আসিয়া, একটু রসিকতা করিবার উদ্দেশ্যে বিঃ কপ্‌ এই কথা শুনি বলিলেন।

“মিস্‌ কপ্‌, এসব কথা লইয়া তামাসা করিতে তোমার লজ্জা বোধ করা উচিত; মনে কর বোকা, যদি এইরূপ যুগত অবস্থাতেই বরিয়া যায়। আমার বিধাণ বেচারি সত্যই যুগা যুগে অগ্রসর হইতেছে, তুমি এখনই ডাক্তারের জন্য বাত।”

মিস্‌ কপ্‌ অবিলম্বে ডাক্তারের জন্য ছুটিলেন এবং অর্ধ বর্ষ পরে ডাক্তার গিলের সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার শিকড় তাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “কেন্দ্রী একটু অল্পত; আমার বিধাণ বোকা আকিসের দ্বারা প্রাপ্ত অভিজ্ঞত হইরাছে।

মিসেস্‌ কপ্‌ সন্দেহচক্রে বাবারে নিজা করিলেন “আমি যুগাইবার পর কি তুমি উহাকে আকিস্‌ বাও-রাইয়াছিলে?”

মিস্‌ কপ্‌ দীর্ঘাক্ষ কলেবর হইয়া বলিলেন, “তোমার দিবা, কিছুই খাওয়াই নাই।”

মিসেস্‌ কপ্‌র মনে পড়িল, গতরাতে তিনি শিকড়কে মিস্‌ কপ্‌র শিকড় রাখিয়া লীতে গিয়াছিলেন, এবং কিরিয়া আসিয়া অবধি উহাকে প্রাপ্ত যুগত দেখিতেছেন। পুনরায় উগ্রভাবে নিজা করিলেন, “তুমি ঠিক বলিতেছ উহাকে কিছুই খাওয়াও নাই?”

মিঃ কপ, এম্বিঃ হইয়া বলিলেন “বেয়া। তোমার কি বিপদ আমি দেখিতে পারি। আমি যে কোনও প্রতিজ্ঞা করি। বলিতে পারি, উহাকে কিছুই খাওয়াই হইবে।”

অনন্তর বলিলেন “রুই আশ্চর্য। আমি এতদূর কোন আশাও পাই নাই; আমার মতে এ সবকে ডাক্তার...”

করুন মিসেস, কপ জন্ম করিতে লাগিলেন। মিঃ কপ, হৃদয়গতবীর হইয়া ডাক্তারের সহিত নীচে নামিয়া গেলেন। হলের ভিতরে আসিয়া ডাক্তারকে নিম্নে ডাকিয়া লইয়া নিরাকর্ষ বলিলেন, “ডাক্তার। আপনাকে একটা কথা বলিতে চাই, কিন্তু তাহার পূর্বে আপনাকে বলিতে হইবে যে কথটা প্রকাশ করিবেন না।”

“বেশজো, কি কথা?”

“মিসেস, কপের নিকটে বলিবেন না?”

“না।”

“কথটা এই যে, ডাক্তার—আমি—আমি—আমি বলিতে পারি খোকাই কি হইয়াছে।”

“আমি জানি। তবে একজন বলেন নাই কেন উহার কি হইয়াছে?”

“কথটা এই, আমি উহাকে কল্য রাতে মেশেরিতক্ করিয়াছিলাম।”

“মেশেরিতক্ করিয়াছিলেন। তবে এখনও উহাকে প্রতিকার করেন নাই কেন?”

“ইহাই তো বড় অমিষ্টের মূল; কেনন করিয়া যে উহাকে প্রতিকার করিতে হইবে, তাহা আমি জানি না; উহার যেহে হাত দুইটিকে বুলাইতে সে হটাৎ শব্দ হইয়া আমায় জোড়ে চলিয়া গেল। একজন ব্যবসায়ী মেশ-বেরিয়ার আদায়ীরা উহাকে প্রতিকার করুন না কি?”

“নতুন নয়; আমি যে একজনের কথা জানি, সে নামজালিস্ কো, যে থাকে, তাহাকে টেলিগ্রাম করিয়া আনাইলেও এক মণ্ডাক আসিবে।”

“ইতিবধৌ প্রোক” বলিয়া বাইবে এবং বেরিয়া উদ্গাদিত হইয়া গেল। হায়, হায়। তবে এখন বুঝা যায় কি?”

“আমি আমার ডাক্তার ডাক্তারের নিকটে গাই, তিনি হইল উপায় বলিয়া দিতে পারেন।”

উত্তরে ডাক্তার ডাক্তারের পূর্বে আসিয়া, সরকরা প্রকাশ করিলেন। ডাঃ ব্রাউন ডাক্তারকে আমায় প্রকাশ করিলে, তাহাকে লইয়া উত্তরে পুনরায় মিঃ কপের পূর্বে আসিলেন। এখন তিনি মনে পরমকণ্ঠে প্রবেশ করিলেন ভবন মিসেস, কপের দুই হইবার উৎকর্ষ হইয়াছে।

ডাক্তার ব্রাউন খোকাটিকে বিছানার পার্শ্ব করিয়া উহার কপাল বগড়াইতে এবং চোখে দুই গুলি মিসেস করিতে লাগিলেন; এইরূপ করে মিঃ কপের পর শিশু চক্ষু মেলিয়া চাহিল এবং উচ্চৈঃস্বরে জন্ম করিতে লাগিল।

যে বর তিনি মিঃ কপ কেবল বিরক্তিই বোধ করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাহা সজীত অপেক্ষাও যথু বলিয়া মনে হইল। মিসেস কপ আনন্দে অধারা হইয়া খোকাটিকে জোড়ে গ্রহণ করিলেন এবং আদর-চুম্বন বর্ষণে তাহাকে অধর করিয়া তুলিলেন। মেশকর্ণ সোহাগের সহিত শিশুকে বকে চালিয়া ধরিয়া দ্বিজাস করিলেন—উহার কি হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন, ডাক্তার?

কেন, আপনার বামী বলিলেন তিনি উহাকে মেশ-মেরাইকক্ করিয়া কেলিয়াছিলেন।

ডাক্তার ব্রাউন জানিতেন না কথটা প্রকাশ করিয়া কি বিপদ আসিলেন।

মিসেস কপ অপরাধীর হিকে একদা তীব্র দুটি নিকপ করিলেন যেন এখনই তাহাকে হত্যা করিবেন কিন্তু শুধু “শিলাচ।” এইকথাটা মূৰ হইতে রাহির করিতেই তিনি বেগে বক পরিত্যাগ করিলেন।

মিঃ কপ ডাক্তারদিগের সহিত নীচে নামিতে নামিতে বলিলেন, “এখন হইতে খোকা চীৎকার করিয়া গলা ছিঁড়িয়া কেলিলেও আমি কিছু বলিব না।”

শ্রী অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

